শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৫৩শ বর্ষ) ফাল্গুন, ১৪০৭ (১ম সংখ্যা

শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠে সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

যুগ্ম-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

কার্য্যালয়

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ✆ ৫৫৫-৮৯৭৩

২৮, হালদার বাগান লেন, কলকাতা—৭০০ ০০৪

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

卐 ☙ 卐

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ., বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ
শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন
শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

卐 ☙ 卐

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, *বিদ্যারত্ন*

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

[মাসিক]

ত্রিপঞ্চাশৎ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৫১৫ বিষ্ণু হইতে ৫১৫ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৪০৭ ফাল্গুন হইতে ১৪০৮ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ২০০১ মার্চ্চ হইতে ২০০২ ফেব্রুয়ারী।]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহ-সম্পাদক ও প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

卐 ☙ 卐

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ., বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ
শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন
শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

卐 ☙ 卐

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, *বিদ্যারত্ন*

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

ত্রিপঞ্চাশৎ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধাদির সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অঋণী	১২।৪৫২
অদৃষ্ট	৭।২৫২
আচার্য্যের অবদান-বৈশিষ্ট্য	১২।৪৬০
উদ্ধব-কৃতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণমহিমা-দশকম্—শ্রী	৮।২৮১, ৯।৩২১
উড়ুপীতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	১০।৩৮৯
একাদশী-মাহাত্ম্য	৮।২৯৭
কর্ম্ম	৯।৩৩৯
'কালস্য কুটিলা গতিঃ'	১।১৬
কৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	৪।১৫৩
কৃষ্ণচরণ-পরমগুরু-প্রভুবরাষ্টকম্—শ্রী	৩।৮১
কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন—শ্রী	১০।৩৬৫, ১১।৪০৫, ১২।৪৪৪
কেন ভজন হয় না?	৭।২৭৩
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবে শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত]	১।২৮, ২।৭০, ৩।১০৪
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শিলং-এ প্রদত্ত]	৩।১০৯, ৪।১৪৮, ৫।১৯২
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [গৌহাটীতে প্রদত্ত]	৬।২২৯, ৭।২৭৬, ৮।৩০৯
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [আসানসোলে প্রদত্ত]	৯।৩৫৫, ১০।৩৯২, ১১।৪৩৩, ১২।৪৬৫
গোপাল-দেবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	১।১
গোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী	১০।৩৬১, ১১।৪০১, ১২।৪৪১
গৌড়ীয়ের ত্রিপঞ্চাশৎ-বর্ষ—শ্রী	১।৩৫
গৌড়ীয়-পত্রিকা সম্বন্ধে বক্তব্য [শ্রীল কেশব গোস্বামী]	১।১০
গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব [শ্রীল কেশব গোস্বামী]	২।৫১, ৩।৯০, ৪।১২৮
গৌড়ীয়	৯।৩৪৪, ১০।৩৮৪
গৌড়ীয় মঠ কি করেন?	৯।৩৫০, ১১।৪২৩
চরণামৃত—শ্রী	১।১৩
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৪।১৫৯

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
জনকরাজ	১১।৪২৭
জীবতত্ত্ব	১।২৬
জীবের কৃত্য	২।৭৮, ৩।১১০, ৪।১৪৫, ৬।২২৪
জ্ঞান	১০।৩৭৮
ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৬।২৩৯
তর্কপন্থা ও শ্রৌতপন্থা	৮।২৯৪
দশমূল-তত্ত্ব [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৯।৩২৩
দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা	২।৫৭, ৩।৯৩
দ্বাদশ-বৈষ্ণব (৭) প্রহ্লাদ	১।২৪, ২।৬৭, ৩।৯৬, ৪।১৪২
ধাম-বৈশিষ্ট্য [কবিতা]	৭।২৬৬, ৮।৩০৩, ৯।৩৪৮, ১০।৩৮৮, ১১।৪৩১, ১২।৪৫৪
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	৩।১১৫
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১২।৪৭৩
নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর	৪।১৩৫, ৫।১৮২, ৬।২১৩, ৭।২৫৬
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব—শ্রী	১।২০, ২।৬৪
নিবেদন [কবিতা]	১।৩৪
পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার	৪।১৫৫, ৫।১৯৬, ৬।২৩৫
পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৫।১৬৪
পুরুষোত্তম-ব্রত [শ্রীল কেশব গোস্বামী]	৫।১৭৩
পুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৬।২০৪
প্রণতি-কুসুমাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে	১২।৪৬৪
প্রকৃত ভারতবাসী কে?	১০।৩৭১
প্রশ্নোত্তর [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১।৪, ২।৪৪, ৩।৮৪, ৪।১২৩, ৫।১৬৪, ৬।২০৩, ৭।২৪৪, ৮।২৮৪
প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা—শ্রীল	১।৮, ২।৪৮, ৩।৮৮, ৪।১২৬, ৫।১৭০, ৬।২০৮, ৭।২৪৬
প্রভুপাদাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	২।৪১
প্রভুপাদের হরিকথামৃত—শ্রীল	৮।২৮৭, ৯।৩২৭, ১০।৩৬৯, ১১।৪০৯ ১২।৪৪৭
প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের পার্থক্য	১১।৪১৯, ১২।৪৫৬

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
প্রার্থনা [কবিতা]	৪।১৪৮
পৃথুমহারাজ-কৃতঃ শ্রীশ্রীহরি-স্তবঃ—শ্রী	৫।১৬১
পৃথুমহারাজকৃতা গো-ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মণ্যদেব-স্তুতিঃ—শ্রী	৬।২০১, ৭।২৪১
বিপদাপদই মানুষের প্রকৃত বন্ধু	৮।২৯৯
বিবৃতি ও প্রার্থনা [কবিতা]	৪।১৪৪
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি	৬।২৩৮, ৯।৩৪৭
বিশেষ নিবেদন	৮।৩১৮
বিগ্রহ—শ্রী	৩।১০৬, ৪।১৪০, ৫।১৮৮, ৬।২১৮, ৭।২৬১
বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	৩।১২০
বিজ্ঞাপন—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রবন্ধাবলী, তত্ত্ববিবেক ও ভক্তিতত্ত্ববিবেক	৫।১৭৭
বিজ্ঞাপন—সাধুসঙ্গে দক্ষিণ ভারত তীর্থ দর্শন	৭।২৬০
বিশ্ববৈচিত্র্য ? [কবিতা]	২।৬০
বৈষ্ণবসেবা	৯।৩৩৫, ১০।৩৭৫, ১১।৪১৩
বৈষ্ণবাপরাধ	১১।৪১৩
ব্যর্থতা [কবিতা]	৬।২২২
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১০।৩৯৯, ১১।৪৪০
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	১২।৪৬৮
ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র	৩।১০০
ভগবদনুশীলন [শ্রীল কেশব গোস্বামী]	৭।২৪৯
ভক্তি-অর্ঘ্য [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে	৫।১৮৬
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমদ্ [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৮।৩১৯
ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিতে	১২।৪৬৩
ভ্রম-সংশোধন	৮।৩১৩, ১১।৪৩০
রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা সম্বন্ধে বিকৃত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—শ্রী	৪।১৩১, ৫।১৭৮, ৬।২১০
রাধাষ্টমী সর্ব্বতিথি-সার কেন ?—শ্রী	৭।২৬৪
রাশিয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার	৮।৩১৪

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রী [শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ]	৮।২৮৭, ৯।৩২৬, ১০।৩৬৬
সন্দর্ভ-সার	২।৫৩, ৭।২৬৮, ৮।২৮৯, ৯।৩৩১, ১১।৪১১, ১২।৪৪৮
সায়ম্ভুব-মনুকৃত-শ্রীশ্রীভগবন্মহিমা-দশকম্—শ্রী	৪।১২১
সাধুসঙ্গে শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-উদ্‌যাপন	৪।১৫৮
সাধুসঙ্গে দক্ষিণ ভারত তীর্থাদি দর্শন	৮।৩১৭
হরিভজন হ'ল না!!	৮।৩০৬
Statement about Shri Goudiya-Patrika	১।৪০

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

আজীবন সদস্যগণের তালিকা (২০০১-২০০২)

১। শ্রীমুকুন্দ দাস
বামনী ময়দান, গৌহাটী (কামরূপ) আসাম—২১।

২। শ্রীপ্রদীপ কুমার সেন
ডাঙ্গালপাড়া, হাতিয়া রোড (দুমকা) ঝাড়খণ্ড।

৩। শ্রীঅজয় কুমার মান্না
নিশ্চিন্তপুর, সোমরুক, উলুবেড়িয়া, হাওড়া।

৪। শ্রীমতী ইলা দেব, শ্রীরামপুর, লম্বুছড়া, (ত্রিপুরা) ধলাই।

৫। কুমারী সন্ধ্যা রায়, কুমারগ্রাম দুয়ার, জলপাইগুড়ি

৬। শ্রীসুকুমার লায়েক, কেন্দঘাটা (দুমকা) ঝাড়খণ্ড।

৭। শ্রীমহীতোষ কুমার দাস
২৭/সি, কে. এম. নস্কর রোড, রিজেণ্ট পার্ক, কলকাতা—৪০।

৮। শ্রীপ্রদীপ কুমার ভাইয়া
তুরা (ওয়েষ্ট গারো হিলস্) মেঘালয়।

৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, গ্রাঃ + পোঃ—মাকালপুর, হুগলী।

১০। শ্রীমতী ইতি (পুতুল) দত্ত
দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং।

১১। শ্রীমনোজিৎ নাগ, ১৮, যোধপুর পার্ক, কলকাতা—৬৮।

১২। শ্রীরাহুল দত্ত, 'যোগমায়া', জয়কুমার রোড, শিলচর—২।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৩শ বর্ষ } ৫ বিষ্ণু, অনিরুদ্ধ, ৫১৫ শ্রীগৌরাব্দ ৩০ ফাল্গুন, বুধবার, ১৪০৭, ইং ১৪/৩/২০০১ {১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোপাল-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

মধুর-মৃদুল-চিত্তঃ প্রেমমাত্রৈকবিত্তঃ
স্বজন-রচিত-বেষঃ প্রাপ্তশোভা-বিশেষঃ।
বিবিধ-মণিময়ালঙ্কারবান্ সর্ব্বকালং
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ।। ১।।

যাঁহার চিত্ত মধুর ও কোমল, প্রেমই যাঁহার একমাত্র ধন, জননী প্রভৃতি স্বজনগণ যাঁহার বেষ রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে যিনি বিলক্ষণ শোভা প্রাপ্ত হন, যিনি বিবিধ মণিময় অলঙ্কার ধারণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোপালদেব আমার হৃদয়ে চিরকাল স্ফূর্ত্তি লাভ করুন।। ১।।

নিরুপম-গুণ-রূপঃ সর্ব্বমাধুর্য্য-ভূপঃ
শ্রিত-তনুরুচি-দাস্যঃ কোটিচন্দ্র-স্তুতাস্যঃ।

অমৃতবিজয়ি-হাস্যঃ প্রোচ্ছলচ্চিল্লিলাস্যঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ।।২।।

যাঁহার রূপ ও গুণের তুলনা নাই, যিনি সর্ব্বমাধুর্য্যের নৃপতি, সকলেই যাঁহার অঙ্গকান্তির দাসত্ব করে, যাঁহার হাস্যে অমৃতও ধিকৃত হয়, যাঁহার বদনকমল কোটি কোটি চন্দ্রকর্ত্তৃক স্তুত, যাঁহার ভ্রূনৃত্য সর্ব্বতঃ উচ্ছলিত, সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন।। ২।।

ধৃত নব পরভাগঃ সব্যহস্ত-স্থিতাগঃ
প্রকটিত নিজকক্ষঃ প্রাপ্তলাবণ্য-লক্ষঃ।
কৃত-নিজজন-রক্ষঃ প্রেম-বিস্তার-দক্ষঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ।। ৩।।

যিনি কোন অপূর্ব্ব গুণোৎকর্ষ ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার বামহস্তে শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরি শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, যিনি নিজ পার্শ্বদেশ ব্যক্ত করিয়াছিলেন ও শত-সহস্রভাবে লাবণ্যমণ্ডিত হইয়াছিলেন, স্বজন-রক্ষক ও প্রেমবিস্তারদক্ষ সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন।। ৩।।

ক্রমবলদনুরাগ-স্বপ্রিয়াপাঙ্গভাগ-
ধ্বনিত-রসবিলাস-জ্ঞানবিজ্ঞাপি-হাসঃ।
স্মৃত-রতিপতি-যাগঃ প্রীতি-হংসী-তড়াগঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ।। ৪।।

উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল অনুরাগবতী ব্রজাঙ্গনাগণের অপাঙ্গ-চালনায় যাঁহার রস-বিলাস-বিষয়ে পরিস্ফুট জ্ঞান-জনিত হাস্য সূচিত হইয়া থাকে এবং যিনি অনঙ্গ-যজ্ঞ স্মরণ করিয়া থাকেন, প্রীতিরূপী হংসীর তড়াগ-স্বরূপ সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন।। ৪।।

মধুরিমভরমগ্নে ভাত্যসব্যেঽবলগ্নে
ত্রিবলি-রলসবত্ত্বাৎ যস্য পুষ্টানতত্বাৎ।
ইতরত ইহ তস্যা মাররেখেব রস্যা
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ।। ৫।।

যাঁহার মাধুর্য্যময় দক্ষিণ-কটিদেশে আলস্যহেতু ত্রিবলি লক্ষিত হইয়া থাকে এবং সেই ত্রিবলির বিপরীত দিকে কন্দর্পরেখার ন্যায় মনোহর রেখা লক্ষিত হয়, সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন।। ৫।।

বহতি বলিতহর্ষং বাহয়ংশ্চানুবর্ষং
ভজতি চ সগণং স্বং ভাজয়ন্ যোঽর্পয়ন্ স্বম্।

গিরি-মুকুটমণিং শ্রীদামবন্মিত্রতা-শ্রীঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ।। ৬।।

যিনি ইন্দ্রকৃত বৃষ্টি নিবারণের জন্য শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন এবং বর্ষায় অভিভূত স্বজনদিগকে অন্ন-পানাদি প্রদান করিয়া যথোচিত স্থানে অর্থাৎ ঐ শ্রীগোবর্দ্ধনের নিম্নদেশে রক্ষা করিয়াছিলেন, শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণ করায় শ্রীদামের ন্যায় শ্রীগিরিরাজের সহিত মিত্রতার শোভা-সম্পাদনকারী সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন।। ৬।।

অধিধরমনুরাগং মাধবেন্দ্রস্য তন্বং-
স্তদমল-হৃদয়োত্থাং প্রেমসেবাং বিবৃণ্বন্।
প্রকটিত-নিজশক্ত্যা বল্লভাচার্য্য-ভক্ত্যা
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ।। ৭।।

সেই শ্রীগোপালদেব স্বীয় শক্তি প্রকটনদ্বারা শ্রীবল্লভাচার্য্যের ভক্তি, শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর অতুলনীয় অনুরাগ এবং তাঁহার নির্ম্মল হৃদয় হইতে উদ্‌গত প্রেমসেবা আমাতে প্রকাশ করিয়া আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন।। ৭।।

প্রতিদিনমধুনাপি প্রেক্ষ্যতে সর্ব্বদাপি
প্রণয়-সুরস-চর্য্যা যস্য বর্য্যা সপর্য্যা।
গণয়তু কতি ভোগান্ কঃ কৃতী তৎপ্রয়োগান্
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ।। ৮।।

ভক্তগণ প্রতিদিন এখনও সর্ব্বদা যাঁহার প্রণয়-রসের আচরণময়ী শ্রেষ্ঠ আরাধনা দেখিয়া থাকেন, যাঁহার অনুষ্ঠান ও উপভোগ কোন পণ্ডিতই সংখ্যা করিতে সমর্থ হন না, সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন।। ৮।।

গিরিধর-বরদেবস্যাষ্টকেনেমমেব
স্মরতি নিশি দিনে বা যো গৃহে বা বনে বা।
অকুটিল-হৃদয়স্য প্রেম-দত্ত্বেন তস্য
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ।। ৯।।

যিনি গৃহে বা বনে অবস্থান করিয়া দিবসে বা রাত্রিতে দেবোত্তম গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের এই অষ্টকদ্বারা তাঁহাকেই স্মরণ করেন, সেই সরলপ্রাণ ভক্তজনের হৃদয়ে শ্রীগোপালদেব প্রেম-প্রদানপূর্ব্বক বিরাজ করুন।। ৯।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৪৭ পৃষ্ঠার পর]

৫০। ব্রজগোপীর পরোঢ়াত্ব-অভিমানের রহস্য কি?

"মায়া-কল্পিত বিবাহিত পতিদিগের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই সঙ্গম হয় নাই। **ব্রজগোপীদিগের পতিগণ কেবল তত্তদ্ভাবের মায়াবতার মাত্র। বিবাহও মায়িক প্রত্যয়-মাত্র—পরদারত্ব নাই, তথাপি পরোঢ়াত্ব-অভিমান নিত্য** বর্ত্তমান। তাহা না থাকিলে বামতা, দুর্ল্লভতা, প্রতিবন্ধকতা, নিষেধ-ভয়জনিত অপূর্ব্ব রসোদয় কখনই স্বভাবতঃ হয় না। তদ্রূপ অভিমান না থাকিলে ব্রজরসে নায়িকাত্ব লাভ করা যায় না, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীই তাহার উদাহরণ।"

—জৈঃ ধঃ ৩২শ অঃ

৫১। শ্রীকৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃত-রসতত্ত্ব কি অশ্লীলতা-দুষ্ট ও ঘৃণ্য নহে?

"নৈতিক ব্যক্তিগণের জড়ীয় রসের প্রতি যে ঘৃণা থাকে, তাহা যদি অপ্রাকৃত রস-চিন্তায় আনা যায়, তাহাকে একটী 'কুসংস্কার' বলি। সেই কুসংস্কারপরবশ হইয়া চিন্ময় জীবের অপ্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের সহিত রাসলীলাদিরূপ অপ্রাকৃত রসকে ভাগ্যহীন লোকসকল ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কি ফল হয়?"

—শ্রীমঃ শিঃ ৫ম পঃ

৫২। পারকীয়-রসাশ্রিত কৃষ্ণপ্রেমিক কিরূপে বিধির সম্মান করেন?

"যেমত কোন স্ত্রী নিজ-বিবাহিত স্বামীকে বাহ্যে আদর করত কোন পরপুরুষের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে গোপনে অনুরক্ত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমকারী পুরুষেরাও পূর্ব্বাশ্রিত বৈধমার্গের বিধি-সকলের এবং ঐ সকল বিধির নিয়ন্তা ও রক্ষকসকলের প্রতি কেবল বাহ্য সম্মান করত ভিতরে ভিতরে রাগানুশীলনদ্বারা পারকীয় রস আশ্রয় করিয়া থাকেন।"

—কৃঃ সং ৮।১০

৫৩। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশে অপ্রাকৃত-রসের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস কি?

"পঞ্চরসের ইতিহাস দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, শান্তরস সর্ব্বাদৌ ভারতবর্ষে পরিদৃশ্য হইয়াছিল। যখন প্রাকৃত-বস্তুতে যজ্ঞাদি ক্রিয়াদ্বারা আত্মা সন্তুষ্ট হইল না, তখন সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার, নারদ, মহাদেব প্রভৃতি পরমার্থবাদীরা প্রাকৃত

জগতে নিস্পৃহ হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থিতিপূর্ব্বক শান্তরসের অনুভব করিলেন। তাহার বহুকাল পর কপি-পতি হনুমানের দাস্যরসের উদয় হয়, ঐ দাস্যরস ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া এশিয়াদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে মোজেস্-নামক মহাপুরুষে সুন্দররূপে পরিদৃশ্য হয়। কপি-পতির বহুকাল পর উদ্ধব ও অর্জ্জুন ইঁহারা সখ্যরসের অধিকারী হন এবং ঐ রস জগতে প্রচার করেন। ক্রমশঃ ঐ রস ব্যাপ্ত হইয়া আরবদেশে মহম্মদ-নামক ধর্ম্মবেত্তার হৃদয়কে স্পর্শ করে। বাৎসল্যরস সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন আকারে উদয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যগত বাৎসল্যরস ভারত অতিক্রম করত ইহুদীদিগের ধর্ম্ম-প্রচারক যীশু-নামক মহাপুরুষে সম্পূর্ণ উদিত হয়। মধুর-রসটী প্রথমে ব্রজধামেই জাজ্বল্যমান হয় ; বদ্ধজীব-হৃদয়ে ঐ রসের প্রবেশ করা অতীব দুরূহ ; কেন না, উহা অধিকার-প্রাপ্ত শুদ্ধজীবনিষ্ঠ। নবদ্বীপচন্দ্র শচীকুমার স্বদল-সহকারে ঐ নিগূঢ় রসের প্রচার করেন। ভারত অতিক্রম করিয়া উক্ত রস এ পর্য্যন্ত অন্যত্র ব্যাপ্ত হয় নাই। অল্প দিন হইল নিউম্যান্ নামক এক পণ্ডিত ইংলণ্ডদেশে ঐ রসের কিয়ৎপরিমাণ উপলব্ধি করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশস্থ ব্যক্তিরা এ পর্য্যন্ত যীশু-প্রচারিত গৌরবগত বাৎসল্য-রসের মাধুর্য্যে পরিতৃপ্ত হন নাই। আশা করা যায় যে, ভগবৎ-কৃপাবলে তাঁহারা অনতিবিলম্বেই মধুর রসের আসব-পানে আসক্ত হইবেন। দেখা যাইতেছে যে, যে-রস ভারতে উদিত হয়, তাহা অনেক দিন পরে পশ্চিমদেশ-সকলে ব্যাপ্ত হয় ; অতএব মধুর-রসের জগতে সম্যক্ প্রচার হইবার এখনও কিছুকাল বিলম্ব আছে। যেমন সূর্য্যদেব প্রথমে ভারতে উদয় হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমদেশ-সকলে আলোক প্রদান করেন, তদ্রূপ পরমার্থ-তত্ত্বের অতুল্য কিরণ সময়ে সময়ে ভারতে উদয় হইয়া কিয়দ্দিবস পরে পাশ্চাত্ত্য-দেশে ব্যাপ্ত হয়।"

—'উপক্রমণিকা,' কৃঃ সং

৫৪। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের দ্বারা এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের দ্বারা রস-তত্ত্বের বিস্তারের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?

"বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ মহাপ্রভুর অনেক পূর্ব্বে ঐসকল রসের প্রচার করেন। মহাপ্রভুর দাদা-গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রথমেই মধুর-রস-প্রচারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পত্তন করেন ; শ্রীঈশ্বরপুরী তাহাকে উন্নত করেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ঐ রস-তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণ ঐ রসের তাত্ত্বিক আস্বাদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই তত্ত্ব সে-সময়ে সামাজিক হয় নাই। জয়দেব কেন, **স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতই মধুর-রসের সম্পূর্ণ ভাণ্ডার। কিন্তু সেই রসভাণ্ডার খুলিয়া সাধারণকে ঐ রস-পান শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ব্বে আর কে করাইয়াছিলেন?"**

—'পদরত্নাবলী', সঃ তোঃ ২।৯

৫৫। প্রেমরস কি তর্কের বিষয়?

"প্রেমরস—দুগ্ধসমুদ্রতুল্য, তাহাতে বিতর্করূপ গো-মূত্র ফেলিলে বৈরস্য উদয় হয়।"

—জৈঃ ধঃ ৩৪শ অঃ

৫৬। বিপ্রলম্ভ-রসের বৈশিষ্ট্য কি?

"বিপ্রলম্ভের অর্থ—বিরহ বা বিয়োগ। *** রঞ্জিত বস্ত্রে পুনরায় রং দিলে যেরূপ রাগ বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ বিরহের দ্বারা পুনঃ সম্ভোগের রসোৎকর্ষ হয়। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না।"

—জৈঃ ধঃ ৩৭শ অঃ

৫৭। চিন্ময়দেহে স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব-ভাব কোন্ কোন্ রসে কিরূপ প্রকাশিত?

"জীবের নিত্যশুদ্ধ দেহ চিন্ময়, তাহাতে স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব ভেদ নাই। চিন্ময়-শরীর—স্বতন্ত্র শুদ্ধকামময়। যখন যে ভাব হয়, তাহাতে শুদ্ধজীবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব হইয়া ওঠে। শান্তরসে—নপুংসকত্ব, দাস্য-সখ্যে—পুরুষত্ব, মাতৃবাৎসল্যে—স্ত্রীত্ব এবং পিতৃবাৎসল্যে—পুংস্ত্ব সিদ্ধ হয়। মধুর উজ্জ্বলরসে সকল জীবই শুদ্ধ স্ত্রীরূপা এবং এক পরম পুরুষ কৃষ্ণের সেবা করেন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৫

৫৮। প্রপঞ্চগত রস কি নিত্য ও বাস্তব?

"যে রস প্রপঞ্চগত, জড়কাব্যে প্রকাশিত,
পরম-রসের অসন্মূর্ত্তি।
অসন্মূর্ত্তি নিত্য নয়, আদর্শের ছায়া হয়,
যেন মরীচিকায় জল-স্ফূর্ত্তি।।"

—'শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ' ৬, গীঃ মাঃ

৫৯। অপ্রাকৃত রসের বিকাশ ও বিলোপের সহায়ক কি?

"রস ব্যতীত জীবন থাকে না। প্রাকৃত জীবন সর্ব্বদা জড়-রসময়। চিদ্রস ভাবভক্ত-জীবনে বিদ্যুৎ-প্রভার ন্যায় ক্ষণিক ব্যাপার-বিশেষ। সদ্গুরু লাভ-ক্রমে ও সাধুসঙ্গ-বলে ঐ অবস্থা উন্নত হইয়া ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত অবস্থা হয়। সাধুসঙ্গাভাবে এবং নাস্তিক্যময় উপদেশ ও নির্ব্বিশেষ-উপদেশক্রমে ঐ কুণ্ঠিত উপাসনাও ক্রমশঃ অতি কুণ্ঠিত, অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও বিলুপ্তপ্রায় অবস্থা স্বীকার করে। ইহা জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।২

৬০। যীশু-প্রচারিত বাৎসল্য-রসের ক্রমবিকাশের প্রথম সোপান কি?

"Jesus proceeds to tell us 'You must love man as thy brother.' From this is inferrcd *the fourth phase* of love which is a feeling that all men are brothers and God is their common Father. This is *Batsalya Rasa* in its first stage of development."

—'To love God' Journal of Tajpur 25th Aug. 1871

৬১। নিম্বার্ক ও গৌড়ীয়-মতে রস-বিচারের বৈশিষ্ট্য কি? গৌড়ীয়-ভজন শ্রেষ্ঠ কেন?

"ভজন-পর্ব্বে নিম্বার্ক-মতে পারকীয় রস স্বীকৃত হয় নাই। স্বকীয়ত্বই নিত্য। গৌড়ীয়-মতে—পারকীয় রসই সর্ব্বপ্রধান। স্বকীয় মতের মাধুর্য্য অপেক্ষা পারকীয়ে মাধুর্য্য অধিকতর।"

—'শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য', সঃ তোঃ ৭ম বর্ষ

৬২। শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্থলবিশেষে স্বকীয়-ভজনের উপদেশ দিলেন কেন? তিনি কি নিজে ঐ মতের উপাসক?

"শ্রীজীবের নিজের কোনপ্রকার স্বকীয় ভজন নাই, তবে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ব্রজেও কতকগুলি উপাসকের স্বকীয়-ভাব-গন্ধ ছিল। *** এই কারণেই ভিন্ন-ভিন্ন-রুচিপ্রাপ্ত শিষ্যদিগের প্রতি তাঁহার পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ। 'স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ' ইত্যাদি 'লোচনরোচনী'-গত তদীয় শ্লোকে সে-কথা স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

৬৩। চিজ্জগতে মধুর-রসের স্থান কোথায়?

"চিদ্ব্যাপার একটী রহস্য-মণি ; তাহাতে আবার পারকীয় মধুর-রসটী সেই মণিগণ-মধ্যে কৌস্তুভ-বিশেষ।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৭

৬৪। অপ্রকট-লীলায় দূরপ্রবাসগত বিরহ আছে কি?

"কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকটভেদে দুইপ্রকার। বিপ্রলম্ভরসে যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রকট-লীলা-অনুসারে কথিত হইয়াছে। সদা রাসাদি-বিভ্রমের সহিত, বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই বিরহ হয় না। মথুরা-মাহাত্ম্যে কথিত আছে যে, গোপ-গোপিকা-সঙ্গে তথায় কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন। 'ক্রীড়তি' এই বর্ত্তমান-প্রয়োগে বৃন্দাবনে কৃষ্ণক্রীড়া নিত্য,—ইহাই জানিতে হইবে। সুতরাং গোলোক বা বৃন্দাবনের অপ্রকট-লীলায় কৃষ্ণলীলার দূরপ্রবাসগত বিরহ নাই। সম্ভোগই নিত্য।"

—জৈঃ ধঃ ৩৮শ অঃ

(ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

"সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-নিরত ব্যক্তির নামই সাধু, সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত ব্যক্তিই সাধু, নিত্যকাল সর্ব্বক্ষণ যিনি সকল চেষ্টার মধ্যে কৃষ্ণের জন্য ব্যস্ত আছেন, সকল চেষ্টাই যাঁহার ভগবানের সেবার জন্য, তিনিই সাধু।"

—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা

"প্রভু কহে বেদান্তসূত্র ঈশ্বরবচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ।।
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এইসব।।"

জীবের ভ্রমাদি দোষ-চতুষ্টয় বিদ্যমান, কারণ তা'দের জ্ঞানের পরিমাণ আছে। সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়দ্বারা সসীম বস্তুরই আংশিক-জ্ঞান তা'দের হয়। সুতরাং তা'দের ঐ চারিটী দোষ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ।

"ন তস্য কার্য্য করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।।"

তাঁ'র স্বাভাবিকী পরাশক্তিপূর্ণ—জ্ঞান, পূর্ণবল ও পূর্ণক্রিয়া। সুতরাং তাঁ'তে ঐ সমস্ত দোষের সদ্ভাব থাকিতেই পারে না।

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।।"

এই সমস্ত শ্বেতাশ্বতর-বচনে তাঁ'র অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলির পূর্ণশক্তির পরিচয় দিতেছেন, সুতরাং তাঁ'র করণাপাটব বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা থাকা সম্ভব নয়। আবার বিপ্রলিপ্সা বা বঞ্চনের ইচ্ছা তাঁহাতে কিরূপে আসিতে পারে? কাহাকে বঞ্চনা করিবেন? মানুষ ত' বঞ্চিতই আছে। মায়াই ত' বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। জীব নিজের স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারে মায়ার অধীনে এসে প'ড়েছে। সুতরাং ঈশ্বর তা'দের আবার বঞ্চনা কর্‌তে প্রয়াস করিবেন কেন? ঈশ্বরের বাক্যে এই সমস্ত দোষের অনুমান করাই ভগবদ্বিরোধ বা নাস্তিকতা।

"উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্য-বৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব।।
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্বকার্য্য।।"

উপনিষদের সহিত বেদান্তের সূত্র স্বাভাবিক প্রধানভাবে অভিধাবৃত্তিদ্বারা যে তত্ত্ব শিক্ষা দেন, তাহাই উৎকৃষ্ট। জাগতিক যুক্তিবাদী, প্রচ্ছন্ন তার্কিকের জন্য যে মায়াবাদ

রচনা ক'রেছেন, জীব তা'তে প্রবেশ কর্‌লে সমস্ত কার্য্য নষ্ট হয়। তিনি শব্দের অভিধাবৃত্তি ত্যাগ ক'রে গৌণ লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে বেদান্তসূত্রগুলির ব্যাখ্যা অসুরমোহনের জন্য প্রণয়ন কর্‌লেন। বেদান্ত ভাষ্যের তাহা উদ্দেশ্য নয়। ভগবান্ নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, তা'তে প্রবেশ ক'রে আমিও নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যাব—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি কর্‌লে বিনাশ। কুণ্ঠাধর্ম্মযুক্ত পদার্থের রূপ-গুণ-নামসমূহ পৃথক্। বৈকুণ্ঠবস্তুর ঐগুলি অপৃথক্। রজঃ-সত্ত্বগুণদ্বারা চালিত হ'য়ে যে প্রতীতি হয় তাহাদ্বারা অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের কথা জান্‌তে পারা যায় না। আচার্য্য শঙ্কর জীবমোহনের জন্য ঐ সমস্তের গৌণ ব্যাখ্যা কর্‌তে আদিষ্ট হ'য়েছিলেন। আপাতদর্শনে ভ্রান্ত ক'রে দেওয়া—কৃষ্ণসেবোন্মুখতা যা'দের নাই, তা'দের জন্য ঐপ্রকার ভাষ্য রচিত। পদ্মপুরাণে মহাদেব ব'লেছেন,—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব কল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিণা।।
ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া।
সর্ব্বস্বং জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে।।
বেদান্তে তু মহাশাস্ত্রে মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ।।"

শিবপুরাণেও ভগবান্ ব'লেছেন,—

"দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু।
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।।"
"মাং চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।"

অন্যাভিলাষীদিগের বাস্তব-জ্ঞানলাভের যোগ্যতা নাই। সেবায় যা'রা পরাঙ্মুখ তাঁ'দের জন্য এই জাগতিক যত্নগুলির আরও বৃদ্ধি কর্‌তে শঙ্করকে আদেশ কর্‌লেন। ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞা পালন করেন সুতরাং তাঁ'র কি দোষ আছে? ভগবান্ নির্দ্দোষ ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি যে কাজ করাচ্ছেন তা'তে দোষ স্পর্শ ক'রতে পারে না।

ব্রহ্মাণ্ডে জীবগণ যে-সকল পাপ করেন, যম তাহার দণ্ডবিধান করেন, কিন্তু পরমার্থজ্ঞান তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইতে যাহা জেনেছেন তাহাই জানান।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।"

প্রত্যেক শব্দের মুখ্য অর্থ—ভগবান্। সাধারণ লোকে মানে করেন ব্রহ্ম। শব্দ ও শব্দীতে ভেদ বিচার কর্‌লে বিষ্ণুবোধক প্রতীতি না হ'য়ে মায়িক প্রতীতি হয়। 'ব্রহ্ম'-শব্দদ্বারা বিশেষরহিত বস্তু বুঝায়। 'বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাদ্ ব্রহ্ম।' যাহা হইতে বৃহৎ আর নাই। ভগবত্তা ব্যতীত পূর্ণতার প্রতীতি নাই। শক্তিবিচার নিরাকৃত হ'য়েছে। রামানুজ বলেন,—"শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ।" বস্তু হ'তেই শক্তির পরিচয়। অধিরোহবাদে শক্তি

হ'তে বস্তুর পরিচয় আধ্যক্ষিক জ্ঞানের বিষয় মনে করেন। জড়েই যাবতীয় আকার। তাঁহার আকার নাই, "মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি।" জন্মস্থিতিভঙ্গ কালক্ষোভ্য ব্যাপার এই শক্তিতে আছে, ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বিশেষধর্ম্ম-বিশিষ্টকেই জড় বলিয়া বলা হয়। শাব্দিকের বিচারে ক্ষুদ্র নহে যাহা, তাহা ব্রহ্ম, যাহা পূর্ণতা জ্ঞাপন করে। মানুষের ধারণা আংশিক, তাঁ'দের এই জড়সাম্যের বিচার স্বীকার্য্য নহে। **(ক্রমশঃ)**

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সম্বন্ধে বক্তব্য

শ্রীপত্রিকার স্বরূপ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত নবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা ও শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার একনিষ্ঠা ঐকান্তিকী শ্রেষ্ঠা সেবিকা। সর্ব্বপ্রধানা ও প্রিয়তমা সেবিকাসূত্রে উক্ত সমিতি উভয় সভারই অভিন্না প্রতিমূর্ত্তি। সুতরাং 'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র' বলিলে ইঁহাকে উক্ত সভাদ্বয়েরও মুখপত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। নবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার মুখপত্র 'শ্রীসজ্জনতোষণী' ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্র 'সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের' অভিন্ন কলেবর এই 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাব, ভাষা ও ধারার সহিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ভাব, ভাষা ও ধারা অভিন্ন। সংক্ষেপতঃ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা শ্রীল রূপ ও রঘুনাথের কথার একমাত্র প্রচারিকা।

সজ্জনতোষণী ও গৌড়ীয়ের অবস্থিতি কাল

শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা বর্ত্তমান কাল হইতে অনুমান ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিতা হইয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে সপ্তদশ বর্ষকাল শ্রীঠাকুর-কর্ত্তৃক পরিচালিতা হন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ ঐ পত্রিকার সপ্তবর্ষকাল সম্পাদনা করেন। মোটের উপর চতুর্ব্বিংশবর্ষকাল সজ্জনতোষণী প্রকাশিতা হইয়াছিলেন। এই চতুর্ব্বিংশ বর্ষের চতুর্ব্বিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে অনুমান ৪৫ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তৎপরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'র নিয়ামক

মহারাজের সহায়তায় মাসিক সজ্জনতোষণী পত্রিকার অভিন্ন কলেবরস্বরূপে 'গৌড়ীয়' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকেন। ইঁহাও চতুর্ব্বিংশ বর্ষ অবধি অবস্থিত থাকিয়া অনুমান ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে অন্তর্হিত হয়েন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আবির্ভাবের কারণ

শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার মনোভাব অনুযায়ী শুদ্ধ-হরিকথা কিয়ৎকাল যাবৎ তাঁহার একনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সেবকগণ প্রচার করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইলেও নানাপ্রকার দৈব ও আসুর দুর্ঘটনায় উক্ত সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের প্রকৃত সেবা করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা শ্রীগুরুপরতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। তখন হইতে 'গৌড়ীয়' অবাধে আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া 'ঘোমটার মধ্যে খেমটা' নীতির পরিপোষক হইয়া পড়িল। কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তি প্রাণহীন গৌড়ীয়ের কঙ্কাল বিষাক্ত দুর্গন্ধ তৈলের দ্বারা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেও ক্রমশঃ তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাপর শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্তসমূহই গৌড়ীয়ের প্রকৃত আহার। তাহার অভাব হইলে গৌড়ীয়ের প্রাণধারণ একান্ত অসম্ভব। কতকগুলি গুরুদ্রোহিতামূলক অপসিদ্ধান্তপর অপদার্থ অখাদ্য- কুখাদ্য গৌড়ীয়কে সঞ্জীবিত রাখিতে পারে না। এইরূপে গৌড়ীয়ের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই তথাকথিত পরিচালকবর্গের অপরাধফলে গৌড়ীয় অন্তর্হিত হন। সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগৎ শ্রীল প্রভুপাদের আচরিত-প্রচারিত শুদ্ধ-রূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-ধারায় অবগাহন করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে।

শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য

বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মজগতে বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রকাশ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই পত্রিকা নির্ভীক চিত্তে নিরপেক্ষভাবে সত্য কথা প্রচার করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্মের অনুকরণে কতকগুলি অপসিদ্ধান্তপর সংবাদপত্রের ও গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাইয়াছি। ক্রমশঃ তাহাদের বিচারধারা যে শ্রীরূপানুগ-শুদ্ধ-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ধারণার প্রতিকূল, তাহা আমরা প্রদর্শন করিব। কেহ বা অপ্রাকৃত স্মৃতির সহিত প্রাকৃত স্মৃতির মিল রাখিয়া পর্ব্বাদি পালনের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন না যে, 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।' আরও কতকগুলি সংবাদপত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলির দ্বারা গৌরজনগণের চিত্তোল্লাসের সম্ভাবনা নাই। ঐ সাময়িক পত্রগুলি সময় সময় কেবল বিষয়-কথা লইয়া, হরিকথার ছলে কেবল মায়ার কথা লইয়া, ভক্তি-বিরুদ্ধ কথা লইয়া পরস্পর কলহ ও প্রণয় উপস্থিত করিয়া কোথাও বা আত্মপ্রশংসায় ভরপূর হইয়া হরিকথা হইতে দূরে চলিয়া যান। তাহাতে ভক্তগণের হৃদয়ে সুখোদয় হয় না। কেহ বা বিষয়িগণের

মতানুগমনে শুদ্ধভক্তির বিলোপসাধন করিয়া ভক্তিমার্গের উন্নতি হইল মনে করেন, কেহ বা প্রাকৃত সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধা করিতে গিয়া শুদ্ধভক্তির সৌন্দর্য্য খর্ব্ব করিয়া ফেলেন। শ্রীপত্রিকা এইপ্রকার সংবাদপত্র-সমূহের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবেন। তবে শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ ভাবসমূহ ভক্তিকথার সহিত অজ্ঞাতভাবে স্থান পাইলে ভাগবতগণের হৃদয়ে সেবাবিরোধ ঘটাইতে পারে, এই আশঙ্কায় মায়িক-প্রসঙ্গ হইতে সর্ব্বদা সাবধান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতে পত্রিকা সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবেন। ভক্তির প্রতিকূল মতবাদ-সমূহে যাহাদের চিত্ত দৃঢ়ভাবাপন্ন তাহারা নিসর্গক্রমে ভক্তি-সুখ সন্দর্শনে অসমর্থ। শ্রীপত্রিকা এই শ্রেণীর পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদন করিতে পারিবেন না।

শ্রীগৌড়ীয়ের সহিত বিভিন্ন নীতির সম্বন্ধ

বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় চিন্তাস্রোত যে-ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা ধর্ম্মজগতের সহিত কতদূর সম্বন্ধযুক্ত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা তাহা সর্ব্বদাই সমালোচনা-মুখে বিশ্লেষণ করিবেন। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষানৈতিক আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়া-কলাপের সহিত এই পত্রিকার প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও যে-স্থলে উক্ত নীতিসমূহ নিত্য সনাতন ধর্ম্মনৈতিক চিন্তাস্রোতের ও আচার-ব্যবহারের ব্যাঘাত জন্মাইবে, সে-স্থলে ইঁহা নির্ব্বাক থাকিয়া জগতের অমঙ্গল আনয়ন করিবেন না। স্বাধীন ভারতের পূর্ব্ব ঐতিহ্য আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি, ধর্ম্মনীতিই যাবতীয় নীতিসমূহের মূল ও ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং যাঁহার উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া বিশ্বের যাবতীয় সত্ত্বা উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেই বস্তুর প্রতি ঔদাসীন্যই আমাদের অধঃপতনের প্রধান কারণ। শ্রীপত্রিকা তাহা প্রতি পদে পদে প্রদর্শন করিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে সচেতন রাখিবেন। ধর্ম্মই ভারতের বৈশিষ্ট্য, ধর্ম্মই ভারতের প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মই ভারতের জীবন। ধর্ম্মের জন্যই ভারত সমগ্র পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। স্বাধীন ভারতের বিজয়-পতাকা সমগ্র বিশ্বের শির্ষোপরি স্থাপন করিবার মূলমন্ত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টকের' অন্যতম "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।"—শ্লোকের তাৎপর্য্য জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীপত্রিকা সর্ব্বদাই মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিবেন।

ধর্ম্মই ভারতের গৌরব ও শান্তিদাতা

ধর্ম্মাধীন রাষ্ট্রই ভারতের গৌরব এবং ধর্ম্মই ভারতকে চিরদিন পরিচালনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম বলিতে কোন সঙ্কীর্ণতা, হীনতা বা কোনপ্রকার অনুপাদেয়তাকে লক্ষ্য করে না। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের ভাণ এক নহে। ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্কীর্ণা অসৎ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। পার্থিব চিন্তাস্রোত মানুষকে

অধঃপতিত করিয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ প্রভৃতির সুব্যবস্থা করাই আমাদের পরাশান্তি লাভের উপায় নহে। যাঁহারা ঐগুলি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণের চরমসীমায় উঠিয়াছেন, তাঁহারাও যে অশান্তির গভীরতম জলধিগর্ভে নিমজ্জিত আছেন, ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। শান্তি একটী পৃথক্ তত্ত্ব। পার্থিব বস্তু তাহা কখনই সম্পাদন করিতে পারে না।

শ্রীপত্রিকার ভাষা

এই পত্রিকা সমগ্র ভারতে যাহাতে সমাদৃত হইতে পারে তজ্জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় প্রবন্ধাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে। প্রধানতঃ বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, আসামী, উৎকল, ইংরাজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার প্রবন্ধাদি ইহাতে স্থান পাইবে।

গভীর গুরুদায়িত্ব লইয়া এই পত্রিকা বিশ্ববাসীর সমক্ষে উপস্থিত হইতেছেন। ভারতবাসীর আন্তরিক সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করে।

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীচরণামৃত

শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের পদজল ও শ্রীশালগ্রাম-শিলারূপী শ্রীহরির স্নানজল—এই উভয় অমৃতস্বরূপ বলিয়া শ্রীচরণামৃত-নামে কথিত হইয়াছে। শ্রীচরণামৃত সর্ব্বদা সমস্ত তীর্থ অপেক্ষা অধিক পবিত্র। শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত পানপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করাই বিধি। মানব শ্রীচরণোদক-পানে পবিত্র হইয়া সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়। বিষ্ণুর চরণামৃত পান করিলে কোটি ব্রহ্ম-হত্যার পাপও নষ্ট হয়। আবার এই চরণামৃত ভূতলে পতিত হইলে অষ্টগুণ পাপ হইয়া থাকে। পদ্মপুরাণ বলিতেছেন,—হে অম্বরীষ! শ্রীহরির চরণামৃত যাঁহার উদরে অবস্থিত থাকে, তুমি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিও।

শ্রীশালগ্রাম-শিলার স্নানজল প্রতিদিন পান করিয়া মস্তকে ধারণ করিলে আর সহস্র-কোটি তীর্থে অবগাহন করিবার প্রয়োজন কি? কারণ গঙ্গা, গোদাবরী, রেবা এবং অন্যান্য মুক্তিদাত্রী নদীসমূহ সমস্ত তীর্থের সহিত এই শ্রীচরণামৃতে বাস করেন। যথা—

গঙ্গা গোদাবরী রেবা নদ্যো মুক্তিপ্রদাস্তু যাঃ।
নিবসন্তি সতীর্থাস্তাঃ শালগ্রামশিলা-জলে।।
কোটিতীর্থ-সহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্।
তীর্থং যদি ভবেৎ পুণ্যং শালগ্রামশিলোদ্ভবম্।। (পদ্মপুরাণ)

যিনি প্রত্যহ শ্রীশালগ্রাম-চরণামৃত পান করেন, তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। শ্রীচরণামৃত পান ও মস্তকে ধারণ করিলে সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন। কলিকালে শ্রীহরির চরণামৃত পান সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ। শ্রীগঙ্গা—শ্রীহরির চরণোদক। সরস্বতীর জল তিনদিনে, নর্ম্মদার জল সাতদিনে, গঙ্গাজল তৎক্ষণাৎ এবং যমুনাজল দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন। ইঁহাদিগকে দর্শন, ইঁহাদিগেতে স্নান ও ইঁহাদের কীর্ত্তন করিলে ইঁহারা পবিত্র করিয়া থাকেন। কিন্তু কলিকালে শ্রীহরি-পাদোদক স্মরণমাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলেন,—

ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহেন তু নার্ম্মদম্।
সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব যামুনম্।।
পুনন্ত্যেতানি তোয়ানি স্নানদর্শনকীর্ত্তনৈঃ।
পুনাতি স্মরণাদেব কলৌ পাদোদকং হরেঃ।। (পদ্মপুরাণ)

প্রতিদিন কোটি শিবলিঙ্গ অর্চ্চন করিলে যে ফল হয়, শ্রীচরণামৃত পান করিলে তদপেক্ষা শতসহস্রগুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। অপবিত্রই হউক, দুরাচারই হউক অথবা মহাপাতকীই হউক, বিষ্ণু-চরণামৃত স্পর্শ করিবামাত্রই সে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া থাকে। কোটি পাতকযুক্ত ব্যক্তিরও মৃত্যুকালে মস্তকে, মুখে ও দেহে যদি বিষ্ণু-চরণামৃত স্পর্শ হয়, তাহা হইলে সে যমালয়ে গমন করে না। যাহারা কখনও দান, হোম, বেদপাঠ ও দেব-পূজাদি করে নাই, তাহারাও বিষ্ণু-চরণামৃত পান করিয়া উত্তমগতি লাভ করিয়া থাকে। যিনি শ্রীচরণামৃত মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার প্রতি ব্রহ্মা, শিব, কেশব—সকলেই প্রসন্ন হন। যিনি শ্রীচরণামৃতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তিনি ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন। চিরদিন আচার-রহিত ব্যক্তিকেও অন্তকালে শ্রীচরণামৃত পান করাইলে সেও পরমগতি লাভ করিয়া থাকে। শ্রীচরণামৃত পানের দ্বারা অপেয়পায়ী, অভোজ্যভোজী, অগম্যাগামী ও সর্ব্বদা পাপ-স্বভাব ব্যক্তিও আশু বন্দনীয় হইয়া থাকে। প্রত্যহ শ্রীচরণামৃত পান ও মস্তকে ধারণ করিলে জরা, মৃত্যু, দুঃখ ও সংসার হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। শ্রীচরণামৃত মঙ্গলস্বরূপ, সুখদায়ক, দুঃখ-নিবারক, আশুফলপ্রদ, সর্ব্ব-পাপনাশক, দুঃস্বপ্ননাশক, সর্ব্বোপদ্রব-শান্তিকর ও সর্ব্বব্যাধি-বিনাশক। যথা—

সদ্যঃ ফলপ্রদং পুণ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যং সর্ব্বদুঃখবিনাশনম্।।
দুঃস্বপ্ননাশনং পুণ্যং বিষ্ণুপাদোদকং শুভম্।
সর্ব্বোপদ্রবহন্তারং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনম্।। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

শ্রীচরণামৃত মস্তকে ধারণ করিলে সকল প্রকার উৎপাতের শান্তি হয়। বৈষ্ণবরাজ শম্ভু এই শ্রীচরণামৃতের মাহাত্ম্য জানেন। তাই তিনি বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গাকে মস্তকে

ধারণ করিয়াছেন। মহাপাপী ও শতশত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও শ্রীচরণামৃত পান করিলে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করে। মহাপাপীও শ্রীচরণামৃত পানপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলে যমদূতগণ তাহাকে কিছুই করিতে পারে না। সে যমদূতগণকে অগ্রাহ্য করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। শ্রীবিষ্ণুর চরণামৃত পান করাই পরম ধর্ম্ম, ইহাই পরম তপস্যা। যিনি শ্রীচরণামৃত পান করেন, তিনি সকল তীর্থে স্নান করেন ও বিষ্ণুর অতি প্রিয় হইয়া থাকেন। শ্রীচরণামৃত অকাল মৃত্যু, সকল ব্যাধি ও সর্ব্বদুঃখ বিনাশ করে। শ্রীচরণামৃত পানের দ্বারা ভগবৎপাদপদ্মে ভক্তিও লাভ হয়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়,—লুব্ধক-নামক ব্যাধ শ্রীহরির চরণামৃত স্পর্শ করিবামাত্র নিষ্পাপ হইয়া উত্তম বিমানে আরোহণপূর্ব্বক মুনিকে বলিয়াছিলেন,—হে মুনে! আপনি যে আমার উপর চরণামৃত নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই আমি বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

সপ্তসমুদ্রের জলও ত্রিতাপাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারে না, কিন্তু অল্পমাত্র শ্রীচরণামৃতদ্বারা এই সংসারাগ্নি সহজেই নির্ব্বাপিত হয়। এই চরণামৃত অমূল্য, ইহার সহিত অন্য কিছুরই তুলনা হয় না। সমুদ্রের তরঙ্গ গণনা করিতে পারিলেও শ্রীচরণামৃতের অনন্ত মহিমা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না।

শ্রীহরিচরণামৃত যদ্রূপ, ভক্তচরণামৃতও সেইরূপ। ভক্ত-চরণামৃতও সর্ব্বতীর্থ-স্বরূপ, সর্ব্বপ্রকার অশুভবিনাশক ও পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্ত-চরণামৃতের মাহাত্ম্য বলিয়া শেষ করা যায় না। এইজন্যই শাস্ত্র বলেন,—.

যেষাং পাদরজেনৈব প্রাপ্যতে জাহ্নবীজলম্।
নার্ম্মদং যামুনঞ্চৈব কিং পুনঃ পাদয়োর্জলম্।।
যেষাং বাক্যজলৌঘেন বিনা গঙ্গাজলৈরপি।।
বিনা তীর্থসহস্রেণ স্নাতো ভবতি মানব।। (স্কন্দপুরাণ)

যাঁহাদের পদরেণুতে জাহ্নবী, নর্ম্মদা ও যমুনা জল লাভ হয়, যাঁহাদের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথামৃত পানের দ্বারা সজ্জনগণ অসংখ্য তীর্থ স্নান না করিয়াও পবিত্র হইয়া থাকেন, সেই ভক্তগণের চরণামৃতের মাহাত্ম্য আর কি বর্ণন করিব?

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৬।১৯) বলেন,—

একনদী—তোমার অমৃতকথাময়ী।
আর নদী—পদ-নীর বহে গঙ্গা হই।।
তিন লোক পাপ হরে দোঁহার শকতি।
দুই তীর্থে স্নান করে ধন্য মহামতি।।
শ্রুতিযোগে স্নান করে এক তীর্থজলে।
অঙ্গসঙ্গে আর তীর্থে স্নান পান করে।।

এইরূপে দুই তীর্থে করে স্নান-পান।
মহাভাগবত হয় বিমল গেয়ান।। (শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী)

ভক্ত-পদজল হরিভজনের প্রধান সহায়ক। ইহা শ্রদ্ধার সহিত সেবন করিলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি লাভ হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল।।
এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়।।
তাতে বার বার কহি,—শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ-তিন-সেবন।।

(চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৬০-৬২)

শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের পরম পবিত্র চরণামৃত পান করিয়া আচমন করিতে নাই। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা।
য আচমতি সংমোহাদ্ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে।। (গরুড়পুরাণ)

যে শ্রীহরির ও তদ্ভক্তের চরণামৃত পানান্তে অজ্ঞানবশে আচমন করে, সে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া পরিগণিত হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

'কালস্য কুটিলা গতিঃ'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে (১১।৩২) শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ" অর্থাৎ আমিই লোকক্ষয়কারী অত্যুৎকট কাল। কেহ কেহ ভগবানের বিক্রমকেই 'কাল' বলিয়া থাকেন। "প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্।" (ভাঃ ৩।২৬।১৬)। "বীর্য্যানি তস্যাখিলদেহভাজামন্তর্ব্বহিঃ পুরুষকালরূপৈঃ।" (ভাঃ ১০।১।৭)। "স এষ ভগবান্ কালঃ সর্ব্বেষাং নঃ সমাগতঃ।" (ভাঃ ১।১৩।১৯)। কালের গতি দুর্জ্ঞেয়া, ইহার দুর্ব্বার গতি কেহই রোধ করিতে পারেন না। দুর্য্যোধন যখন সন্ধির সকল প্রস্তাবই অগ্রাহ্য করিলেন, তখন ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—"'কালপক্কমিদং মন্যে সর্ব্ব ক্ষত্রং জনার্দ্দন" (মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১২৭।৩২) অর্থাৎ "হে জনার্দ্দন! বুঝিতেছি এই ক্ষত্রিয়েরা কালপক্ক হইয়া উঠিয়াছে।" কঠ উপনিষদ্ ১।২।২৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

যস্য ব্রহ্মশ্চ ক্ষত্রশ্চ উভে ভবত ওদনম্।
মৃত্যুর্যস্যোপমেচনং ক ইথা বেদ যত্র সঃ।।

"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয়ই ভগবানের অন্নস্বরূপ এবং মৃত্যু অর্থাৎ প্রাণিগণের মারক যম তাঁহার ব্যঞ্জনসদৃশ, সেই জগৎসংহারক মহাবলশালী ভগবান্ কালরূপে কোথায় অবস্থান করেন, তাহা কেহই সহজে জানিতে সমর্থ হয় না।"

যেমন বন্য হস্তী শুড়ের দ্বারা আকর্ষণ করত তরুরাজি উৎপাটিত করে, সেইরূপ সর্ব্বসংহারক কাল অবলীলাক্রমে সমুদায় জগৎ নিরন্তর বিচলিত ও বিপৎপাতে অভিভূত করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। কালের লীলা অদ্ভুত ও পরাক্রম অচিন্ত্য। কাল প্রত্যহই অসংখ্য লোক (জগৎ সংসার) ভক্ষণ করিতেছে, তথাপি সে তৃপ্ত হইতেছে না। মহাক্ষুধার্ত্ত কালের মতিগতি কেবল ভক্ষণেই পর্য্যবসিত। নট যেমন নাট্যশালায় নানারূপ ধারণ ও ক্রীড়া করে, তেমনই কালও এই সংসারে হরণ, নাশ, ভক্ষণ প্রভৃতি নানা আকারে নৃত্য করিতেছে। বালক যেমন কাদা লইয়া নানাপ্রকার পুতুল প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে এবং পরক্ষণেই আবার তাহা বিনষ্ট করে, তেমনই কালও চতুর্দ্দশ ভুবন, বিবিধ দেশ, বন, পর্ব্বত, অসংখ্য ও বিবিধ জীব এবং তাহাদের আচার পরস্পর সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার তাহা সংহার করিতেছে। যদ্রূপ দিবা ও রাত্রি উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, হ্রাস ও বিনাশ পর্য্যায়ক্রমে প্রাপ্ত হইতেছে এবং সে-সকল পুনঃ পুনঃ ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছে ; সেইরূপ মনুষ্যও জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস, বিনাশ ও পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হইতেছে ও সে-সকল পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনরাগমন করিতেছে। কাল জীর্ণ কুটিরস্থ মণির ন্যায় জগতের জীবসমূহকে মৃত্যুরূপ পেটিকা মধ্যে সংস্থাপিত করিয়া রাখে। যেমন বৃক্ষের পত্র পুনঃ পুনঃ সমুৎপন্ন ও পুনঃ পুনঃ জীর্ণ, শীর্ণ ও বিলয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জগতের জীবসমূহ বার বার জন্মগ্রহণ করে ও বার বার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কাল যেন একটী উড়ুম্ব বৃক্ষ (একপ্রকার ডুমুর গাছ)। তাহার ফল অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড, প্রাণীসকল তন্মধ্যগত মশক, তাহারা কিছুকাল বৃথা ঘুং ঘুং শব্দ করে, তারপরে মরিয়া যায়। সর্প যদ্রূপ ভেক ভক্ষণ করে, তদ্রূপ ক্রূরহৃদয় কাল অবিশ্রান্ত প্রাণীদিগকে আক্রমণ ও তাহাদিগের তরুণ শরীরে জরা উপস্থিত করিয়া গ্রাস করিতেছে।

কাল সমুদায় পদার্থের অতি ভীষণ সংহারক রুদ্র। যদ্রূপ বাড়বানল উচ্ছলিত সমুদ্রের সলিলরাশি গ্রাস করে, তদ্রূপ সর্ব্বভুক কালও সংসারের সকল বস্তু গ্রাস করিয়া থাকে। সংসারে এমন কিছুই নাই যাহা সর্ব্বভুক কালের ভীষণ গ্রাসে পতিত না হয়। যিনি যতই বড় হউন, বল, বুদ্ধি, বৈভব যাঁহার যতই থাকুক, দ্যোতমান কাল সমস্তই বিনাশ করিবেন ; কিছুমাত্র বিলম্ব বা কাহারও প্রতীক্ষা করিবেন না। লোকসকল জন্মগ্রহণ করিয়াই কালগহ্বরে পতিত হয়। গরুড় যেমন নাগদিগকে গলাধঃকরণ করেন, সেইরূপ কালও পরম রূপবান্ সৎকর্ম্মশালী সুমেরুসদৃশ গৌরবান্বিত ব্যক্তিদিগকেও নিগীরণ ও জীর্ণ করেন। কি নির্দ্দয়, কি কঠিন, কি ক্রূর, কি কর্কশ, কি কৃপণ, কি অধম সকল ব্যক্তিই কালের উদরস্থ। ভগবানের ভক্ত ব্যতীত এমন কেহই নাই যিনি কালের

গ্রাস হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। জগতে কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ এমন কোন বস্তু নাই কাল যাহার তস্কর নহে। কালের প্রভাবে অমর দেবতাগণ মৃত্যুর কবলে কবলিত হন। এমন কি, দেবরাজ ইন্দ্রও কালবদনে চর্ব্বিত হন।

বালকগণ যেমন নিজ নিজ প্রাঙ্গনে কন্দুক নিক্ষেপপূর্ব্বক ক্রীড়া করে, সেইরূপ কালও গগনচত্বরে পুনঃ পুনঃ চন্দ্র-সূর্য্য নামক কন্দুকদ্বয় উদয় ও অস্ত করত ক্রীড়া করিতেছে। এই বিলাসচতুর কাল নিজেও দৌড়াইতেছে এবং তাহার লক্ষ্যও নিরন্তর দৌড়াইতেছে, অথচ সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে না। সে সকলকেই দুঃখবাণে বিদীর্ণ করিতেছে। কালই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যভেদী ও ইহার বাণও অব্যর্থ। জীর্ণ জগতে বিষয়লোলুপদিগকে সে মর্কট অপেক্ষা অধিক চঞ্চল করিয়াছে। অগ্নি যদ্রূপ উচ্চ প্রকৎশ শিখাদ্বারা বস্তুসমূহকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ কালও দুরাশা ও দুশ্চেষ্টাদ্বারা উদ্দীপিত করিয়া লোকদিগকে দগ্ধ করে। যাহাদের এই সংসারে স্বসুখবাসনা আছে, কালরূপ মূষিক তাহাদের সেই বাসনারজ্জুর ছেদনকর্ত্তা। তাহারা যতই বাসনারজ্জু নির্ম্মাণ করুক না কেন, কাল মূষিক তাহা ধীরে ধীরে ও অলক্ষে ছেদন করিবেই।

কালের গতি অত্যন্ত কুটিলা, ইহার স্বভাব নিরূপণ করা অতিশয় দুঃসাধ্য ব্যাপার। আজ যেখানে গভীর খাত দেখা যায়, কাল হয়ত' সেইস্থানে মেঘমালামণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইবে। আজ যেখানে অভ্রভেদী উচ্চ বৃক্ষের নিবিড় বন, কাল হয়ত' সেইস্থানে সমতল পৃথিবী অথবা গভীর কূপ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যাইবে। আজ যে লতাচ্ছন্ন ভীষণদর্শন অরণ্য দৃষ্ট হইতেছে, ঐ অরণ্য একদা নির্জ্জীব ও নিষ্পাদল মরুভূমি হইতে পারে। যে নগর পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারসম্পন্ন মানবগণে পরিপূর্ণ ছিল, কতিপয় দিবস পরে সেই নগরও জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে দেখা যায়। আজ যে শরীর কৌশেয় বস্ত্র, মাল্য ও বিলেপনে ভূষিত, কাল হয়ত' দেখা যাইবে সেই দেহ বিবস্ত্র অবস্থায় দূরবর্ত্তী গর্ত্তে নিপতিত থাকিয়া পচিতেছে। মনুষ্য পশু ও পশু মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। জল স্থল হইতেছে, স্থল জল হইতেছে এবং সমুদ্রও মরুভূমি হইতেছে।

একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে এই যে নদীর খেলা।
আশ্চর্য্য এ কিছুই নহে এও ত' কালের লীলা।।

সংসারে প্রত্যেক পদার্থ পূর্ব্বে একরকম থাকে, পরে আর একরূপ হয়। সম্পদ্ যেরূপ ক্ষণকালের মধ্যে হয়, আপদও তদ্রূপ ক্ষণকালের মধ্যে হয়। লোকসকল ক্ষণমধ্যে ধনশালী হয়, আবার ক্ষণমধ্যে দরিদ্র হয়। আজ যে বিপুল ধন-সম্পদের অধিপতি, কাল সে পথের ভিখারী।

আজ যে মহারাজাধিরাজ, কাল সে ভিক্ষা চায়,
চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়।

সংসার প্রতিদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে ও প্রতিদিন উৎপন্ন হইতেছে। কতকাল অতীত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, অথচ আজ পর্য্যন্ত পোড়া সংসারের শেষ হইল না। কি যৌবন, কি শরীর, কি দ্রব্য, সমুদায় বস্তু অনিত্য ও তরঙ্গের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল। ক্রীড়া-কৌতুকাদির অভিলাষ পূর্ণ হইতে না হইতেই যৌবন আসিয়া বাল্যকাল গ্রাস করে। আবার স্ত্রীসম্ভোগাদির অভিলাষ পূর্ণ হইতে না হইতেই বার্দ্ধক্য আসিয়া যৌবনকে গ্রাস করে। কি বিপদ, কি সম্পদ, সমুদায়ই পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে, স্থিরভাবে কখনও থাকে না।

সহায়, সম্পদ, বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন পদ্মপত্রে নীর।

দেখা যায়, বলবান্ দুর্ব্বলের হস্তে বিনষ্ট হইতেছে, এক ব্যক্তিও শত শত ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিতেছে এবং অযোগ্য ব্যক্তিও উচ্চপদে আসীন হইতেছে। অধিক কি আর বলিব, কালের দ্বারা সমুদায় জগৎ পরিবর্ত্তনশীল।

এ জগতের জীবন বাতায়নসন্নিহিত দীপশিখার ন্যায় চঞ্চল, মৃত্যু আগমনোন্মুখ, অনুরাগ কেবল অসার বিষয়সুখের অনুসরণে নিরন্তর ধাবমান। এই পৃথিবীতে লোকসকল বিষয়ানুসন্ধানে মলিনচিত্ত, বন্ধুবান্ধব ভববন্ধনের রজ্জু, ভোগসকল মূর্ত্তিমান্ মহারোগ এবং জড়সুখ মৃগতৃষ্ণিকার অনুরূপ। অজ্ঞলোক যাহাকে ভোগস্থান বলিয়া জানে, সে-সমস্তই দারুণ দুঃখের আধার এবং তৃণাদি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত লোকশ্রেণীও দুঃখের আবাসভূমি। এই সংসারে সত্যের উদয় কুত্রাপি দৃষ্টগোচর হয় না। দুর্জ্জনসঙ্গই সতত সুলভ ও সাধুসঙ্গ নিতান্ত দুর্ল্লভ। যাহাতে কালভয় নাই, মৃত্যুভয় নিবারিত আছে, তাহা এ সংসারে দৃষ্টিগোচর হয় না। মৃত্যুভয়ে ভীত ব্যক্তির নিকট ভৃত্য, মিত্র, বান্ধব, বিত্ত সমস্তই নীরস। জীব কি-প্রকারে ক্ষণভঙ্গুর এই সংসারে আস্থাবান হইতে পারে?

এই সংসারে অবোধ বালিকার পুতুলখেলার ন্যায় আমরা মায়ার খেলায় উন্মত্ত হইয়াছি, একেবারে মাতিয়া রহিয়াছি। যখন আমাদের চিজ্জগতের প্রতি কোন অনুরাগ থাকে না, তখনই আমরা রূপ, যৌবন, বিদ্যা, বাহুবল, পাণ্ডিত্য, সুরম্য অট্টালিকা, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে আমার আমার বলিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠি। কিন্তু বুঝি না যে, এই আনন্দ পুতুলখেলার ন্যায় অতি তুচ্ছ, নশ্বর, হেয় ও অনুপাদেয়, দুইদিনের জন্য মাত্র। এই ক্ষণিক আনন্দে কোন নিত্য সুখ নাই। জগৎপতি কৃষ্ণের সেবা জীবকে নিত্যানন্দ দান করিয়া থাকে ও মায়ার সেবা জীবকে নিরানন্দ প্রদান করে। বহু ভাগ্যফলে অহৈতুক কৃপাসিন্ধু সম্বন্ধজ্ঞানপ্রদাতা নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীগুরুদেব আমাদের উদ্ধারের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়া চিজ্জগতের একমাত্র নিত্যপতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ করিয়া দেন। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যখন আমরা গুরু-কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়া ধন্য হই,

জড়ানন্দের প্রতি তখন আমাদের বিতৃষ্ণা আসিয়া যায়। পুতুল খেলারূপ সংসারের অনিত্য খেলায় আমাদের আর স্পৃহা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তগণের সেবাই কালজয় করিয়া নিত্যানন্দলাভের একমাত্র উপায়। ইহা ব্যতীত জীবের আর দ্বিতীয় উপায় কিংবা অন্য গতি নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

□□□

শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে।। (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১)

অনন্ত অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ঈশ্বর শ্রীনিত্যানন্দকে বন্দনা করি। মূর্খলোকও তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে সক্ষম হয়।

"সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম।।
একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায়।।
সেই কৃষ্ণ— নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ।।

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।৪-৬)

শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভাবের পূর্ব্বে মাঘী শুক্লা-ত্রয়োদশী-তিথিতে রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামে শ্রীহাড়াই পণ্ডিত (ওঝা) ও পদ্মাবতীর গৃহে ব্রজের বলাই শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ংপ্রকাশ ভগবান্ বলদেব।

দৈবক্রমে একদিন এক সন্ন্যাসী একচক্রা গ্রামে শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি নিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন এবং হাড়াই পণ্ডিতের নিকট তাঁহার তীর্থ পরিক্রমায় সহায়তার জন্য নিত্যানন্দকে কিছুদিনের জন্য প্রার্থনা করিলেন। অনন্যোপায় হইয়া হাড়াই পণ্ডিত তাঁহার প্রাণপ্রতিম পুত্রকে সেই সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। নিত্যানন্দ সমস্ত তীর্থস্থান পরিক্রমা করেন। এইভাবে পর্য্যটন করিতে করিতে তিনি নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মায়াপুর ঈশোদ্যানে শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন।

এদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে স্বপ্নে দর্শন করিলেন। তিনি ভক্তগণকে বলিলেন,—"আমি আজ এক অপরূপ স্বপ্ন দেখিলাম। তালধ্বজ একটী রথ আমার দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই রথে এক প্রকাণ্ড শরীরধারী বসিয়া আছেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন ১৪০৭ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০১

তাঁহার স্কন্ধে একটী বিশাল স্তম্ভ। তিনি চঞ্চল গতিবিশিষ্ট। তাঁহার বামহস্তে বেত্রবাঁধা এক কমণ্ডলু। তাঁহার পরিধানে নীলবসন এবং মস্তকে নীল বস্ত্র বাঁধা রহিয়াছে। তাঁহার কর্ণে বিচিত্র কুণ্ডল। তাঁহার ভাব দেখিয়া তাঁহাকে হলধর বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিল। তিনি দশ-বিশবার আমার নাম ধরিয়া "ইহা নিমাই পণ্ডিতের ঘর" কিনা—জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এমন অবধূত বেশ দর্শন করিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম এবং অপলকনেত্রে তাঁহার রূপ দর্শন করিতে লাগিলাম। আমি খুব সম্ভ্রম সহকারে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি হাসিয়া কহিলেন,—"অহো! ইহাই ত' আমার ভাইয়ের বাড়ী। আমার ভাইকে আমি অনেকদিন সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। আজ ভাইয়ের দেখা পাইলাম।" তিনি বলিলেন,—"নিমাই! কাল তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হইবে।" তাঁহার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার যে কি অবস্থা হইল তাহা বলিতে পারি না। আমার বর্ষাধারা হেন আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। আমি দেখিলাম—তিনি হলধরভাবে গর্জ্জন করিতেছেন।—এই কথা বলিতে বলিতে গৌরহরির ভাবান্তর হইল। স্বপ্নে তিনি নিত্যানন্দের এই রূপ দর্শন করিয়া ভক্তবৃন্দসহ তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িলেন। ভ্রমিতে ভ্রমিতে শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ শ্রীনিত্যানন্দের দর্শন পাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তিনি নিত্যানন্দের তত্ত্ব প্রকাশ করিবার মানসে শ্রীবাসকে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। শ্রীবাস শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোক কীর্ত্তন করিলেন,—

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ।।" (ভাঃ ১০।২১।৫)

তৎকালে নটবরবপু শ্রীকৃষ্ণ চূড়ায় শিখিপুচ্ছ ভূষণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার পুষ্প, পরিধানে কনকবর্ণ পীতবসন এবং গলে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া অধরামৃতদ্বারা বংশীছিদ্র পূরণ করিতে করিতে শঙ্খ-চক্রাদি লক্ষণযুক্ত নিজ পাদপদ্মের রতি বা লীলাস্থলী বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তখন গোপগণ তদীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন।

ইহা শুনিয়া নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে পর শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া নিত্যানন্দের স্তুতি করিতে লাগিলেন। তিনি ভক্তগণের নিকট নিত্যানন্দের স্বরূপ ও মহিমা কীর্ত্তনমুখে বলিতে লাগিলেন,—"অহো! আজ আমার কি শুভদিন। চারিবেদের সার যে দুর্ল্লভ ভক্তিযোগ আজ দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরশক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহেন। তাহা না হইলে এইপ্রকার কম্প, হুঙ্কার, গর্জ্জন কি অন্যে সম্ভব হয়? এই ভক্তিযোগ দর্শন করা যাঁহার ভাগ্যে

একবার ঘটিবে, তাঁহাকে কৃষ্ণচন্দ্র কোনওদিন পরিত্যাগ করিতে পারেন না।" তিনি নিত্যানন্দের স্তুতি করিয়া তাঁহার তত্ত্ব কহিতে লাগিলেন,—"হে নিত্যানন্দ! তুমি ঈশ্বরের পূর্ণশক্তি। জীব কেবলমাত্র তোমার ভজন করিলেই কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারিবে। তোমার চরিত্র দেবেরও অগম্য। তোমার দর্শনে চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্রীকৃত হইয়া থাকে। তোমার তত্ত্ব বুঝিবার বা দর্শন করিবার ভাগ্য কাহারই বা আছে। কৃষ্ণভক্তি মূর্ত্তিমন্ত হইয়া তোমার শ্রীবিগ্রহে প্রকটিত হইয়াছেন। মুহূর্ত্তমাত্র যদি কাহারও ভাগ্যে তোমার দুর্ল্লভ সঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে তাহার জন্ম-জন্মান্তরের কোটি কোটি পাপ সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া যায়। আজ আমার কি শুভদিন। যেহেতু কৃষ্ণ আমার নিকট তোমাকে আনিয়া দিলেন, সেইহেতু বুঝিলাম—কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাকে উদ্ধার করিবেন। আমার মহা সৌভাগ্যফলে তোমার চরণ দর্শন পাইলাম। তোমার ভজনদ্বারাই কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ হয়।"—এইভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বর্ণনমুখে তাঁহার কিছু মহিমার কথা প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছি।—

একদিন একটী কাক শ্রীবাসের কৃষ্ণসেবার ঘৃতপাত্র লইয়া চলিয়া গেল। শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনীদেবী হায় হায় করিতে লাগিলেন। মালিনীদেবীর দুঃখ দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রভু সেই কাককে ঘৃতপাত্র ফেরৎ দেওয়ার জন্য আদেশ করিলে কাক তাঁহার আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করিয়া সেই ঘৃতপাত্র ফেরৎ দিয়া গেল। নিত্যানন্দের এতাদৃশ প্রভাব দর্শন করিয়া মালিনীদেবী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সম্বিৎ পাইয়া তিনি নিত্যানন্দের স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং নিত্যানন্দ-তত্ত্ব বর্ণনমুখে বলিতে লাগিলেন,—"হে প্রভো! তোমার পক্ষে এই কার্য্য আর কি বেশী হইতে পারে। দ্বাপরে তুমি মৃত গুরুপুত্রকে যমের ঘর হইতে লইয়া আসিয়াছিলে। তোমার মস্তকোপরি অনন্ত ভুবনের অধিষ্ঠান, তুমি সর্ব্বজগতের পালনকর্ত্তা। তোমার নাম একবার গ্রহণ করিলে জীবের অনাদিকালের অবিদ্যা সমূলে বিধ্বংস হয়। ত্রেতাযুগে লক্ষ্মণরূপে যখন বনবাসে ছিলে তখন তুমি সীতাদেবীর রক্ষক নিযুক্ত ছিলে, কিন্তু তুমি সীতাদেবীর পাদযুগল ব্যতীত আর কিছুই দর্শন কর নাই। তোমার বাণে রাবণ-বংশ ধ্বংস হইয়াছিল। তুমি এই চতুর্দ্দশ ভুবনের পালনকারী।"—এইভাবে নিত্যানন্দ-তত্ত্বকথা বলিতে বলিতে মালিনীদেবী ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

নিত্যানন্দের অচিন্ত্যতত্ত্বের কথা অনভিজ্ঞ অভক্তজনের কোনওদিন বোধগম্য হইবে না। তজ্জন্যই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিলেন,—

"কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা তত্ত্বজ্ঞানী।
যাহার যেমত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি।।
যে সে কেন নিত্যানন্দ-চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ মোর রহুক হৃদয়ে।।

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১১।৬১-৬৩)

একদিন মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সমীপে অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতেছেন, এমন সময় নিত্যানন্দ শচীগৃহে বাল্যভাবে দিগম্বরবেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি সহস্তে তাঁহাকে বস্ত্র পরিধান করাইলেন। নিত্যানন্দকে দেখিয়া শচীমাতার তাঁহাকে বিশ্বরূপ জ্ঞান হইল এবং পরম স্নেহভরে তাঁহাকে পাঁচটী ক্ষীরের সন্দেশ ভোজন করিতে দিলেন। সেই সন্দেশ ভোজনকালে নিত্যানন্দ মহৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি পাঁচটী সন্দেশের মধ্যে একটী খাইয়া অপর চারিটী উঠানে ছড়াইয়া ফেলিলেন এবং শচীমাতাকে আরও সন্দেশ চাহিলে আই আর কোথায় পাইবেন বলায় নিত্যানন্দ জিদ্ ধরিয়া কহিলেন,—"গৃহের মধ্যে নিশ্চয়ই সন্দেশ রহিয়াছে। সন্দেশ দাও।" শচীমাতা গৃহাভ্যন্তরে গিয়া সেই চারিটী সন্দেশ দেখিতে পাইলেন। তিনি আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া নিত্যানন্দকে ঈশ্বরজ্ঞানে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

একদা নিত্যানন্দ বাল্যভাব অবলম্বনপূর্ব্বক দিগম্বরবেশে হুঙ্কার করিয়া—"আমার প্রভু নিমাই পণ্ডিত, আমার প্রভু নিমাই পণ্ডিত" বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু আস্তেব্যস্তে নিজের মস্তকের বস্ত্র তাঁহাকে পরাইলেন এবং তাঁহাকে সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার নানাপ্রকার সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি নিত্যানন্দকে বলিলেন,—"তুমি নামে নিত্যানন্দ এবং সাক্ষাৎ নিত্যানন্দরূপ। আনন্দ কোনও সময় তোমাতে স্তব্ধ হয় না। তুমি সাক্ষাৎ বলরাম।"

"বলরামো মমৈবাংশ সোঽপি তত্র ভবিষ্যতি।
নিত্যানন্দ ইতি খ্যাতো ন্যাসি চূড়ামণিঃ ক্ষিতৌ।। (বৃহদ্‌যামল)

মহাপ্রভু নিত্যানন্দের নিকট একখণ্ড কৌপীন চাহিয়া লইলেন এবং উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্তগণকে দিলেন ও সকলকে মস্তকে বাঁধিতে বলিয়া নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কহিতে লাগিলেন।—"এই বস্ত্র সকলে শিরে ধারণ করুন। ইহা যোগেশ্বরেরও দুর্ল্লভ বস্তু। এই নিত্যানন্দের কৃপাতেই বিষ্ণুভক্তি লভ্য হইয়া থাকে। ইঁনি কৃষ্ণের সঙ্গী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই। ইঁনি সর্ব্বজীবের জনক, রক্ষাকর্ত্তা ও সকলের পরম বান্ধব। ইঁনি কৃষ্ণরসভাবিতা মতি। একমাত্র ইঁহার সেবার দ্বারাই প্রেমভক্তি লাভ অনায়াসে হইয়া থাকে। ইঁনি সন্ধিনীশক্তি অধিষ্ঠিত বিষ্ণুবিগ্রহ। সুতরাং আপনারা সকলে ইঁহার কৌপীন মস্তকে বন্ধন করুন এবং গৃহে লইয়া গিয়া যত্নসহকারে পূজা করুন।"

(ক্রমশঃ)

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

দ্বাদশ-বৈষ্ণব

(৭) প্রহ্লাদ

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ আবির্ভূত হইবেন, মাতৃগর্ভে আছেন। দৈত্য-অরি দেবরাজ ইন্দ্র সুযোগ পাইয়া প্রহ্লাদের আসন্ন-প্রসবা সগর্ভা মাতা কয়াধুকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। উদ্দেশ্য,—গর্ভস্থ দৈত্যকুমার ভূমিষ্ঠ হইলেই তাঁহাকেও বধ করিবেন। কিন্তু, বধ করে কে কাহাকে? "রাখে হরি মারে কে?" সহসা দেবর্ষি নারদ আসিয়া ধাবমান মহেন্দ্রের গতি রোধ করিলেন। কহিলেন,—"করিয়াছ কি? ইন্দ্র, কাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছ? ইনি যে হিরণ্যকশিপু-পত্নী পরমভাগ্যবতী কয়াধু! ইঁহার পবিত্র গর্ভে এক পরম বৈষ্ণব রহিয়াছেন। ছাড়, ছাড়, এখনি ইঁহাকে পরিত্যাগ কর। বৈষ্ণব-অপরাধ হইলে, বৈষ্ণবের অঙ্গে আঘাত করিলে আর কি তোমার রক্ষা আছে?" ইন্দ্র মহাভয়ে তৎক্ষণাৎ কয়াধুকে ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহাকে পরম ভাগবতের আশ্রয়-স্থল জানিয়া ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে পরম যত্নে আপন আশ্রমে লইয়া গেলেন। হিরণ্যকশিপু তখন মন্দরাচলে ঘোরতর তপস্যায় রত ছিলেন। তাই দেবর্ষি কয়াধুকে বলিলেন,—"চল মা, যতদিন তোমার স্বামী ফিরিয়া না আসেন, ততদিন তুমি নিরাপদে আমার আশ্রমেই বাস করিবে।"

প্রহ্লাদ-জননী নারদের আশ্রমেই রহিলেন। সাধ্বী সতী ইচ্ছা-প্রসব কামনা করিয়া পরমসুখে সাধুসেবা করিতে লাগিলেন। ভাগ্যবান্ প্রহ্লাদের ত' গর্ভাবাস হইতেই সাধুসঙ্গের সুযোগ ঘটিল! দেবর্ষি নারদ সেই গর্ভস্থ শিশুকেই লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মাতাকে নিগূঢ় ভগবত্তত্ত্ব উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রহ্লাদ গর্ভে থাকিয়াই শুকদেবের মত সম্পূর্ণ চিত্তযোগে সেই সন্মুখরিত কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাহা স্ত্রীজাতি কয়াধুতে তেমন কার্য্যকরী না হইলেও প্রহ্লাদের হৃদয়ে উর্ব্বর ভূমির প্রভূত পত্র-পল্লবে সমৃদ্ধ তৃণতরুর মত পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি যথাসময় ভূমিষ্ঠ হইলেন, কিন্তু সেই সর্ব্বার্থসাধন মহামন্ত্র কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণতত্ত্ব একটুও বিস্মৃত হইলেন না। সাধু-মুখোচ্চারিত কৃষ্ণনাম কয়াধুর কর্ণপথে অন্তরস্থ হইয়া গর্ভস্থ প্রহ্লাদের শ্রবণযোগে একেবারে মর্ম্মস্পর্শ করিয়াই তথায় সুদৃঢ় পাষাণখোদিত রেখার ন্যায় অক্ষয় হইয়া রহিল। মহামহিম মহাভাগবত প্রহ্লাদ গর্ভমধ্যেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, কৃষ্ণনাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন! কয়াধু ক্ষণে ক্ষণে সেই কৃষ্ণনামধ্বনি শুনিয়া চমকিতা হইতেন!

কঠোর তপস্যায় দুর্ল্লভ বর লাভ করিয়া অধিকতর দুর্জ্জয় হইয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। সংবাদ জ্ঞাত হইয়া দেবর্ষি কয়াধুকে তথায় রাখিয়া আসিলেন। তিনি শুভক্ষণে সুপুত্র প্রসব করিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন ১৪০৭ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০১

পিত্রালয়ে পরমযত্নে শিশু প্রহ্লাদ শশিকলার মত ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছেন। তাঁহার বিদ্যারম্ভের কাল উপস্থিত হইল। দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে যথানিয়মে গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। দৈত্যরাজ শুক্রাচার্য্য অনুপস্থিত থাকায় তাঁহার দুইটী পুত্র—ষণ্ড ও অমর্ক শিশুর শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইলেন। শিশুটী যে সামান্য নহে, তাঁহার চরম শিক্ষা, পরম দীক্ষা যে বহুপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, তাহা আর জানিবে কে? ষণ্ডামর্ক পড়াইতে আরম্ভ করিলেন ; প্রহ্লাদও পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু সে পড়াত' তাঁহার ভাল লাগে না ; তাঁহার অন্তরে যে পরাবিদ্যার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে ; অপরা বিদ্যার বিফল বাক্য আর ভাল লাগিবে কেন? তিনি ক্ষণে ক্ষণে বিভোর হন ; কৃষ্ণচিন্তায় তন্ময় হন ; ভগবদ্বিমুখ গুরুবাক্য কর্ণে প্রবেশ করে না।

একদিন দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে কোলে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস! বল দেখি, তুমি কি ভাল বলিয়া মনে কর?"

প্রহ্লাদ বলিলেন,—"মিথ্যা মমতাপূর্ণ আত্মার অধঃপাতের কারণ, গৃহান্ধকূপ পরিত্যাগ করিয়া বহির্ম্মুখজন-সঙ্গবর্জ্জিত বনে গিয়া হরিসাধনা করাই আমি ভাল মনে করি।"

দৈত্যরাজ পুত্রের মুখে বিপক্ষ হরির স্তুতিবাদ শুনিয়া ক্রোধে অট্টহাস্য করিয়া কহিলেন,—"পরবুদ্ধিতে এইরূপেই বালকদের বুদ্ধিভেদ ঘটে। যাও, এই বালককে পুনর্ব্বার গুরুগৃহে লইয়া যাও ; সাবধানে রক্ষা কর, শিক্ষা দাও ; ছদ্মবেশী বিপক্ষীয়েরা যেন আর ইহার বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে না পারে।"

প্রহ্লাদ আবার গুরুগৃহে নীত হইলেন। ষণ্ডামর্ক তাঁহাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রহ্লাদ সত্য বল দেখি, এত বালকের মধ্যে তোমারই এমন বুদ্ধিভেদ কেন হইল? ইহার কারণ কি?" উত্তরে প্রহ্লাদ বলিলেন,—"সর্ব্বকারণকারণ শ্রীহরিই ইহার কারণ।" ব্রাহ্মণেরা তাঁহার কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিলেন। নানাবিধ ভয় দেখাইয়া ত্রিবর্গ-প্রতিপাদক শাস্ত্রসকল পাঠ করাইতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ তাহাতে মনোযোগ দিলেন না ; হরিপদ-চিন্তাতেই নিবিষ্ট হইয়া পরমানন্দে রহিলেন। ষণ্ডামর্ক মনে করিলেন, বালক এবার পাঠে বেশ মনোযোগী হইয়াছে। তখন আবার তাঁহাকে দৈত্যরাজের কাছে লইয়া যাওয়া হইল। তিনিও পুত্রকে কোলে লইয়া পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা প্রহ্লাদ, বল দেখি, এতদিন তুমি গুরুর কাছে যাহা শিখিয়াছ, তাহার মধ্যে উত্তম কথা কি পাইয়াছ? একটু বলত' শুনি।"

ষণ্ডামর্কের সেই বহির্ম্মুখী বিদ্যায় উত্তম আর কি ছিল? কি বা থাকা সম্ভব? অপরের মায়িকবুদ্ধিতে তাহার কোনও বিষয় উত্তম বলিয়া বোধ হইলেও তাহা সজ্জনের হৃদয় স্পর্শ করিবে কেন? তিনি,—যে বাক্যে শ্রীহরির যশঃকীর্ত্তন নাই তাহা ব্রহ্মার

বাক্য হইলেও তাহা ত্যাগ করেন। প্রহ্লাদেরও হৃদয়ে ঐ সকল বিফল বিদ্যার কোনও শিক্ষাই স্থান পাইল না। ঐ বিফল বিদ্যায় গর্ব্বিত আত্মবিস্মৃত ব্রাহ্মণদিগকেও তিনি গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলেন না। পারিবেন বা কেন? প্রহ্লাদের গুরু যে সেই বিশ্ব-বৈষ্ণব-গুরু, গোবিন্দগত প্রাণ, মহাপ্রাণ নারদ ; প্রহ্লাদের শিক্ষা যে সেই সর্ব্ববিৎ, সেই নিখিল-তত্ত্ববিৎ মহাত্মার শ্রীমুখবাক্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছে। পিতার বাক্য শ্রবণমাত্র স্বতঃই যেন প্রহ্লাদের ঐ হৃদয় হইতে উচ্ছলিত হইয়া বদন-কমলে এই অমিয়বাণী উদ্‌গত হইল,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।" (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

প্রহ্লাদ বলিলেন,—"শ্রীহরির নাম-গুণগান শ্রবণ, কীর্ত্তন ; তাঁহার রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ ; তাঁহার পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ;—এই নববিধ ভক্তিযোগে ভগবদ্ভজনই জীবের উত্তম শিক্ষা।"

আবার সেই কথা। সর্ব্বনাশ! হিরণ্যকশিপু মহাক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া ষণ্ডামর্ককে কহিলেন,—"রে দুর্ম্মতি ব্রহ্মবন্ধো! এইসকল অনর্থকর অসার বাক্য এই বালককে কেন শিখাইলি? দেখিতেছি তোরা আমার ছদ্মবেশী শত্রু।" (ক্রমশঃ)

জীবতত্ত্ব

মাংসময় স্থূল দেহ, লিঙ্গাত্মক সূক্ষ্ম দেহ,
'জীব'-'আত্মা' অতীত সবার।
যাহা অন্তর্হিত হ'লে, দেহ যায় পচে গলে, দারা,
পুত্র কেহ নহে কা'র।।
যাহা না রহিলে হায়! শ্মশানেতে ল'য়ে যায়,
ফেলে দেয় জঙ্গলে বা জলে।
লক্ষ অংশ কেশাগ্রের, পরিমাণ সে জীবের,
জন্মে, মরে নাহি কোন কালে।।
সেত' হয় অবিনাশী, বলে শাস্ত্র তত্ত্বদর্শী,
তা'র নাশ কদাচ ত' নয়।
নাশশীল হয় দেহ, না পারে রাখিতে কেহ,
জীবনান্তে তাহা হয় ক্ষয়।।

আত্মা হয় অজ নিত্য, সনাতন চির-সত্য,
দেহসনে তার নাহি নাশ।
জীর্ণ দেহ ছে'ড়ে যায়, নব দেহ পুনঃ পায়,
নর যথা ত্যজে ছিন্ন বাস।।
অস্ত্র নাহি তারে মারে, অগ্নি নাহি পুড়ে তারে,
জলে দ্রব তাহা নাহি হয়।
অচ্ছেদ্য, অদাহ্য হয়, শোষ্য, আর্দ্র কভু নয়,
দেহ-নাশে তার নাশ নয়।।
আত্মা কভু নহে বিপ্র, ক্ষত্রিয় অথবা শূদ্র,
কিংবা সেত' বৈশ্য কভু নয়।
গৃহী কিংবা ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী বা বনচারী,
বর্ণাশ্রমী আত্মা নাহি হয়।।
আত্মা কৃষ্ণ-শক্তি হয়, যথাগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়,
অংশু যথা সূর্য্যের কিরণ।
আত্মা নিত্য কৃষ্ণদাস, ভেদাভেদ-পরকাশ,
চিন্তাতীত বলে বিজ্ঞজন।
অনাদি কর্ম্মের ফলে, দেহ লাভ কালে কালে,
চৌরাশী লক্ষেতে ঘুরে ফিরে।
গুরু-কৃষ্ণ-কৃপাবলে, কৃষ্ণভক্তি তা'র হ'লে,
ঘূর্ণীপাক হ'তে তবে তরে।।
কৃষ্ণের অপর শক্তি, যার নাম মায়াশক্তি,
ভক্তিহীনে সদা দেয় দুঃখ।
কভু কিছু সুখী করে, কভু দুঃখ দিয়া জারে,
নাহি দেয় পরাশান্তি সুখ।।
যদি কোন ভাগ্যফলে, সাধুকৃপা তার মিলে,
কৃষ্ণভক্তি সেই যবে পায়।
অকৈতব সেবাকালে, নিষ্কাম ভক্তির ফলে,
সেই জীব তবে তরে যায়।।

—শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

সর্ব্বাগ্রে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-চরণে অনন্তকোটি দণ্ডবৎ-প্রণতি। তদনন্তর পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ, সুধী সজ্জনমণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলী-চরণেও আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ। আজ আমরা এখানে সকলে উপস্থিত হয়েছি কোন একটা বিশেষ ব্যাপারে। ব্যাপারটা কিছুই নয়, আজ কারও জন্মতিথি বা জন্মদিন। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যদি কোন গৌড়ীয়-ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর জন্মতিথি উপস্থিত হয়, তাহলে সেইদিন তাঁর পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গ থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্য্যন্ত সকল গুরুবর্গের পূজাবিধান করেন। এককথায় গুরুবর্গের কৃপা অহৈতুকী। কিন্তু সেই কৃপা অনুভব করার জন্য সম্বাৎসরিকভাবে কখনও সেই অনুষ্ঠান করা হয়। শাস্ত্রানুসারে প্রতি মুহূর্ত্তে যদি আমরা গুরুকৃপা অনুভব করতে না পারি, তাহলে আমাদের সাধন-ভজনের সম্ভাবনা থাকে না। তাই অন্ততঃ বৎসরান্তে একবার সেই সন্ন্যাসীর জন্মদিনে গুরুপূজা বা ব্যাসপূজার আরম্ভ করা হয়। আমরাও আজ এখানে সমবেত হয়েছি সেই গুরুপূজা বা ব্যাসপূজা উপলক্ষে।

ব্যাসগুরু থেকে আরম্ভ করে বা তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী যে গুরুপরম্পরা রয়েছে তাতে কৃষ্ণ আছেন সকলের প্রথমে।—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্।।

কৃষ্ণই আদিগুরু। আবার আশ্রয়বিগ্রহ হিসাবে ধরতে গেলে ব্যাসদেবকেই ধরতে হয়। ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করুন। শাস্ত্র যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখব, সমস্ত শাস্ত্র বিশেষভাবে প্রণয়ন করেছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ঋষি। তিনি বেদ বিভাগ করেছেন, বেদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ উপনিষদাদি রচনা করেছেন, মহাভারত, পুরাণাদি রচনা করেছেন। এসব গ্রন্থাদি আলোচনা করবার পরও তিনি মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলেন। যা ইতিহাস আমরা পাই—বিষণ্ণ-বদনে ব্যাসদেব বসে আছেন, সেই সময় নারদঋষি তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। নারদঋষি জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাস, তুমি বিষণ্ণবদনে বসে আছ কেন? বেদব্যাস বললেন,—কি জানি প্রভু আমার এই বিষণ্ণতার কারণ। আমি ত' জীবকল্যাণের জন্য বহুকাজ করেছি, তথাপি মনে শান্তি পাই না কেন? নারদঋষি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। ধ্যানস্থ হওয়ার পর তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি তোমার মানসিক অশান্তির কারণ। তুমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-মাহাত্ম্য প্রচুররূপে কীর্ত্তন কর নাই। এইজন্য তোমার মানসিক অশান্তি। এইকথা শুনবার পর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সমাধিস্থ হন। তত্ত্বদর্শন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে, তিনি ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তাঁর পক্ষে না হওয়ার কিছু নাই। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত

প্রকাশ করেন। প্রকাশ করেন—একথা বলার কারণ হল জিনিষটা আগে থেকে আছে। আদৌ ভগবান্ ব্রহ্মাজীকে চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করেছিলেন। তদনুসারে তারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে দিয়েছেন। এই গ্রন্থের সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা আছে,—

"গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ।
হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা।
গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ।।"

অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক যে গ্রন্থে আছে, দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত যে গ্রন্থ, যে গ্রন্থ 'সত্যং পরং ধীমহি' এই গায়ত্রী দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, তাকে ভাগবত বলে জানবে। আবার অন্যত্র বলছেন,—"সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।" যদি কারও বেদান্ত দর্শন জানতে হয়, পড়তে হয়, তাহলে শ্রীমদ্ভাগবত তাকে অনুশীলন করতে হবে। আবার এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলছেন,—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ।।"

এই গ্রন্থ মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক গ্রন্থ। "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাম্"—বেদান্ত দর্শনের অর্থগ্রন্থ ; "ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ"—মহাভারতের অর্থ নির্ণায়ক এই ভাগবত। "গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ"—যদি কারও গায়ত্রীর অর্থ জানতে হয়, তাহলে তাকে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করতে হবে। "বেদার্থ-পরিবৃংহিত"—যদি কারও বেদ আলোচনা করবার ইচ্ছা হয়, তাহলেও এই ভাগবত আলোচনা করতে হবে আগে। তবে এর তাৎপর্য্য নির্ণয় করা যাবে, বুঝা যাবে।

শাস্ত্র যে কথা আমাদের শিখাচ্ছেন তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা হল—আমরা ভগবানেরই সম্পর্কিত। নিখিল বিশ্বাত্মা ভগবান্ তিনি আমাদিগকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, আর যেভাবে পরিচালিত করছেন, সবটাই একটা রহস্যযুক্ত ব্যাপার। তার মধ্যে থেকে আমাদের আত্মকল্যাণের জন্য পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। সে পরীক্ষায় ফেল করা যত ছাত্রছাত্রী আমরা সবাই এই সংসারে এসে জন্মগ্রহণ করেছি। এখানে এসে মায়ার সংস্পর্শে ভগবান্‌কে ভুলে গেছি, মূল মালিককে ভুলে গেছি। তাই আমাদের এখানে বহুরকমের কষ্ট পেতে হয়। শাস্ত্র বলছেন,—এই কষ্ট থেকে যদি তোমরা উদ্ধার লাভ করতে চাও, তাহলে পুনরায় আবার সেই ভগবানের শরণাপন্ন হও। গীতা-ভাগবতে সেই উপদেশই আছে।

এ সংসারে আমরা আছি, খেয়ে, থেকে, পরে চলছে একরকম। কিন্তু এ চলাটা একরকম, আর যাঁরা সাধন-ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি তাঁদের চলা আর একরকম। জগতের সাধারণ লোকের সঙ্গে তুলনা হয় না তাঁদের। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গ যাঁরা,

তাঁরা যে উপদেশ করেছেন সাধন-ভজন সম্বন্ধে, তা সবই শাস্ত্রে লেখা আছে। আমাদের সেইটা অনুসরণ করতে হবে। *"যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।"*— শাস্ত্রের কথা হচ্ছে এইটা।

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ।।"

তাহলে আমাদের স্থানটা ত' এ জগৎ নয়, পরজগৎ। ভগবানের স্থানই আমাদের স্থান। সেখান থেকে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে এসে আমাদের কর্ম্ম-কর্ম্মফল ভোগ করতে হচ্ছে। দুঃখের কথা ; সুখের, শান্তির কথা নয় এটা। শাস্ত্র তাই বলছেন, গুরু-বৈষ্ণবগণ তাই বলছেন যে, আমাদের সেখানে ফিরে যেতে হবে। সেখানে ফিরে গেলেই আমাদের আনন্দ। সে আনন্দ এ জগতে লাভ হয় না, হবে না। আবার হয়, কখন? গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য করে, শাস্ত্রের আনুগত্য করে যখন আমরা সাধন-ভজন-পথে অগ্রসর হই তখন আনন্দের কথা আসে। শাস্ত্রানুসারে আমাদের হরিভজন করা দরকার, কৃষ্ণভজন করা দরকার—এইটা সনাতন শাস্ত্রের উপদেশ।

সনাতন শাস্ত্রের মধ্যে দেবদেবীর পূজার কথা ঠিক বলা নাই। যেটা বলা হয়েছে, সেটাও অধিকারভেদে। যারা অত্যন্ত কর্ম্মজড়, যারা উন্নততম শাস্ত্রের বিচার, সাধন-ভজনের কথা কিছুই বোঝে না, তাদের জন্য বলা আছে। কিন্তু সেটা ত' বুদ্ধিমান্-বুদ্ধিমতীর কর্ত্তব্য নয়। তাই আমাদের হরিভজনের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টাবিশিষ্ট হতে হবে—এটাই হল সনাতন শাস্ত্রের উপদেশ, ভাগবত ধর্ম্মের উপদেশ, সনাতন ধর্ম্মের উপদেশ। এটাকে বাদ দিয়ে আমাদের মঙ্গলের কোন ব্যবস্থা নাই।

আমরা আজকের যে দিনে উপস্থিত হয়েছি এখানে, এর নাম বলা হয়েছে কি?—ব্যাসপূজা। ব্যাসপূজা কেন? কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস থেকে আরম্ভ করে পরবর্ত্তী সমস্ত গুরুবর্গের পূজার অনুষ্ঠান আজ। পূজাপঞ্চকের যে অনুষ্ঠান, সেটাও ব্যাসপূজারই অন্তর্গত। এটা মায়াবাদী-সম্প্রদায়ের মধ্যেও আছে। কিন্তু তারা যে পূজা করে, সেই পূজার ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে সন্দেহ আছে। কেন সন্দেহ আছে? তাদের বিচার হচ্ছে *"গুরু অনবগতস্যাৎ।"* গুরু তত্ত্বদর্শী নন। গুরু যদি তত্ত্বদর্শী না হন, তাহলে আমি কি করে তত্ত্বদর্শী হব? প্রশ্ন আসে। শাস্ত্র আলোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, মায়াবাদী-সম্প্রদায়েও গুরুপূজার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যারা বলছেন—*'গুরু অনবগতস্যাৎ'* তাদের মঙ্গলের কথা কি আছে? গুরু ত' সর্ব্বজ্ঞ। ভগবৎকৃপায় গুরু সর্ব্বজ্ঞ, বৈষ্ণব সর্ব্বজ্ঞ—এটা তত্ত্বদর্শন। কোন ব্যক্তিবিশেষের পরে আরোপিত বস্তু নয় এটা। তত্ত্বদর্শনের বিচার। শাস্ত্রে সব জায়গায় তত্ত্বদর্শনের পরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আমরা যখন কোন মানুষের পরে এটা আরোপ করি, তখন ভুল করে ফেলি। এটা তত্ত্বদর্শন নয়। ভগবত্তত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্ব, জগতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব—এগুলো তত্ত্বদর্শন, আলোচনার

বিষয়। কিন্তু তা না হয়ে উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে আজকাল। শাস্ত্রানুসারে আমাদের বিচারটা নিতে হবে। সেখানে শিক্ষা যা রয়েছে সেই অনুসারে আমাদের অগ্রসর হতে হবে, Process, Procedure অনুসারে আমাদের সাধন-ভজনপথে অগ্রসর হতে হবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ। তাকে বাদ দিয়ে কিছু করতে পারি না।

আমাদের ইচ্ছানুসারে আমরা যদি কিছু করতে যাই, তাহলে সবটাই ভুল হয়ে যাবে। আমাদের জন্মের থেকে যে জিনিষ আমরা দেখছি, শুনছি, বুঝছি, সেই অনুসারেই আমরা চলবার চেষ্টা করছি বর্ত্তমানে। কিন্তু আমাদের কে পরিচালিত করবেন?—শাস্ত্র পরিচালিত করবেন। শাস্ত্র কি?—শাস্ত্র ভগবানের শ্রীমুখের বাণী। ভগবান্ সাক্ষাদ্ভাবে বলছেন শাস্ত্র। বেদ কাকে বলব? স্বয়ং আবির্ভূত তত্ত্ব, ভগবানের নিঃশ্বসিত বাণী, তাকে বলে বেদ। সেই বেদের মধ্যে বহু কথা সুন্দরভাবে বুঝানো আছে। বেদকে বলছেন পরোক্ষবাদ।—

"পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা।।"

বেদ হল পরোক্ষবাদ—Indirect speech। কিন্তু গীতা-ভাগবত Direct speech, সাক্ষাদ্ভাবে ভগবান্ উপদেশ করেছেন, নির্দ্দেশ করেছেন। এর ভিতরে কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম বলে তিনটে জিনিষ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কর্ম্ম মানে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম। অকর্ম্ম হল শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান, আর শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হল বিকর্ম্ম। এই তিনটে জিনিষই আমাদের বুঝতে হবে। যদি আমি ভগবানের উপাসনা করতে যাই, তাহলে আগে আমাকে এটা জানতে হবে, বুঝতে হবে, শিখতে হবে। তা না হলে আমার তত্ত্বজিজ্ঞাসার সমাপ্তি হবে না, তত্ত্বদর্শন আমার লাভ হবে না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর যে উপদেশ, তার মধ্যে রয়েছে,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।।"

তত্ত্বসিদ্ধান্ত বড় কঠিন, মাথায় ঢোকে না। সেজন্য অলসতা করে ওটা অনুশীলন করব না, অভ্যাস করব না—এটা বোকামি, বুদ্ধিমত্তা নয়। তাহলে আগে আমাকে শিখতে হবে, জানতে হবে। ওটা যদি না জানি আমি, তাহলে আমার হরিভজন করার কোন সুযোগ নাই।

জগতের ভাল-মন্দ একরকম, আর পারমার্থিক ভাল-মন্দ আর একরকম। আমাকে যদি হরিভজনে প্রবৃত্ত হতে হয়, তাহলে শাস্ত্রীয় যে তত্ত্বদর্শন সেটা আমাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। শাস্ত্র আমাদের আলোচনা করতে হবে। শাস্ত্র অনুশীলন নিজের দ্বারা হবে না। তার মধ্যেও আনুগত্যের প্রয়োজন আছে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তখন পুরীতে অবস্থান করছেন। এক 'যদ্বা তদ্বা' কবি এসে তার কিছু লেখা মহাপ্রভুকে শুনাবার

আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মহাপ্রভুর কাছে তিনি বললেন,—আমি কিছু আপনাকে শুনাতে চাই। মহাপ্রভু বললেন,—এটা আমি দেখি না। তাঁর যে Private secretary স্বরূপ দামোদর তাঁর কাছে যেতে বললেন। যা কিছু বলার ঐখানে গিয়ে বলুন। স্বরূপ দামোদর সব শুনে বললেন,—আপনি কি লিখেছেন বলুন। 'যদ্বা তদ্বা' কবি যখন বর্ণনা করছেন তখন স্বরূপ দামোদর কিছুক্ষণ শুনে বললেন,—আর পড়তে হবে না। কেন? তত্ত্বদর্শনে সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য বললেন আর পড়তে হবে না। সেখানে বর্ণিত হয়েছে,—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে।।
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ।।"

কথাগুলো এসেছে এইভাবে। শাস্ত্র আলোচনা করতে হবে তাহলে গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে। নিজে নিজে পড়া হবে না। নিজে নিজে জগতের পড়াও শেখা যায় না। সেখানেও শিক্ষকের দরকার। পরমার্থক্ষেত্রেও শিক্ষকের দরকার। শাস্ত্র বলছেন, শুনবার লোক নাই, আর উপদেশ করবার লোকও খুব কম। তাহলে কি করে আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা? এর মধ্যে আমাদের মঙ্গল খুঁজে নিতে হবে। এটাই হল শাস্ত্রের উপদেশ। শাস্ত্রের কথা ওজন করা কথা, হিসাব করা কথা। সেইজন্য বলা হয়েছে একে Axiomatic Trurh—বাস্তব সত্যকথা। এর কোন হেরফের হয় না।

ধরুন, আমরা ভারতরাষ্ট্রে বাস করি। ভারতীয় সংবিধান যদি আমরা মানি, তাহলে আমরা ভারতবর্ষে থাকবার অধিকার পাই। যত আইনকানুন আছে, সব আইনকানুনের সুযোগ-সুবিধা পাই। তদ্রূপ শাস্ত্র হচ্ছেন পারমার্থিক সংবিধান। আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে। তাহলে আমরা রক্ষা পাই, আশ্রয় পাই। তা না হলে নিরাশ্রিত অবস্থায় ঘুরে ঘুরে মরতে হবে, প্রাণটা যাবে। আমাদের গুরুবর্গের যে উপদেশ-নির্দ্দেশ আছে, তা তাঁদের নিজেদের কথা নয়। সব উপরওয়ালার কথা। উপরওয়ালা কে? উপরওয়ালা হলেন স্বয়ং ভগবান্—যিনি গীতা-ভাগবত উপদেশ করেছেন সাক্ষাদ্ভাবে। শাস্ত্র কাকে বলব? কাকে কাকে শাস্ত্র বলা হবে?—সে সম্বন্ধে ধারণা থাকা চাই। শাস্ত্র বললেন,—

"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাঞ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে।।
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ।।"

ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারি বেদ এবং মহাভারত, মূল রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র—এই সকলকেই শাস্ত্র বলছেন। অন্য আর কিছু শাস্ত্র নয়? এই শাস্ত্রের

অনুগত যত প্রকরণ গ্রন্থ তা সবই শাস্ত্র। আর এই শাস্ত্রের যে তত্ত্বসিদ্ধান্ত, এর বিরুদ্ধ যেগুলো, সেগুলো শাস্ত্র নয়। এগুলোকে সযত্নে পরিত্যাগ করবে, পরিহার করবে। তাহলে শাস্ত্রে ত' সব উপদেশ রয়েছে। আমরা কি আর বলব! এখন কলিযুগে এসে গেছি আমরা। অন্যান্য যুগের ব্যবস্থা অন্যরকম ছিল। বহু বহু পরমায়ু ছিল তখনকার মানুষের। তপস্যা করে লাভ করেছেন ভগবান্‌কে সত্যযুগে। ত্রেতাযুগে যাগযজ্ঞ করে ভগবান্‌কে লাভ করেছেন। দ্বাপরযুগের লোক পূজার্চ্চন করে ভগবান্‌কে লাভ করেছেন বিশেষভাবে। কিন্তু আমরা ত' কলিজীব। আমাদের কি ব্যবস্থা রয়েছে? শাস্ত্র বললেন,—হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন। এছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা নাই। শুধু নাম-সঙ্কীর্ত্তন। ব্যবস্থা সহজ-সরল অন্যান্য যুগের থেকে। "নামসঙ্কীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়।" এইটাই সেখানে উপদেশ। আমাদের হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা মিলিবে সকল। অন্যান্য যুগের যে-সকল তারকব্রহ্ম নাম আছে, তার যতটুকু ভাল প্রাপ্তি, তার সবটুকু কলিযুগের—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"

—এই মহামন্ত্রের মধ্যেই আছে। সেজন্য শাস্ত্রের উপদেশ,—

"যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্।"

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।।

এ ঘোর সংসারে,　　পড়িয়া মানব,
না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি',　　হরি ভজে যদি,
তবে অন্ত হয় ক্লেশ।।

তাহলে আমাদের সাধন-ভজন-প্রচেষ্টার দরকার আছে। এ অভ্যাস আমাদের নাই। জন্ম-জন্মান্তরের সব অভ্যাস ভুলে গেছি আমরা। আমাদের এ জগতে বদ্ধদশার কারণ সম্বন্ধে ভাগবত বলছেন,—মূল মালিককে ভুলে গেছি আমরা। যাঁর সেবা করা দরকার, সেই সেবা করার কথা ভুলে গেছি আমরা। সেখান থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছি। কল্যাণ কিসে হবে? কিছুতেই ত' ওটা করব না আমরা। সাংসারিক বিষয়ে পটু আমরা; কিন্তু পরমার্থ-বিষয়ে আমাদের মোটেই চেষ্টা নাই,—নিশ্চেষ্ট। কিভাবে আমাদের কল্যাণ হবে?

ব্যাসপূজা দিবস। কজন লোক জানছেন এই ব্যাসপূজা, গুরুপূজা। এটা তাঁদের কৃপাপ্রার্থনা করা। আমার শিক্ষক যাঁরা, পরমার্থ গুরু যাঁরা, তাঁদের কথা ত' চিন্তা-

ভাবনা করতে হবে। প্রতিদিন চিন্তা করতে হবে, প্রতি মুহূর্ত্তে চিন্তা করতে হবে। শুধু কেবল সম্বাৎসরিক উৎসবরূপে পালিত হবে কেন এটা? শাস্ত্রের যা নির্দ্দেশ আছে, তাতে এটা সবসময়, সর্ব্বক্ষণ পালন করার কথা আছে।

"হরি গুরু-বৈষ্ণব, তিনের স্মরণ,
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন।।" (ক্রমশঃ)

নিবেদন

হে শ্রীগুরুদেব!
সুপ্ত আমি রহি এ দেহে, জানিতাম
আমি ত' দেহ, ভজিতাম দেহ-মন—
প্রীতি লাগি'। কিন্তু হে প্রভো!
কি দয়া তব! নিজ কৃপা-বলে
আকর্ষিলে মো হেন অধমে!
ঘুচা'লে সে ভ্রম মম, জানা'লে—
আমি ত' আত্মা—নহি ত' দেহ—
স্বরূপে কৃষ্ণদাস। সে বিস্মৃতি-
হেতু মায়াবশ ; দৈবী যে পরাইল,
প্রপঞ্চের ফাঁস, দুর্ল্লঙ্ঘ্য! দুরত্যয়!
তবে যদি আশ, লঙ্ঘিবারে সে ফাঁস,
লভিতে স্বরূপস্থিতি। পুনঃ কৃষ্ণদাস্য
—বরণোপায়। শুদ্ধভক্তি—
সাধন শুধু ; সেবাশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য
—কুণ্ডতীর ; সাধ্য অন্বেষণ—
কেবল কৃষ্ণপ্রীতি। মো হেন অধম—
অণুচিৎকারণ ; পুনঃ মায়াবশহেতু—
অনর্থ-লিপ্ত—কি শক্তি ধরে,
কৃষ্ণপ্রীতি সাধিবারে ; তব কৃপাবলে
না হ'লে গুণিতক। এত কৃপা যবে
তব, পারি কি হৃদে, ধরিতে আশা,
সেবিবারে—চরণ তব—জনমে জনমে।।

—শ্রীউপেন্দ্র দাসাধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়ের ত্রিপঞ্চাশৎ-বর্ষ

শ্রীপত্রিকার নববর্ষে শ্রীগৌড়ীয়-পূর্ব্বাচার্য্যবর্গের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক অন্বয়-ব্যতিরেকমুখী উপদেশামৃত

শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের উপদেশাবলী

৫০। সাধারণতঃ বিরহে সান্ত্বনার আবশ্যক। বিরহ-ব্যথিত হৃদয় সান্ত্বনা পাইলে সঞ্জীবিত থাকে, নচেৎ পুনঃ পুনঃ বিরহ-যাতনা তাহাকে দশম-দশায় উপনীত করায়। যিনি যতটা পরিমাণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আসক্তচিত্ত, তিনি ততটুকুই তাঁহার বিরহ অনুভব করিবেন।

৫১। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের দুরবস্থা এবং স্বাতন্ত্র্যের প্রতি আঘাত না করিয়া সকলের স্বাভাবিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শিক্ষাভিমানিকে কৃপা করিয়া বঞ্চনা করিয়াছেন।

৫২। সাধু-বৈষ্ণবসঙ্গে থাকিয়া হরিনাম কীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করা। 'ভজন' বলিতে কৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র ভজন। ইহাই শ্রীরূপ-রঘুনাথের শিক্ষা।

৫৩। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি প্রচারাখ্যা ভক্তিই শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট 'ভাগবত-মত' এবং মঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ, শ্রীবিগ্রহ-সেবাদি-পরিচালন প্রভৃতি অর্চ্চনাখ্যা ভক্তিই 'পাঞ্চরাত্রিক-মত'।

৫৪। "শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ", "অনুসরণ ও অনুকরণ", "আসল ও নকল", "Ontology ও Morphology", "পারমার্থিক ও ব্যবহারিক" প্রভৃতি এবং গৌড়ীয়ের বপু ও বাণী আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই বা তাহার পার্থক্য উপলব্ধি হয় নাই। তাই গুরুদাসগণের নিকট প্রার্থনা তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে আমার কাণ প্রস্তুত করিয়া দেন। কাণ প্রস্তুত না হইলে "উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে"—এই বাক্যের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িব।

৫৫। আম্নায়-বাণীর আশ্রয় ব্যতীত বা শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত সচ্চিদানন্দ-ভক্তির বিনোদন হইতে পারে না। তাই শ্রীল ঠাকুরের পূজা অর্থাৎ তৃপ্তিসাধনকে লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধান্ত-বাণীরই পাদপদ্মে অর্ঘ্য বিতরণ করি।

৫৬। "পর"-শব্দে অনাদি শ্রেষ্ঠ বস্তুকে লক্ষ্য করে। যে-কার্য্যের দ্বারা আমাদের শ্রেষ্ঠতা বিনষ্ট হয়, তাহাকে পর-উপকার বলা যায় না। নিত্যানন্দময় বস্তুই শ্রেষ্ঠ। জীব নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইলেই পর-উপকারের ফল লাভ করিল।

৫৭। কেবলাদ্বৈতবাদী আত্মঘাতী হইতে পারে, শাস্ত্র কখনও আত্মঘাতী হইতে পারেন না। নির্ব্বিশেষত্বই যদি বেদের মত হয়, তবে বেদ স্বয়ং নির্ব্বিশেষ হইয়া নিজ অস্তিত্ব-শূন্যতার পরিচয় দিবে। আমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া সভামধ্যে বলিতেছি—'আমি

নাই।' ইহাতে আমার উন্মত্ততাই জ্ঞাপিত হয়। বেদ কখনও তাঁহার নিত্য সত্তা বর্ত্তমান থাকাতে তাহার অস্বীকার করিতে পারে না।

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

৫৫। "ভগবানের ভক্তগণ ভগবানকে নাম-সঙ্কীর্ত্তনসহযোগে ডাকেন ভগবানের সুখের জন্য— ভগবানের সেবার জন্য ; তাঁহাদের নিজের কোন কামনা পরিতৃপ্তির জন্য নহে।"

৫৬। "শ্রীবিগ্রহ বৈকুণ্ঠস্থ চিদ্‌বিলাস ভগবানের নিত্যরূপেরই প্রাপঞ্চিক-জগতে করুণাময় অবতার। তাহা ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন। বৈষ্ণবগণ জড়ের আকার বা জড়নিরাকারান্তর্গত ঈশস্বরূপ-কল্পনাকারী পৌত্তলিক নহেন।"

৫৭। "ব্রহ্মসূত্রে যেরূপ সংক্ষেপে শ্রুতির তাৎপর্য্য কথিত রহিয়াছে, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত তত্ত্বসূত্রেও সেইরূপ বেদান্তভাষ্য—ভাগবতের সিদ্ধান্ত ও তাৎপর্য্য স্বল্পাক্ষরে অতি সুষ্ঠুরূপে কথিত হইয়াছে।"

৫৮। **"আচারবান্ বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন না করিলে কখনও ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য।"**

৫৯। "ভাগবতই বেদান্তসূত্রের মূলভাষ্য—এই কথা শ্রীজীব গোস্বামী বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। শঙ্করের ভাষ্য—বিজাতীয় (Foreign) ভাষ্য, আর ভাগবত স্বয়ং সূত্রকর্ত্তার সূত্রের ভাষ্য বলিয়া তাহাই একমাত্র প্রকৃত ভাষ্য। বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য একমাত্র ভাগবতেই পাওয়া যায়।"

৬০। " **'কৃষ্ণ'**-শব্দ ব্যতীত অন্যত্র **'ভক্তি'**-শব্দ প্রযোজ্য হ'তে পারে না। **কৃষ্ণই একমাত্র ভক্তির বিষয়। ব্রহ্ম-জ্ঞানের বস্তু, পরমাত্মা—সান্নিধ্যের বস্তু, কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র সেব্যবস্তু।"**

৬১। "শব্দমাত্রেরই দ্বিবিধ বৃত্তি—বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি ও অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি। যে শব্দের বৃত্তি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শ্রীচৈতন্যদেব হ'তে তফাৎ হ'য়ে অন্য কিছু উদ্দেশ করে, তা' শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ি। বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে সকল কথাই কৃষ্ণ-বাচক—কৃষ্ণোদ্দেশক।"

৬২। " 'কৃষ্ণ'-শব্দদ্বারা গণগড্ডালিকা যা' বুঝেন, তা' কৃষ্ণ-শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় নহে। ভাষান্তরে 'গড্', 'আল্লা' প্রভৃতি শব্দ, এমন কি, সংস্কৃত ভাষায় 'ঈশ্বর', 'পরমাত্মা' প্রভৃতি শব্দ কৃষ্ণ হ'তে মিশ্রিত একটা মহের (তেজঃপুঞ্জের) বাচকমাত্র। তাঁরা 'কৃষ্ণ'-শব্দের পূর্ণ প্রগ্রহবৃত্তি ধারণ করতে পারেন না।"

৬৩। "গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়, এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সাধুসঙ্গ—গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না।"

৬৪। "শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করলে আমি নির্ম্মোহ, নির্ভয় ও অশোক হ'তে পারি। যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী হই, তা' হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করেন।"

৬৫। "সাধারণ গুরুগণ আমাদিগকে মরণ থেকে বাঁচাতে পারেন না—নিত্যজীবন দিতে পারেন না ; এজন্য তাঁ'দের আংশিক গুরুত্ব। কিন্তু যিনি আমাদিগকে মরণধর্ম্ম হ'তে রক্ষা ক'রেছেন—আমাদিগকে নিত্যত্বের উপলব্ধি দি'য়েছেন, তিনিই পূর্ণ ও নিত্যগুরু।"

৬৬। "শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্ত্যজ্ঞান করো না। তিনি তোমার অনন্ত-জীবন-দাতা, তোমার ভবরোগের সদ্‌বৈদ্য, সর্ব্বতোভাবে তোমার একমাত্র উপকারক।"

৬৭। "মানব যে-কাল পর্য্যন্ত তর্কপথ গ্রহণ করে, সে-কাল পর্য্যন্ত গুরুর দর্শন-লাভ ঘটে না।"

৬৮। "সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ ভগবান্ আমার জন্য সকল মঙ্গল যাঁ'র করে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি তাঁ'র নিকট শতকরা শত-পরিমাণ আমাকে সমর্পণ করি, তা' হ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। আর যদি কপটতা, দ্বিহৃদয়তা, লোক-দেখান মিছা ভক্তি বা ভণ্ডামী করি, তা' হ'লে তিনিও বঞ্চনা ক'রে থাকেন।"

৬৯। "শ্রীগুরুদেব আমার জন্য অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তা' নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য,—এটা হচ্ছে শরণাগতের লক্ষণ।"

৭০। "যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তা' হ'লে সেই সুযোগ করিয়ে দেওয়ার একমাত্র মালিক—কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়প্রদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁ'দের কপালের জোর আছে, তাঁ'রা এই সুবিধাটা পান। যিনি যেরূপভাবে শরণাগত হন, তাঁ'র নিকট তদুপযোগী গুরুপাদপদ্ম উপস্থিত হন।"

৭১। "নির্ভেদ-জ্ঞানিগুরু, কর্ম্মিগুরু, যোগিগুরুর, ব্রতিগুরু, তপস্বিগুরু, ঐন্দ্রজালিক গুরু, কপটগুরু কখনও 'গুরু' পদবাচ্য হ'তে পারেন না, তাঁ'রা সকলেই লঘু। তাঁ'রা জীবের উপকারক নন,—আত্মহিংসক ও পরহিংসক। কিন্তু একমাত্র মহাভাগবত বৈষ্ণব-গুরুই জীবে অহৈতুক দয়াময় পরদুঃখ-দুঃখী।"

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশামৃত

অভিধেয়-তত্ত্ব

২৬। "আমি কে? এই জড় ব্রহ্মাণ্ডই বা কি? ভগবদ্বস্তুই বা কি? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি?—এই চারিটী প্রশ্নের সদর্থ পাইলে সম্বন্ধ-জ্ঞান হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞান-প্রাপ্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কি, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই সর্ব্বশাস্ত্রের 'অভিধেয়' বলিয়া জানিতে হইবে।"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন ১৪০৭ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০১

২৭। "বৈধ-বিধানের মূল তাৎপর্য্য এই যে, যৎকালে বদ্ধজীবদিগের আত্মার নিত্যধর্ম্মরূপ রাগ নিদ্রিতপ্রায় থাকে, অথবা বিকৃতভাবে বিষয়রাগরূপে পরিণত থাকে, তখন আত্মবিদ্বৈদ্যগণ ঐ রোগ দূরীকরণের জন্য যে-সকল বিধান করেন, তাহাই বিধিমার্গ।"

২৮। "পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি-বলে সাধুদিগের মুখ হইতে হরিকথা শ্রবণানন্তর হরি-বিষয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহাই 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধার উদয় হইতে হইতেই একটু শরণাপত্তির উদয় হয়—'শ্রদ্ধা' ও 'শরণাগতি' প্রায় একই তত্ত্ব।"

২৯। "বহু সুকৃতির ফলস্বরূপ ভগবৎকৃপা-ক্রমে জীবের সংসার-বাসনা দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে ; তখন স্বভাবতঃই সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথার আলোচনা হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ অধিকতর চেষ্টার সহিত কৃষ্ণ-বিষয়ক অনুশীলন হইলে ভগবানকে পাইবার লোভ জন্মে। তখন শুদ্ধচরিত্র তত্ত্বজ্ঞ গুরুর চরণ আশ্রয় করত ভজন শিক্ষা করিতে হয়। ভজন-বলেই জীবের ভগবৎকৃপা লাভ হয়।"

৩০। "সকল আত্মাতেই ভক্তির বীজ আছে। সেই বীজকে অঙ্কুর ও ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত করিতে হইলে তাহার মালীগিরি করা আবশ্যক। ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনা, পরমেশ্বরের উপাসনা, সাধুসঙ্গ ও ভক্তিনিষেবিত স্থানে বাস ইত্যাদি কতকগুলি কার্য্যের আবশ্যকতা আছে। ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় ভূমি পরিষ্কার, কণ্টক ও কঠিন কঙ্করাদি দূরীকরণরূপ কার্য্যসমূহ নিতান্ত প্রয়োজন। ভক্তি-বিজ্ঞান জানিলে ঐ সকল কার্য্য সুচারুরূপে হইতে পারে।"

৩১। "আমি শুদ্ধ, চিৎকণ, কৃষ্ণদাস'—ইহা ভুলিয়া স্ব-স্বরূপ হইতে বদ্ধজীব দূরে পড়িয়াছেন, সেই স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তিই জীবের প্রথম অনর্থ। জড়বস্তুতে অহং-মমাদি বুদ্ধি করিয়া অসৎ বিষয়-সুখাদির তৃষ্ণাকে অসত্তৃষ্ণা বলি ; পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা—এই তিনপ্রকার অসত্তৃষ্ণা। আর অপরাধ দশবিধ ; *** হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতেই শোকাদির উদ্ভব। এই চারিপ্রকার অনর্থ—অবিদ্যাবদ্ধ-জীবের নৈসর্গিক ফল, সাধুসঙ্গে শুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনদ্বারা ঐ সমস্ত অনর্থ ক্রমে দূর হয়।"

৩২। "কৃষ্ণভক্তজনই আমার মাতা-পিতা, কৃষ্ণভক্তজনই আমার বন্ধু, ভ্রাতা, কৃষ্ণই আমার একমাত্র পতি এবং কৃষ্ণের সংসার ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।"

৩৩। "যাঁহার হৃদয় নির্গুণ, তাঁহারই ব্রজ-জনের আনুগত্যে রুচি জন্মে, অতএব রাগানুগা-ভক্তিতে লোভ বা রুচিই একমাত্র সদ্ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক।"

প্রয়োজন-তত্ত্ব

৩৪। "সুখই প্রয়োজন বটে, কিন্তু জড়ীয় দেহ-সুখ বা বাসনা-সুখ যথার্থ নিত্য-সুখ নয়। চিৎসুখই সুখ। তাহাই প্রয়োজন। অত্যন্ত মোক্ষে অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তি বই

কোনপ্রকার সুখ নাই। সুতরাং নিত্য-সুখরূপ প্রয়োজন-জ্ঞানদ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞানের পুষ্টি এবং অভিধেয়-আচরণের দৃঢ়তা ও শুদ্ধতা হয়।"

৩৫। "ব্রহ্মবাদীদিগের ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মার লয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাযুজ্যরূপ মোক্ষানুসন্ধানটী নিতান্ত আত্মচৌর্য্যরূপ দোষ-বিশেষ ; যেহেতু তাহাতে কিছুমাত্র আনন্দ নাই ; **জীবেরও কোন লাভ নাই এবং ব্রহ্মেরও কোনপ্রকার উদ্দেশ্য সাধন হয় না।"**

৩৬। "অন্য সকল ভাবকে নিজ-বশে রাখিয়া যে ভাব কর্ত্তৃত্ব করে, তাহাই স্থায়িভাব। জাত-ভাব-পুরুষের যে রতি লক্ষিত হইয়াছে তাহাই কৃষ্ণে অনন্য-মমতা-সংযুক্ত ও কিয়ৎ-পরিমাণে গাঢ় হইতে হইতেই রসোপযোগী স্থায়ী ভাব হইতে পারে। যদিও ঐ রতি স্বীয় নির্দ্দিষ্ট সীমা অর্থাৎ অবিমিশ্র একভাবত্ব অতিক্রম করিয়া প্রেম প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিয়াছে, তথাপি তাহাকে রতিই বলা যাইবে।"

৩৭। "আত্মাতে রসের প্রাচুর্য্য হইলে মন পর্য্যন্ত তাহার ঢেউ লাগে। ঢেউ মনকে অতিক্রম করত সাধক-শরীরে ব্যাপ্ত হয়। তখনই পরস্পর রসের পরিচয়। **বৈকুণ্ঠ-রসে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র নায়ক।** এই বৈকুণ্ঠ-রসই ফলিত হইয়া স্বর্গীয় মানস-রসরূপে পরিণত ; পুনশ্চ প্রতিফলিত হইয়া পার্থিব-রস হইয়াছে।"

৩৮। "বৈকুণ্ঠ-রস, স্বর্গীয়-রস এবং পার্থিব-রস—এই ত্রিবিধ রসেরই বিধান, প্রক্রিয়া ও স্বরূপ একই প্রকার। বৈকুণ্ঠ-রসই বৈষ্ণবের জীবন। অন্য দুইপ্রকার রস বৈকুণ্ঠরসোদ্দেশক না হইলে নিতান্ত ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধেয়। নীচ-প্রবৃত্তি-পরবশ লোকেরাই স্বর্গীয় ও পার্থিব-রসে মুগ্ধ হন। বৈষ্ণবগণ বিশেষ সতর্কতা-সহকারে স্বর্গীয় ও পার্থিব-রসকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-রসের আলোচনা করিয়া থাকেন।"

৩৯। **"মথুরা-রাজ্যপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার মহাপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণভজন করা যায়, তাহাই সর্ব্বোত্তম।"**

৪০। "নিবৃত্তিপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের শুষ্কতা-নিবন্ধন তাহাদের পক্ষে মধুর-রস নিতান্ত অনুপযোগী ; আবার জড়প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে জড়বিলক্ষণ-ধর্ম্ম দুরূহ হয়।"

৪১। "রস জ্ঞাত হইবার বিষয় নয়, কেবল আস্বাদনের বিষয়। জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ যে দুইটী জ্ঞানের প্রাথমিক ব্যাপার, তাহা সমাপ্ত না হইলে জ্ঞানের চরম ব্যাপার যে আস্বাদন তাহা হয় না।"

৪২। "গোপী হইয়া কৃষ্ণকে মধুর-রসের দ্বারা সেবাই ভক্তের কর্ত্তব্য। **যিনি কৃষ্ণ সাজিয়া এই রস আস্বাদন করিবেন, তিনি অবশ্য অবিলম্বে নরকে গমন করিবেন।** শঠ, ধূর্ত্ত, কূটীনাটী-পরায়ণ লোকেরাই এই অপরাধ করিয়া থাকে।"

FORM–IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956]

1. Place of Publication–Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P.O. Nabadwip (Nadia), W.B.
2. Periodicity of its Publication–Last day of every Bengali month, i.e. once in a month.
3. Printer's name–Tridandi Swami Shri Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj
   Nationality–Indian Goudiya-Vaishnaba,
   Address–Shri Devananda Goudiya Math,
   Tegharipara, P.O. Nabadwip (Nadia), W.B.
4. Publisher's name–Do
   Nationality–Do
   Address–Do
5. Editor's name–Tridandi Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Narayan Maharaj
   Nationality–Indian Goudiya-Vaishnaba,
   Address–Shri Devananda Goudiya Math,
   Tegharipara, P.O. Nabadwip (Nadia), W.B.
6. Name and address of individuals who own the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the capital,– Tridandi Swami Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, Swami Bhakti Vedanta Acharyya hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./ *Swami B. V. Acharyya*

Dated 28. 2. 2001 Signature of Publisher

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ॥

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যযাত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৩শ বর্ষ } ৫ মধুসূদন, গর্ভোদশায়ী, ৫১৫ শ্রীগৌরাব্দ ৩০ চৈত্র, শুক্রবার, ১৪০৭, ইং ১৩/৪/২০০১ { ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদাষ্টকম্

[শ্রীগৌরদাস-ব্রহ্মচারি-কাব্য-ব্যাকরণতীর্থেন বিরচিতম্]

আনন্দ-সচ্চিদ্বলদেব-মূর্ত্তি -
ব্রহ্মাণ্ড-সন্মণ্ডিত-শুদ্ধকীর্ত্তিঃ।
সংসারসিন্ধূত্তরণৈক-পোতঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্।। ১।।

যিনি সচ্চিদানন্দ শ্রীবলদেববিগ্রহ, ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার অলৌকিক বিশুদ্ধ কীর্ত্তি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, যিনি জীবগণের সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারের একমাত্র বৃহৎ নৌকাস্বরূপ, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন?।। ১।।

প্রতপ্তচামীকর-গৌররূপঃ
সদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারভূপঃ।

শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য-সমাজরাজঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্।। ২।।

যিনি অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, যিনি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বিচারের নৃপতি, যিনি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের রাজা, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন?।। ২।।

গৌড়ীয়-গোষ্ঠীগণ-প্রাণ-বন্ধুঃ
প্রপন্ন-দুঃখার্ত্ত-প্রসাদসিন্ধুঃ।
বিতণ্ডিপাষণ্ডি-প্রচণ্ড-দণ্ডঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্।। ৩।।

যিনি গৌড়ীয় ভক্তগণের প্রাণের বন্ধু, যিনি শরণাগত দীনদুঃখিগণের প্রতি অনুগ্রহের সাগর, যিনি কুতার্কিক-ধর্ম্মধ্বজি-পাষণ্ডিগণের প্রতি প্রচণ্ড দণ্ডবিধানকারী, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন?।। ৩।।

শ্রীরাধিকা-প্রেম-তড়াগ-হংসো
হংসদ্বিজ-প্রাজ্ঞ-কুলাবতংস।
সঙ্কীর্ত্তন-প্রেম-মধুপ্রমত্তঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্।। ৪।।

যিনি শ্রীরাধিকার প্রেমসরোবরের হংস, যিনি পরমহংস, বিপ্র ও পণ্ডিতগণের শিরোভূষণ, যিনি নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রেমরূপ মদ্যপানে প্রমত্ত, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন?।। ৪।।

চণ্ডাল-শূদ্রাধম-ভক্তিশন্দঃ
সর্ব্বংসহা-বন্দ্য-পদারবিন্দঃ।
প্রেমাব্ধিচন্দ্রো ভজনদ্রুকন্দঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্।। ৫।।

যিনি চণ্ডাল ও শূদ্রাধমগণকে ভক্তিরূপ মঙ্গলপ্রদাতা, যাঁহার পাদপদ্ম সমগ্র জগতের বন্দনীয়, যিনি প্রেমসাগরের চন্দ্র ও ভজনরূপ তরুর মূল, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন?।। ৫।।

গৌরাঙ্গ-গোবিন্দ-বরেণ্য-ভক্তো
বিশুদ্ধ-সদ্ধর্ম্ম-প্রচাররক্তঃ।
রাধা-যশোগান-সহস্রবক্ত্রঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্।। ৬।।

যিনি গৌরাঙ্গ-গোবিন্দের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ-প্রধান, যিনি বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম প্রচারে

সর্ব্বদা অনুরক্ত, যিনি শ্রীরাধিকার গুণাবলী কীর্ত্তনে সহস্রবদন, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন?।। ৬।।

বেদান্ত-বেদাঙ্গ-পুরাণদক্ষো
বিখণ্ডিত-প্রাজ্ঞ-কুতর্ক-লক্ষঃ।
শান্ত-প্রশান্তোপরমাত্মনিষ্ঠ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্।। ৭।।

যিনি বেদান্ত, বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিঃশাস্ত্র) ও পুরাণশাস্ত্রে নিপুণ, যিনি পণ্ডিতাভিমানী প্রাকৃত পণ্ডিতগণের কুতর্করাশি খণ্ডনকারী, যিনি শমগুণযুক্ত, প্রশান্ত, বিষয়বিরক্ত ও পরমাত্মনিষ্ঠ, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন?।। ৭।।

হরেঃ কথাযাতসমস্ত-যামো
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-মুদাভিরামঃ।
শ্রীধাম-মায়াপুর-বাস-যত্নঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্।। ৮।।

যাঁহার শ্রীহরিকথাকীর্ত্তনে অষ্টপ্রহর অতিবাহিত হইত, যিনি হরিকথাকীর্ত্তনে রোমাঞ্চ, কম্পাশ্রু ও হর্ষাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিবশ হইয়া পড়িতেন, যিনি শ্রীধাম মায়াপুরবাসে পরমানন্দিত হইতেন, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন?।।৮।।

হা ক্বাসি মৎপ্রাণপ্রভো! ক্ব গুপ্তো
গৌরাখ্য-দাসস্তবদুঃখতপ্তঃ।
প্রপন্নভক্তার্ত্তিহরস্ত্বমেব দ্রক্ষ্যামি
কিং চন্দ্রমুখং সকৃৎ তে।। ৯।।

হা! হা! আমার প্রাণের প্রভু! আপনি কোথায়? অকস্মাৎ আপনি কোথায় লুক্কায়িত হইলেন? এ অধমদাস আপনার বিরহ-দুঃখে অনুতপ্ত, আপনি শরণাগত ভক্তগণের একমাত্র আর্ত্তিনাশকারী, অতএব শরণাগত আমি একবার কি আপনার ঐ চন্দ্রবদন দেখিতে পাইব? ।। ৯।।

হে দীনবন্ধো! করুণৈকসিন্ধো!
কুরু প্রসাদং! ময়ি মন্দমূঢ়ে!
লক্ষাপরাধে বহুপাপগাঢ়ে!
তৎপাদপদ্মেঽস্তু মতিশ্চ কৃষ্ণে।। ১০।।

হে দীনজনের বন্ধু, হে গুরুদেব, আপনি করুণার একমাত্র সিন্ধু, অতএব আমি মহামূর্খ, বহু অপরাধী, বহুপাপে অভিভূত আমায় আপনি কৃপা করুন, যেন আপনার পাদপদ্মে ও কৃষ্ণের প্রতি মতি থাকে।। ১০।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র ১৪০৭ ; ১৩ এপ্রিল, ২০০১

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৭ পৃষ্ঠার পর]

প্রেম

১। প্রেমের স্বরূপ কি?

" *'দৃঢ়মমতাশয়াত্মিকা প্রীতিঃ প্রেমা।'*

প্রীতি দৃঢ়-মমতাতিশয়রূপিণী হইলে 'প্রেম'-নাম প্রাপ্ত হয়।"

—আঃ সূঃ ৮৭

২। প্রেমের বিস্তার-ক্রম কি? প্রেম-স্নেহ-মান-প্রণয়াদির স্বরূপ কি?

"রতি সর্ব্বাতিক্রমী সামর্থ্যপ্রযুক্ত সমর্থা নাম প্রাপ্ত হয়। ইহা গাঢ় সর্ব্ববিস্মরণ-কারিণী শক্তিবিশিষ্টা। বিরুদ্ধ-ভাবদ্বারা অভেদ্যরূপে দৃঢ়া হইলে 'প্রেম'-নাম পায়। প্রেম ক্রমে নিজ-মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপ ধারণ করে। ** পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে প্রেম চিদ্দীপ-দীপন-লক্ষণ প্রাপ্ত হন এবং হৃদয়কে দ্রব করেন, সেই প্রেমাই 'স্নেহ'। ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ-ভেদে স্নেহ দুই প্রকার। অত্যন্ত আদরময় স্নেহই ঘৃতস্নেহ। মদীয়ত্বাতিশয়-রূপ স্নেহই মধুস্নেহ। রতির আকার দুইটী অর্থাৎ 'তাঁহার আমি'—এই ভাবনাময়ী রতি এবং 'তিনি আমার'—এই ভাবনাময়ী রতি। ঘৃতস্নেহে 'আমি তাঁহার'—এই ভাবটী চন্দ্রাবলীর স্নেহ। মধুস্নেহে 'তিনি আমার'—এই ভাবটী শ্রীরাধার মধুস্নেহ। উৎকৃষ্ট স্নেহ অদাক্ষিণ্য ও কৌটিল্য-প্রকাশপূর্ব্বক 'মান' হয়। উদাত্ত ও ললিত-ভেদে মান দুইপ্রকার। অভেদ-মননরূপ বিশ্রম্ভযুক্ত মানই 'প্রণয়'। কোনস্থলে স্নেহ হইতে মান হইয়া প্রণয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রণয়ের উৎকর্ষে অতিশয় দুঃখ ও সুখরূপে যাহা প্রতীত হয়, তাহাই 'রাগ'। নীলিমা ও রক্তিমা-ভেদে রাগ দুইপ্রকার। স্থায়ী মধুর ভাব, ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং হাসাদি সপ্ত, একত্রে একচত্বারিংশৎ ভাবান্তর। যে রাগ স্বয়ং নব-নব ভাবে সদা অনুভূত প্রিয়কে প্রতিক্ষণে নব-নব করিয়া দেয়, তাহাই 'অনুরাগ'। ইহাতে বশিত্বভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং অপ্রাণিমধ্যে জন্মলালসা হইয়া অনুরাগ অনন্ত উন্নতি ধারণ করে এবং বিপ্রলম্ভে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি করায়। **বিপ্রলম্ভই প্রেমবৈচিত্ত্য**। যাবদাশ্রয় বৃত্তিরূপে অনুরাগ স্বয়ং বেদ্য-দশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে তিনিই 'ভাব' ও 'মহাভাব' হন।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৭

৩। প্রীতির স্বরূপ ও কার্য্য কি?

"প্রীতি অশেষ তরঙ্গ-রঙ্গে চিদ্বিলাস-স্বরূপিণী হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ কৃষ্ণে সর্ব্বদা

রসবিস্তারিণী। প্রীতির স্বভাবক্রমে কৃষ্ণে প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকার-রস প্রকটিত হয়। কৃষ্ণ-তত্ত্বের জনাকর্ষণ-বিশেষ হইতে কৃষ্ণনাম ; শ্যামরূপ চিদ্‌ঘনানন্দসর্ব্বস্ব হইয়া পরমামৃত ও প্রীতিজনক ; গোপীবল্লভ কৃষ্ণ অনন্তকল্যাণগুণদ্বারা সম্পূর্ণ এবং নিত্যলীলা-রসাঢ্য। এই নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিচয়ের দ্বারা আত্মার প্রেষ্ঠতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ পরিদৃশ্য।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৪। সর্ব্বোত্তম প্রাপ্য-বস্তু কি? তাহা কয় প্রকার?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-মতে কেবল প্রেমই—সর্ব্বোত্তম ফল। ভাবোত্থ ও প্রসাদোত্থ-ভেদে প্রেমও দ্বিপ্রকার। ভাবোত্থ আবার বৈধ-ভাবোত্থ ও রাগানুগীয় ভাবোত্থ-ভেদে দ্বিবিধ। প্রসাদোত্থ প্রেম বিরল ; ভাবোত্থ প্রেমই সাধারণ।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৫। কেবল-প্রেম ও মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেমের বৈশিষ্ট্য কি?

"প্রেম দুইপ্রকার—কেবল-প্রেম ও মহিম-জ্ঞানযুক্ত-প্রেম। রাগানুগা ভক্তির সাধনক্রমে প্রায়ই কেবল প্রেম উদিত হয়। বিধি-মার্গীয় সাধন-ভক্তগণ প্রায়ই মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেম লাভ করত সার্ষ্ট্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হন।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৬। প্রেমের লক্ষণ ও প্রেমের বাধক কি?

"তৃপ্তির অভাবই প্রেমের লক্ষণ। সেই প্রেমই ভক্তির ফল। মোক্ষাদি কেবল ভক্তির অবান্তর ফলমাত্র। তদবস্থায় আত্মারামতা প্রেমের বাধক বলিয়া সাধুগণের মতে অতি হেয়।"

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

৭। প্রেমিকের প্রার্থনা কি?

"শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অরুণ-বর্ণ পাদপদ্মে আমার কায়মনোবাক্যজ প্রেম দিনে দিনে বর্দ্ধিত হউক ; শুদ্ধবৈষ্ণবে আমার প্রীতি থাকুক ; প্রভুর গুণসাগরে আমার প্রীতি থাকুক ; কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবায় আমার প্রীতি থাকুক ; কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আমার প্রীতি থাকুক ; আশ্রিত-জনে এবং ভজনোন্মুখ ব্যক্তিতে আমার প্রীতি থাকুক ; কৃষ্ণোন্মুখ স্বীয় আত্মায় আমার এরূপ প্রীতি থাকুক, যাহাতে কৃষ্ণভক্তি হয়।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৮। সর্ব্বাগ্র বস্তু কি?

"বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তগণই মহাজন। তাঁহাদের প্রতি প্রীতিই প্রার্থনীয়। স্বীয় আত্মাই ক্ষেত্র ; তথায় প্রীতি আরোপণীয়া। হৃদয়ে প্রীতিকে অবরোধ করুন। কৃষ্ণই জগতের একমাত্র ধন। বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকটস্থিত ব্যক্তিবিশেষ। প্রেম ও প্রীতিই সর্ব্বাগ্র বস্তু; প্রীতি অপেক্ষা আর কিছুই নাই।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৯। অসংখ্য বেদ-শাখার মধ্যে কোন্ শাখা গৌরসুন্দরের প্রিয়? তাঁহার ফল কি?

"এই বেদশাস্ত্র শাখা-সহস্র-সম্পন্ন। ইহার মধ্যে একটী মাত্র প্রভুর প্রিয়। সেই শাখার নাম কৃষ্ণভক্তি-শাখা ; প্রীতিই সেই শাখার সৎফল ; তাহা হইতে এই ভূতলে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই। সেই প্রীতিই একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

১০। মহাপ্রভুর একমাত্র অস্ত্র কি?

"প্রীতি বা প্রেমাই প্রভুর একমাত্র অস্ত্র। সেই অস্ত্রের যদি উদয় হয়, তবে সর্ব্ববিঘ্ন দূর হইয়া সকলেই সুখী হইবেন ; জীবচিত্ত আর ভবদুঃখ প্রাপ্ত হইবে না।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

১১। প্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু হইলে ইতরানুরাগ উপস্থিত হয় কেন?

"যেমন অপুত্রক পিতার পুত্র-স্নেহের উদয় হয় না, অবিবাহিত স্ত্রীর স্বামীর প্রতি স্নেহ উপলব্ধ হয় না, উপকারী পুরুষের প্রতি অজ্ঞানবশতঃ উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ ইতরানুরাগী মূঢ়দিগেরও স্বতঃসিদ্ধ ভগবৎ-প্রেম কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।"

—তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

১২। প্রেম ও মোক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টী? প্রেমভক্তের জীবন কিরূপ?

"জীবের পক্ষে প্রেমাপেক্ষা আর উচ্চ লাভ কিছুই নাই। মোক্ষ—প্রেমের নিকট একটী ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক তত্ত্ববিশেষ। প্রেমের বহুতর অবান্তর ফলের মধ্যে 'মোক্ষ' একটী ফল। জড়সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে যদি প্রেমোদয় হয়, জড়সম্বন্ধ তখন আর উপলব্ধ হয় না। **প্রেমভক্তের জীবন অত্যন্ত জড়সঙ্গ-রহিত ও কৃষ্ণময়।** সূর্য্যোদয়ে খদ্যোতের ন্যায় প্রেমোদয়ে বিধি লুক্কায়িত হয়। প্রেমভক্তের সম্মুখে প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠরূপে প্রতিভাত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৬।১

১৩। ভক্তির অবান্তর ও মুখ্যফল কি?

"জীবাত্মা ভক্তি-বলে জড়মুক্ত হইলেই সঙ্গে-সঙ্গে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু সে মুক্তি ভক্তির অবান্তর ফল অর্থাৎ মুখ্য ফল নহে। মুক্ত পুরুষ যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন, তাহাই সাধনভক্তির মুখ্য ফল।"

—'লৌল্য', সঃ তোঃ ১০।১১

১৪। বিশ্বপ্রেম ও আত্মপ্রেমের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য কি?

"বিশ্বপ্রেম অথবা মানুষে মানুষে প্রেম কেবল আত্মপ্রেমের বিকার মাত্র। আত্মায় ও আত্মায় যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আদর্শ।"

—'প্রীতি', সঃ তোঃ ৮।৯

১৫। সাধুসঙ্গ ব্যতীত কি প্রেমোদয় সম্ভব নহে?

"প্রেম একটী পরমশুদ্ধ চিদ্ধর্ম্মফলকবিশেষ। সাধুচিত্তই তদ্‌গ্রহণে যোগ্য ও প্রবণ

এবং অসাধুচিত্ত তাহার বিক্ষেপক। সাধুসঙ্গ না থাকিলে সেই ফলক জীব-হৃদয়ে সহসা প্রবেশ করে না। তড়িৎসম্বন্ধে আকর্ষণ ও অনাকর্ষণের ন্যায় সাধুসঙ্গ ও অসাধুসঙ্গ প্রবলরূপে কার্য্যকর।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

১৬। কৃষ্ণপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমে পার্থক্য কি?

"সমুদায়ের মূলেই বিশুদ্ধ প্রেম। অনৈতিক জীব ঐ প্রেমকে বিকৃতভাবে জড়ীয় অবস্থায় রাখে। পাশ্চাত্ত্য নৈতিক পণ্ডিত কোঁৎ (বা কম্‌টি?) তাহাকে **একটু নিঃস্বার্থ-বিধিবদ্ধ করিয়া বিশ্বময় করিতে উপদেশ করেন।** শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সিদ্ধ জীবের শুদ্ধ চিন্ময় প্রেমের আলোচনা শিক্ষা দিয়াছেন। জড়মূলক কোঁৎ ঐ প্রেমের জড়শুদ্ধ বিকারকে লৈঙ্গিক অবস্থায় বিস্তৃত করিতে বলেন। কোঁৎ-এর উপদেশে জীবের মঙ্গল নাই, কেবল লৌহশৃঙ্খল-ত্যাগপূর্ব্বক স্বর্ণশৃঙ্খল ধারণ করিবার বিধি দেখা যায়। মহাপ্রভু জীবের শৃঙ্খল দূর করিয়া বিশুদ্ধ প্রেম আস্বাদন করিতে জীবকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা শিক্ষা দিয়াছেন।"

—'পদরত্নাবলী', সঃ তোঃ ২।৯

১৭। কৃষ্ণপ্রেমের অচিন্ত্য-প্রভাব কি?

"কৃষ্ণপ্রেম এমনই এক বস্তু যে, উহা সুখকে দুঃখ করে এবং দুঃখকে সুখ করে।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

১৮। কৃষ্ণের নিত্যরাস কি? প্রীতিধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয় কি?

"বৃহজ্জড় ক্ষুদ্র-জড়কে টানে। সূর্য্য বৃহদ্বস্তু, সুতরাং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আপনার দিকে টানে, কিন্তু সেই সেই গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র গতি-বলে সূর্য্য হইতে পৃথক্ থাকিতে গিয়া গোলাকারে ভ্রমণ করে। আবার গ্রহদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও গতিও সেই কার্য্যের সহায় হইয়াছে। যেরূপ প্রতিফলিত জগতে দেখিতেছ, সেইরূপ চিজ্জগতেও দেখ। *** চিন্ময় বৃন্দাবনবিহারীই চিজ্জগতের সূর্য্য ; জীবসমূহ—তাঁহার লীলা-পরিকর। **কৃষ্ণ জীবকে প্রেমাকর্ষণ-ধর্ম্মে টানিতেছেন। জীবনিচয় নিজ স্বতন্ত্র-গতিক্রমে তাঁহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন।** ফল এই যে, বলবৎ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগতি পরাভূত হইয়াও জীবগণকে মণ্ডলাকার কৃষ্ণরূপ-সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের নিত্যরাস। তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিগত সহচরীগণ বিশেষভাবে তাঁহার নিকটস্থ এবং সাধনসিদ্ধা সহচরীগণ কিয়দ্দূরে অবস্থিত। কৃষ্ণের চিন্ময়-লীলাই প্রীতি-ধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয়।"

—'প্রীতি', সঃ তোঃ ৮।৯

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা

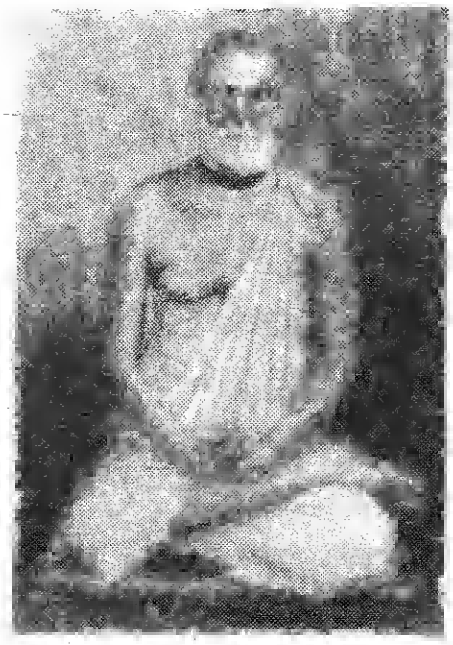

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১০ পৃষ্ঠার পর]

"ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ অনূর্দ্ধসমান।।
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার।।
চিদানন্দ দেহ তাঁ'র স্থান পরিবার।
তাঁ'রে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার।।"

ভগবান্ চিদৈশ্বর্য্যদ্বারা পরিপূর্ণ। চেতনময় পদার্থে কোন অবরতার বিদ্যমানতা নাই। তাহাতে কেবল উপাদেয়তা আছে। এখানে খণ্ডজ্ঞানে অনুপাদেয়তা। কোন কোন বস্তুতে শক্তি প্রদত্ত হ'য়েছে, কোন কোন বস্তুতে দেওয়া হয় নাই। পরিচ্ছিন্ন রাজ্যে এরূপ। কিন্তু বৈকুণ্ঠে অপরিচ্ছিন্ন রাজ্যে সেরূপ নয়। চেতনের সাহায্যে অচেতন পদার্থ ক্রিয়াবান্। পরমেশ্বর নিঃশক্তিক হ'লে তাঁকে অচিৎ করা হয়। কিন্তু তিনি পূর্ণ চেতনবস্তু। আমাদের চেতনধর্ম্মের সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ হ'লে তাঁর চেতনতার স্বরূপ বুঝা যায়। জড়জগতে যাহা হয় তাহা প্রতীক। 'ন প্রতীকে ন হি সঃ' ব্রহ্মসূত্র। প্রতীকদ্বারা ব্রহ্মবস্তু নিরূপিত হ'বেন না। শক্তিমদ্বস্তুর প্রতীতি ও প্রতীকের প্রতীতি পৃথক্ বস্তু। ভগবদ্বস্তু চেতনের ঈশ্বরতায় পূর্ণ। তদপেক্ষা উচ্চ বা সমান নাই। তিনি "অনূর্দ্ধসমান" নারায়ণের অধিষ্ঠানরহিত হ'লে অশ্বের অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু সেইজন্য অশ্ব নারায়ণ নহেন।

'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।'

ভগবৎসেবার জন্য স্মৃতিবিশিষ্ট হওয়াই মুক্তি।

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।।"

প্রকৃতির অন্তর্গত হ'য়েও তাহার বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি ঈশ্বরের সেবাবুদ্ধিতে প্রণোদিত হ'লে মায়ার কাছে থেকেও তাহার গুণে বশীভূত হয় না।

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।"

বিভুচিতের আনুগত্য ব্যতীত মানুষের আর কোন ধর্ম্ম নাই, জান্‌লেই তার মঙ্গল। বৈকুণ্ঠের নিত্যতা, শ্রীহরির নিত্যতা আছে।

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যে বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।।"

সেই একমাত্র পূর্ণচেতন নিত্যবস্তুকে জান্‌তে পে'রে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ পরাশান্তি লাভ করেন, আর কেহ শান্তি পায় না।

অদ্বৈত ও অদ্বয়জ্ঞান পৃথক্। অদ্বয়জ্ঞানে বৈশিষ্ট্য থাকে, অদ্বৈতে তাহা ধ্বংস হয়। শুদ্ধাদ্বৈত-বিচারে যাহা শ্রীধরস্বামী দেখিয়েছেন তাহাই বিষ্ণুস্বামীর মত। নিত্য গোলোকের হেয় প্রতিফলন এই পৃথিবী। কিন্তু তাহা এখানকার অবরতাশূন্য। সুতরাং জগতের প্রতীতি তাহাতে আরোপযোগ্য নহে। বল্লভের মতে কৃষ্ণলীলায় প্রবেশের পর লীলার নিত্যত্ব নাই। শ্রীধরের মতে "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" জড়জগতের ঔপাধিক প্রতীতির বৈশিষ্ট্য আছে। বোধায়নের আনুগত্যে রামানুজীয় বিচার আমাদের স্বীকার্য্য। নাম-রূপ-গুণ-লীলা একত্রীভূত হ'য়ে লীলাসংগোপন হ'বে, এরূপ মত গ্রহণীয় নহে। নিত্য বৈকুণ্ঠে লীলার বৈচিত্র্য নিত্য। আমার ভোগের ইন্দ্রিয়ের অতীত হ'লেই নিরাকারবাদ।

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।।"
"মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি।"

অর্জ্জুনকে ভগবান্ যে বিরাট্‌রূপ দর্শন করিয়েছেন তাহা নিত্য নহে, ক্ষণস্থায়ী। জীবের চিত্তকে জড়াভিনিবেশ হ'তে মুক্ত কর্‌তে এইপ্রকার প্রকাশ। তদীয় মাধ্যমিক আকার না থাক্‌লে তদীয় শক্তির মাধ্যমিক আকার সম্ভব কিরূপে? আমরা ভেদাংশ-নির্ম্মিত অণুচিৎ পদার্থ। বহিরাবরণের বিচার, প্রাকৃত বিচার প্রবল থাক্‌লে ভোগায়তন থাক্‌বে।

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।।"

সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সকল সময় হরিদাস্যে প্রতিষ্ঠিত হ'লে জীবন্মুক্তি হ'বে। মন প্রভু হ'য়ে একাদশ ইন্দ্রিয় পরিচালনা করায় আমরা প্রভু হ'য়েছি। কর্ম্ম ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি কর্‌তে বা কখন দৌড়াচ্ছি। চেতন জগতের ঐশ্বর্য্যের ধারণা আমাদের নাই। অচেতনের ধর্ম্মগুলি ঈশ্বরে আরোপ করি মাত্র। জগতের জড়াশ্রিত ঐশ্বর্য্য, বৈকুণ্ঠে চিদৈশ্বর্য্য। জড়সাকার, জড়নিরাকার, জড়নির্গুণবাদী মায়াবাদী অভক্ত। ভেদবাদী ও অভেদবাদীর বিতর্কই মায়াবাদ। তা'তে প্রবিষ্ট হ'বার আবশ্যকতা নাই।

ভগবানের বিভূতি সঙ্কর্ষণাদি, তজ্জাত বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ বা পুরুষাবতারগণ সমস্তই চিদানন্দাকার। লীলামর্য়ের অধিষ্ঠানের ব্যাঘাত নাই। কিন্তু আমাদের আংশিক

আবৃতদর্শনে এইরূপ প্রতীতি। পূর্ণলীলার বৈচিত্র্য আবরণদ্বারা জগতের অন্তর্ভুক্ত আমি এই বিচারই দুষ্ট। বৈষ্ণবের কৃপায় মনকে নিগৃহীত ক'রে অনর্থ হ'তে মুক্ত হ'তে পার্‌লে ক্রমে স্বরূপসিদ্ধিক্রমে ভগবানের বালকৈশোরাদিলীলা-দর্শনের যোগ্যতা পাব। গোলোকবস্তু বিশ্বে অবতীর্ণ হ'য়েছেন বটে, কিন্তু আমাদের অনর্থবশতঃ তাঁহার দর্শন হচ্ছে না। পূর্ণলীলার বিচিত্রতা মেঘদ্বারা সূর্য্যালোক আবৃতের ন্যায় আবৃত হ'য়ে আছে। এই আবরণ উন্মুক্ত হ'লে আমরা অধোক্ষজের লীলার প্রতীতি পাব। আমাদের প্রয়োজন—নিত্যত্ব, পূর্ণচেতনতা ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ।

"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।"

বিবর্ত্ত থাকাকালে অধোক্ষজের অনুভূতি-রাহিত্য।

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ম্।।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।"

এই অনর্থমেঘ বিদূরিত হ'লে তাঁর লীলাদর্শনের যোগ্যতা হয়। অনর্থ মূলতঃ দুইপ্রকারে পরিচয় দেয়। ভোগানর্থ ও ত্যাগানর্থ। গুণদ্বারা আবৃতদর্শনে আবরণ। আবরণ উন্মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। জড়জগতের ভোগ বা ত্যাগের বিচারে অবস্থিত হ'লে মায়িক আবরণ থাক্‌বেই। বৈকুণ্ঠের প্রতীতিতে ভোগ বা ত্যাগের বিচার নাই। যেকাল পর্য্যন্ত অক্ষজজ্ঞান—ভোগ ও ত্যাগের জ্ঞান আমাদের থাক্‌বে, ততকাল স্বরূপ-জ্ঞান হবে না।

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্।।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা।।"

বৈষ্ণবের অনুসরণে ভাগবতের অনুশীলন হ'তে অনর্থ দূরীভূত হ'লে যমুনার জল ও তীরস্থ বালুকাদি চিন্ময় প্রতীত হ'বে। তখন আমাদের ভোগ্যবিচার থাক্‌বে না। কৃষ্ণভোগ্য আমাদের পূজ্যবস্তু। তদীয় প্রসাদের সেবাদ্বারা প্রপঞ্চ জয় হ'বে। ব্রজের সকল বস্তু মুকুন্দের প্রিয়, অপ্রাকৃতলীলার অনুকূল। তাহা জড়প্রতীতির অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহাই মহাভাগবতের দর্শন। দাস গোস্বামী ব'লেছেন,—বৈকুণ্ঠে বাস অপেক্ষা আমি ব্রজবাস কামনা করি ; নিত্য ব্রজবাসীর সঙ্গে সম্বন্ধ চাই, তাঁ'রা ভগবানের মামকী তনু। তাঁ'দের সকলকেই আমি বন্দনা করি। আশ্রয়-জাতীয় পাঁচপ্রকার সেবককে যেন কোনপ্রকারে আমরা অবজ্ঞা না করি।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র ১৪০৭ ; ১৩ এপ্রিল, ২০০১

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব

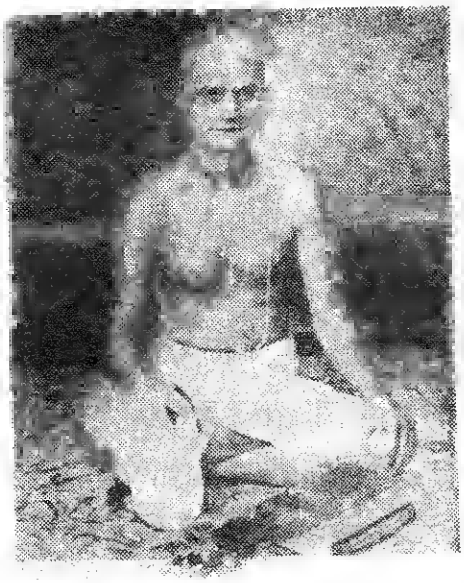

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার কৃত বেদান্ত-ভাষ্য—শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যের কথা স্মৃতিপটে জাগরিত হয়। তাঁহার ভাষ্যই তাঁহাকে চারি-সম্প্রদায় বৈষ্ণবের মধ্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। এমনকি, চারি সৎসম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য প্রধান দার্শনিক সম্প্রদায়গুলিও আচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের কথা স্মরণ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবগণের ত' কথাই নাই, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ই তাঁহার প্রতিভার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

সৎ ও অসৎ সম্প্রদায়

শ্রীশ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁহার স্বরচিত পদ্মপুরাণ শাস্ত্রে লিখিয়াছেন,—"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।" অর্থাৎ সম্প্রদায়বিহীন যে-সমস্ত মন্ত্র বর্ত্তমান যুগে পরিদৃষ্ট হইতেছে, তৎসমুদয়ই ফলপ্রদ নহে। এইস্থলে 'মন্ত্র'-শব্দের দ্বারা প্রণব ও স্বাহা-পুটিত দীক্ষামন্ত্র অথবা তদনুকূল শিক্ষাসমূহকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ব্যতীত অসাম্প্রদায়িক শিক্ষার প্রতিষ্ঠা নাই। বর্ত্তমান যুগে যে সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত চিন্তা প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার সহিত শাস্ত্রোক্ত সাম্প্রদায়িকতার প্রচুর পার্থক্য আছে। একপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা লোককে অধঃপাতিত করে, অন্যপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা পতিত জীবকে উদ্ধার করিয়া সর্ব্বোত্তম স্থানে সমাসীন করায়। যাহারা সৎসম্প্রদায় স্বীকার করিতে অক্ষম, তাহারা সৎসম্প্রদায় হইতে পৃথক্ করিয়া অসৎ-সম্প্রদায়ের প্রশ্রয় দিতেছেন। এইরূপ অসৎ-সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে বহু প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারাও প্রত্যেকে অসৎ কার্য্যের প্রশ্রয় দিবার জন্য এক একটী সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন। এইপ্রকার অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়সমূহের গণ্ডিগুলি যতই উৎসাদিত হইবে ততই জগতের মঙ্গল।

গলতাগাদীতে সৎ-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা

সৎ-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় যে প্রকৃত সৎ-সম্প্রদায়—তাহা গলতার গাদীতে স্থাপন করেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তাঁহার মূল-পুরুষ শ্রীবলদেবের বিচার-বিজয়-বৈজয়ন্তী-ক্ষেত্র জয়পুরের নিকটবর্ত্তী গলতা পাহাড় শ্রীদ্বারকাধাম পরিক্রমাকালে সমস্ত ভক্তমণ্ডলীকে প্রদর্শন করাইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র ১৪০৭ ; ১৩ এপ্রিল, ২০০১

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন

এই গলতা পাহাড়েই তিনি রামানন্দী, শাঙ্কর, শৈব প্রভৃতি বহু ধর্ম্মযাজী পণ্ডিতগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথই যে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা স্থাপন করেন। বিচারে পরাস্ত হইয়া যাবতীয় ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকগণ পদ্মপুরাণের উক্ত প্রমাণের দ্বারা তাঁহাকে আক্রমণ করেন। তাঁহারা বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শাস্ত্রোক্ত কোন সম্প্রদায় স্বীকার না করায় বলদেবের প্রদর্শিত বিচারযুক্তি যতই অকাট্য হউক না কেন, উহা নিষ্ফল বলিয়া গণ্য হইবে। আচার্য্য বলদেব তাঁহাদের এই উক্তির নিষ্ফলতা প্রদর্শনকল্পে কয়েকদিনের মধ্যে বেদান্তের ভাষ্য রচনা করেন। এই সম্পর্কে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে বলদেবের অলৌকিক শক্তির পরিচয় সম্বন্ধে বহু ইতিহাস প্রচলিত আছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ মধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত

শ্রীবলদেবই সেই সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে ব্যাসোক্ত চারি-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া বিশ্ববাসীকে জানাইয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে বলদেবের এই বিচারের পূর্ব্বেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মধ্ব-সম্প্রদায়ের একটী শাখাস্বরূপ বিবেচিত হইত। কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুই মধ্ব-সম্প্রদায়ের জনৈক আচার্য্য শ্রীশ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদকে আচার্য্য স্বীকার করিয়া তাঁহার অনুগত সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিয়াছেন যে, তাঁহারা সকলেই মধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত। আচার্য্য বলদেব আমাদিগকে যে গুরুপরম্পরা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুরই প্রদর্শিত পরম্পরা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করিলেও ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। নিম্নে বলদেব-প্রদর্শিত শ্রীগুরু-পরম্পরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রদর্শিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্।।
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্।।
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং-শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ।।
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বর-শিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ।। (প্রমেয় রত্নাবলী)

(ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—১৫)

শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ যে অপ্রাকৃত, তাহা প্রমাণিত হইল। কিন্তু তাঁহার তনু-ত্যাগের কথার কিরূপে সঙ্গতি হইবে?

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

যয়াহরদ্ভুবো ভারং তাং তনুং বিজহাবজঃ।
কণ্টক কণ্টকেনৈব দ্বয়ঞ্চাপীশিতুঃ সমম্।।
যথা মৎস্যাদিরূপাণি ধত্তে জহ্যাদ্‌যথা নটঃ।
ভূভারঃ ক্ষপিতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্।।

(ভাঃ ১।১৫।৩৪-৩৫)

[কাহারও পদে কণ্টক বিদ্ধ হইলে, তিনি অন্য একটী কণ্টকের সাহায্যে বিদ্ধ কণ্টকটীকে উন্মূলিত করেন এবং পশ্চাৎ উভয় কণ্টককেই পরিত্যাগ করেন, তদ্রূপ জন্ম-বিরহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও যে মূর্ত্তিদ্বারা ধরিত্রীর ভারস্বরূপ অসুরগণের বধ সাধনপূর্ব্বক পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ সেই শরীরও অপ্রকট করিলেন।। ৩৪।। যেরূপ নট বিশেষ বিশেষ চরিত্র অভিনয়ের জন্য বহুবিধ সজ্জা গ্রহণ করে এবং অভিনয় অন্তে সেই রূপ অন্তর্হিত করে, সেইরূপ ভগবান্‌ও বিশেষ প্রয়োজন উদ্দেশ করিয়াই মৎস্যাদি বহুবিধ রূপ পরিগ্রহ করেন এবং প্রয়োজন সাধিত হইলে সেইসকল রূপ অপ্রকট করেন ; সেইপ্রকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও যে কলেবরদ্বারা ভূভার হরণ করিয়াছিলেন, তাহা অন্তর্হিত করিলেন।। ৩৫।।]

তনু, রূপ ও কলেবর—এই শব্দসকলদ্বারা ভগবানের 'দেহ' নির্দ্দিষ্ট হয় নাই ; 'ভাব' উক্ত হইয়াছে—ভূভার-হরণেচ্ছা-লক্ষণ এবং দেবতা-প্রতিপালনেচ্ছারূপ ভাব। তৃতীয়স্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে 'তনু'-শব্দে ব্রহ্মার ভাব বলা হইয়াছে। "বিসসর্জাত্মনঃ কায়ং" ব্রহ্মা পঞ্চপ্রকার অবিদ্যা সৃষ্টি করিয়া তাহা তমোময় দেখিয়া মন প্রসন্ন না হওয়ায় সেই দেহ ত্যাগ করিলেন। তৎপরে অসুরগণকে সৃষ্টি করিলে অসুরগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গেলে শ্রীহরির উপদেশে "বিমুঞ্চতাত্মতনুং ঘোরাম্"—নিজের কাম-কলুষিত তনু ত্যাগ করিলেন। তদনন্তর গন্ধর্ব্ব-অপ্সরাগণকে সৃষ্টি করিয়া "বিসসর্জতনুং তাম্" সেই তনু ত্যাগ করিলেন। তৎপরে কর-চরণাদির প্রসারিত করিয়া ব্রহ্মা যখন দেখিলেন যে, সৃষ্টি বৃদ্ধি হইল না, তখন "ক্রোধাদুৎসসর্জ হ তদ্বপুঃ"—ক্রোধবশে সেই বপু ত্যাগ করিলেন। উক্ত শ্লোকসকলের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—সর্ব্বত্র তনুত্যাগো নাম তত্তন্মনোভাবত্যাগো বিবক্ষিতঃ"—"সর্ব্বত্র তনু ত্যাগ অর্থে মনোভাব ত্যাগ। শ্রীভগবান্ সম্বন্ধেও এইরূপ জানিতে হইবে। ভার-হরণাদিকার্য্য স্বয়ং ভগবানের

নহে, পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর কর্ম্ম। তবে যখন স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হন, তখন যুগাবতারাদির কর্ম্মও (ভূভার-হরণ, দেবতা-প্রতিপালনাদি) তাঁহা হইতে নিষ্পন্ন হয়, তাঁহাতে ঐ ভাবের আভাসমাত্র ছিল। এজন্য কণ্টক-দৃষ্টান্ত সুসঙ্গত। কণ্টক-বিদ্ধাঙ্গ ব্যক্তির বিদ্ধ-কণ্টক ও মোচক-কণ্টক দুইটীই যেমন সমান, শ্রীভগবানেরও তদ্রূপ। এ বিষয়ে পরমাত্ম-সন্দর্ভে এইরূপ সিদ্ধান্তিত ঃ—

চিন্মাত্রস্বরূপ শ্রীভগবান্ স্বরূপ-শক্তিদ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠাদিগত অনন্ত ঐশ্বর্য্যাদি-যুক্ত। তিনি প্রাকৃত-গুণরহিত বলিয়া অবিকারী। স্বরূপশক্তির বিলাসভূত অনন্ত ক্রিয়া সর্ব্বদা নিত্যসিদ্ধরূপে তাঁহাতে বিদ্যমান অর্থাৎ শ্রীভগবান্ অনন্তরূপে স্বরূপশক্তির প্রকাশিত অনন্তলীলায় নিত্যনিরত বলিয়া লীলাবির্ভাব-কর্ত্তা তাঁহার অবস্থান্তর-প্রাপ্তি সম্ভব নহে। এজন্য প্রাকৃত কর্ত্তার ন্যায় তিনি বিকারপ্রাপ্ত হন না। তিনি যদি স্বরূপে নির্ব্বিকার হন, তবে তাঁহার সত্ত্বাদি গুণ এবং গুণাশক্তিহেতু স্থিত্যাদি-ক্রিয়া কিরূপে সম্ভব? চিন্মাত্র-বস্তুবিরোধী সেইকল গুণ ও ক্রিয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহ তাঁহাতে যুক্ত হয় না। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বলিয়া স্বেচ্ছাক্রমেও সে-সকল অঙ্গীকার করেন না। কেবল লীলাবশতঃই গুণাতীত তিনি গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হন, সেই লীলাদ্বারা কিরূপে গুণ-ক্রিয়ান্বিত হন? তদুত্তর,—লীলা—ক্রীড়া। বালক বস্তুবিশেষ বা অন্য বালককর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়। স্বরূপ-বৈভবে পরিতৃপ্ত ভগবান্ অন্য বস্তু হইতে তাদৃশ লীলায় প্রবৃত্ত হন না। তাঁহার আশ্রিতা গুণময়ী মায়াই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি মায়ার নিয়ামক বলিয়া মায়ার কার্য্য তাঁহার লীলাবিশেষ-রূপে গণ্য হয়। তাঁহার চিচ্ছক্তিদ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠাদিলীলা আর মায়াশক্তিদ্বারা সৃষ্ট্যাদিলীলা নিষ্পন্ন হয়। মায়াসহ তাঁহার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই, এজন্য বলা হইল, ভূভার-হরণাদি-কার্য্যে তাঁহার আবেশ থাকিতে পারে না।

মৎস্যাদি-রূপও নিত্য। ঐ সকল রূপের ধারণ ও ত্যাগ সম্বন্ধে তাৎপর্য্য—মৎস্যাদি-অবতারে পৃথিবীর ভারস্বরূপ "দৈত্য-বধাদি-বিষয়ক ভাব গ্রহণ ও ত্যাগ" বুঝিতে হইবে। "ধত্তে জহ্যাদ্ যথা নটঃ।" দৃষ্টান্তস্বরূপে 'নট' শ্রাব্য-রূপকাভিনেতা—কথক। শ্রাব্য-রূপকাভিনেতা নিজরূপে নিজবেশে থাকিয়াই পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অভিনয় সহকারে গান করিবার নিমিত্ত নায়ক-নায়কাদি ভাব ধারণ ও ত্যাগ করে। শ্রীভগবান্ সম্বন্ধেও তাদৃশ জানিতে হইবে অর্থাৎ স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াই নানা রূপ প্রকটন করেন। তৃতীয় স্কন্ধে বিশেষভাবে বর্ণিত,—

প্রদর্শ্যাতপ্ত-তপসাবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্।
আদায়ান্তরধাদ্ যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্।। (ভাঃ ৩।২।১১)

শ্রীউদ্ধব বিদুরকে বলিয়াছিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতাবৎকাল নিজমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া লোকলোচন-স্বরূপ সেই মূর্ত্তি তাহাদের নিকট হইতে যেন বলপূর্ব্বক গ্রহণ

করিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। লোকসকল দীর্ঘকাল দর্শন করিয়াও তাহাতে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। এস্থলে লোকলোচনস্বরূপ নিজমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া তাহা লইয়াই অন্তর্দ্ধান করিলেন, ত্যাগ করিয়া নহে। শ্রীসূতের উক্তিতেও এইরূপ দেখা যায়,—

যথা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং, জহৌ স্বতন্বা শ্রবণীয়-সৎকথঃ।
তদাহরেবাপ্রতিবুদ্ধচেতসামভদ্রহেতুঃ কলিরন্ববর্ত্তত।। (ভাঃ ১।১৫।৩৬)

যাঁহার সৎকথা সকলে শ্রবণ করিয়া থাকে, সেই ভগবান্ মুকুন্দ যেদিন নিজশরীর-দ্বারা এই পৃথিবী ত্যাগ করিলেন, সেইদিনই অবিবেকী ব্যক্তিগণের অমঙ্গলহেতু কলির অনুবৃত্তি হইল অর্থাৎ কলি প্রবেশ করিল।

এই শ্লোকে 'স্বতন্বা'-শব্দে তৃতীয় বিভক্তি থাকায় সহার্থে নহে। 'সহার্থে তৃতীয়া' স্বীকার করিলে যেমন পৃথিবী ত্যাগ করেন, তদ্রূপ নিজতনুও ত্যাগ করেন বুঝায়। এস্থলে 'করণে তৃতীয়া' বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে তনুদ্বারা পৃথিবী ত্যাগ বুঝাইবে। শ্রীবসুদেব বলিয়াছেন,—

সূতীগৃহে ননু জগাদ ভবানজো নৌ,
সংজজ্ঞ ইত্যনুযুগং নিজধর্ম্মগুপ্ত্যৈ।
নানাতনূর্গগনবদ্বিদধজ্জহাসি,
কো বেদ ভূম্ন উরুগায় বিভূতিমায়াম্।। (ভাঃ ১০।৮৫।২০)

হে ভগবন্! সূতিকাগৃহে আমাদিগকে বলিয়াছ যে, অজ তুমি নিজধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রতিযুগে জন্মগ্রহণ কর। হে উরুগায়! তুমি গগনের ন্যায় অসঙ্গ হইয়া নানা তনু ত্যাগ ও গ্রহণ কর। পরমেশ্বর তোমার বিভূতিরূপা মায়াকে কে জানিতে পারে?

শ্রীবসুদেবের উক্তি ভগবন্মহিম-জ্ঞানপ্রধান। তিনি বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ নিজ-মানবলীলাকে প্রাকৃত মনুষ্যচেষ্টাবৎ অনুমান করিয়া শ্রীভগবানে পুত্রবুদ্ধির প্রতি আক্ষেপ করেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি ভগবদুক্তি জল্পনা করিয়া নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। "যদি আমি তোমার পুত্র না হই, তবে পুত্রবুদ্ধি কেন করিতেছ?" শ্রীভগবানের এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় "সে-বিষয়ে তোমার বাক্য-গৌরবই প্রমাণ, অন্য কোন প্রমাণ নাই" ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য বলিলেন,—"আপনি জন্মরহিত হইয়াও আমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন" একথা তিনি নিজে সূতিকাগৃহে বলিয়াছেন। শ্রীভগবদুক্তি,—"আমি আপনাদের তনু-প্রবেশ-নির্গম অপেক্ষায়ই জন্মগ্রহণ করি" বলা হইয়াছে। তনু-প্রবেশ-নির্গম চিহ্নদ্বারা জন্ম বলা যাইতে পারে না। যেহেতু আমি পরমাত্মরূপে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবে প্রবেশ ও নির্গম করি। এবিষয়ে প্রমাণ,—

তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি।।

(কঠোপনিষৎ)

ধীর পুরুষ সেই দুর্দ্দর্শ গূঢ় অনুপ্রবিষ্ট (সকলের অন্তর্যামী) গুহাস্থিত (সকল প্রাণীর হৃদয়-গুহায় বিরাজিত), গহ্বরেষ্ঠ (মুক্তজীবেও অবস্থিত), পুরাণ (সর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী), দেব (স্বপ্রকাশ বা ক্রীড়াদি-গুণবিশিষ্ট) দেবতাকে ধ্যানযোগে অবগত হইয়া হর্ষ-শোক পরিত্যাগ করেন।

সুতরাং সর্ব্বভূতের ন্যায় তোমাদিগেও প্রবেশ করিয়াছি ; তাহাই তোমাদের নিকট জন্মরূপে আরোপিত, এইরূপ মনে কর। তদুত্তরে বসুদেব বলিতেছেন,—"তুমি গগনের ন্যায় অসঙ্গ হইয়া নানা তনু গ্রহণ ও ত্যাগ কর।"

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা ও ঐ রূপের নিত্যস্থিতি প্রমাণিত হইল। পৃথিবীর উক্তি,—

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্।

* * * *

এতে চান্যে চ ভগবন্ নিত্য যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ।।

(ভাঃ ১।১৬।২৭, ৩০)

সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি গুণ যাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান, কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, সম্প্রতি সেই গুণনিধি শ্রীনিবাসকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত লোক পাপহেতু কলির দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছে বলিয়া আমি শোক প্রকাশ করিতেছি।

অতএব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নররূপে স্বাভাবিক নিত্য সৌন্দর্য্য ও ওজ-বল প্রভৃতিসহ নিত্য অবস্থিতি প্রসিদ্ধ।

শ্রীগোপালতাপনীতে বর্ণিত হইয়াছে,—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তং পীঠ্যাং যে তু যজন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।।

যিনি নিত্যসমূহের মধ্যে নিত্য, চেতনসমূহের মধ্যে যিনি চেতন এবং একাকী হইয়াও বহুজনের কামনা বিধান করেন, পীঠস্থিত তাঁহাকে যে-সকল ধীরব্যক্তি পূজা করেন, তাঁহাদের যেমন অক্ষয় সুখ লাভ হয়, তদ্রূপ অন্যের—ভজনবহির্ম্মুখ-জনের হয় না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

ভজনরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে দীক্ষাগ্রহণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। দীক্ষাদ্বারা জীবের ভগবানের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ জন্মে। সম্বন্ধজ্ঞানের অপর নামই 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞান'। সদ্‌গুরুপদাশ্রয় হইতেই এই দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। "আদৌ গুরুপদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণ-দীক্ষাদি শিক্ষণম্।" মন্ত্রে উপদেশমাত্রকেই যাঁহারা দীক্ষা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা অজ্ঞ। বস্তুতঃ যাহাতে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, তাহার নামই 'দীক্ষা'। দিব্যজ্ঞানলাভ যে যে বিধান হইতে সম্পন্ন হয়, তদ্দ্বারা জীবের ভোগময় লাভের সম্যক্‌রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পণ্ডিতগণ ইহাকেই দীক্ষা বলিয়া থাকেন। দিব্যজ্ঞান লাভের অভাব ও পাপপ্রবৃত্তির ক্ষয় না হইলে দীক্ষা হয় নাই জানিতে হইবে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত হইয়াছে,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।।

"যেহেতু দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ, অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' নামে অভিহিত করেন।" দীক্ষাদ্বারা জীবের ক্রমশঃ কর্ম্মবন্ধনরূপ অবিদ্যা নাশ হইতে থাকে। একমাত্র দীক্ষিত ব্যক্তিই সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ। বেদ সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত জীবকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া বিনির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ব্রাহ্মণো বা এষ জায়তে যো দীক্ষতে" অর্থাৎ দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই ব্রাহ্মণ হন।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।। (তত্ত্বসাগর)

"যে-প্রকার কোন রসবিধানদ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাংস্যের সুবর্ণত্ব লাভ ঘটে, তদ্রূপ বৈষ্ণবী-দীক্ষাদ্বারা মনুষ্যমাত্রেরই দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হয়।" কেহ কেহ দ্বিজত্ব-শব্দদ্বারা দ্বিজাতি বলিতে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সংশয় নিরসনার্থে "যথা কাঞ্চনতাং" শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং 'বিপ্রতা' অর্থাৎ দীক্ষাপ্রাপ্ত মনুষ্যমাত্রেরই ব্রাহ্মণতা।" 'নৃণাম্'-শব্দের দ্বারা 'মনুষ্যমাত্রেরই' এবং 'দ্বিজত্ব'-শব্দদ্বারা 'ব্রাহ্মণতা' এই অর্থ সূচিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণত্ব, দ্বিজত্ব বা বিপ্রত্ব চ্যুতগোত্রমূলক নহে, পরন্তু অচ্যুত গোত্রীয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"জড়বদ্ধ জীবদিগের মায়িক সংসারে স্বভাব ও বংশানুসারে যে দ্বিজত্ব লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশরূপ এই দ্বিজত্ব লাভ উৎকৃষ্ট, কেন না, চিদ্বিষয়ে দীক্ষিত হইয়া যে দ্বিজত্ব বা অপ্রাকৃত জন্মলাভ হয়, তদ্দ্বারা চিজ্জগৎ প্রাপ্তিরূপ

জীবের চরম মহিমা।" মোটকথা বৈষ্ণবী-দীক্ষাপ্রভাবে মনুষ্যমাত্রেই (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, পুরুষ যে হউক না কেন) বিপ্রত্ব লাভ করেন। এতৎপ্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে উল্লেখ রহিয়াছে,—

পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা স্বামিগোত্রেণ গোত্রিকা।
তথা দীক্ষাপ্রভাবেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।।

"পিতার গোত্রবিশিষ্টা কন্যা যেমন বিবাহের পর স্বামীর গোত্রে গোত্রযুক্তা হয়, তদ্রূপ মনুষ্যেরও দীক্ষার দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হয়।"

অধোক্ষজ ভগবান্ আমার সেব্য বস্তু, আমি সেই ভগবানের সেবক ; ভগবানের সেবা ব্যতীত আমার অন্য কোন কৃত্য নাই বা হইতে পারে না—ইহাই দিব্যজ্ঞান বা প্রকৃত দীক্ষা। এই জ্ঞানের অভাব যেখানে, সেইখানেই অজ্ঞানতা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা হয় নাই জানিতে হইবে। দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত না হইয়াই "আমরা সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছি"—মুখে এই কপট অভিমান করিতেছি বলিয়াই যাবতীয় অনর্থ উপস্থিত হইতেছে। আমাদের দীক্ষিতের কপট অভিমান সবই নিরর্থক। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার পরেও বিষয়ে অভিনিবেশ আমাদের কি করিয়া থাকিতে পারে? সংসারে উন্নতি করিবার স্পৃহা কিরূপে হৃদয়ে বাসা বাঁধিতে পারে? ভগবৎ-সেবাপ্রবৃত্তির অভাবেই দীক্ষাগ্রহণের পরও জড়প্রতিষ্ঠা, অর্থসংগ্রহের স্পৃহা ও স্বজনগণের সেবার প্রচেষ্টা প্রভৃতি আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে—বলীবর্দ্দের ন্যায় নাকে দড়ি দিয়া ভবচক্রে ঘুরপাক খাওয়াইতেছে। ভাগ্যক্রমে সেবার সুযোগ পাইয়াও অধনে যতন করিতে গিয়া তাহা আমরা হেলায় হারাইতেছি।

বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ ব্যতীত জীবনধারণ নিরর্থক

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উল্লেখ রহিয়াছে,—"বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকশ্চ স এবো বৈষ্ণবো দ্বিজঃ" অর্থাৎ হে দ্বিজ! যিনি বিষ্ণু মন্ত্রের উপাসক তিনিই বৈষ্ণব। বৈষ্ণবতার মধ্যেই ব্রাহ্মণতা অনুস্যূত। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ ব্যতীত সর্ব্বদুঃখ বিমোচন হইতে পারে না এবং কেহই ভগবৎপূজার অধিকারী হইতে সক্ষম হন না। সেইজন্য দীক্ষাগ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষা-বিরহতো জনঃ।। (বিষ্ণুযামল)

"অদীক্ষিত ব্যক্তি যাহা কিছু করে, সমস্তই নিরর্থক ও তাঁহার মৃত্যুর পর সে পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈর্নলব্ধ হরের্দীক্ষানার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ।। (স্কন্দপুরাণ)

"যাহারা শ্রীহরির দীক্ষাপ্রাপ্ত হয় নাই এবং ভগবান্ জনার্দ্দনকে অর্চ্চনা করে নাই, এই সংসারে তাহারা পশু এবং তাহাদের জীবনে ফল কি?"

গর্ভস্থিতা মৃতা বাপি মুষিতাস্তে সুদূষিতাঃ।
ন প্রাপ্তা যৈর্হরেদীক্ষা সর্ব্বদুঃখবিমোচনী।। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

"যাহারা সর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তক শ্রীহরির দীক্ষাপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা গর্ভে অবস্থান করিতেছে অথবা তাহারা মৃত, অপহৃত অথবা দোষদুষ্ট হইয়া আছে।" উপনয়ন সংস্কার ব্যতীত যেরূপ ব্রাহ্মণের বেদে অধিকার জন্মে না, তদ্রূপ বিষ্ণুদীক্ষা ব্যতীত জীবের ভগবৎ-পূজারাধনায় অধিকার হয় না। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আত্মশোধন করাই জীবমাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অসাত্বত তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির মঙ্গল লাভ হয় না

সাত্বত পঞ্চরাত্রের মতে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক—এই চারি সম্প্রদায়ে দীক্ষিত বৈষ্ণবই বাস্তবিক বৈদিক ব্রাহ্মণ। অসাত্বত তন্ত্র বেদবিরুদ্ধ বলিয়া বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত কোন ব্যক্তিই বৈদিক ব্রাহ্মণতা লাভ করিতে পারেন না। ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তের নিকট দীক্ষিত না হইলেই ষষ্ঠী, মাকাল, ঘেঁটু প্রভৃতির পূজা, প্রেতশ্রাদ্ধাদি, প্রসাদে অবজ্ঞা প্রভৃতি নানাপ্রকার নারকীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হয়, ঐগুলিই দিব্যজ্ঞানের অভাব। যেখানে সাম্প্রদায়িক দীক্ষার অভাব সেখানে ভগবদ্বিদ্বেষ ও ভক্তবিদ্বেষ সাধিত হয়। একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্যই বিষ্ণুদীক্ষাদ্বারা দীক্ষিতকে ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে বৈদিক উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিতে সমর্থ।

গৃহ্ণাতি ভক্তো ভক্ত্যা চ কৃষ্ণমন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবাৎ।
অবৈষ্ণবাদ্ গৃহীত্বা চ হরিভক্তির্ন বর্দ্ধতে।।

"ভক্ত ভক্তির সহিত বৈষ্ণবের নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, অবৈষ্ণবের নিকট হইতে মন্ত্র লইলে হরিভক্তি বর্দ্ধিত হয় না।" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

বিষ্ণুভক্তিবিহীনাচ্চ ভক্তিহীনো ভবেন্নরঃ।
শৈবাৎ শাক্তাদ্ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন বর্দ্ধতে।।

"যে বিষ্ণুভক্তিহীন, তাহার নিকট হইতে মন্ত্র লইলে মানুষ ভক্তিহীন হয়। আর শৈব ও শাক্তের নিকট হইতে মন্ত্র লইলে হরিভক্তি বর্দ্ধিত হয় না।"

ন চ শাক্তাৎ ন শৈবাচ্চ গৃহ্ণীয়াদ্বৈষ্ণবাদ্দ্বিজাৎ।
শাক্তাৎ শৈবাৎ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন জায়তে।। (কালীতন্ত্র)

"যে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব তাহার নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে, শাক্ত বা শৈবের নিকট হইতে নহে। শৈব বা শাক্তের নিকট মন্ত্র লইলে হরিভক্তি লাভ হয় না।"

দীক্ষিত ব্যক্তি কখনও প্রাকৃত শূদ্র বা অব্রাহ্মণ নহেন

কেবলমাত্র শৌক্রবিধানের পক্ষপাতী পঞ্চোপাসক স্মার্ত্তগণ শূদ্র দীক্ষাবিধান বলিয়া যে বিচার করিয়াছেন, তাহা 'দীক্ষা'-শব্দবাচ্য নহে। তাহাকে নামাপরাধ বা দীক্ষাবাধ বলা যাইতে পারে। এইরূপ দীক্ষা-দান-চাতুর্য্যদ্বারা যে কৃত্রিমতা সাধিত হইয়াছে, তাহাতে পারমার্থিকগণ বলেন যে, উহা নব্যস্মার্ত্তের মনগড়া ও কাল্পনিক। দীক্ষাবিধানদ্বারা শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তির বিপ্রত্ব সিদ্ধ হইলেও দীক্ষিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ যজ্ঞসূত্রের দ্বারা বিনির্দ্দিষ্ট হইবেন না—এইরূপ মৎসরতা-ব্যঞ্জক অশাস্ত্রীয় কথা কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে,—"শূদ্রোকুলোদ্ভূত দীক্ষিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণের ন্যায় যজ্ঞসূত্র-গ্রহণে তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতার ব্যাঘাত ঘটিবে।" দীক্ষিত পারমার্থিক ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র না থাকিলে মৎসরগণের পক্ষে তাহাকে 'শূদ্র', 'পাপী' প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিতে যে সুবিধা হইবে। নিজেরা 'ব্রাহ্মণব্রুব' হইয়াও দীক্ষিত পারমার্থিক ব্রাহ্মণকে 'শূদ্র' সম্বোধন করিয়া নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারিয়া অশেষ ক্ষতিসাধন করিতেছেন। **(ক্রমশঃ)**

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

বিশ্ববৈচিত্র্য ?

জগতের সুখে আপনা বিলিয়ে,
ভগবৎস্মৃতি সাগরে মিশায়ে,
আপনারে ভাবে—
"চিরদাস ভবে
আমি রে মোহিনীর।
হেসে খেলে মোর যাবে চিরদিন,
ভোগ-সুখ কভু না হইবে ক্ষীণ,
মলিন বদন
না হ'বে কখন না
র'বে নয়নে নীর।।
সব ধনে ধনী আমি গরীয়ান্,
চিরদিন মোর কাটিবে সমান,
পূরব পুরুষে
পরম হরিষে
লভিল যেমতি যশ।

আমিও তেমতি লভিব সুযশ,
দেশবাসী মোর রবে সবে বশ,
প্রতাপে আমার
হৃদয়ে সবার
জাগিবে অতীব ত্রাস।।
দিনেকের তরে আমার প্রভাব,
খরব না হ'বে, না র'বে অভাব,
মোর দ্বারদেশে
মোর পদ-পাশে
রহিবে সকলে নত।"
শমন-শমন জারি অচিরায়,
হ'বে মূঢ় প্রতি ভাবে নাক হায়,
ভাবে দুরাচার
গর্ব্ব কভু তার
না হইবে প্রতিহত।।
আজি যেই জন পথের ভিখারী,
কাল সে সাজিয়া রাজ্য-অধিকারী,
পূর্ব্ব-পরিচয়
সব ভুলে যায়
ভাবে আমি চির রাজা।
পর্ণকুটীর-নিবাসী অভাগারে,
চক্রবৃদ্ধি সুদ আদায়ের তরে,
সাজিয়া শাসক
বরিয়া নরক
দেয় হায় ঘোর সাজা।।
'ক'কারের কভু দেখেনি আকার,
হে বিজ্ঞ (?) হ'য়ে মালিক টাকার,
পণ্ডিতেরে কহে
"শোন মূর্খ ওহে
ফেল টাকা মানে মানে।
আমি মানী জন সম্মানে কাহার,
করি না ব্যাঘাত শোন দুরাচার,

ভালয় ভালয়ে
নিজ মান লয়ে
ঘরে যাও টাকা গুণে।।"
দেখিয়া যাহারে বলিষ্ঠ আকারে,
জনগণ যারে বরিল সাদরে,—
'দেশের গৌরব
বলিয়া সকলে
ঘোষিল সম্মান যার।'
আজিরে সে-জন নিমতলা ঘাটে,
নীত হ'ল এক সুসজ্জিত খাটে,
বন্ধুগণ চায়
সে নিদ্রিত রয়
নিদ্রা ভাঙ্গিবে না আর।।
তাই বলি, সব ইন্দ্রজালসম,
সারা দুনিয়াটা ছলনা-চরম,
সেবাই পরম
জীবের ধরম
ভোগত্যাগে দুরগতি।
জাগতিক আশা মনের ভরসা,
সকলি জগতে শুধুই নিরাশা,
আশাপাশে নরে
বেঁধে কারাগারে
দেয় দেবী সাজা অতি।।
কে আমি এসেছি কোন্ দেশ হ'তে,
হ'বে মোর পুনঃ কোন্ দেশে যেতে,
কেন বা এ বিশ্ব
এবে হয় দৃশ্য
অদৃশ্য কেন বা হ'বে?
চিরদিন সমভাবে ধরাধামে,
হ'বে কি আমার বসতি আরামে,
ওহে প্রিয় ভ্রাতঃ
চিন্ত এই তত্ত্ব
ভজ হরি অকৈতবে।।

চিন্ত মনে তব প্রাণ-প্রিয়তমা,
তব প্রতি যার প্রীতি অনুপমা,
তুষিছে তোমারে
কতই আদরে
প্রাণাধিক ভালবেসে।
যবে তুমি হ'বে প্রাণ-বায়ুহীন,
তুষিবে তোমারে সেকি সেই দিন,
দিব্য তনু তব
ভেবে পচা শব
না আসিবে দেহ-পাশে।।
তাই ত্যজি' মোহ-মদিরার নেশা,
সুজনে করয়ে শ্রীপদ-ভরসা,
হুঁসিয়ার জন
না রয়ে কখন
বাসনা-কুহকে ম'জে।
চ'লে যায় কালে হেন জগতেরে,
নিত্য বাসস্থান মনে নাহি করে,
চিরকাল ভবে
সমান না যাবে
জেনে সুখে হরি ভজে।।
করুণানিধানে অকৈতব মনে,
পালক, পোষক, তারক জেনে,
যম-নিয়মাদি
আসন-সমাধি
ত্যজি' করে মহা-যজ্ঞ।
মনের সহিত হৃষীকসকলে,
আহুতি প্রদানে সেবা-যজ্ঞানলে,
শ্রীপদকমলে
সঁপি' প্রাণ-ফুলে
ধামবাসে লভে ভাগ্য।।

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

□□□

শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৩ পৃষ্ঠার পর]

মহাপ্রভু এক সময়ে চন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে ব্রজলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। তখন তিনি নিজে রুক্মিনীর ভূমিকায় প্রথমে লক্ষ্মীর অভিনয় করেন। দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর রমাবেশে নাচিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রভু পুনঃ আদ্যাশক্তিরূপে প্রকটিত হইলেন এবং নিত্যানন্দ বড়াই বুড়ীর অভিনয় করিয়াছিলেন। কৃষ্ণলীলার সহায় হইতেছেন একমাত্র বড়াই বুড়ী। নন্দ মহারাজ, নন্দরাণী, জটিলাদি বর্ষীয়ান্ ও বর্ষীয়সী গোপ-গোপী তাঁহার বাক্যকে বেদবাক্যের ন্যায় সম্মান দিতেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের লীলা করান কায়া আচ্ছাদিয়া। তিনি যুগললীলার সাক্ষাৎ সহায়িকা। এখানে দ্রষ্টব্য যে, নিত্যানন্দ-কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণলীলা উপলব্ধি করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে ডাকিয়া আনিয়া গোপনে অনেক পরামর্শ করিলেন। তিনি নিত্যানন্দকে বলিলেন,—"তুমি এইভাবে নিভৃতে থাকিলে চলিবে না, যেজন্য আসিয়াছ তাহা কর। আমার একমাত্র অভীষ্ট হইতেছে যে,—নাম প্রচার করিয়া জগৎ উদ্ধার করিতে হইবে।" তিনি নিজাভীষ্ট পূরণের জন্য তাঁহাকে গৌড়দেশে শুভবিজয় করিবার নির্দ্দেশ দিলেন। নিত্যানন্দ গৌরহরির আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গৌড়দেশ অভিমুখে রওনা হইলেন। প্রথমে তিনি পাণিহাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় গঙ্গাতীরে রাঘব পণ্ডিতের ভবনে তিনমাস অবস্থান করিয়া ভজনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তারপর খড়দহে গদাধর দাসের গৃহে এবং সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক তথায় সমস্ত বণিকের গৃহে গৃহে কীর্ত্তন প্রচার করিতে লাগিলেন এবং সকলকে কৃষ্ণভজনে দীক্ষিত করিলেন। জগদ্‌গুরুবাদে নিত্যানন্দই গুরুতত্ত্বের আকর। নিত্যানন্দের এই পতিতপাবন-লীলায় এমনকি ভগবদ্বিদ্বেষী যবনগণও তাঁহার অশোক-অভয়-অমৃত-আধারস্বরূপ শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছিল। এইভাবে তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট আসিলেন। তাঁহার অতিমর্ত্ত্য-লীলা সাধারণের বোধগম্য হয় নাই।

সেইসময় মহাপ্রভুর একজন সহপাঠী ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারিলেন না। তিনি মহাপ্রভুকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু নিত্যানন্দের প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা হয়। সেই ব্রাহ্মণ নীলাচলে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার সন্দেহের কথা জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু ব্রাহ্মণের নিকট নিত্যানন্দ স্বরূপ-তত্ত্ব ও তাঁহার অচিন্ত্য চরিত্র কথা বর্ণন করিয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,—

"নিত্যানন্দস্বরূপ—পরম অধিকারী।
অল্পভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি।।

পতিতের ত্রাণ লাগি' তাঁ'র অবতার।
যাঁহা হৈতে সর্ব্বজীব হইবে উদ্ধার।।
যে তাঁহারে প্রীতি করে, সে করে আমারে।
সত্য সত্য সত্য বিপ্র, কহিল তোমারে।।
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে।।"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৬।১১৫, ১১৭, ১২১-১২৩)

"গৃহ্ণীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্।।

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৬।১২৪)

নিত্যানন্দের চরণকমল ব্রহ্মারও বন্দনীয়। সুতরাং নিত্যানন্দ-তত্ত্ব সম্বন্ধে জানিতে হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাই একমাত্র সম্বল। তাঁহাকে শাস্ত্রে পরম যোগীন্দ্ররূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি আদিদেব, সহস্রবদন, নিত্যশুদ্ধ কলেবরে এই ধরণী ধারণ করিয়া আছেন। তিনি সাক্ষাৎ বলরাম। সেই বলরামের পঞ্চরূপ, যথা—মহাসঙ্কর্ষণ, কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও শেষ। নিত্যানন্দ তাঁহাদের সকলের অংশী। মূল সঙ্কর্ষণ।

"সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দ্যাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু।।"

(শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কড়চা)

সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ যাঁহার অংশ ও কলা সেই নিত্যানন্দ রাম আমার শরণস্বরূপ হউন।

মায়াতীত সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই মুখ্য ঐশ্বর্য্যযুক্ত চতুর্ব্যূহ তত্ত্বে তিনি সঙ্কর্ষণাখ্যরূপে বিরাজমান। মহাসঙ্কর্ষণ চিন্ময় বিশুদ্ধ তত্ত্ব—তিনি নিত্যানন্দের অঙ্গ বা প্রকাশ।

"তুরীয়, বিশুদ্ধসত্ত্ব, 'সঙ্কর্ষণ' নাম।
তিঁহো যাঁর অংশ, সেই নিত্যানন্দ-রাম।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।৪৮)

নিত্যানন্দের একটী অংশস্বরূপ মায়াভর্ত্তা-ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয়রূপ কারণাব্ধিশায়ী আদিদেব পুরুষাবতার। তাঁহার নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা-বিধাতার সূতিকাধাম ও লোকসমূহের বিশ্রামস্থান। সেই গর্ভোদশায়ী নিত্যানন্দের অংশের অংশ।

"হেন নারায়ণ,—যাঁর অংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব্ব-অবতংস।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১০৭)

যাঁহার অংশের অংশ, তাঁহার অংশ—ক্ষীরোদশায়ী—অখিল পরমাত্মা ; পালনকর্ত্তা বিষ্ণু। যাঁহার কলা পৃথিবীধারী অনন্ত—সেই নিত্যানন্দ রামকে আমি প্রণাম করি।

"নিত্যানন্দ-স্বরূপ পূর্ব্বে হইয়া লক্ষ্মণ।
লঘুভ্রাতা হইয়া করে রামের সেবন।।
শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪৯, ১৫৬)

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রার্থনায় বলিলেন,—

"নিতাই-পদ-কমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।।"

লোচনদাস ঠাকুর গাহিলেন,—

"এলো গৌর-রসনদী কাদম্বিনী হ'য়ে।
ভাসাইল গৌড়দেশ প্রেমবৃষ্টি দিয়ে।।
নিত্যানন্দ রায় তাহে মারুত সহায়।
যাঁহা নাহি প্রেমবৃষ্টি তাঁহা লয়ে যায়।।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"নিত্যানন্দ প্রভু বিষ্ণুতত্ত্বের মূলবস্তু হইলেও দশদেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণসেবা করেন।"

সুতরাং নিত্যানন্দই নিত্য জগদ্‌গুরু। নিত্যানন্দ প্রভু নিখিল রসের আধার। ভক্তগণের প্রাণধন, নিরন্তর প্রেমোন্মত্ত এবং কৃষ্ণভক্তি কল্পবৃক্ষের মূলস্বরূপ। তিনি সর্ব্বজগতের মঙ্গল বিধানকারী। কলিযুগে পাপহত জীবগণের উদ্ধারের জন্য তাঁহার করুণার অন্ত নাই। তিনি হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচারদ্বারা দুস্তর ভবসমুদ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন এবং এই সংসারসাগর অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইবার উপায় বিধান করিয়াছেন। যিনি ভক্তিরসসমূহ প্রদানকারী, যিনি রসিক ভক্তগণের সর্ব্বস্বধন, যিনি নিখিল রসের আধারভূত, যিনি ত্রিজগতের সারবস্তু—সেই নিত্যানন্দ রামের অভয় পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করাই সর্ব্বজীবের একমাত্র কর্ত্তব্য।

নিতাই চরণ, ভজ ওরে মন,
কিছুই উপায় নাই।
নিতাই নাম লৈলে, দুঃখ যায় চলে,
বলরে মন সদাই।।
ব্রজের বলাই, হলেন নিতাই,
জীবের উদ্ধার তরে।

দ্বারে দ্বারে গিয়া, প্রেম বিলাইল,
আচণ্ডাল গেল তরে।।
পতিত অধম, দীন হীন জন,
নিতাই করুণা বলে।
অনায়াসে সবে, নাম-প্রেম লভে,
হয় নাই কোনকালে।।
নিতাই দয়াময়, হইয়া সদয়,
হরিদাসে কৃপা করি'।
অন্তিম সময়ে, উদয় হইয়ে,
দিও চরণ তরী।।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

দ্বাদশ-বৈষ্ণব

(৭) প্রহ্লাদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৬ পৃষ্ঠার পর]

রাজসেবক ব্রাহ্মণেরা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"হে ইন্দ্রশত্রো! এ সকল কথা ইহাকে কেহ শিখায় নাই। এ ছেলের পেটে পেটে বুদ্ধি। আপনিই এসব শিখিয়াছে।"

তখন দৈত্যপতি পুত্রকে বলিলেন,—"হাঁ রে দুষ্ট, তোর এ দুর্ম্মতি কোথা হইতে হইল? তো'কে এ শিক্ষা তোর গুরু ত' দেন নাই ; তবে কিরূপে পাইলি?"

পিতার প্রশ্নে প্রহ্লাদ বলিতেছেন,—"পিতঃ! যাহারা বিষয়ে বিমুগ্ধ, গৃহে একান্ত বদ্ধ, তাহাদের বুদ্ধি স্বতঃ বা পরতঃ কোনরূপেই কৃষ্ণে আসক্ত হয় না। তাহাদের কৃষ্ণে মতি কোথা হইতে হইবে? তাহারা দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়ের বশে সংসারে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া কেবল চর্ব্বিত চর্ব্বণই করে। বিফল বিষয়-সেবাতেই পুনঃ পুনঃ জীবনপাত করিয়া থাকে। আর যে গুরুর কথা আপনি বলিতেছেন, তাঁহারাও ত' ঐরূপ বিফল বিষয়েই মগ্ন ; এ তত্ত্ব, এ শিক্ষা তাঁহারাই বা কোথায় পাইবেন, যে তাহা অপরকে দিবেন? অন্ধ কি অপর অন্ধকে সুপথ দেখাইয়া গন্তব্যে লইয়া যাইতে পারে? সে আপনার সহিত অপরকেও নষ্ট করে। তেমনই ঐ গুরুপদপ্রাপ্ত পণ্ডিতম্মন্য বিষয়ী ব্যক্তিরাও তদনুগত অভাগ্য শিষ্যদিগকে ভ্রান্ত পথে লইয়া ভয়াল কাল-সাগরেই মগ্ন করে ; আর আপনিও ডুবিয়া মরে। নিষ্কিঞ্চন সাধু-গুরুর পদরজে অভিষিক্ত না হইলে শ্রীহরির অভয়পদে মতি কাহারও হয় না ; কাল ভয়ও যায় না।"

আর সহ্য হইল না ; অসুরপতি অবিলম্বে পুত্রকে কোল হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। ক্রোধে অধীর হইয়া আদেশ করিলেন,—"এই দুরাত্মাকে এখনই সংহার কর।" কিন্তু, হায়, সংহার করিবে কে, কাহাকে? কাল-কাল শ্রীহরির সর্ব্বভয়হর চরণকমলে যে একান্ত শরণ লইয়াছে ; সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিয়া যে সেই চরণসেবাতেই সদা রত রহিয়াছে ; শ্রীহরির অভিন্ন-স্বরূপ হরিনাম যাঁহার জিহ্বায় নিরপরাধে নিয়ত নৃত্য করিতেছেন ; তাঁহার একগাছি কেশমাত্রও উৎপাটন করিতে পারে, এমন শক্তিমান্ শত্রু কে? মহাবল দৈত্যদিগের শত শত শিতধার ভয়াল খড়্গ সেই শিশুর অঙ্গে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, তথাপি তাহাতে কেহ একটী ঈষৎ রেখাপাতও করিতে পারিল না। তারপর, কালকূট, অভিচার আদি আরও কত উদ্‌যোগ আশ্চর্য্যরূপে ব্যর্থ হইল ; কেহই প্রহ্লাদের কিছু করিতে পারিল না। অত্যুচ্চ শৈলশৃঙ্গ হইতে পাতিত হইয়াও তিনি সম্পূর্ণ অক্ষত দেহে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন। তিনি অনলে পুড়িলেন না ; জলে ডুবিলেন না ; অনাহারে শুষ্ক হইলেন না ; ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াও রুদ্ধশ্বাস হইলেন না। তাঁহার অঙ্গের রূপ-লাবণ্য উথলিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি অজয়-অমরবৎ পরমানন্দে কৃষ্ণপ্রেমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

দৈত্যরাজের এবার বড় ভয় হইল। সন্দেহ হইল,—প্রহ্লাদ অমর নাকি? আর তিনি তাঁহার উপর কোন অত্যাচার করিলেন না। ষণ্ডামর্ককে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন,—"আপনারা প্রহ্লাদকে এখন যত্নপূর্ব্বক সংসারী রাজাদের ত্রিবর্গ-সাধন ধর্ম্মশিক্ষা দান করুন।"

আবার সেই ছাইভস্ম শিক্ষা ; আবার সেই অমেধ্য ভোজনের দুর্গন্ধ উদ্‌গার! অঙ্গে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত ; মুখে সুতীব্র কালকূট ; বক্ষে দুর্ব্বহ পাষাণভার ; কৃমিপূর্ণ কারাগারের ঘোর অন্ধকার ;—অহো, তাহাও যে সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ ছিল! কিন্তু এই শৌরিচিন্তা-বিমুখ-জনসঙ্গ আর তাহাদের মুখের অসার বাক্যপূর্ণ অসৎপ্রসঙ্গ যে ঘোরতর হইয়া উঠিল! তথাপি তাহা ভগবদিচ্ছা জানিয়া, ভগবচ্চিন্তায় সকল ভুলিয়া ভক্তকুলমণি প্রহ্লাদ সেই স্থলেই কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন সেই গৃহাসক্ত ব্রাহ্মণেরা গৃহকর্ম্মে স্থানান্তরে গমন করিলে দৈত্যবালকেরা খেলা করিবার উত্তম সময় বুঝিয়া প্রহ্লাদকেও তাহাদের সঙ্গে লইল। প্রহ্লাদ বড় কাহারও সঙ্গে মিশিতেন না, সতত আত্মভাবেই বিভোর হইয়া জড়ের মত থাকিতেন। দৈত্যবালকদের অবস্থা বুঝিয়া আজ তাঁহার দয়া হইল ; তিনি সকলের সহিত মিলিত হইয়া একস্থানে বসিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। বালকেরাও তাঁহার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া অন্যাসক্তি ত্যাগ করিয়া একমনে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল। মধুর বাক্যে মহাত্মা প্রহ্লাদ বলিতে লাগিলেন,—"ভাই সকল! এই মনুষ্য-জন্ম আমাদের কত দুর্ল্লভ ; কত জন্মের পর আমরা এই পরম সুযোগ লাভ করিয়াছি ; আর কত দ্রুত

হইয়া বহিয়া যাইতেছে,—হায়, হায়, এমন সুযোগ যাহাতে সফল হয় তাহা না করিয়া যদি আমরা বিফল কর্ম্মেই ইহা ব্যয় করি, তবে আমাদের কত ক্ষতি বল দেখি? এ ক্ষতি কি আর কিছুতেই পূরণ হইবে? হইবে না। এস ভাই, এমন দুর্ল্লভ জীবন আর হেলায় হারাইও না ; যাহাতে জীবন সার্থক হয়, তাহাই করি। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই মানবজীবনের একমাত্র সাফল্য। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই মানবজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহাতেই জীবনের মূল প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। এই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন মনুষ্যদেহই প্রয়োজনসাধক। এই দেহ কিন্তু অনিত্য ; কখন যে ইহার পতন হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। তাই কাল বিলম্ব না করিয়া কৌমারকাল হইতেই আমাদের কৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই দেব-দৈত্যাদি সকলের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃদ্। কুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সকলে সর্ব্বথা তাঁহার শরণ লও। সর্ব্বদা তাঁহাকেই স্মরণ কর। তাঁহারই প্রীতির জন্য তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। সকল বিদ্যা, সকল কর্ম্ম তাঁহারই সেবায় সার্থক হয়। নতুবা সমস্তই ব্যর্থ। আমি তোমাদিগকে নূতন কথা বা আমার মনোমত কথা কিছুই বলি নাই। শ্রীভগবান্ স্বয়ং এই নির্ম্মল জ্ঞান নারদকে উপদেশ দিয়াছিলেন। আর আমি পরম সৌভাগ্যে সেই সর্ব্ববিৎ নারদের শ্রীমুখ হইতেই ইহা শ্রবণ করিয়াছি।"

তারপর কৌতূহলী বালকগণের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রহ্লাদ কিরূপে নারদের মুখে তত্ত্বোপদেশ লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলিলেন। পরে তাহাদিগকে আরও কত অমূল্য উপদেশ দান করিলেন। বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণে মতি যাহাতে আসক্ত ও দৃঢ় হয়, সেই ধর্ম্ম, সেই কর্ম্মই সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিবে। শ্রীসদ্গুরুসেবা, সাধুসঙ্গ, সাধুশাস্ত্র শ্রবণ ও অধ্যয়ন, শ্রীকৃষ্ণের নাম ও গুণ কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনা, তদীয় পাদপদ্ম ধ্যান, সর্ব্বভূতে তাঁহার অবস্থিতি জ্ঞান, সর্ব্বজীবে সদয় ব্যবহার এবং সমস্ত লব্ধবস্তু কৃষ্ণসেবায় সমর্পণ—এই সমস্তই ভগবদ্ভজনের অঙ্গ। ইহা হইতে কামাদি ইন্দ্রিয় জয় এবং শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি লাভ হয়। তোমরা সকলে আজ হইতেই এই সনাতন সর্ব্বমঙ্গল ভাগবত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর ; ইহা হইতেই তোমরাও আমার মত মঙ্গল লাভ করিবে। কুল, মান, রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিজ্ঞতা, দান, ধ্যান, ব্রত, তপস্যা, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি যদি কৃষ্ণভক্তিহীন হয়, তবে নিশ্চয় জানিও—তাহা কিছুই নহে। কেবল ভক্তিতেই কৃষ্ণকৃপা লাভ হয়।"

প্রহ্লাদের সঙ্গে সমস্ত দৈত্যবালক দুর্ল্লভ তত্ত্বোপদেশ পাইয়া পরমার্থ হরিপাদপদ্মে চিত্তযোগ লাভ করিল। প্রহ্লাদের সঙ্গে সকলেই হরিভক্তিতে আপ্লুত হইয়া "হরি হরি" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বহির্ম্মুখ গৃহব্রত গোদাস অনাচার আচার্য্যব্রুবগণের কোনও কথাই কেহ শুনিল না। তাঁহাদের বড় গৌরবের গুরুত্ব আর তথায় একমুহূর্ত্তও টিকিল না। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র ১৪০৭ ; ১৩ এপ্রিল, ২০০১

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবে

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

(শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, তুরা (মেঘালয়), তাং ১৯।১২।২০০১)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৪ পৃষ্ঠার পর]

হরি, গুরু, বৈষ্ণব—এই তিন তত্ত্বকে বাদ দিয়ে চলতে পারব কি আমরা সংসারে? চলবার কোন উপায় নাই। এঁরাই আমাদের পথের দিশারী। এঁদের উপদেশ-নির্দ্দেশ নিয়েই আমরা অগ্রসর হব। নিজে নিজে চেষ্টা করে কিছু হবে না। আনুগত্য দরকার। তাই বৈষ্ণবধর্ম্ম মানে আনুগত্যের ধর্ম্ম, আনুগত্য ছাড়া কোন কথাই নাই। এখানে গুরুতত্ত্ব যেখানে বলা হচ্ছে, তিনি নিত্যানন্দপ্রভুকে মানেন আগে, কারণ নিত্যানন্দতত্ত্ব হল গুরুতত্ত্ব। নিত্যানন্দ প্রভুর উপদেশে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে জানতে পারা যায়, বুঝতে পারা যায় ও নিত্যানন্দের কৃপায় যে তত্ত্বদর্শনটা আমরা বুঝি, জানি, গুরুতত্ত্বই তাঁরা তা উপদেশ করেন। আবার তাঁরা কোথা থেকে জানেন? তাঁদের উপরওয়ালার থেকে জানেন। পর পর আসে আনুগত্যের কথা। শেষের দিকে যাঁদের কাছ থেকে আমরা তত্ত্বসিদ্ধান্ত শিক্ষা পাই, তাঁরা হলেন সব সখী। তাঁদের আনুগত্যে রাধাঠাকুরাণীর কৃপা পাই আমরা। তারপরে রাধারাণীর কৃপায় আমরা কৃষ্ণসেবা পাই, সাক্ষাৎকার পাই। সব জিনিসগুলো ত' আনুগত্যের ধর্ম্ম। আমরা কাকেও বাদ দিতে পারি না, আমাদের এই Channel—লাইন ধরে যেতে হবে, অগ্রসর হতে হবে। আমি চট্ করে কিছু পেয়ে গেলাম এমন কিছু নয়।

অনেকে বলেন গুরুকরণ করার দরকার কি? শাস্ত্রানুসারে গুরুকরণের প্রয়োজন আছে। সেইকথাই বুঝানো হল শাস্ত্রে, তাঁকে বাদ দিয়ে নয় কিছু। ভগবানকে আমি সোজাসুজি কিছু বলতে পারি না, ডাকলেও ভগবান্ সাড়া দেবেন না আইনতঃ। তিনি চাইবেন যে, এ কারও মারফত আসুক আমার কাছে। সোজাসুজি যাওয়ার উপায় নাই ত'। সেখানে বলছেন,—

(গুরু-) বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয়।।

গুরু-বৈষ্ণবের যদি Certificate থাকে, তাহলে ভগবান্ অতি সহজেই সেটা গ্রহণ করেন, করবেন। যেখানে তত্ত্বদর্শন এসেছে, দেবী প্রশ্ন করেছেন শিবঠাকুরের কাছে,—কার আরাধনা করব? তার উত্তরটা কি এসেছে?—"আরাধানানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম।" তুমি আরাধনা করবে? হাঁ। কৃষ্ণের আরাধনা কর। প্রশ্ন হচ্ছে,—এর থেকে আর বড় কোথায়ও কিছু আছে? বললেন, হাঁ আছে। "তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।" ভগবানের সেবা থেকে ভক্তের সেবা বড়—ভগবান্ নিজে বলছেন এই কথা।

"আমার ভক্তের পূজা আমা হতে বড়।
বেদ-পুরাণেতে ইহা কহিলাম দঢ়।।"

দৃঢ় করে বললাম। তাহলে ভক্ত ছাড়া ভগবান্ নন, আবার ভগবান্ ছাড়াও ভক্ত নন। দুজনকেই চাই পাশাপাশি। তারই ভিতরে গুরুতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব—এই দর্শন বলা আছে।

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।"

সেখানে বলছেন কি? প্রেষ্ঠ সেবক গুরুতত্ত্ব। গুরু—গুরুত্ব, হরি—হরিত্ব। স্বয়ং হরি এবং তাঁর বিশেষ গুণ হরিত্ব। সেখানে তত্ত্ব বিচারে বলছেন,—ইনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী ভগবান্ নহেন। হরিত্ব—অর্থাৎ আশ্রয় বিগ্রহ, যাঁকে আশ্রয় করে আমরা ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে পারি। গুরু-বৈষ্ণব আশ্রয়-বিগ্রহ। আর বিষয়-বিগ্রহ হচ্ছেন নারায়ণ-তত্ত্ব। আমি শুধু গুরু বুঝি, আর কিছু বঝি না, তা হবে না। তার ভগবৎপ্রাপ্তি অনিশ্চিত, হতে পারে না।

'ব্যাসপূজা' মানে ব্যাসগুরু থেকে আরম্ভ করে সমস্ত গুরুবর্গের পূজা। একই সূত্রে বাঁধা তাঁরা। পৃথক্ পৃথক্ কথা নাই। একই কথা নিয়ে, একই বিচার নিয়ে, একই তত্ত্বদর্শন নিয়ে তাঁরা চলেন এ সংসারে। আমি শুধু শাস্ত্র মানব ; গুরুর কথা মানব না, তা হবে না, চলবে না। গুরুর কথা মানতে হবে, বৈষ্ণবের কথা মানতে হবে, ভগবানের কথা মানতে হবে। তিনটে একসঙ্গে মানতেই হবে—এইটাই হল বিচারধারা।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।।

ভগবান্ ব্রহ্মাজীকে উপদেশ করেছেন। ব্রহ্মাজী তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে সেই উপদেশ করেছেন। সেই উপদেশ ক্রমশঃ এই জগতে প্রচারিত হয়েছে। তত্ত্বদর্শনটা এইরকম।

"গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বিশ্বকর্ত্তুর্হি ব্রহ্মণঃ।" গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত যে বাণী তাকে বলে ব্রহ্মবিদ্যা। সেটা গুরুপরম্পরায় আসে, প্রকটিত হয়। যদি এটা না হত, তাহলে আমরা জানতাম কি করে? আমাদের জানবার কোন উপায় নাই। ভগবান্ গীতায় উপদেশ করছেন তাঁর সখা অর্জ্জুনকে। অর্জ্জুনকে ত' উপদেশ করবার কোন দরকার নাই। অর্জ্জুন ত' তাঁর সখা। তাহলে গীতা উপদেশ কাদের জন্য করলেন? এই বোকা, হতভাগা আমরা এখানে কষ্ট পাচ্ছি, তাই আমাদের জন্যই উপদেশ করলেন। অর্জ্জুন হল নিমিত্তমাত্র। সেকথা গীতায় বলা আছে—

"নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" নিমিত্তমাত্র হও। নিমিত্তমাত্রই ত' তুমি। আমাদের জন্য গীতার উপদেশ। অর্জ্জুনের মাধ্যমে সেই শিক্ষা জগতে প্রচারিত হয়েছে বোকা,

হতাভাগা আমাদের জন্য। জিনিসটা বুঝতে হবে আমাদের সেইভাবে। অর্জ্জুনকে উপদেশ দেওয়ার কোন দরকার ছিল না। ভগবান্ এইরূপে এই জগতে প্রকটিত হন। তত্ত্ববস্তু তিনি। তাঁকে লাভ করতে গেলে আনুগত্য ছাড়া আর কিছুই হবে না। সর্ব্বত্রই আনুগত্যের প্রয়োজন। সেই আনুগত্য কিরকম? নিখাদ, খাদ নাই তার ভিতরে। বাস্তবক্ষেত্র, আন্তরদর্শন তাকে বলে। "হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।"

আমরা যে নাম করব, শাস্ত্র বলছেন,—তুমি কি নাম করতে পার? না পার না। তথাপি ত' নাম করতে হবে, শাস্ত্রে উপদেশ আছে। বহুদিন ধরে অনেক 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' করলাম, কিছু ত' হল না। এখন বাদ দেব নাকি? শাস্ত্র বলছেন,—না বাদ দিতে হবে না। আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত তুমি নাম কর, তখন সবটাই ঠিক হবে। প্রথম প্রথম একটু ভুল হতে পারে, দোষ-ত্রুটী হতে পারে। কিন্তু ক্রমশঃ ক্রমশঃ সেই নামপ্রভুর কাছে আকুলতা-ব্যাকুলতা নিয়ে ক্রন্দন করলে সবটাই ঠিক হয়ে যায়। "নামাপরাধযুক্তানি নামান্যেব হরন্ত্যঘম্"—এইকথা বলা আছে শাস্ত্রে। প্রথম প্রথম নাম গ্রহণ করার সময় অপরাধ থাকবে। কিন্তু ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাঁর কাছে—নামপ্রভুর কাছে কান্নাকাটি করলে, প্রার্থনা করলে ক্রমশঃ ক্রমশঃ করলে সেটা সেরে যাবে। শুদ্ধনাম উচ্চারিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের বাস্তব দর্শন নাই, বাস্তব প্রাপ্তি নাই। সুতরাং নাম হচ্ছে না বলে কি ছেড়ে দেব? সে কথা নাই। সাধনের পথটা ধরে রাখতে হবে, নিরুৎসাহিত হতে হবে না। প্রচুর ধৈর্য্য, প্রচুর উৎসাহ দরকার সাধনের পথে। ভজনের কথা নয়। সাধন অতিক্রান্ত হলে তখন ভজনের কথা। সাধন যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে ভজন আরম্ভ হয়েছে। সাধন যতদিন হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত Theoretical, Practical বলা যাবে না। যখন থেকে আরম্ভ হল ভজন, তখন থেকে Practical—বাস্তববোধ। বাস্তববস্তু লাভ হয়েছে যখন তখন তার মধ্যে কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকবে না। বাস্তব সত্যদর্শন নিয়ে যিনি থাকেন সবসময় তিনি কখনও কোন ভুল করবেন না, তার ভিতরে কোন ভুল নাই, কোন সংশয় নাই।

গীতার মধ্যে যে তত্ত্বদর্শন আছে সে কার কার তত্ত্বদর্শন লাভ হয় না? "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"—আমি যদি অজ্ঞ থাকি তাহলে আমার তত্ত্বদর্শন লাভ হবে না। আমি যদি অশ্রদ্ধালু থাকি, তত্ত্ববস্তুর উপর নির্ভরশীল না হই, বিশ্বাস না করি, তাহলে হবে না কিছু। 'সংশয়াত্মা'—ভগবান্ আছেন কি নাই, ভগবান্ আমাদের দয়া করেন কি না, এইরূপ সংশয় থাকলে কিছু হবে না। আর Positive side বিচার করতে গিয়ে কি বললেন? চার রকমের লোক আমাকে লাভ করতে পারে। "আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ"—এই চারজন পারবে। আর উল্টোপাল্টা করছে যারা, তারা কতরকম আছে? তা পাঁচ ছয় রকম আছে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র ১৪০৭ ; ১৩ এপ্রিল, ২০০১

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।।"

এই কয়রকমের লোক এরা ভগবানকে পাবে না। আসুরিক ভাব আছে এদের মধ্যে, কিছু মানে না। গুরু-বৈষ্ণব মানে না, ভগবান্ মানে না। কিছু মানে না যারা, তাদের কি গতি হবে? "ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।" সবথেকে খারাপ গতি কি?—নরক গতি। কৃষ্ণ নিজেই বলছেন গীতার মধ্যে,—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।।
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।।

দৈবীসম্পদ্ আগে ব্যাখ্যা করেছেন, পরে আসুরী সম্পদ্ ব্যাখ্যা করছেন। আসুরী সম্পদ্ প্রথমে আরম্ভ করেছেন যখন তখন কয়রকম?

"অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্।।"

এই কয়রকম। অসংখ্যপ্রকার আছে নাস্তিক লোক, কেবল তাদের ভাবধারার একটু একটু পরিবর্ত্তন। 'মায়াবাদী' একটা শব্দ বলা আছে শাস্ত্রে। সমালোচনার মুখে আছে শব্দটা মায়াবাদী, নির্ব্বিশেষবাদী। হাজারও রকমের মায়াবাদী, হাজারও রকমের নির্ব্বিশেষবাদী, হাজারও রকমের নাস্তিক্যবাদী আছে। আমাদের সেগুলো বুঝতে হবে। ভগবানকে ভালবাসতেই হবে—এই কথাটা সর্ব্বাগ্রে বিচার করতে হবে আমাদের। এছাড়া ত' কোন উপায় নাই আমাদের। সেজন্য "যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।"—এই কথাটী এসেছে। ভগবদ্ভজন হওয়া চাই, কৃষ্ণভজন হওয়া চাই, শুধু সংসারে থেকে খাওয়া-পরা-থাকা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে হবে না। এর মধ্যে কোন বুদ্ধিমত্তা নাই। সেই কথাই শাস্ত্রের বিশেষ উপদেশ। তা আমরা ভুলে যাই কেন এটা। এ সংসারটা ত' মায়ার কারাগার। আবার কোথাও বলা হয়েছে সমুদ্র, মহাসমুদ্র। কি করব এখানে থেকে? কৃষ্ণ নিজে বলছেন অর্জ্জুনকে,—অর্জ্জুন! তুমি এখানে কেন কষ্ট পাও, চল, যেখানে ছিলে সেখানে আমার কাছে চল। এই উপদেশগুলো আমাদের বুঝতে হবে।

কি কথা বললেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে? এখানকার চন্দ্র, সূর্য্য সেখানে আলো দেয় না। তাহলে এখানকার চন্দ্র-সূর্য্য কোথা থেকে আলো পায়?—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।।

সেই পরজগতের যে চন্দ্র-সূর্য্য, তাদের আলোয় এখানকার চন্দ্র-সূর্য্য আলোকিত। একথা বলছেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে। তাহলে তত্ত্বদর্শন বুঝতে হবে আমাদের।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।

যাবে আমার যেখানে দেশ সেইখানে? তোমারও ত' সেইখানে বাড়ী ছিল, সেইখানে দেশ ছিল। তুমি আমারই কেউ। এ বোধ তোমার নাই কেন? চল, ফিরে চল, এখানে কষ্ট পাওয়ার দরকার নাই। সব তত্ত্বদর্শনগুলো ত' এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই পরাৎপরতত্ত্ব যে ভগবান্, পরাৎপর বস্তু যে ভগবান্ তাঁর ভজনের প্রয়োজন আছে। দেবদেবীর ভজনের কথা নাই। আছে লোক ঠকানোর ব্যাপার। শাস্ত্র আবার লোক ঠকান নাকি? না, তা নয়। কিন্তু ঠকে যাবে, তার ভিতরে সেই ভাব না থাকলে। ভগবানকে কি চিটিংবাজ বলা হবে? ভগবান্ কি চিটিংবাজ? তা ত' নয়। তিনি ত' কৃপা করবার জন্য বসে আছেন। তিনি ত' আমাদের ন্যায় হতভাগাদের অবস্থা দেখে কান্নাকাটি করেন। তাহলেও একটা কথা আলোচনার মধ্যে রয়েছে। আলোচনাটা কি?—

"আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব।।"

এটা হল ভগবানের নিষ্কপট করুণা। আর পরীক্ষা যখন করেন আমাদের তখন কি?—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া।।

অল্প কিছু পেলেই ভক্ত সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, দিয়ে দাও ওকে। ভগবান্ নিজে বাঁধা পড়ে যাবেন ভক্তের কাছে—এটা তিনি চান না। কিন্তু যদি কোন ভক্ত তাঁকে বেঁধে ফেলেন, তখন আর করবার কিছু নাই। সবটাই ছেড়ে দিচ্ছেন। ভাগবত বলছেন (১১শ স্কন্ধ)—

ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।
যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ।।

আমাকে ভাগবত ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ করুন। সনাতন ধর্ম্ম কাকে বলে বলুন, নিত্যধর্ম্ম কাকে বলে বলুন, আত্মধর্ম্ম কাকে বলে বলুন। আমি অন্য জিনিস শুনব না। আমি যেটা শুনব সেটা আমার Suggestive question। যে বিষয় আমি শুনব সে বিষয় আমি নির্দ্দিষ্ট করে বলছি। ওইটাই আমি শুনব, অন্য কিছু শুনব না। সুতরাং ভগবদ্দর্শন আলোচনা যেখানে আছে, সেখানে বলছেন,— ভগবান্ ভক্তের কাছে বিক্রীত হয়ে যান। বিক্রীত হয়ে যান? হাঁ।

"কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার।।"

ভগবান্‌ও বিক্রীত হয়ে যান ভক্তের কাছে। একটু একটু ভয়ও তার ত' আছে। আমাকে বেঁধে ফেলবে, আমি কোথাও বাঁধা পড়ি না, ধরা দিতে ভগবানেরও একটু কষ্ট হয়। কিন্তু ভক্তের কাছে ধরা দিতে ভগবানের কষ্ট হয় না। অভক্তের কাছে ধরা দিতে কষ্ট হয়। সে যদি চেষ্টা করে, তাহলে কষ্ট হয়। ভক্তের কাছে ওটা কষ্ট মনে করেন না ভগবান্, তিনি ত' চান ওটা। সমস্ত নিখিল বিশ্বাত্মার কল্যাণ চান তিনি, সেই কল্যাণ নিয়েই তিনি বসে আছেন। কান্নাকাটি শুধু আমরা করি তা নয়, আপনারা জেনে রাখবেন কান্নাকাটি ভগবান্‌ও করেন আমাদের জন্য। এত স্নেহ-মমতা তাঁর।

রাক্ষসী পূতনা শিশু খাইতে নির্দ্দয়া।
ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লঞা।।
তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে।
না ভজে অবোধ জীবে হেন দয়ালুরে।।
ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ. সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য।।

এই ত' তত্ত্বদর্শন। ভগবান্ চট করে কাকেও ধরা দিতে চান না, কিন্তু ভক্ত ত' তাঁকে বেঁধে ফেলেনই। এটাই ভক্তের ভক্তত্ব। আর ভগবানের ভগবত্তা কি?—নিখিল বিশ্বের কল্যাণকারী। আপনারা মনে করবেন না শুধু যাঁরা সাধন-ভজন করেন, তাঁরাই কান্নাকটি করেন, তা নয় ; ভগবান্‌ও কান্নাকাটি করেন ভক্তের জন্য। শাস্ত্রে এইসব কথাগুলো কথাগুলো, বিষয়গুলো পরমসত্য। একটুও কোন অবক্তব্য ব্যাপার নাই এর ভিতরে। যারা এই বিষয়ে অগ্রসর হচ্ছেন, তাদের অসুবিধার কিছু নাই। ভগবান্ তাদের সবসময় সাহায্য করেন। সেই প্রেমময় ভগবান্ যদি আমাদের সাহায্য না করতেন, তাহলে আমরা কিছুই করতে পারতাম না এ সংসারে। আমরাই সব করছি—এ বাহাদুরি আমাদের বৃথা। হবে না ওটা। বাহাদুরিটা সব ভগবানকেই ছেড়ে দিতে হবে—এই কথাই গীতা-ভাগবতে বুঝানো আছে। আমাদের যেন কোন বাহাদুরি না থাকে। আমরা তাঁর বাহাদুরির কিছু অংশ নিয়েই এ সংসারে চলব।

সংসারেই থাকব না, চলে যাব তাঁর কাছে। যে ভুলটা হয়েছে, সেই ভুল আবার সংশোধন করব। সেইজন্যই ত' সাধন-ভজন। ভুলে গেছি আমরা। "কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।" 'অনাদি'-শব্দ কেন শাস্ত্রে প্রয়োগ? শাস্ত্র বলছেন,—প্রাকৃত কালসৃষ্টির পূর্ব্ব থেকেই এ ঘটনা হচ্ছে। সেইজন্যই অনাদি-শব্দ ব্যবহার করা হল। তাহলে কি করব আমরা? ভুল যদি করেছি, তাহলে ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করি। সাধন করি। সাধনের পর ভজন। ভজন যখন আরম্ভ হচ্ছে তখন আর নিজের ইচ্ছায় নয় কিছু, সব ভগবানের কাছে—সমর্পিতাত্মা ভগবানের কাছে। সেই ভক্ত কান্নাকাটি

করছেন, খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই, ভগবানকে গিয়ে খাইয়ে আসতে হচ্ছে। বলুন ত' কি কষ্টকর ব্যাপার! ভগবানকে গিয়ে খাইয়ে আসতে হচ্ছে ভক্তকে। এমন ভক্ত যিনি আছেন তাঁর জন্য ভগবান্ সবসময় চিন্তা-ভাবনা করছেন। সাধারণভাবে একটা কথা, আর বিশেষভাবে একটা কথা। তাঁর জন্য সবসময় চিন্তা-ভাবনা তাঁর আছে। এইরকম স্নেহ-মমতা। এখানে প্রাকৃত জগতের যে লেনদেন, সে লেনদেনের কোন কথা নাই।

প্রহ্লাদ মহারাজ সেই শিক্ষা দিলেন আমাদের। শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হয়েছেন, ভক্তবাক্য সত্যকারী নৃসিংহদেব। কেন না, প্রহ্লাদ যা বলেছে সেটা সত্য করতে হবে আমাকে। তাই নৃসিংহদেবের আবির্ভাব। প্রহ্লাদ কি বলেছেন? পিতা তাকে বলেছে, তোর ভগবান্ যদি সব জায়গায় থাকে, তাহলে এই স্তম্ভের ভিতরে দেখছি না কেন তোর বিষ্ণুকে? প্রহ্লাদ বললেন,—আমি দেখছি এর ভিতরেও তিনি আছেন। তাঁর দর্শনটা বাস্তব দর্শন। আমার ভক্ত মিথ্যা কথা বলে না, সত্যদর্শন বলে—সেটা প্রমাণ করবার জন্য নৃসিংহদেব বেরিয়ে এলেন স্তম্ভ থেকে। দুটো ব্যাপার ওখানে। ভক্তবাক্য সত্যকারী ভগবান্। অসময়ে প্রলয় ঘটে যাচ্ছে। সব ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। সামনে কেউ যেতে পারছে না, নৃসিংহদেবের সামনে কারোর যাওয়ার উপায় নাই। লক্ষ্মীদেবী তিনি দূরে আছেন। দেবতারা বললেন,—মা! আপনি গিয়ে আপনার প্রভুকে ঠাণ্ডা করুন। আমি পারব না বাবা! তখন সবাই পরামর্শ করলেন, যাঁর জন্য এঁর আবির্ভাব, তাঁকে পাঠাও।

বৎস প্রহ্লাদ, তুমি তোমার প্রভুকে ঠাণ্ডা কর। উনি গিয়ে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করলেন। নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে কোলে তুলে নিয়ে তার মস্তক আঘ্রাণ করছেন। প্রহ্লাদ, আমার জন্য তোমার এত কষ্ট। কিন্তু আমি ত' তোমাকে কোন কষ্ট দিই নাই, সব ব্যবস্থা নিয়েছি। পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছে, আমি ধরেছি; সমুদ্র থেকে ফেলে দিয়েছে, আমি ধরে নিয়েছি; তোমাকে বিষ দিয়েছিল, কিন্তু সেটা অমৃত হয়ে গিয়েছিল, তুমি মর নাই, বেঁচে গেছ। সবক্ষেত্রে ত' আমি রক্ষা করেছি তোমাকে। আর কোন কষ্ট করতে হবে না তোমাকে। যা কষ্ট করেছ করেছ। তোমার বংশে তোমার পিতারই মৃত্যু হল শুধু আমার হাতে। এটাতে আমার কিছু দোষ নাই। কেন? নির্ব্বন্ধ ছিল, সেই অনুসারে হয়েছে। আমার হাতে তোমার বংশে আর কেউ মরবে না। প্রহ্লাদ বলছেন,—ঠাকুর, তুমি আমাকে রক্ষা কর, কৃপা কর। নৃসিংহদেব বললেন,—আমি ত' তোমায় কিছু বর দিতে চাই। দর্শন যখন তোমাকে দিলাম, তখন কিছু বর দেব, আশীর্ব্বাদ দেব তোমাকে। কি বর নেবে? আমি কোন বর নেব না। বর নেবেন না তিনি। কি ব্যাপার! কতটা আন্তরিকতা! নৃসিংহদেবকে শুনিয়ে দিচ্ছেন তিনি, ঠাকুর আমাকে কি বেণে (ব্যবসাদার) পেয়েছেন? আমি ওরকম ব্যবসা করি না তোমার সঙ্গে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র ১৪০৭ ; ১৩ এপ্রিল, ২০০১

"আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ।।"

আমি যে প্রভু শিষ্যের সেবার বিনিময়ে, সেবকের সেবার বিনিময়ে কিছু চায়, আমি তাকে প্রভু বলে মানি না। আবার যে শিষ্য, যে সেবক প্রভুর সেবার বিনিময়ে কিছু চায়, আমি তাকে সেবক বলে মানি না। আমার কিছু দরকার নাই। বার বার অস্বীকার করছেন। তখন নৃসিংহদেব বললেন, তাহলে কি করব? আমার যে একটা বরদাতা ভগবান্, বরদ ভগবান্ বলে নাম আছে, সেটা ত' তাহলে চলে যাবে। তুমি কি চাও আমার নামটা চলে যাক্? আমার জন্য তোমার নাম কেন মুছে যাবে? না, তা হতে পারে না। দাও, বর দাও। কি চাও বল? এমন বর দাও, যেন এই জাগতিক বর চাইবার ইচ্ছা মনে না হয়, কোনদিন আমার হৃদয়ে না জাগে।

"যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্।।"

এই জাগতিক বিষয় প্রার্থনা করার কোন বুদ্ধি যেন আমার না থাকে, কখনও যেন না চাই তোমার কাছে ভক্তি ছাড়া কিছু। তথাস্তু। এই বলে 'বরদ' নামটা রাখলেন নৃসিংহদেব। কে বেশী চালাক? ভক্ত চালাক বেশী হয়ে গেল। কার কাছ থেকে এ বুদ্ধি পেয়েছেন? নৃসিংহদেবের কাছ থেকে পেয়েছেন নিশ্চয়ই, তা না হলে কোথা থেকে পাবেন তিনি? বাচ্চা শিশু সে কার কাছ থেকে পাবে? তার উপরওয়ালা অভিভাবকের কাছ থেকে সব পায়—যা সম্পদ্, যা কিছু জ্ঞান, গম্য, বিদ্যা, বুদ্ধি সবকিছু তাঁর কাছ থেকেই ত' পায়। সেইভাবে ত' তিনি পেয়েছেন। এদিক থেকে ত' কিছু শিক্ষা পান নাই। তাঁর মাকে উপদেশ করেছেন নারদঋষি। সেইসব উপদেশ প্রহ্লাদ গর্ভে থেকে শুনেছেন। সেইসব উপদেশ অসুর বালকগণের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতেন পাঠশালায়। সব জিনিসটা ত' ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ ব্যাপার। ভগবান্ যাঁকে কৃপা করেছেন, দয়া করেছেন, তাঁর পক্ষে ত' কিছু অসুবিধা নয়। সেই ভগবান্ কি করতে পারেন?—কাককে গরুড় করতে পারেন।

কাক কারও করেনি সম্পদ্ হরণ।
কোকিল কারো করেনি ধন বিতরণ।।
কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কাণে।
কোকিল অখিলপ্রিয় সুমধুর গানে।।

ভগবান্ কি করছেন? কাককে গরুড় করতে পারেন এবং করেন। এটা তাঁর দয়া। এটা চায় না কখনও ভক্ত, কিন্তু ভগবান্ তাকে দিয়ে দেন। কেন? যেহেতু তিনি বরদ ভগবান্। সব জায়গায় ত' বিচারের কথা একই আছে, সব শাস্ত্রের বেলায় একই ধরণের কথা বলা আছে।

আমরা আজ শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে সবাই মিলিত হয়েছি এক জায়াগায়। হরিকথা আমাদের আলোচনা করতে হবে, ভগবৎকথা শ্রবণ করতে হবে, ভক্তকথা শ্রবণ করতে

হবে, ভক্তি-মহাদেবীর স্মৃতি আমাদের বহন করতে হবে, সাধন-ভজন কি করে করতে হবে, তা আমাদের জানতে হবে, সাধন-ভজন-পথে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এ সবটাই আমাদের Practical হওয়া দরকার। Theoretical থাকলে আমাদের হবে না কিছু। এর জন্য কষ্ট স্বীকার কি? কান্নাকাটি। সাধন-ভজন মানে কান্নাকাটি। এই কান্নাকাটি যদি আপনারা রাখতে পারেন, তাহলে নিশ্চয়ই ভগবান্ আপনাদের কৃপা করবেন, দয়া করবেন। এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় শাস্ত্রানুসারে, গুরুবর্গের বাক্যানুসারে, বৈষ্ণবগণের বাক্যানুসারে।

আপনারা সবাই কৃপা করুন, আমার যাঁরা সতীর্থগণ এখানে হাজির আছেন এবং আমার আর যারা আছেন হাজির, তারা সবাই আমার পরে শুভদৃষ্টিপাত করুন, কৃপা করুন—আমি যেন শ্রীনাম গ্রহণ করতে পারি, গুরুবর্গের বাণী যেন অন্তরে বহন করতে পারি। আপনারা আমাকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করবেন, এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২৯ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্। তিনি কৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্তশ্রেষ্ঠ হ'লেও শিষ্যের নিকট তিনি কৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ—কৃষ্ণের কৃপা-মূর্ত্তি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ তাঁর সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করে বলেছেন,—"মামেকং শরণং ব্রজ।" শরণাগত-বৎসল ভগবান্ তাঁর একান্ত শরণাগত ভক্তকে তাঁর সাধন-ভজন-সম্বন্ধীয় গূঢ় রহস্যসকল ও দীক্ষা তিনি সাক্ষাৎভাবে স্বয়ং প্রদান না করে তাঁর অভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ গুরুরূপে আবির্ভূত হয়ে গুরুশক্তিদ্বারা স্নিগ্ধ শিষ্যকে কৃষ্ণ-সেবা শিক্ষা দান করেন। তাঁর উপদেশ-মন্ত্র ভক্তিসহকারে যথাযথ মান্য করত সাধন-ভজন করলে মায়া-পিশাচী পলায়ন করে ও তখন জীব শুদ্ধভক্তি লাভ করে কৃষ্ণের নিকট গমন করে।

তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৫)

কৃষ্ণ অন্তর্যামী গুরু-রূপেও শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দেন,—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামি-রূপে শিখায় আপনে।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৭)

গুরুসেবা ও কৃষ্ণভজনই জীবের সংসার-বন্ধন হতে উদ্ধার লাভ ও প্রয়োজন-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়।—

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৫)

ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব সমস্ত যোগশাস্ত্র শ্রবণ করে যোগপন্থাকে বহ্বায়াসযুক্ত জেনে শ্রীভগবানের নিকট শুদ্ধভক্তিযোগ-কথা শুন্‌বার উদ্দেশে তাঁকে বলেছেন,—

নৈবোপয়ন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধূন্বন্নাচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।।
(ভাঃ ১১।২৯।৬)

অর্থাৎ—"হে ঈশ, ব্রহ্মার সদৃশ আয়ুলব্ধ কবিসকলও তোমার স্মৃতিজনিত আনন্দদ্বারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে সমর্থ হন না, যেহেতু, তুমি অপার কৃপাবশতঃ দেহধারী জীবের সমস্ত অশুভ নাশ ও স্বগতি প্রকাশ করবার জন্য বাহ্যে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আছ।"

দেবর্ষি শ্রীনারদের বাক্যে জানা যায়,—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত তথা পরমহংস ভাগবতগণের পদরজে যে-পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরায়ণ ব্যক্তিরা অভিষিক্ত না হয়, সেই কাল পর্য্যন্ত সেই গৃহব্রতগণের মতি ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না অর্থাৎ সদ্‌গুরুদেবের বা মহতের পাদপদ্মধূলি মস্তকে গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের প্রতি তাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না, ফলে অনর্থরূপ সংসারও অপগত হয় না।

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু তাঁর 'বৃহদ্ভাগবতামৃত'-গ্রন্থে শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের পরমপ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থে ভগবান্ স্বয়ংই শ্রীগোপকুমারকে ব্রজভূমিতে গমনের আদেশ করে বলেছেন,—

তত্র মৎ পরমপ্রেষ্ঠং লপ্স্যসে স্বগুরুং পুনঃ।
সর্ব্বং তস্যৈব কৃপয়া নিতরাং জ্ঞাস্যসি স্বয়ম্।।

"সেই ব্রজভূমিতে আমার পরমপ্রেষ্ঠ তোমার স্বীয় গুরুকে তুমি পুনরায় প্রাপ্ত হবে এবং সেই গুরুর কৃপায় স্বয়ং সমস্ত বিষয় সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হতে পারবে।"

শ্রুতিতেও কথিত হয়েছে,—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছাঃ ৬।১৪।২) অর্থাৎ "আচার্য্য হতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন।"

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।। (শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)

"যাঁর শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন

শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়ে থাকে।"

স্বতঃপ্রমাণ শিরোমণি বেদ ও তাঁর মুখ্য তাৎপর্য্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, উপনিষদ্ প্রভৃতি সচ্ছাস্ত্রসমূহে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যত্ব ও একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। এই ভারতবর্ষের শেষ সীমায় সরস্বতী নদীর তীরস্থ 'শম্যাপ্রাস'-আশ্রমে অবস্থান করে ভগবান্ বেদব্যাস যে বেদকে ঋকাদি চারিভাগে বিভক্ত করেন এবং বেদার্থবোধক মহাভারত, পুরাণাদি অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন ও পরিশেষে তাঁর সমাধিলব্ধ অবস্থায় সর্ব্বশাস্ত্রের সার মীমাংসাস্বরূপ ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য ও বেদ-বাক্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা নির্ণায়ক মহাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করে গেছেন, তাহা অনুসরণ করলেই প্রকৃত শ্রেয়ঃপথের সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতই প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্মের সন্ধান-প্রদাতা। 'শ্রীমদ্ভাগবত' সম্বন্ধে শাস্ত্রে কথিত হয়েছে,—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ।।
(হঃ ভঃ বিঃ ১০।২৮৩ অঙ্কধৃত গরুড় পুরাণ-বচন)

"এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্যদ্বারা সম্বর্দ্ধিত।"

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ।। (ভাঃ ১২।১৩।১৫)

"সর্ব্ব-বেদান্তের সারকেই শ্রীমদ্ভাগবত বলা হয় ; যিনি ইহার রসামৃতে তৃপ্তিলাভ করেছেন, তাঁর কখনও অন্য শাস্ত্রে আসক্তি থাকে না।"

শ্রীব্যাসদেবের কৃপায় বেদ, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রাদি প্রাপ্ত হয়েছি, সুতরাং তিনিই আদি গুরু। তাঁর বাক্য ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা—এই দোষচতুষ্টয়-বর্জ্জিত। তাঁর বাক্যে দোষ দর্শন বা তাঁকে ভ্রান্ত বললে তাঁর প্রতি অনাদর, তাঁকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা হয়ে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।। (ভাঃ ১১।১৭।২৭)

ভগবান্ উদ্ধবকে বললেন,—হে উদ্ধব! গুরুদেবকে মৎস্বরূপ তথা আমার প্রকাশ-বিগ্রহ বলে জানবে। গুরুদেবকে ঔপাধিক জড়-দেশ-কাল-পাত্রাবচ্ছিন্ন বুদ্ধিদ্বারা মৎসর হয়ে মরণশীল মানব-বুদ্ধি করলে তাঁকে অত্যন্ত অসূয়া, অনাদর বা অবজ্ঞা করা হয়। গুরুদেব—সর্ব্বদেবময়, তাঁকে অসূয়া বা অবজ্ঞা করবে না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৩শ বর্ষ } ৭ ত্রিবিক্রম, সঙ্কর্ষণ, ৫১৫ শ্রীগৌরাব্দ ৩১ বৈশাখ, সোমবার, ১৪০৮, ইং ১৪/৫/২০০১ {৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকৃষ্ণচরণ-পরমগুরু-প্রভুবরাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

প্রপন্ন-জন-নীবৃতি জ্বলতি সংসৃতি-জ্বালয়া
মদীয়-নয়নোদিতাতুল-কৃপাতিবৃষ্টির্দ্রুতম্ ।
বিধূয় দবথুং করোত্যমল-ভক্তি-বাপ্যৌচিতীং
স কৃষ্ণচরণঃ প্রভু প্রদিশতু স্বপাদামৃতম্ ।। ১।।

শরণাগতরূপ জনপদ, সংসার-জ্বালায় জ্বলিত হইলে যাঁহার নেত্রমেঘ অতুল কৃপাবৃষ্টিপূর্ব্বক শীঘ্রই সেই তাপ নির্ব্বাপণ করিয়া অমল-ভক্তিরূপ বারিতে অবগাহন করাইয়া থাকেন, সেই কৃষ্ণচরণ প্রভু স্বপাদামৃত প্রদানে অনুমতি প্রদান করুন।। ১।।

যদাস্য-কমলোদিতা ব্রজ-ভুবো মহিম্নাং ততিঃ
শ্রুতা বত বিসর্জ্জয়েৎ পতি-কলত্র-পুত্রালয়ান্ ।
কলিন্দ-তনয়া-তটী বন-কুটীর-বাসং নয়েৎ
স কৃষ্ণচরণঃ প্রভুঃ প্রদিশতি স্বপাদামৃতম্ ।। ২।।

যাঁহার মুখকমল-বিনির্গত ব্রজবাসীর মহত্ত্বশ্রেণী শ্রুত হইয়া স্বামী, ধন, পুত্র ও গৃহাদি বিসর্জ্জন করাইয়া থাকেন এবং যিনি যমুনার তটদেশে বনকুঞ্জে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়া থাকেন, সেই কৃষ্ণচরণ প্রভু আপন স্বপাদামৃত প্রদানে অনুমতি দান করুন্।। ২।।

ব্রজাম্বুজ-দৃশাং কথং ভবতি ভাব-ভূমা কথং
ভবেদনুগতিঃ কথং কিমিহ সাধনং কোঽধিকৃৎ।
ইতি স্ফুটমবৈতি কো যদুপদেশ-ভাগ্যং বিনা
স কৃষ্ণচরণঃ প্রভুঃ প্রদিশতু স্বপাদামৃতম্।। ৩।।

ব্রজসুন্দরীগণের ভাব-সার্ব্বভৌম কি-প্রকারে সঞ্জাত হইল? কি-প্রকারেই বা তাঁহাদের আনুগত্য লাভ হয়? এ বিষয়ে কি সাধন, কি-প্রকারেই বা সেই অধিকার লাভ করা যায়? এ বিষয়ে কে অধিকারী? এই সব তত্ত্বের সমাধান যাঁহার উপদেশ ব্যতীত কেহ লাভ করিতে পারেন না, সেই কৃষ্ণচরণ প্রভু নিজ-পাদামৃত প্রদানে অনুমতি প্রদান করুন্।। ৩।।

তপস্বি-যতি-কর্ম্মিণাং সদসি তার্কিকানাং তথা
প্রতি-স্বমত-বৈদুষী-প্রকটনোঢ়-গর্ব্ব-শ্রিয়াম্।
বিরাজতি রবির্যথা তমসি যঃ সর্ব-ভক্তোজসা
স কৃষ্ণচরণঃ প্রভুঃ প্রদিশতু স্বপাদামৃতম্।। ৪।।

যিনি তপস্বী, কর্ম্মী ও তার্কিকগণের স্ব-স্ব-মত-রক্ষণার্থ স্ব-স্ব বিদ্যার প্রকাশহেতু অত্যন্ত অভিমানে পরিপূর্ণ সভাতে, স্বভক্তিরূপ তেজঃপুঞ্জ পরিব্যাপ্ত হইয়া অন্ধকারে সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন, সেই কৃষ্ণচরণ প্রভু স্বীয় পাদামৃত প্রদানে অনুমতি প্রদান করুন্।। ৪।।

কিমদ্য পরিধাস্যতে কিমথ ভোজ্যতে রাধয়া
সমং মদন-মোহনো মদন-কোটি নির্ম্মর্জ্জিতঃ।
ইতীষ্ট-বরিবস্যয়া নয়তি যোঽষ্ট-যামান্ সদা
স কৃষ্ণচরণঃ প্রভুঃ প্রদিশতু স্বপাদামৃতম্।। ৫।।

কন্দর্প-কোটী-লাবণ্যাবগাহী শ্রীমদনমোহন শ্রীরাধিকাসহ অদ্য কি পরিধান করিবেন এবং কি বা ভোজন করিবেন? এইরূপ ইষ্টপূজার চিন্তাতেই যিনি অহোরাত্র যাপন করেন, সেই কৃষ্ণচরণ প্রভু তাঁহার পাদামৃত প্রদানে অনুমতি প্রদান করুন্।। ৫।।

মৃদঙ্গ-করতালিকা-মধুর-কীর্ত্তনে নর্ত্তয়ন্
জনান্ সুকৃতিনো নটন্ স্বয়মপি প্রমোদাম্বুধৌ।
নিমজ্জতি দৃগম্বুধিঃ পুলক-সঙ্কুলঃ স্নাতি যঃ
স কৃষ্ণচরণঃ প্রভুঃ প্রদিশতু স্বপাদামৃতম্।। ৬।।

মৃদঙ্গ-করতাল-যোগে সুমধুর হরিকীর্ত্তনে যিনি ভাগ্যবান্ লোকসকলকে নৃত্য করাইয়া থাকেন এবং স্বয়ংও নৃত্য করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়েন এবং যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলক পরিব্যাপ্ত হয়, তৎকালে নয়নে এতই অশ্রু অবিরল ধারায় প্রবাহিত হয়, যেন তিনি সম্পূর্ণরূপে স্নানই করিতেছেন—এইরূপ লক্ষিত হয়েন, সেই কৃষ্ণচরণ প্রভু স্বপাদামৃত প্রদানে অনুমতি প্রদান করুন্।। ৭।।

সমং ভগবতো জনৈঃ প্রবর-ভক্তি-শাস্ত্রোদিতং
রসং সু-রসয়ন্ মুহুঃ পরিজনাংশ্চ যঃ স্বাদয়ন্।
স্বশিষ্য-শত-বেষ্টিতো জয়তি চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়া
স কৃষ্ণচরণঃ প্রভুঃ প্রদিশতু স্বপাদামৃতম্।। ৭।।

যিনি ভাগবত-জনের সহিত অত্যুত্তম ভক্তিশাস্ত্র-বর্ণিত রস সম্যগ্রূপে চিত্রিত করেন এবং বারম্বার সেই রস-লহরী শিষ্যগণকে আস্বাদন করান, যিনি চক্রবর্ত্তী উপাধি ধারণ করিয়া শত শত শিষ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া জয়যুক্ত হয়েন, সেই কৃষ্ণচরণ প্রভু আপন পাদামৃত প্রদানে অনুমতি দান করন ।। ৭।।

স্থিতিঃ সুর-সরিত্তটে মদন-মোহনো জীবনং
স্পৃহা রসিক-সঙ্গমে চতুরিমা জনোদ্ধারণে।
ঘৃণা বিষয়িষু ক্ষমা ঝটিতি যস্য চানুব্রজে
স কৃষ্ণচরণঃ প্রভুঃ প্রদিশতি স্বপাদামৃতম্।। ৮।।

যিনি গঙ্গাতীরে বাস করেন, মদনমোহনদেবই যাঁহার জীবন, রসিক ভক্তসঙ্গমে যাঁহার প্রবল লালসা, পতিত-তারণে যিনি বড়ই চতুর, বিষয়িগণে অবজ্ঞা এবং অনুগত ব্যক্তি দোষ করিলে যিনি তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করেন, সেই কৃষ্ণচরণ প্রভু নিজ পাদামৃত প্রদানে অনুমতি প্রদান করুন্।। ৮।।

ইদং প্রভুবরাষ্টকং পঠতি যস্তদীয়ো জন-
স্তদঙ্ঘ্রি-কমলেষ্টধীঃ স খলু রঙ্গবৎ-প্রেমভাক্।
বিলাস-ভৃত-মঞ্জুলাল্যতি-কৃপৈক-পাত্রী-ভবন্
নিকুঞ্জ-নিলয়াধিপাবচিরমেব তৌ সেবতে।। ৯।।

অনুগত হইয়া তচ্চরণ-পদ্মে বুদ্ধি সন্নিবেশপূর্ব্বক যিনি এই প্রভুবরাষ্টক পাঠ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই নিকুঞ্জ-বিলাসী রাধাকৃষ্ণের প্রেমের পরম পাত্র হয়েন এবং বিলাসপূর্ণ মনোজ্ঞ সখীবর্গের অপরিমেয় কৃপাপাত্র হইয়া সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।। ৯।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৪৭ পৃষ্ঠার পর]

১৯। শুদ্ধপ্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ কি?

"আকর্ষ (Magnet) উপযুক্তস্থলে আসিলে লৌহ যেমত তাহার প্রতি স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ প্রবৃত্ত হয়, অণুচৈতন্য জীবও সেইরূপ পরমচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের প্রতি সান্মুখ্য অবস্থায় যে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি দেখান, তাহাই শুদ্ধপ্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ।

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

২০। কৃষ্ণপ্রীতি ও জড়-প্রীতির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য কি?

"বিষয়প্রীতি ও কৃষ্ণপ্রীতির ভেদ এই যে, সেই একই প্রবৃত্তি যখন জড় হইতে শুদ্ধভাবে কৃষ্ণোন্মুখী হয়, তখনই কৃষ্ণপ্রীতি। যখন কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া বিষয়াভিমুখী থাকে, তখনই তাহার নাম—জড়-প্রীতি বা বিষয়াসক্তি।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

২১। প্রপঞ্চগত জীবের কি সম্ভোগরস আস্বাদনীয় নহে?

"মহাপ্রভুবাক্যেন প্রপঞ্চান্তর্ব্বর্ত্তি-জীবানাং পূর্ব্বরাগাদিময়ো বিপ্রলম্ভ এব আস্বাদনীয়ঃ।"

—সঃ ভাঃ ৭

২২। ভক্তিরসাস্বাদক প্রেমিকগণ কৃষ্ণনামসেবাসুখাপেক্ষা অন্য কোনও বস্তুর আদর করেন কি?

শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদানাম্—

"যোগ-শ্রুত্যুপপত্তি-নির্জ্জনবন-ধ্যানাধ্বসংভাবিতাঃ
স্বারাজ্যং প্রতিপদ্য নির্ভয়ময়ী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ।
অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহর-প্রোন্মীলদিন্দীবর-
শ্রেণী-শ্যামল-ধামনাম জুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি।।

ভাষ্যম্। ভক্তিরাসাস্বাদকানাং মোক্ষসুখাদপি শ্রীভগবন্নাম-সেবন-সুখাধিক্যং দর্শয়ন্ শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী-প্রিয়শিষ্য-শ্রীমদীশ্বরপুরীমহোদয়েন সিদ্ধান্তিতং পরমরহস্যং যোগ-শ্রুত্যুপপত্তি ইত্যাদিনাহ। যোগ আসন-প্রাণায়ামাদ্যষ্টাঙ্গঃ। শ্রুত্যুপপত্তিঃ ঔপনিষদং ব্রহ্মজ্ঞানম্। নির্জ্জনবন বানপ্রস্থসাধনম্। ধ্যানম্—অরূপস্য ব্রহ্মণঃ কল্পিতরূপচিন্তনম্।

অধ্ব—তীর্থাটনম্। এতৈঃ সম্ভাবিতং স্বস্বরূপানুভবং তত্ত্বসাযুজ্যং বা। তত্ত ভয়শূন্যম্। তৎ প্রতিপদ্য প্রাপ্য দ্বিজা বর্ণাশ্রমাভিমানিনঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাঃ মুক্তা ভবন্ত। কিন্তু বর্ণাশ্রমাভিমানরহিতানাং শ্রীকৃষ্ণনামসেবকানাম্ অস্মাকং লক্ষাবধি জন্মাস্তু।।"

—'ভাবাবলী'

২৩। দ্বিবিধ চিন্ময় অবস্থা কি কি? স্বরূপতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতি ও বস্তুতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতিতে বৈশিষ্ট্য কি?

"চিন্ময়ধামরূপ বৃন্দাবনে প্রকৃতির অতীত অভিনব মদনস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান। 'শ্রীমদন'-শব্দে সামান্যতঃ জড় কবিসকল যাহাকে অর্থ করেন, তাহা প্রাকৃত-জগতে মাংসপিণ্ডের পরস্পর আকর্ষীক, নিতান্ত প্রাকৃত ও হেয় কামতত্ত্ব। জীবসকল জড়ে বদ্ধ হইয়া দেহে আত্মাভিমান করত সেই কামের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। কৃষ্ণসম্বন্ধতত্ত্ব জানিতে পারিলে জীবের অপ্রাকৃত চিন্ময় অবস্থায় অবস্থিতি হয়। সেই অবস্থা দুই প্রকার—স্বরূপগত ও বস্তুগত। তত্ত্ব-প্রতীতি হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ এখনও জড়সম্বন্ধ বিগত হয় নাই—এমত অবস্থায় চিন্ময়-তত্ত্ব কথঞ্চিদুদয় হইলে স্বরূপতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতি হয় ; **কিন্তু বস্তুতঃ হয় না**। স্থূল ও লিঙ্গময় জড়তত্ত্বের সহিত কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে সম্বন্ধ-গন্ধ-রহিত হইলে বস্তুতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতি হয়। স্বরূপ-অবস্থিতিতে সাধনা আছে। সেইসময় চিন্ময় কামগায়ত্রী ও চিন্ময় কামবীজে কৃষ্ণের উপাসনা হইতে থাকে । পুরুষ বা স্ত্রী, স্থাবর বা জঙ্গম—সকলকেই সেই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক মন্মথমন্মথরূপ কৃষ্ণ আকর্ষণ করিয়া থাকেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, মঃ ৮।১৩৭-১৩৮

২৪। সর্ব্বসাধ্যসার কি? শুদ্ধভক্তির প্রথমাবস্থা কি?

"প্রেমভক্তিই সর্ব্বসাধ্যসার। শুদ্ধভক্তি প্রথমাবস্থায় শান্তভক্তিরূপে প্রতীত ; তাহাতে কৃষ্ণের প্রতি মমতা-বুদ্ধি থাকে না।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, মঃ ৮।৬৮

২৫। অহৈতুক কৃষ্ণপ্রেমানন্দ সর্ব্বসুখ-শিরোমণি কেন?

"সুখ-লাগি' সর্ব্বজীব নানা যুক্তি করে।
তর্ক করে, যোগ করে সংসার ভিতরে।।
সুখ-লাগি' সংসার ছাড়িয়া বনে যায়।
সুখ-লাগি' যুদ্ধ করে রাজায় রাজায়।।
সুখ-লাগি' কামিনী-কনক পাছে ধায়।
সুখ-লাগি' শিল্প আর বিজ্ঞান চালায়।।
সুখ-লাগি' সুখ ছাড়ে ক্লেশ শিক্ষা করে।
সুখ-লাগি অর্ণব-মধ্যেতে ডুবে মরে।।

নিত্যানন্দ বলে ডাকি' দুহাত তুলিয়া।
এস জীব কর্ম্ম-জ্ঞান-সঙ্কট ছাড়িয়া।।
সুখ-লাগি' চেষ্টা তব আমি তাহা দিব।
তার বিনময়ে আমি কিছু না লইব।।
কষ্ট নাই, ব্যয় নাই, না পাবে যাতনা।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলি নাচ নাহিক ভাবনা।।
যে সুখ আমি ত' দিব তার নাই সম।
সর্ব্বদা বিমলানন্দ নাহি তার ভ্রম।।"

—নঃ ধাঃ ১ম অঃ

২৬। শুদ্ধ আত্মার প্রণয়ভাব বা মহাভাবাদি কি জড়গত অবিদ্যার বিকার?

"জীবস্য নিত্যসিদ্ধস্য সর্ব্বমেতদনাময়ম্।
বিকারাশ্চিদ্‌গতাঃ শশ্বৎ কদাপি নো জড়ান্বিতাঃ।।
বৈকুণ্ঠে শুদ্ধচিদ্ধাম্নি বিলাসা নির্ব্বিকারকাঃ।
আনন্দাব্ধিতরঙ্গাস্তে সদা দোষবিবর্জ্জিতাঃ।।

কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যভাব ব্যতীত অপ্রাকৃতাবস্থায় প্রণয়ভাব, মহাভাব প্রভৃতি যে-সকল অবস্থার বিচার করা যায়, তাহা কেবল মায়িক চিন্তাকে অপ্রাকৃত চিন্তা বলিয়া স্থির করা মাত্র। এই অশুদ্ধ মত-সম্বন্ধে কথিত হইল যে, নিত্যসিদ্ধ জীবের প্রণয়-বিকারসকল জড়গত-অবিদ্যার বিকার নয়, কিন্তু চিদ্‌গত বিলাস বলিয়া জানিতে হইবে। শুদ্ধ চিদ্ধামরূপ বৈকুণ্ঠে যে-সকল বিলাস আছে, সে-সমুদায়ই সর্ব্বদোষ-রহিত আনন্দ-সমুদ্রের তরঙ্গ-বিশেষ ; তাহাদিগের প্রতি 'বিকার'-শব্দ প্রযুক্ত হয় না।"

—কৃঃ সং ১।১১-১২

২৭। প্রেম-মন্দির কোথায় অবস্থিত?

"কৃষ্ণপ্রেমের মন্দির—শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের উচ্চ চূড়ায় স্থাপিত। তথায় উঠিতে হইলে প্রাকৃত কর্ম্মকাণ্ডীয় চৌদ্দলোকময় জগদ্রূপ সোপান অতিক্রম করত বিরজা-ব্রহ্মলোকরূপ জ্ঞানকাণ্ডীয় সোপান ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে উঠিতে হয়। কর্ম্ম-জ্ঞানের সোপানাবলীর নিষ্ঠা ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে করিতে ভক্তির অধিকার লাভ হয়। ভক্তি-সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া প্রেম-মন্দিরের দ্বার দর্শন করিতে হয়।"

—'নিয়মাগ্রহ', সঃ তোঃ ১০।১০

২৮। প্রেমারুরুক্ষুগণকে শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপে নিজগণে আহ্বান করিয়াছেন?

"হে প্রেমারুরুক্ষু সাধক-ভক্তগণ! আপনারা বৈধভক্তির দ্বারা লব্ধ ভাবমার্গে এই জগতের স্থূল চতুর্দ্দশ স্তরকে অতিক্রম করিয়াছেন। এই চতুর্দ্দশ স্তরের ঊর্দ্ধভাগে

লিঙ্গ-জগতের হরধামরূপ চতুঃসংখ্যক স্তরকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হউন। বিরজারূপ বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় দুইটী স্তর ভেদ করুন, তবে গোলোক-বৃন্দাবনের সীমা লাভ করিবেন। ঐ দুই স্তরই ব্রহ্মধাম ও বৈকুণ্ঠ। গোলোকে আত্মভাবময় পঞ্চস্তর দেদীপ্যমান—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর স্তরে গিয়া শ্রীগোপীদেহরূপ নিজের নিত্যসিদ্ধ চিন্ময়-দেহ অবলম্বন করত শ্রীমতী রাধিকার যূথে শ্রীমতী ললিতার গণে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীরূপ মঞ্জরীর কৃপায় নিজ-হৃদয়ে শুদ্ধ চিন্ময় বিভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা স্বীয় স্থায়িভাবকে রসাবস্থায় উন্নত করুন। নামাকৃষ্ট রসজ্ঞ হইলে অনায়াসে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমধন অর্জ্জন করত কৃতকৃতার্থ হইবেন। স্বীয় বর্ত্তমান অধিকার-বিচার ও জড়দেহে যুক্তবৈরাগ্য এবং নিরন্তর নামরসপানে সর্ব্বোত্তম অধিকার লাভ করুন।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৭

২৯। 'প্রেমারুরুক্ষু' ও 'প্রেমারূঢ়ে'র তারতম্য কি?

"প্রেমই জীবের প্রয়োজনতত্ত্ব। ভাবজীবন পুষ্ট হইয়া প্রেমজীবন হয়। জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে ক্রমে প্রেম-মন্দির প্রাপ্ত হন। অতএব প্রেমাধিকারে দুইটী অবস্থা অর্থাৎ প্রেমারুরুক্ষু-অবস্থা এবং প্রেমারূঢ়-অবস্থা। প্রেমারূঢ় হইলে আর তাহা হইতে উচ্চাবস্থা নাই। সেখানে অখণ্ড-কৃষ্ণরসই এক অদ্বয়-তত্ত্ব। ** আরুরুক্ষু-অবস্থায় প্রেমভক্তগণ একান্ত কৃষ্ণভক্ত। একান্ত শরণাগতিই তাঁহাদের সাধারণ লক্ষণ।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৩

৩০। 'প্রেমারূঢ়' কাহারা?

"সারগ্রাহিগণ প্রেমতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অতি শীঘ্র বাঞ্ছনীয় স্থল প্রাপ্ত হন। তাঁহারাই প্রেমারুরুক্ষু। তাঁহারাই অতি শীঘ্র প্রেমারূঢ় বা সহজ পরমহংস হন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৩১। শুদ্ধ চেতন ব্যতীত প্রীতিধর্ম্ম অন্যত্র আছে কি? জড়জগতে কি প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই? জড়ে আকর্ষণ ও গতি কোথা হইতে আসিল?

"বিভুচৈতন্য ও অণুচৈতন্য—উভয়েই প্রীতিধর্ম্মবিশিষ্ট। আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই বিশুদ্ধ প্রীতিধর্ম্ম নাই। আত্মার ছায়া যে মায়া-প্রসূত জড়, তাহাতে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃতি-মাত্র আছে, ধর্ম্ম স্বয়ং তথায় নাই। এই কারণেই জড়জগতে কোন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই, প্রীতির বিকৃত স্বরূপ আকর্ষণ ও গতিমাত্র তাহাতে আছে। সেই বিকৃত ধর্ম্মানুসারে পরমাণু-সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া স্থূল হয়; আবার স্থূল বস্তু-সকল পরস্পর আকর্ষণদ্বারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে।

—'প্রীতি', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৯

৩২। প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত কি?

"প্রেমবিলাস-তত্ত্বে দুই প্রকার ভাব আছে—অর্থাৎ সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের স্ফূর্ত্তি হয় না। বিচ্ছেদের নাম—বিপ্রলম্ভ, তাহাই প্রেমবিলাসের বিবর্ত্ত অর্থাৎ বিচ্ছেদকালে অধিরূঢ়ভাববশতঃ সম্ভোগ-অভাবেও সম্ভোগস্ফূর্ত্তি। রায় রামানন্দ নিজ-কৃত ঐ রসের একটী সঙ্গীত গান করিতে করিতে মহাপ্রভু স্বীয় ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন। গীতটি বিচ্ছেদকালে শ্রীমতীর উক্তি, সুতরাং বিপ্রলম্ভ-দশায় সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তি।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, মঃ ৮।১৯১-১৯৩

৩৩। বিপ্রলম্ভে সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তি কিরূপ?

"প্রেমবিলাস-সম্ভোগেও যেরূপ আনন্দ, বিপ্রলম্ভেও সেইরূপ। বিশেষতঃ বিপ্রলম্ভে অধিরূঢ়-মহাভাবরূপ সর্পে রজ্জুভ্রমের ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্ণভ্রমজনিত বিবর্ত্তভাবাপন্ন একরূপ সম্ভোগের উদয় হয়।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, মঃ ৮।১৯৪

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫০ পৃষ্ঠার পর]

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।"
"ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধসমান।।
তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।।"

শ্রুতিশাস্ত্র বলেন,—

"অগ্নের্যথা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি।"

প্রজ্বলিত অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গকণা, ইহাদের ক্রিয়াগত ভেদ আছে। একটী বৃহৎ, অপরটী অল্প। আলোকের বৃহত্ত্ব ও অল্পতা। জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণ শক্তিমান্। একটী সর্ব্বশক্তিমান্, অপরটী অংশ। অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি। বস্তুটী শক্তিমান্, বস্তুর শক্তি জীবতত্ত্ব। জীব কদাপি ব্রহ্মবস্তু নহে। বৃহত্ত্বা ব্রহ্মত্ব। মহাভারতের অন্তর্গত গীতা—শ্রীকৃষ্ণের গান, অর্জ্জুন তাহার শ্রোতা। তা'তে ব'লেছেন,—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।"

জীবশক্তি ভগবানের তটস্থাশক্তি, ইহাকে পরাপ্রকৃতি বলা হ'য়েছে। বিষ্ণুপুরাণ সাত্বত-পুরাণগুলির মধ্যে প্রধান। তা'তে আছে,—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।।"

পাঁচপ্রকার বস্তু জড়জগতে অপরা-প্রকৃতিজাত। তাহা স্থূলভাবে পরিচিত এ ভোগ্যজাতীয়। ক্ষিতি—কাঠিন্য, অপ্—তরলতা, তেজ—সূক্ষ্মতা, মরুৎ—বায়ব পদার্থ, ব্যোম—অবকাশ ও গতি। এইগুলি অপরার ভোগ্য অংশ। ভোক্তৃত্বাংশে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও মহান্ এই পাঁচটী। ইহা ছাড়া আর একটী পরা প্রকৃতি আছে। স্বভাব দুই প্রকার। একপ্রকার বৈষম্যযুক্ত, অপরপ্রকারে তাহা নাই। জীবের নিত্যমঙ্গলের বিচার আসিলে পরাপ্রকৃতির আলোচনা আসিবে। জীব জড়জগতের ভোগবাসনায় বদ্ধভাবাপন্ন হন, পৃথিবীস্থ ক্ষিত্যপ্তেজাদিবস্তুর ভোক্তৃধর্ম্মে অবস্থিত হন। চিচ্ছক্তিপরিণত বৈকুণ্ঠ গোলোক প্রভৃতিতে সেবকসূত্রে এইসকল পদার্থের সহিত সম্বন্ধ। আমরা ভোক্তা, জগৎ ভোগ্য, ইহা বদ্ধজীবের বিচার। বৈকুণ্ঠে বিষয় একটী, আশ্রয় বহু। দ্বাদশ-রসের একমাত্র রসিক কৃষ্ণে পূর্ণভোগ্যতা গোলোকে বর্ত্তমান। বদ্ধজীবের বিচারে জাগতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হওয়ায় কৃষ্ণকে আড়াইপ্রকার রসের বিষয় মনে করা হয়। কিন্তু কৃষ্ণের পাদপদ্মে ৫টী মুখ্য ও ৭টী গৌণরস আসিয়া একত্র সেবা করে। বৈকুণ্ঠে আড়াই প্রকার রস। মর্য্যাদাবিচারে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুবস্তু আলোচনা হ'য়ে থাকে। আমাদের চেতনময় শরীরে পূর্ণচেতনকে গ্রহণ কর্‌বার যোগ্যতা আছে। জীব অমুক্ত অবস্থায় ভোগবাসনাযুক্ত। জড়জগৎ ভোগ বা ত্যাগ কর্‌বার ইচ্ছা হ'লে অচিৎকে চিৎস্থানে স্থাপন ক'রে মেটে জিনিষকে ভোগ কর্‌তে চায়। বিবেচক ভগবৎস্মৃতিযুক্ত ব্যক্তির কদাপি ঐ দুর্ব্বুদ্ধি আসে না। তাঁ'দের বুদ্ধি হয় আমি সেবক, আমার প্রভুর দ্রব্য গ্রহণ কর্‌বার অধিকার কোথায়?' কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী হ'লে অন্যের উপর প্রভুত্ব কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা হয়।

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশাস্তেষাং
জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে।।"

কামাদি ষড়্‌বর্গের ত' কতপ্রকারে গোলামি ক'রলাম, তারা ত' কতজন্ম ধ'রে

খাটিয়ে নিলে, অদৌ ত' দয়া কর্‌লে না। মাপার ধর্ম্মে অবস্থিত হ'য়ে অন্যের দাস্য কর্‌তে গিয়ে আমি এই সর্ব্বনাশে প'ড়েছি। তোমার সেবা বিস্মৃত হ'য়ে কাঙ্গাল হ'য়ে প'ড়েছি। আমার ত' কৈ লজ্জা হ'ল না! ওদের গোলামি থেকে অবসর নেওয়ার ইচ্ছা ত' হয়নি। এখন আমি সুবুদ্ধি আশ্রয় ক'রে তোমারই অভয় পাদপদ্মে শরণ নিচ্ছি। আমাকে দাস্যে নিযুক্ত ক'রে এবার রক্ষা কর। ঐ মানবগুলি আমাকে কৃষ্ণের নাম-রূপাদি বুঝ্‌তে দিলে না। রূপরসগন্ধাদি আমাকে চাকর কর্‌তে ব্যস্ত হ'ল। যতদিন জড় উপাধিতে সংশ্লিষ্ট আছি, ততদিন ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচেষ্টা নানাদিকে প্রধাবিত ক'রেছে। এখন বুঝ্‌তে পে'রে তোমারই কাছে ফিরে এলাম, তুমি রক্ষা কর।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তখন আমাদিগকে জানালেন,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।"
"হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।"

হে শরণাগত জীব, তোমাদের জড় ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীনামের গ্রহণ হ'বে না। সেবোন্মুখ হ'লে নামপ্রভু কৃপা ক'রে আপনা হ'তে তোমার চিদিন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হবেন। কলিতে হরিনামই একমাত্র সেব্য। তাঁহারই সেবায় স্বরূপজ্ঞানের উদয়ে সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা। যতদিন জড়-উপাধিতে সংশ্লিষ্ট আছি, ততদিন ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচেষ্টা আমাদিগকে নানাদিকে প্রধাবিত ক'রবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নিঃশক্তিক ব্রহ্মবাদীদিগকে ব'ললেন,—বহির্জগতের শক্তি-পরিণত ব্যাপার ত্যাগ ক'রে চিচ্ছক্তি-পরিণতিতে ধাবিত হও।

"মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি।।"

নির্ব্বিশেষবাদ অচিৎপ্রতীতি-জাত।

"'অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম।। (ক্রমশঃ)

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫২ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীবলদেব রূপানুগ বৈষ্ণব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য বলদেবের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা বলা বাহুল্য। বলদেবের আচার-বিচার ও ভজন-পদ্ধতি সর্ব্বতোভাবেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি অঙ্গীকার করিয়াছেন। যেহেতু বলদেব রূপানুগ বৈষ্ণব। তাঁহার রূপানুগত্ব তাঁহার বিবিধ গ্রন্থ হইতে প্রচারিত আছে। যাঁহারা শ্রীবলদেবকে

রূপানুগ বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত, তাঁহারা প্রকৃতই ভ্রান্ত ও বৈষ্ণব-অপরাধী। এমন কি তাঁহারা সম্প্রদায়-অনুগত গুরুপরম্পরায় গুর্ব্বানুগত্য ত্যাগ করিয়া শ্রীবলদেবের নাম উল্লেখ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। এরূপ অসৎ সম্প্রদায়কে—'কর্ত্তাভজা', 'কিশোরী-ভজা' বা 'ভজন-খাজা' সম্প্রদায় বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

শ্রীবলদেবের আবির্ভাব-কাল

শ্রীল বলদেবের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে সুস্থির সিদ্ধান্তে আমরা এখনও উপনীত হইতে পারি নাই। তবে শ্রীল রূপ গোস্বামীর সঙ্কলিত স্তবাবলীর টীকা প্রণয়নের কাল নিরূপণ করিতে গিয়া তিনি স্বয়ং ১৬৮৬ শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয় বর্ত্তমান সময়ের কিঞ্চিদূর্দ্ধ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভৌমজগতে প্রকট ছিলেন। সেই সময়ে শ্রীশ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বর্ত্তমান ছিলেন। আচার্য্য বলদেব তাঁহাকে তাঁহার শিক্ষাগুরু-রূপে বরণ করিয়াছিলেন। বলদেবের পাঞ্চরাত্রিক গুরু-পরম্পরা প্রদর্শনকালে আমরা এই সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিব।

শ্রীবলদেবের জাতি ও জন্মভূমি

শ্রীবলদেব গৌড়দেশ অর্থাৎ বাঙ্গলাদেশের উপকণ্ঠে উৎকল দেশে বালেশ্বর জেলার উপরিভাগের অন্তর্গত রেমুণার নিকটবর্ত্তী একটী পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উৎকল দেশে জন্মগ্রহণ করিলেও বলদেব কোনদিনই কোনপ্রকার প্রাদেশিকতার কালিমার প্রশ্রয় দেন নাই। শৌক্র-বৈশ্যকুলে উদ্ভূত বলিয়া তাঁহাকে কেহ বৈশ্য বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি কৃষিজীবি খণ্ডাইৎ জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ-কুল-তিলক বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং বহু শৌক্র-ব্রাহ্মণ তাঁহার পদাবলেহন করিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে কেহই ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভব বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন নাই। তিনি তাঁহার নিজের জীবনের দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।।
কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়।।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীগীতাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ।" অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মানুসারে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র চারিটী বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলদেব নিজে আচরণ করিয়া এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, এমন কি, তাঁহার বর্ণের মধ্যে অনেকেই আজও উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীবলদেব দৈববর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠার অন্যতম আদর্শ

শ্রীল প্রভুপাদ এ সম্বন্ধে আমাদিগকে যাহা জানাইয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—"যে-সকল মতিচ্ছন্ন শৌক্রকুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণব্রুব 'যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।।'—এই স্মৃতি-বাক্য গোপন করিয়া আপনাদিগকে 'ব্রাহ্মণব্রুব'-সংজ্ঞায় প্রচলিত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণ-ব্রুবেতর কুলে বৈষ্ণবাচার্য্যের জন্মগ্রহণ, বিদ্যাভূষণাদি সংজ্ঞা-গ্রহণ বা শ্রুত্যাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন সম্ভব নহে। তাঁহাদের ঐতিহ্যজ্ঞানের দরিদ্রতা নিতান্ত শোচনীয়া। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই এই কল্পিত যুক্তির বিভঞ্জনকারী। বৃত্ত-ব্রাহ্মণ হইতেই শৌক্র ব্রাহ্মণকুল উদ্ভূত হইয়া মন্বাদি-প্রচলিত স্মার্ত্তধর্ম্ম গ্রহণ করেন। গীতাশাস্ত্র এইসকল মতবাদের বিরোধী বৃত্ত-বর্ণেরই পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারতের স্থানে স্থানে, শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ গোস্বামি-গ্রন্থ, আগম-প্রামাণ্য ও নারদাদি পঞ্চরাত্র, রামার্চ্চন-চন্দ্রিকা প্রভৃতি পদ্ধতি-গ্রন্থের আলোচনাভাবে বঙ্গীয় স্মার্ত্তকুল শ্রৌত-পথের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি আচার্য্যকুল-বহির্ম্মুখ অক্ষজবাদীর তর্কপথ-কুঞ্জর-দন্ত ভগ্ন করিয়া দিয়াছেন। শ্রৌতপন্থা ভক্তি-পথেরই নামান্তর। তর্কপন্থা বহির্ম্মুখ নাস্তিক সম্প্রদায়ের বাসনামূলে জাত।"

শুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও একাকারত্ব এক নহে

তর্কপথের পথিকগণ সুবিধাবাদী। তাঁহারা স্ব-স্ব বংশ-মর্য্যাদার অযথা বহুমানন করিবার জন্য শাস্ত্রযুক্তিকে উল্লঙ্ঘন করিতে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ নহেন। ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদার-নীতি অনুসারে সমাজ সংগঠিত হইলে জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। বর্ত্তমান সমাজ আপন আপন শৌক্র-পারম্পর্য্য অবলম্বন করিয়া যে বংশ-মর্য্যাদা স্থাপন করিতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত নহে। বর্ত্তমান যুগের রাজনৈতিকগণও ইহার উৎসাদন-কল্পে যত্নবান্ হইতেছেন। প্রকৃত শাস্ত্রানুগত সমাজ সংগঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। অশাস্ত্রীয় ও উচ্ছৃঙ্খল একাকারত্ব জগতের মঙ্গল আনয়ন করিবে না। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

দীক্ষার আবশ্যকতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬০ পৃষ্ঠার পর]

শূদ্রকুলোদ্ভূত দীক্ষিত ব্যক্তির যদি উপবীত গ্রহণ ও বেদপাঠে অধিকার নাই, তবে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কেন শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণকে অধ্যাপনা করাইয়াছিলেন এবং বেদান্তের ভাষ্য প্রণয়ন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন? স্মার্ত্তের বিচারে বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু যদি 'শূদ্র' হন, তবে তিনি 'বেদান্তাচার্য্য' উপাধি কিরূপে লাভ করিলেন? আজকাল গুরুব্রুবগণকে শিষ্যকে দীক্ষাদান করিয়াও দীক্ষিত শিষ্যের সহিত অস্পৃশ্য শূদ্রের ন্যায় আচরণ করিতে দেখা যায়। তাহারা তাহাদের তথাকথিত দীক্ষিত শিষ্যকে অর্চ্চনের অধিকার দেন না, এমন কি, শূদ্রজ্ঞানে তাহাদের হস্তে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। শিষ্য যদি কখনও শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন, গুরুব্রুবগণ শূদ্র শিষ্যের স্পর্শে শ্রীমূর্ত্তি শূদ্র হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া 'শূদ্রের ঠাকুর' জ্ঞানে শ্রীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন। গুরুব্রুবগণ কেবল বার্ষিক দক্ষিণা গ্রহণ করিবার সময় শিষ্যগণকে দীক্ষিত জানেন এবং তাহা সকলের নিকট প্রচারও করেন। সুতরাং ঐ সকল গুরুব্রুব, ব্রাহ্মণব্রুবগণের দীক্ষিত ব্যক্তি 'যথা পূর্ব্বং তথা পরম্' থাকিয়া যায়।

কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিই অর্চ্চন ও নাম-সঙ্কীর্ত্তনে অধিকারী

আজকাল একশ্রেণীর নব্যদলের মুখ হইতে শোনা যায়,—"কলিকালের যুগধর্ম্ম একমাত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তন, নাম করিতে হইলে দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাদির অপেক্ষা নাই, সুতরাং সদ্‌গুরুর নিকটে গিয়া দীক্ষা গ্রহণের কোন আবশ্যকতা নাই।" সকল শাস্ত্রই নব্যদলের কাল্পনিক ধারণাসমূহের মূলচ্ছেদ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনের অধিকার কেবলমাত্র কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির—ইহাই সহস্রমুখে বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রসকল গান করিয়াছেন। অপবিত্র অশুচি হইয়া কখনও অর্চ্চন হয় না। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকলেই অপবিত্র। পারমার্থিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত অর্চ্চনে কাহারও অধিকার নাই। অর্চ্চন করিবার পূর্ব্বে অবশ্যই দীক্ষার আবশ্যক। স্ত্রীলোকের উপনয়নাদি হইলেও দীক্ষালাভের দ্বারা তাঁহারা দ্বিজ হন এবং নাম-যজ্ঞের ও অর্চ্চনাদি বিষয়ে যোগ্যতা লাভ করেন। পুরুষ অনুপনীত হইলে তাঁহার প্রকৃত দীক্ষালাভ ঘটে নাই জানিতে হইবে। অর্চ্চন না করিয়া এই পৃথিবীতে কেবল নিজের উদরপূর্ত্তির জন্য বাঁচিয়া থাকিলে 'পাপিষ্ঠ' উপাধি লাভ করিতে হয়। শূদ্রতা পাপিষ্ঠতারই নামান্তর। শূদ্র হইয়া কোন দ্রব্যই শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা যায় না।

বিষ্ণুদীক্ষা-বিধানক্রমে সাবিত্র্য-জন্ম অবশ্যই হইবে। সাবিত্র্য-জন্ম না হইলে বিষ্ণুদীক্ষা প্রদত্ত হয় নাই জানিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের পূর্ব্ববিভাগ "শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে" ভাঃ ৩।৩৩।৬ শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনী

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"শৌক্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন সবন-যজ্ঞে অধিকার প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ চণ্ডালকুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির সবনযজ্ঞে যোগ্যতা প্রাপ্তির প্রতিকূল দুর্জ্জাতিত্বাদির মূল প্রারব্ধ—পাপ বিদূরিত হইলেও তাঁহার দীক্ষা ব্যতীত সাবিত্র্য জন্ম লাভ হয় না, যেহেতু অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র্য-সংস্কার গ্রহণ শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তির যেমন সবনযোগ্যতা-নির্ণায়ক বিশেষ পুণ্যময় সাবিত্র্য-জন্মের অপেক্ষা থাকে, সেইরূপ চণ্ডালকুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণতা বা সবনযোগ্যতা লাভ হইলেও সাবিত্র্য-জন্মের অপেক্ষা আছে।"

ভগবৎপ্রেম যদি আমাদের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হয়, তাহা হইলে দীক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরসুন্দর লোকশিক্ষার জন্য শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট দীক্ষাভিনয়ের যে লীলা করিয়াছিলেন, তাহা ত' কাহারও অজানা নয়। দীক্ষাবিধান বৈধভক্তির ক্রিয়া বিশেষ। বিধিভক্তি লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্রানুসারে উহা বিশৃঙ্খলতায় পর্য্যবসিত হয়। বিধিবিরুদ্ধ উচ্ছৃঙ্খলতাই যাহাদের লক্ষ্য, তাহারা কখনই কৃষ্ণভক্ত নহে। মায়ার ভোক্তা কখনই কৃষ্ণভক্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না। কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানহীন ব্যক্তিমাত্রেই 'শূদ্র'। অসংস্কৃত শূদ্র কখনও দীক্ষালাভ করেন নাই, সেইজন্য অদীক্ষিত অবস্থায় তিনি কৃষ্ণকে কোন বস্তুই প্রদান করিতে পারেন না। যাহারা দীক্ষাবিধান স্বীকার করেন না, তাহারা শাক্তমতাবলম্বনে বলপূর্ব্বক অবৈধভাবে ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব হইতে চাহেন, শাস্ত্র তাহাদের যথেচ্ছাচারিতার অনুমোদন করেন না। যাহারা প্রাকৃত বিচারে আসক্ত, তাহাদের সেবা শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে গ্রহণ করিবে? অদীক্ষিত অবস্থায় অর্থাৎ দীক্ষাবিধান ব্যতীত কৃষ্ণসেবা করিব—এই বিচারটি উৎপাতেরই জন্য। যাহারা বর্ণাশ্রমে থাকিয়া কৃষ্ণভজন করিবেন, তাঁহারা শাস্ত্রবিধি ও দীক্ষাবিধি অবশ্যই পালন করিবেন।

কলিকালে শূদ্রাশূদ্র মানব সকলেই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার অধিকারী

দীক্ষা দ্বিবিধা—বৈদিকী ও বেদানুগা। যোগ্যজ্ঞানে সংস্কৃত দ্বিজের দীক্ষা বৈদিকী। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও ব্রহ্মযামল বাক্যানুসারে কলিকালে বৈদিকী দীক্ষার সম্ভাবনা নাই। বেদানুগা দীক্ষা দুইপ্রকার—পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী। অযোগ্য ব্যক্তিকে অধিকারী-জ্ঞানে পৌরাণিকী দীক্ষা এবং অধিকারী-বিচারে ভাবি-যোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদত্ত হয়। পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষাই কলিকালে মহাজনানুমোদিত। ইহাতে স্ত্রী, শূদ্রাদি যেই হউক না কেন, সকলেরই অধিকার আছে। অনধিকারী ব্যক্তি এই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার দ্বারাই কলিকালে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের যোগ্যতা লাভ করেন। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বের ১৪৩।৪৬, ৫০, ৫১ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, —"নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব-সংস্কার লাভ

করেন। জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি কোনটিই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ। বৃত্তে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন।" মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বের ১৪৩।১৪৬ শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায়,—"শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ" অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষালাভের পরে শূদ্রের আর দ্বিজত্বের লক্ষণাভাব থাকে না ; যেহেতু পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার মধ্যেই দশসংস্কার পদ্ধতি অনুস্যূত আছে।"

'পঞ্চরাত্র' বলিতে সাত্বত আগম বা তন্ত্রকে বুঝায়। স্বয়ং শ্রীনারায়ণ পঞ্চরাত্রের বক্তা। নারদ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাভাগবতগণও পঞ্চরাত্রের বক্তা। শ্রীহরির উপাসনা ব্যতীত অন্য কোন নশ্বর ভোগবাদের কথা সাত্বততন্ত্র পঞ্চরাত্রে স্থান পায় নাই। ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা যিনি করেন, তিনি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া উপনয়ন সংস্কার প্রদান করিলে তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় মনোনিবেশ না করিয়া ইতরকার্য্যে ধাবিত হন, তবে তাঁহার উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণের কি প্রয়োজন ছিল? পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-বিধি সম্বন্ধে শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে পাওয়া যায়,—

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ।।

"গুরুদেব স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায়, সেই মন্ত্রপ্রভাবে পুত্র ও শিষ্যাদির পুনর্জ্জন্ম হয়। তখন বিনীত পুত্র ও শিষ্যদিগকে বৈদিক দশ-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য তাহাদিগকে 'ব্রহ্মচারী' করাইয়া মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ শিক্ষা দিবেন—ইহাই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-বিধি।"

শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিমাত্রেরই সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য

দীক্ষা কেবল কাণে ফুঁ দেওয়া বা নেওয়া কোন মন্ত্র নহে। প্রকৃত দীক্ষালাভ হইলে জীবের অমেধ্য-কুমেধ্য খাদ্যের প্রতি লোভ তথা কুবাসনা চিরতরে দূরীভূত হইয়া যাইবে। যিনি মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই, তিনি মন্ত্রদানে অনধিকারী, তিনি কখনও গুরু হইতে পারেন না। সদ্‌গুরুকে বাদ দিয়া আমরা যদি তথাকথিত নামধারী গুরুর নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করি, তাহাতে আমাদের কোনকালে মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তথাকথিত নামধারী গুরুর প্রদত্ত মন্ত্র সামর্থ্যহীন প্রাকৃত জড়বস্তুরই অন্যতম, তাহা অপ্রাকৃত জগতের সত্যবস্তু হইতে পৃথক্। সদ্‌গুরু হইতে দীক্ষা না গ্রহণ করিবার ফলে আমাদের দীক্ষাকার্য্যটি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না ; দীক্ষিত ও অদীক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। অসদ্‌গুরু প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্রে ও গুরুতে অবিশ্বাস হওয়া স্বাভাবিক।

শাস্ত্র আমাদিগকে বিত্তোপহারক গুরুকে ছাড়িয়া সন্তাপহারী সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান

করিতে উপদেশ করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত বাস্তব সত্য উপলব্ধি করিতে চাহেন, তাঁহারা অবশ্যই সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া বিপ্রত্বলাভ করিবেন। সদ্‌গুরু প্রদত্ত মন্ত্রলাভের দ্বারা শক্তিশালী হইলে আমাদের আর গুরু ও শাস্ত্রে অবিশ্বাস থাকিবে না, অবিশ্বাস অনায়াসে বিদূরিত হইবে। মন্ত্রজপের প্রভাবে সংসার-দাবানল চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইবে। সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়ে ভজন করিতে থাকিলে ব্রাহ্মণত্ব ও যোগিত্বকে ক্রোড়ীভূত করিয়া বৈষ্ণবত্বরূপ যে লোভনীয় পদ অবস্থিত, আমরা তাহাতে অধিরূঢ় হইয়া কৃতকৃতার্থ হইতে সক্ষম হইব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

প্রহ্লাদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৯ পৃষ্ঠার পর]

তাহা বিশুদ্ধ ভাগবত-ভাবের প্রবল প্লাবনে নিঃসত্ত্ব শুষ্ক তৃণের মত চূর্ণ হইয়া কোথায় ভাসিয়া গেল। তাঁহারা সভয়ে রাজসকাশে গিয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সংবাদ শুনিয়া দৈত্যরাজ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন ; তাঁহার আরক্ত চক্ষুঃদ্বয় হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। আবার প্রহ্লাদের ডাক পড়িল। দিব্যমূর্ত্তি, মহাশয় প্রহ্লাদ হরিপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে নির্ভয়ে সেই সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় দুরন্ত দৈত্যপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ক্রোধান্ধ রাজা গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"দুর্ব্বিনীত বালক! আজ আর তোর ক্ষমা নাই! আজ আমিই তোকে যমালয়ে পাঠাইব। আমি ক্রুদ্ধ হইলে ঈশ্বরসহিত সমস্ত লোক সভয়ে কম্পিত হয় ; আর তুই নির্ভয়ে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছিস্?—তোর এত দর্প কাহার বলে?"

প্রহ্লাদ অবাত-অকম্প উজ্জ্বল দীপশিখার ন্যায় সভামধ্যে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দীপ্তচক্ষে, দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন,—"রাজন্! অখিল জগতে জগন্নাথ শ্রীহরিই একমাত্র বলবান্ পুরুষ। তাঁহারই মহাশক্তির ঈষৎ আভাসমাত্রে সকলেই যথোচিত বল ধারণ করিয়া স্ব-স্ব কর্ম্ম করিতেছে। তুমি, আমি এবং ব্রহ্মাদি চরাচর সমস্ত তাঁহারই আশ্রিত, বশীভূত। সেই সর্ব্বাশ্রয় শ্রীহরির পদবলই আমার পরম সম্বল। তিনিই—তিনিই সকলের সামর্থ্য, সাহস, বুদ্ধি, বল, ইন্দ্রিয় ও আত্মা, তিনিই সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা। পিতঃ, মোহের বশে মত্ত হইয়া আর কেন আত্মনাশের পথ প্রশস্ত করিতেছেন? যদি শ্রেয়ঃলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে অবিলম্বে সেই সকলের ঈশ্বর, সর্ব্বাত্মা শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করুন্।

প্রহ্লাদের হিতবাক্য আসন্নমৃত্যু মহাসুরের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিল

না। তিনি আরও উত্তেজিত হইয়া কহিলেন,—"আরে মন্দভাগ্য, তুই বলিতেছিস্ কি? আমি ভিন্ন অন্য ঈশ্বর আবার কে? 'হরি' 'হরি' করিতেছিস্ ;—হরি তোর কোথায়? তুই বলবি—'হরি আমার সর্ব্বত্রই আছেন।' বেশ, তাই যদি হয়, তবে এই স্তম্ভের মধ্যে সে নাই কেন?"

প্রহ্লাদ তখন সেই স্তম্ভের দিকে তাকাইয়া যুক্তকরে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"নাই কে বলিল পিতঃ? ঐ যে—ঐ যে আমার হরি, স্তম্ভের মধ্যেও বিরাজ করিতেছেন।।"

পলকমধ্যে দৈত্যরাজ আসন হইতে উঠিয়া সেই স্তম্ভের উপর ভীমবেগে মুষ্টিপ্রহার করিলেন। আর সেই সঙ্গে মহামেঘমন্দ্রে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখি, কোথায় তোর হরি!—কে তোকে আজ রক্ষা করে?" মহাশব্দে আকাশ পূর্ণ হইল। সেই শব্দের প্রতিশব্দ-সহ সহসা আর একটী ভীষণতর শব্দ উত্থিত হইয়া সকলকেই স্তব্ধ করিয়া দিল! প্রলয়ের প্রচণ্ডবেগে বুঝি ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ বিদীর্ণ হইয়া গেল! ব্রহ্মাদি দেবগণ স্ব-স্ব-ধামে ঐ ভীম শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রমাদ গণিলেন! প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু ব্যতীত সভাস্থ সকলেই প্রাণভয়ে জড়পিণ্ডবৎ নিজ নিজ স্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে দৈত্যরাজ দেখিতে পাইলেন, স্তম্ভ হইতে অর্দ্ধনর, অর্দ্ধসিংহ এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তালবৃক্ষ-প্রমাণ মহাবাহু উদ্যত করিয়া আরক্তচক্ষে গর্জ্জন করিতে করিতে তাহার দিকে বেগে অগ্রসর হইতেছেন! আর কথা কহিবার অবসর হইল না ; সেই অতি ভীষণ অপূর্ব্বদর্শন নরসিংহ বিদ্যুৎবলে আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিলেন। দানবেন্দ্রও অবিলম্বে গদা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রাণপণে আঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? ভক্তের সাধন-বিঘ্ন দূর করিতে, ভক্তের বাক্য সত্য করিতে, নরসিংহরূপে অবতীর্ণ শ্রীভগবান্ অবিলম্বে সেই অমিতবিক্রম অসুরকে গদাসহিত ধারণ করিয়া ক্রোড়মধ্যে গ্রহণ করিলেন। অসুরেন্দ্র অহিমুখাগত মূষিকের ন্যায় ধৃত হইয়া দারুণ ব্যথায় 'বাপ্' 'বাপ্' 'মা' 'মা' রবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পুরোবর্ত্তি প্রহ্লাদ পিতার মুখে মৃত্যুকালে এই বিফল বাক্য শুনিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"মাতস্তাতেতি মা ব্রুহি মরণে সমুপস্থিতে।
বদ গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দেতি পুনঃ পুনঃ।।" (হরিভক্তিসুধোদয়)
মরণ সময়ে পিতঃ, কেন আর বিফল বচন?
'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' নাম কর উচ্চারণ।।

বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থ অংশে মৈত্রেয়ের প্রশ্নে পরাশরের উত্তরে লিখিত আছে যে, ভক্তবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলে হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবকে "ইনি বিষ্ণু" এই বুদ্ধি না করিয়া কোন পুণ্যরাশিসমুদ্ভূত প্রাণিবিশেষ বলিয়া মনে করিয়াছিল। রজোগুণের উদ্রেকহেতু মরণকালে তাঁহার রূপ চিন্তা করিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁহার

হস্তে নিধনকালে রাবণদেহে ত্রৈলোক্যাধিকারিণী নিরতিশয় ভোগ-সম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। এই কারণে ভগবানকে আলম্বন অর্থাৎ সেব্যবিষয়-বিগ্রহবুদ্ধি না করায় তাহার মন ভগবানে নিবিষ্ট হয় নাই। সে রাবণদেহে কামপরবশত্ব হেতু জানকীতে আসক্ত-চিত্ত হইয়া ভগবান্ রামচন্দ্রের রূপ দর্শন মাত্র করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে রামে বিষ্ণুবুদ্ধি না হইয়া তাহার অন্তঃকরণে কেবল তৎপ্রতি মনুষ্যবুদ্ধিই হইয়াছিল। পুনরায় শ্রীরামহস্তে পতনফলে শিশুপালদেহে শ্লাঘ্য চেদিরাজ বংশে জন্ম এবং প্রচুর ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুজ্ঞানে বহুজন্ম পর্য্যন্ত বিদ্বেষফলে তাঁহার চিত্তে সেই বিদ্বেষ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকায় নিন্দন-তর্জ্জনাদিতেও সে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিত। আর বদ্ধমূল বিদ্বেষ-প্রভাবে ভ্রমণ, ভোজন, স্নান, উপবেশন ও শয়নাদি কোন অবস্থায়ই কিছুতেই সেই সুন্দর ভগবদ্রূপ শিশুপালের কৃষ্ণাবিষ্ট-চিত্ত হইতে অপসারিত হয় নাই। আক্রোশাদিতেও সেই নামের উচ্চারণ এবং হৃদয়ে সেই রূপের অবধারণ করিতে করিতে অন্তিমকালে দ্বেষাদি অপরাধ দূর হওয়ায় নিজ বিনাশনিমিত্ত আগত সুদর্শন-চক্রের কিরণচ্ছটায় পরমব্রহ্ম ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়াছিল। (প্রতিকূল হইলেও) ভগবৎ-স্মরণপ্রভাবে অভদ্ররাশি দগ্ধ হওয়ায় শিশুপাল ভগবচ্চক্রে নিহত হইয়া ভগবৎ-সমীপে উপনীত হইয়া সাযুজ্যগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

যে-সকল দৈত্যগণকে শাস্ত্র গো-বিপ্রঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছে, সেই শিশুপালাদি দৈত্য যে সাজুয্যমোক্ষ লাভ করিয়াছেন, সেই মোক্ষকে কিরূপে শ্লাঘ্য বলা যায়? ভগবদ্ভক্তগণই সাধু এবং ভগবদ্বিদ্বেষিগণই অসুর। সাধুত্বে ও অসুরত্বে যেরূপ সর্ব্বদা বৈপরীত্য-ধর্ম্ম আছে, তাহাদের সাধন ও সাধ্য-বিষয়েও সেইরূপ বৈপরীত্যভাব বর্ত্তমান। অসুরদিগের সাধু-বিদ্বেষ ও গো-বিপ্র-হননই সাধন এবং মোক্ষই সাধ্য, ভক্তদিগের ভক্তিই সাধন ও প্রেমই সাধ্য।

হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়া ভক্তজনরক্ষক—নৃসিংহদেব দৈত্যশোণিতে লিপ্ত এবং অন্ত্রমালায় ভূষিত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তথায় শিব-ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, মহসর্পসকল, প্রজাপতিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ, চারণ, যক্ষ, কিম্পুরুষ, কিন্নর, বেতাল এবং সুনন্দাদি বিষ্ণুপার্ষদগণ সকলেই সমবেত হইয়া দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে শান্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। শেষে দেবগণ পরামর্শ করিয়া শিশু প্রহ্লাদকেই তাঁহার প্রভুর সকাশে প্রেরণ করিলেন। প্রহ্লাদ নির্ভয়ে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া পাদমূলে প্রণত হইলেন। প্রিয়তম ভক্তকে পার্শ্বগত দেখিয়া প্রভু অমনি প্রশান্তভাব প্রাপ্ত হইলেন। স্নেহভরে স্বীয় করকমল শিশুর মস্তকে স্থাপন করিলেন। সিংহ যেমন অপরের প্রতি ভীষণ হইলেও স্বীয় শাবকের প্রতি

স্নেহশীল হয়, নৃকেশরীরও তেমনই অভক্ত দৈত্যের প্রতি অত্যুগ্র হইলেও ভক্ত প্রহ্লাদের প্রতি প্রসাদ বিতরণ করিলেন।

শ্রীকরস্পর্শমাত্র প্রহ্লাদের সমস্ত অশুভ দূর হইল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয় ব্রহ্মজ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। প্রহ্লাদ প্রভুর মুখপদ্মে মধুলোলুপ নয়ন-ভৃঙ্গ দুইটী নিবদ্ধ করিয়া প্রেম-গদগদ মধুর বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া পরমানন্দে বরহস্ত উত্তোলন করিয়া কহিলেন,—"বৎস প্রহ্লাদ, তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।"

বালক মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"ভগবন্, আমার হৃদয় স্বভাবতঃই ভোগসুখে লুব্ধ। তার উপর আর আপনি আমাকে বরদ্বারা প্রলোভিত করিবেন না। আপনি দয়াময়, আমাকে রক্ষা করুন। বর আমি কিছু চাহি না। প্রভো, যে আপনার দর্শন পাইয়া **আপনার চরণসেবা ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করে, সে ত' আপনার ভৃত্য নহে, বণিক্।** স্বামীর নিকট যে ব্যক্তি নিজ-সুখের জন্য কিছু কামনা করে, সে সেবক নহে ; আর যিনি নিজ প্রভুত্ব-ইচ্ছায় সেবককে কাম্যবস্তু দান করেন, তিনিও সেবকের হিতেচ্ছু প্রভু নহেন। আপনি ত' আমার তেমন প্রভু নহেন ; আমিও ত' অপর প্রত্যাশা করিয়া আপনার সেবা করি নাই ; সুতরাং আপনি আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। তবে একান্তই যদি আপনি আমাকে কিছু বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন—যেন আমার হৃদয়ে কোনও ভোগবাঞ্ছাই উদিত না হয়। ভোগবাঞ্ছাই জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করে। আর একটী কথা—আপনি কৃপা করিয়া আমার পিতাকে ক্ষমা করুন ; তিনি আপনার প্রতি দ্বেষ এবং ততোধিক আপনার ভক্তের প্রতি অত্যাচার করিয়া অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছেন।"

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—"প্রহ্লাদ, তোমার মত নিষ্কাম ভক্তের মুখে ইহাই যোগ্য কথা। তোমার হৃদয়ে ভোগবাঞ্ছা থাকিতে পারে না। তাহা হইলেও তুমি কিছুকাল রাজ্য কর ; আমাকেই সেব্য ও ভোক্তা জানিয়া সমস্ত বস্তুকে আমার সেবোপকরণ-রূপে নিযুক্ত কর। বস্তুসিদ্ধিকালে তুমি আমার নিত্যসেবায় প্রবিষ্ট হইবে। আর তোমার পিতার কথা যে বলিতেছ, তাহা আর আমাকে কেন বলিতে হইবে? যে কুলে কৃষ্ণভক্ত আবির্ভূত হন, সে কুলের পিতা, পিতামহ হইতে ঊর্দ্ধতন বিংশতি পুরুষ পাপমুক্ত হইয়া সদ্গতি লাভ করেন। তোমা হইতেই তোমার পিতার উদ্ধার হইয়াছে। তুমি এখন তাহার শেষ কার্য্য সম্পাদন করিয়া তদীয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও।"

শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার আদেশমত প্রহ্লাদ পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য শেষ করিয়া যথাসময়ে দ্বিজগণদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। পরে, নির্ব্বিবাদে বহুকাল রাজত্ব করিয়া কালপ্রাপ্তে বস্তুসিদ্ধি লাভ করিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজেরই কুলে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

◆◆◆◆

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র

কশ্যপের পুত্র সূর্য্যদেব হইতে বর্ত্তমান মন্বন্তরের অধিপতি বৈবস্বত মনু জন্মগ্রহণ করেন। সেই বৈবস্বত মনুর হাঁচিবার সময় তাঁহার নাসিকা হইতে ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়। ইক্ষ্বাকু কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করেন এবং ভগবান্ শ্রীহরিকে লাভ করেন। ইক্ষ্বাকুর পুত্রের নাম বিকুক্ষি। বিকুক্ষির বংশে পুরঞ্জয় প্রভৃতি অনেক বীর ও অন্যান্য রাজর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বংশেই দশরথ-নামে এক মহাভাগ্যবান্ পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনে সর্ব্বদা নিয়োজিত থাকিতেন এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক পৃথিবী পালন করিতেন। মহারাজ দশরথের রাজত্বকালে রাক্ষসগণ দেবতাদিগের উপর ভীষণ উপদ্রব আরম্ভ করিল। দেবতাগণ অতিষ্ঠ হইয়া সকলের পরিত্রাণকারী ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা ভগবানের আদেশে বানরাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হনুমান বায়ুর অবতাররূপে অবতীর্ণ হন।

সাধুগণের পরিত্রাণ ও ভয় নিবারণের জন্য এবং দুষ্ট রাক্ষসদিগের বিনাশসাধনের জন্য পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীহরি রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন—এই চারি অংশে দশরথের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। কৌশল্যাদেবীর গর্ভে শ্রীরামচন্দ্র, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত, সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম হয়। অতিশয় রূপলাবণ্যবিশিষ্ট এই চারি পুত্র লাভ করিয়া মহারাজ দশরথ মনের আনন্দে মহাসুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

রাক্ষসগণ যাজ্ঞিক ভিক্ষু সাধুগণের উপর হিংসা করিয়া তাঁহাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল এবং তাঁহাদের প্রতি হিংসা আচরণ করিতে লাগিল। সেই সময় মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র উহাদের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত ভগবান্ রামচন্দ্রকে নিজের আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন। সঙ্গে লক্ষ্মণও গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাদের সঙ্গে তাড়কা-নাম্নী এক রাক্ষসীর সাক্ষাৎ হইল। রামচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, ভিক্ষুগণ সাধন-ভজনের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তোমরা তাঁহাদিগকে অযথা হিংসা কর কেন?" তদুত্তরে তাড়কা বলিল,—"সাধুদিগের প্রতি হিংসা-দ্বেষ করাই বা তাঁহাদের উৎপীড়ন করাই আমাদের স্বভাব।" তখন রামচন্দ্র বলিলেন,—"তবে আমারও একটী স্বভাব শোন, যাহারা সাধুদিগকে হিংসা বা দ্বেষ করে, তাহাদের নিধন করাই আমার স্বভাব।" এই বলিয়া পথিমধ্যে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র তাড়কা রাক্ষসীকে সংহার করিয়া মুনির আশ্রমে গমন করিলেন এবং বিশ্বামিত্র যজ্ঞে মারিচাদি রাক্ষস নিধন করিলেন। এইভাবে যজ্ঞাদি কর্ম্মের সমূহ বিঘ্ন অপসারিত করিয়া বিদেহ রাজ্যের অভিমুখে রওনা হইলেন। বিদেহরাজ্যের রাজন্যবর্গ রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক খুবই সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

সেখানে অবলীলাক্রমে হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাদেবীকে পত্নীরূপে অঙ্গীকার করিলেন। সেই সময় সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের স্তব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র পত্নী সীতাদেবীকে লইয়া লক্ষ্মণ ও বশিষ্টসহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং পিতৃদেব দশরথ ও মাতাঠাকুরাণীগণের চরণ বন্দনা করিলেন। সমস্ত প্রজাগণ পরমানন্দ লাভ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনাপূর্ব্বক তাঁহার অভয় চরণারবিন্দে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিলেন।

রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য অভিলাষী হইয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছেন, এমন সময় রাণী কৈকেয়ী তাহাতে বাধ সাধিলেন। একসময় রাজা দশরথ কৈকেয়ীর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুইটী বর দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। কৈকেয়ী দাসী মন্থরার পরামর্শে ঐ সময় দুইটী বর প্রার্থনা করিয়া বসিলেন। এক বরে রামের বনগমন এবং দ্বিতীয় বরে তাঁহার পুত্র ভরতের রাজ্যলাভ। অর্থাৎ রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে যাইতে হইবে এবং ভরতকে রাজা করিতে হইবে। অনন্যোপায় হইয়া রাজা দশরথ তাহা স্বীকার করিলেন ; কিন্তু রামচন্দ্রের বনগমনের পর তিনি শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন।

বিমাতা কৈকেয়ীর কথায় এবং পিত্যসত্য পালনের জন্য সীতাদেবী ও লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্র বনে গমন করিলেন। সেইসময় তিনি বহু রাক্ষসের বিনাশ সাধন করেন। তিনি লক্ষ্মণের দ্বারা লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগ্নী শূর্পনখার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করান। এইরূপে অপমানিত হইয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য রাবণ-অনুচর খর-নামক রাক্ষস সেনাপতি দূষণসহ অসংখ্য সৈন্য লইয়া রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিল। রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে তাহাদের সংহার করিলেন।

এইসকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং নিজ ভগিনীর দুর্দ্দশা দেখিয়া রাবণের সীতাহরণের দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইল। মারীচ রাক্ষস মায়ামৃগরূপ ধারণ করিয়া আশ্রমের অনতিদূরে আসিলে সীতাদেবীর আগ্রহাতিশয্যে রামচন্দ্র লক্ষ্মণসহ যেই তাহাকে ধরিবার জন্য গিয়াছেন, অমনই রাবণ সীতাকে হরণ করিলেন। কিন্তু মহাশক্তিস্বরূপিণী জগন্মাতা সীতাদেবীকে স্পর্শ করিবার ক্ষমতা রাবণের নাই। রাবণ কেবলমাত্র ছায়াময়ী মূর্ত্তিকে সীতাভ্রমে অপহরণ করিয়াছিল। যাহা হউক, শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণসহ সীতা অন্বেষণে রত হইলেন। তিনি আনন্দঘন মূর্ত্তি। তাঁহার নিকট দুঃখ কিরূপে আসিতে পারে? তবে তাঁহার যে সাধারণ মানবের মত আচরণ—তাহা কেবলমাত্র আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের শিক্ষার নিমিত্ত জানিতে হইবে। তিনি লক্ষ্মণসহ সীতাদেবীর অন্বেষণ করিতেছেন—এমন সময় পবন-অঞ্জনার পুত্র হনুমান রামচন্দ্র সকাশে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন এবং নিজপ্রভু রামচন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে জটায়ুর সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। জটায়ু তাঁহাদিগকে সীতার সংবাদ দিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন।

তাঁহারা জটায়ুর সৎকার করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে কবন্ধ বধ, বালি বধ ইত্যাদি করিয়া সুগ্রীবের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিলেন। সুগ্রীবের আদেশে বানরসকল সীতাদেবীর অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িলেন।

হনুমান দক্ষিণ দিকে যাইতে যাইতে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন এবং অশোককাননে সীতাদেবীর সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি সীতাদেবীকে রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয় দিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে চূড়ামণি গ্রহণ করিয়া অশোকবন বিধ্বংস করিলেন। নিজের লেজে আগুন লাগাইয়া লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া এপারে ফিরিয়া আসিলেন এবং সীতাদেবী-প্রদত্ত চূড়ামণি রামচন্দ্রকে দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বানরগণের সহায়তায় সেতুবন্ধন করিয়া লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইলেন এবং অসংখ্য রাক্ষস বিনাশ-পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে বিনাশ করিয়া বিভীষণকে লঙ্কার রাজ্যভার প্রদান করিয়া বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে পুষ্পকরথে হনুমানসহ সীতাদেবীকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিলেন। ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার পাদপদ্মে নিপতিত হইলেন। রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও জননীগণের পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। রামচন্দ্রের আগমনে অযোধ্যা আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়া গেল।

পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। সে দৃশ্য অতীব চমৎকার। নিখিল প্রাণিগণের মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্র যখন রাজা হন তখন যদিও ত্রেতাযুগ বর্ত্তমান ছিল, তথাপি ঐ যুগ সুখসমৃদ্ধি ও ধর্ম্মাদির দ্বারা সত্যযুগের সমান হইল। রামরাজত্বে আধি, ব্যাধি, জরা, সন্তাপ, দুঃখ, শোক, ভয়, ভ্রান্তি প্রভৃতি আর কিছুই রহিল না।

সত্যযুগে ধ্যান এবং ত্রেতায় যজ্ঞের প্রাধান্য ছিল। তজ্জন্য ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যুগমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া নিজেই নিজের অর্চ্চন করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে যথারীতি দান করিয়া তাঁহাদের আনন্দবিধান করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণ রামচন্দ্রের ভৃত্যবাৎসল্য দেখিয়া সাশ্রুনয়নে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

প্রজাদের তাঁহার প্রতি কিরূপ ধারণা—তাহা অবগত হইবার জন্য তিনি ছদ্মবেশে রাত্রিকালে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন শুনিতে পাইলেন যে,—এক ব্যক্তি সীতাদেবীর চরিত্রকে কটাক্ষ করিয়া তাহার স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করিতেছে। তিনি গৃহে ফিরিয়া মূঢ় লোকের ভয়ে ভীত হইবার ছলনায় সীতাদেবীকে লোকচক্ষে ত্যাগ করিবার অভিনয় করিলেন। সেইসময় সীতাদেবী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। বাল্মিকীমুনি সীতাদেবীকে তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় দিলেন। সেই আশ্রমে সীতাদেবীর লব ও কুশ নামক যমজ পুত্রের জন্ম হয়। সীতাদেবী বাল্মিকীর নিকট তাঁহার পুত্রদ্বয়—লব ও কুশকে রাখিয়া পাতালে প্রবেশ করেন। রামচন্দ্র ইহা শ্রবণ করিয়া সীতার

বিরহে খুবই দুঃখিত হইলেন এবং তের হাজার বৎসর অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের অন্তর্দ্ধান-লীলা-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়,—

"স্মরতাং হৃদি বিশ্বস্য বিন্ধং দণ্ডক কণ্টকৈঃ।
স্বপাদপল্লবং রাম আত্মজ্যোতিরগাৎ ততঃ।।" (ভাঃ ৯।১১।১৯)

'ততঃ' অর্থাৎ অগ্নিহোত্র যজ্ঞাদি সমাপন করিয়া রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যের কণ্টকে বিদ্ধ স্বীয় পাদপদ্ম স্মরণকারী ভক্তগণের হৃদয়মধ্যে বিন্যস্ত করিয়া চিৎ জ্যোতির্ম্ময় প্রপঞ্চাতীত ধামে গমন করিলেন। তিনি সরযু নদীর তীরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন।

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন—এই চারিজন যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতার বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে রামচন্দ্রকে ভগবান্ নারায়ণের অবতার, লক্ষ্মণকে শেষ, ভরতকে চক্র ও শত্রুঘ্নকে পদ্মের অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

রামচন্দ্রের চরিত্র মানবমেধা বুঝিতে পারিবে না। যিনি বিশ্বাত্মা, পরমেশ্বর এবং যিনি স্ব-স্বরূপেই আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহার কোনদিন সীতা-বিরহের জন্য দুঃখ হইতে পারে না। স্ত্রীসঙ্গাদি দুঃখ যে দুর্ব্বার—ইহা আমাদের ন্যায় মর্ত্ত্যজীবকে শিক্ষাদান করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার এই লীলাভিনয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়ছেন,—"মর্ত্ত্যজীব দুইপ্রকার—ধর্ম্মশীল ও ভক্তিমান্। তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও প্রেম শিক্ষা দিবার জন্য স্বীয় লীলায় ধার্ম্মিকত্ব ও প্রেমাধীনত্ব—এই দুইপ্রকার ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। ধার্ম্মিকগণের তদীয় সাধ্বী ভার্য্যাকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, বরং তাঁহার নিমিত্ত দুঃখাদি ক্লেশও সহনীয়। ভগবান্ রামচন্দ্র নিজলীলায় সেইরূপ ভাবও প্রদর্শন করিয়া ধার্ম্মিকগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। আবার তদ্দ্বারা ভক্তগণকে দেখাইয়াছেন যে,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ তাহা পরানন্দ-সুখ।।"

অর্থাৎ স্থায়িভাবরূপ প্রেমাবস্থা বাহ্যতঃ বিরহজনিত অত্যন্ত ক্লেশের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও তাহা বাস্তবিক জড়কর্ম্মফলজনিত দুঃখমাত্র নহে। কেননা, বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদজনিত তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে।

শ্রীরামলীলা কেবল প্রাকৃত বদ্ধজীবের লীলার ন্যায় নহে। সেখানে কামনার গন্ধমাত্রও নাই। রামচন্দ্র কোনও বিষয়েই আসক্ত নহেন। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বাসুদেব। তিনি ভক্তবান্ধব এবং ভক্তাত্মা।

দশাবতারের মধ্যে রামচন্দ্রকে সপ্তম অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং পঞ্চবিংশ লীলাবতারের মধ্যে তিনি বিংশ অবতার।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ ১৪০৮ ; ১৪ মে, ২০০১

পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন,—

"নৃসিংহ রাম কৃষ্ণেষু ষাড়্গুণ্যং পরিপূরিতম্।
পরাবস্থাস্তু তে তস্য দীপাৎ উৎপন্ন দীপবৎ।।"

যেমন প্রদীপ হইতে প্রদীপান্তরের উৎপত্তি হইলেও সকল প্রদীপই সমান ধর্ম্মাবলম্বী, তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে রাম ও নৃসিংহের অভিব্যক্তি হইলেও এই তিনজনই ষাড়্গুণ্যে পরাবস্থাপন্ন।

রামচন্দ্র নীতির মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাকে 'মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম' বলা হয়।

কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে সমস্ত রস অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী রস বর্ত্তমান। কিন্তু রামচন্দ্র-অবতারে আড়াইটী রস বর্ত্তমান ছিল। এই অবতারে বাৎসল্যরস সঙ্কুচিত হইয়াছে। মধুর রস ত' নাই-ই। রামচন্দ্র একপত্নী-ব্রতধর ছিলেন। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ রামচন্দ্রকে পতিরূপে পাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—এই লীলায় উহা সম্ভব নহে। কৃষ্ণলীলায় ঋষিচরী গোপীরূপে জন্মলাভ করিয়া গোপী আনুগত্যে উহা সম্ভব হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। রাম-নৃসিংহাদি তাঁহার অংশ বা কলা। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন,—

"রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৯)

কলাবিভাগে (অংশাংশভাবে) রামাদিমূর্ত্তিতে ভগবান্ জগতে নানা অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে পরমপুরুষ স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

পদ্মপুরাণে 'রাম'-শব্দের অর্থ বলিয়াছেন,—

"রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রাম পদেনাসৌ পরং ব্রহ্ম অভিধীয়তে।।"

অর্থাৎ—জড়বিষয়-বিনিবৃত্ত যোগিগণ অনন্ত অর্থাৎ জড়াতীত সত্যানন্দ চিদাত্ম-স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমতত্ত্বে রমণ অর্থাৎ আনন্দলাভ করেন। এইজন্যই পরম ব্রহ্মবস্তুকে 'রাম'-নামে অভিহিত করা হয়।

"রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে।।"

অর্থাৎ—রাম রাম রাম বলিয়া মনোরম যে রাম নাম তাহাতে আমি রমণ (আনন্দলাভ) করি। হে বরাননে! একটী রাম নাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য।

রাম ও কৃষ্ণনামে পরমব্রহ্ম সমান অর্থকত্ব। কিন্তু লীলাগত বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন,—

"সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্।
একবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি।।" (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ)

বিষ্ণুর পবিত্র সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল লাভ হয়, কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ করিলেই সেই ফল দিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই—এক রাম নাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য। সুতরাং তিনবার রামনামের ফল একবার কৃষ্ণনামেই পাওয়া যায়।

"বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখ-মৌলি-বলিং রমণীয়ম্।
কেশব-ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে।।"

হে কেশব! হে রামরূপধৃক্! হে জগদীশ! তুমি দশানন সংহারকালে (ইন্দ্রাদি) দশদিক্‌পালের (তুষ্টিনিমিত্ত তাঁহাদের) চিরবাঞ্ছিত রাক্ষসরাজের দশমুণ্ড রমণীয় বলিরূপে তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন ; হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও।

কিম্পুরুষবর্ষে জগৎকারণভূত লক্ষ্মণাগ্রজ সীতাপতি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণ সান্নিধ্যে নিবিষ্টচিত্তে উপবিষ্ট হইয়া পরমভাগবত শ্রীহনুমান অপ্রতিহত ভক্তিসহকারে কিম্পুরুষবর্ষ-বাসিগণের সহিত তাঁহার উপাসনা করিতেছেন।

রঘুকুলপতি, রামচন্দ্র, অযোধ্যা-অধিকারী।
সুর-নরগণ, পূজে চরণ, মুনিগণ ভয়হারী।।
জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম, জয় জয় রাম।

গন্ধর্ব্বগণ প্রভু রামচন্দ্রের যে পরমকল্যাণময়ী চরিত গান করিয়া থাকেন, কিম্পুরুষ-পতি আর্ষ্টিসেনের সহিত হনুমান তাহা অতি সাবধানে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেছেন।

"পুরুষো রামচরিতং শ্রবণৈরূপধারয়ন্।
আনৃশংস্য পরো রাজন্ কর্ম্মবন্ধৈর্বিমুচ্যতে।।" (ভাঃ ৯।১১।২৩)

শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন,—হে রাজন্! যে ব্যক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা রামচন্দ্রের চরিত ধারণ করিবেন, তিনি মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবিগ্রহ

'বিগ্রহ'-শব্দটীকে বিশ্লেষণ করিলে 'বি' আর 'গ্রহ' দুইটী শব্দ পাওয়া যায়। 'বি'-শব্দের অর্থ বিশেষরূপে, আর 'গ্রহ'-শব্দের অর্থ গ্রহণ করা। তাহা হইলে বিশেষরূপে গ্রহণ করা হয় যাঁহাকে তিনিই বিগ্রহ। আবার 'গ্রহ'-শব্দের অর্থ উপাদান। যিনি বিশেষ উপাদান স্বীকার করিয়াছেন, তিনি বিগ্রহ। যেমন---

হেনকালে তথায় আইলা হরিদাস।
শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তি যাঁর বিগ্রহে প্রকাশ।। (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১৬)

হরিদাস-বিগ্রহ বিষ্ণুভক্তি নামক উপাদানে গঠিত অর্থাৎ তাঁহার বিগ্রহ বিষ্ণুভক্তি অবলম্বিত। ঠাকুর হরিদাস শুদ্ধভক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ। আবার বিগ্রহকে বপু, দেহ, মূর্ত্তি প্রভৃতি বলা হয়। মূর্ত্তি কাহাকে বলে?—

যখন হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ শক্তির যুগপৎ সমভাবে অভিব্যক্তি ঘটে কোন বিশুদ্ধসত্ত্বে, তখন ঐ বিশুদ্ধসত্ত্বকে মূর্ত্তি বলা হয়। "যুগপৎ শক্তিত্রয় প্রধানাং মূর্ত্তিঃ।" (ভগবৎসন্দর্ভঃ ১০৩)। আবার "ভগবদাখ্যায়াঃ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তেঃ প্রকাশহেতুত্বাৎ মূর্ত্তিরিত্যর্থঃ।" (ভগবৎসন্দর্ভ ১০৩)। ভগবদ্বিগ্রহপ্রকাশ বিশুদ্ধসত্ত্ব মূর্ত্তি। অর্থাৎ শ্রীভগবানের বিগ্রহ শক্তিত্রয়প্রধান শুদ্ধসত্ত্বময় মূর্ত্তি।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্ব্বকারণকারণম্।।" (ব্রঃ সং ৫।১)

শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। যাঁহার বিগ্রহ সৎ, চিৎ ও আনন্দময়, তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। 'সৎ'-শব্দের অর্থ অস্তিত্ববান্ অর্থাৎ যাঁহার সত্তা আছে তিনি সৎ। শ্রীকৃষ্ণের দেহ নিত্যসত্তাযুক্ত, নিত্য সদ্বস্তু। কৃষ্ণের দেহের কোনকালেই অভাব ছিল না, বর্ত্তমানে অভাব নাই এবং ভবিষ্যতেও অভাব থাকিবে না অর্থাৎ কৃষ্ণবিগ্রহ কালাতীত। কালিক বিচারে নিত্যবস্তুর বিচার চলে না। 'চিৎ'-শব্দের অর্থ চৈতন্য। কৃষ্ণবিগ্রহ পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ। কৃষ্ণ আনন্দময় বিগ্রহ। ঘনীভূত আনন্দই তাঁহার দেহ। এই আনন্দ মায়িক আনন্দ নয়। এই আনন্দ চিন্ময় আনন্দ। সেইকারণে তাঁহার বিগ্রহ চিদানন্দঘন বিগ্রহ। তাঁহার দেহ রক্ত-মাংসে গঠিত পাঞ্চভৌতিক দেহ নয়। তাঁহার দেহ সচ্চিদানন্দময় বলিয়া দেহ-দেহী ভেদ নাই, যাহা জীবের আছে। জীবের দেহ ও দেহী দুইটী ভিন্ন বস্তু, সে-কারণে জীবের দেহ-দেহী ভেদ আছে। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময়, তাঁহার বিগ্রহও সচ্চিদানন্দময়। জীবের দেহীর শক্তি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিভিন্নপ্রকারে প্রকাশিত হয় এবং এক একটী ইন্দ্রিয় এক এক প্রকার কাজ করে। একটী বিশেষ ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে না। যেমন কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা নাসিকার কার্য্য সম্ভব নহে। কিন্তু কৃষ্ণ-বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ বলিয়া বিগ্রহের সর্ব্বত্রই সমভাবে এই গুণ বিদ্যমান। অতএব তাঁহার যে কোন ইন্দ্রিয় অপর ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে পারে।

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। (ব্রঃ সং ৩২)

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ উজ্জ্বল বিগ্রহ এবং তাঁহার অঙ্গসমূহই সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিযুক্ত অর্থাৎ একটী বিশেষ ইন্দ্রিয় নিজবৃত্তি ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তিযুক্ত হয়। তাঁহার বিগ্রহ আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়। কৃষ্ণবিগ্রহ চিৎস্বরূপ। চিৎস্বরূপে অঙ্গ-অঙ্গী, ধর্ম্ম-ধর্ম্মী, দেহ-দেহীর ভেদ থাকিতে পারে না। কৃষ্ণ অঙ্গী হইলেও তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গই পূর্ণ-কৃষ্ণ। চিদ্বৃত্তি তাঁহার সকল অঙ্গে পূর্ণভাবে বিদ্যমান্। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড পূর্ণ চিত্তত্ত্ব। "সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।'" (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৩৫)। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের তনু সচ্চিদানন্দ।

'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি,—তিন চিদানন্দ-রূপ।।" (চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১৩১)

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবিগ্রহ এবং কৃষ্ণের স্বরূপ অর্থাৎ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ—এই তিন ভেদরহিত। নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ তিনই চিদ্বস্তু—তিনই চিদানন্দ-রূপ।

শ্রীকৃষ্ণের নরবপু বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক। তিনি আনন্দঘন-বস্তু, আর আনন্দঘন-বস্তুই বিভু। "অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।" (কঠোপনিষৎ ১।২।২০)। তিন অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইতে পারেন, আবার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইতেও পারেন। অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রাবস্থায়ও তিনি বিভু ; আবার যখন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তখনও তিনি বিভু। "নরাকৃতি পরং ব্রহ্মেতি স্মরণাৎ পরং শ্রীকৃষ্ণং ধীমহি।" "পরং ধীমহি—পর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি। পর-শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ, তাহা কিরূপে সম্ভব?। তাহার উত্তর—'নরাকৃতি পরংব্রহ্ম'—পরমব্রহ্ম নরাকৃতি—এই কথা স্মরণ করিয়া, নরাকৃতি পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করিবার জন্য 'পরম্' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ১৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নরবপু ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন। তাঁহার দেহ পরিমিত। এই পরিমিত দেহেই তিনি সর্ব্বব্যাপক। মৃদ্ভক্ষণ-লীলাই ইহার উত্তম প্রমাণ।

যশোদামাতা শিশু শ্রীকৃষ্ণের মুখগহ্বরে অনন্তকোটি ভগবদ্ধাম, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, ব্রজধাম ইত্যাদি দর্শন করিলেন। যদি শিশু কৃষ্ণ বিভু না হইতেন, তাহা হইলে মাতা যশোদা ঐ রূপ দর্শন লাভ করিতে পারিতেন না। দামবন্ধন-লীলা এবং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সম্মুখে দ্বারকা-মাহাত্ম্য প্রকট-লীলাতেও তিনি তাঁহার বিভুত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়াও কৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে নরবপুতেই বিভু।

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্।।"

শ্রীউদ্ধব শ্রীবিদুরের নিকট জ্ঞাপন করিতেছেন,—

শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি গোলোকের নিত্যবিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়াবলে মর্ত্ত্যলীলায় উপযোগী স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ অঙ্গবিশিষ্ট এবং সৌভাগ্যঋদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত শ্রীমূর্ত্তিটির যে রূপ তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন করে।

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন,—"কীদৃশং মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং নরাকৃতিত্যর্থঃ" নরাকৃতি কৃষ্ণমূর্ত্তি মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী অর্থাৎ মনুষ্যলীলার উপযোগী।

স্বীয় নরলীলোপযুক্ত শ্রীমূর্ত্তির সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মুগ্ধ।

"কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ২১।১০১)

বৈকুণ্ঠাদি ধামে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে লীলা করিয়া থাকেন।। কিন্তু সকল লীলার মধ্যে নরলীলাই সর্ব্বোত্তম। সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ ঘটিয়াছে, নরলীলায়। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ নর-অভিমানে লীলা করিয়াছেন। এই লীলা নরের ধ্যান-ধারণাদির উপযোগী। ব্রজ পরিকরদের সহিত লীলা করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই কারণে নরলীলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

নরবপু ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে লীলা করিয়াছিলেন। নরাকৃতি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ—অনাদিসিদ্ধ রূপ অনাদিকাল হইতেই তাঁহার দ্বিভুজরূপ। বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন,—"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতিঃ।" (৪।১১।২)। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নরাকৃতি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হয়েন। নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপ। এই নরাকৃতি কেমন? নরলীলার উপযোগী গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর। ইহা অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় বিগ্রহ।

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। (ব্রঃ সং ৫।৩৮)

প্রেমাঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিনয়নে অর্থাৎ প্রেমভক্তিযোগে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ সাধুগণ প্রাকৃত বিচারাতীত রূপ-গুণবিশিষ্ট যে শ্যামসুন্দরকে স্ব-স্ব শুদ্ধ হৃদয়ে অবলোকন করিয়া থাকেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি।

জড়ীয় শ্যামবর্ণ বলিতে আমরা যাহা বুঝি শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরূপ তাহা নহে। শাস্ত্রে

কৃষ্ণের শ্যামবর্ণকে 'চিদ্বৈচিত্র্যগত নিত্যসুখদ বর্ণ' বলিয়া কথিত হইয়াছে। জড়নেত্রে ইহাকে অবলোকন করা যায় না। প্রেমিকভক্ত ভক্তিভাবিত হৃদয়ে অদ্যাপিও শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের 'গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর' মূর্ত্তি কল্পিত নয়। প্রেমিকভক্তের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনে তাহা পরিদৃষ্ট। (ক্রমশঃ)

—শ্রীভবদ্বন্ধু দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

স্থান—শিলং, তাং ১০।৫।১৯৯৩

সনাতন ধর্ম্ম গুরুবাদী ধর্ম্ম—একথা সব জায়গায় বলা আছে। আবার সনাতন ধর্ম্ম বেদনিষ্ঠ ধর্ম্ম—একথাও বলা আছে। গুরুবাদী ধর্ম্ম নিয়ে আজ আমি বিশেষ কিছু আলোচনা করছি। যেখানে গুরুতত্ত্ব সেখানেই আশ্রিত-তত্ত্ব রয়েছে। শাস্ত্র তিনভাবে প্রকাশিত। শাস্ত্রে যে বর্ণিত বিষয়, বিশেষ করে যে-সব প্রমাণিক গ্রন্থ তাতে দেখা যায়, আলোচনার বিষয়বস্তু তিনটে বিষয় নিয়ে—সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন-তত্ত্ব। এই তিনটে নিয়েই আলোচনা হয়েছে। সম্বন্ধ মানে আমরা জীবাত্মা, পরমাত্মা ভগবান্ কে? আমরাই বা কে? এ সম্বন্ধ মেনে নিতে হয়। যদি ভগবান্ আমাদের উপরওয়ালা, তাহলে তাঁর সঙ্গে কিরূপ সম্পর্ক স্থাপন করব? কিভাবে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হবে?—এই চিন্তা-ভাবনা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যদি ভগবান্ আমাদের অত্যন্ত আপনজন—নিজজন, তাহলে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়েছে কেন, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়েছি কেন আমরা? এই প্রশ্ন আসে। যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু এখন পুনরায় ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কি উপায়? সেখানে বলছেন শাস্ত্র,—সাধন-ভজনের দ্বারাই সে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং সেই সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম একমাত্র ভক্তিবৃত্তি। তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে প্রয়োজন-তত্ত্ব। সাধন-ভজনের চরম ফল কি? আমরা কতটুকু কি পেতে চাই, আর সাধন-ভজনের বাস্তব পরিপূর্ণ ফলটা কি? এই তিনটে বিষয় শাস্ত্রে আলোচনা হয়েছে। বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে, রামায়ণে, মহাভারতে, গীতায়—সব জায়গায় ঠিক একই ঢঙে শাস্ত্র আলোচিত হয়েছে। আমাদের হৃদয়ে যতপ্রকারে সংশয়, সন্দেহ, প্রশ্ন আসে, সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই শাস্ত্রে দেওয়া আছে। খুব বেশী দূর যেতে হবে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে যত রকম প্রশ্ন আমাদের হতে পারে সব প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া আছে। ভাগবত পর্য্যন্ত এগোবার প্রয়োজন হয় না। আলোচনার ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনা যখন আমরা করি, তখন দেখি ভাগবতের আলোচনা শেষ হয়েছে পূর্ণ শরণাগতিতে। পূর্ণ আত্মসমর্পণে গীতার বিচার শেষ হয়েছে। একটা কীর্ত্তন হচ্ছিল,—

ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার।।

ষড়ঙ্গ শরণাগতি কি?—

দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
'অবশ্য রক্ষিবেন কৃষ্ণ',—বিশ্বাস-পালন।।
ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার।।

এই ছয়রকম ধরণের শরণাগতি। শাস্ত্রে শ্লোকাকারে বর্ণিত হয়েছে,—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ।।

এটা যাঁর হয়েছে, যাঁদের হয়েছে, তাঁরা তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি। তত্ত্বজ্ঞানী তাঁদের বলা হবে। যাঁদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়েছে তাঁরা কিন্তু বাইরে অনেক লোকের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে চান না। তাঁদের একটা পৃথক্ চিন্তা-ভাবনা আছে। তাঁদের অধিকারোচিত যে ব্যবহার, সে ব্যবহারে সাধারণ মানু: আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না। মনে হয়, ওঁরা যেন ওঁদের নিজেদের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কথাটা কিরকম? শ্রীমদ্ভাগবতে প্রশ্নটা তুলেছেন প্রহ্লাদ মহারাজ।—

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।

পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন। এই বাক্যের দ্বারা প্রহ্লাদ মহারাজ কি রকম ব্যক্তি বা কোন্ দলের লোক বুঝতে পারা যায়। সাধু-মহাজনদের ভিতরে দুই শ্রেণীর ব্যক্তি আছেন। একপ্রকার হচ্ছেন ভজনানন্দী, আর একপ্রকার আছেন গোষ্ঠানন্দী। ভজনানন্দী যাঁরা তাঁরা বহু লোকসংঘট্ট পছন্দ করেন না। নির্জ্জন স্থান পছন্দ করেন এবং সেইভাবে নিজের সাধন-ভজন করেন। আর গোষ্ঠানন্দী নিজে সাধন-ভজন করেন এবং বহু ব্যক্তিকে সাধন-ভজনের সুযোগ দেন। প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, তিনি গোষ্ঠানন্দী। তিনি নিজে সাধন-ভজন করছেন এবং সকলকে সাধন-ভজন করাবেন। সাধু-মহাত্মাদের এই অবস্থা দেখে অনেকে ভুল করে ফেলেন। অনেকেই উল্টোপাল্টা কিছু বুঝে ফেলেন। ভুলবুঝাবুঝি—Misunderstanding হয় সেখানে।

অপরকে সাহায্য করতে গেলে নিজের কিছু লোকসান হয়, কিছু সময় নষ্ট হয়। তা হবেই। অধিকার বিচারের প্রশ্ন আছে এখানে। প্রাথমিক অবস্থায় যারা সাধন-ভজনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের বলা হয়েছে প্রাকৃত ভক্ত। ভুল-ভ্রান্তি হয়

তাদের, ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে তাদের, কিন্তু বিষয়বস্তুকে ছেড়ে দিলে হবে না, প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। শাস্ত্রে যে-সকল বিধি-নিষেধ আছে, সেগুলো ঠিক ঠিক ভাবে পালন করে যেতে হবে—একথা বলা আছে। মধ্যম অধিকারী যিনি তিনি কিন্তু সকলকে নিয়ে চলবার চেষ্টা করছেন। ভাল-মন্দ বিচারটা পাশাপাশি রাখছেন। সেখানে আছে তুলনামূলক আলোচনা—Comparative study। তুলনামূলক আলোচনা ত' ভাল, এইটা এইটা তুমি অনুশীলন করবে, অভ্যাস করবে জীবনে। এটা এটা খারাপ, ছেড়ে দেবে, এ জিনিষ কখনও রাখবে না। পরিত্যাগ করবে সর্ব্বতোভাবে। সেখানে ভালমন্দের বিচারটা সবসময় পাশাপাশি রেখে বুঝাতে হচ্ছে। যাকে বলা হয় ভক্তি-অনুকূল এবং ভক্তি-প্রতিকূল বিষয় গ্রহণ ও বর্জ্জন। তৃতীয় অধিকারী যিনি তাঁর ক্ষেত্রে তিনি কোনটা দেখছেন না। গৌরের আমার সব ভাল, তিনি কারও দোষ-ত্রুটী নিতে যাচ্ছেন না। কারও গুণ নিয়েও ব্যাখ্যা করতেও যাচ্ছেন না। আপনভাবেই বিভাবিত, 'স্বানুভাবানন্দী' যাঁকে বলা হয়, আত্মারাম।

আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলছেন আত্মারাম মুনি-ঋষিগণের কথা। তাঁরা প্রাকৃত জগতের কোন ভাল-মন্দের মধ্যে নাই। এখানকার যে সব আইনকানুনগুলো আছে সাধক-সাধিকার ক্ষেত্রে, সে সমস্ত আইনকানুনের উর্দ্ধে তাঁরা। এখন এঁদের পরস্পর কিরূপ ব্যবহার, কিরূপ চালচলন, কিভাবে এঁরা সমাজে চলবেন, সেগুলো শাস্ত্রে খুব ভালভাবে বুঝানো আছে।

যারা সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হন নাই, তাদের সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কিছুক্ষণ আগেই সেইরূপ কীর্ত্তন শুনলাম। সাধন-ভজন যারা আরম্ভ করেছেন সদ্‌গুরুর উপদেশক্রমে, তারা ঠিক পথে চলতে আরম্ভ করেছেন। তাদের একরকম অধিকার। মধ্যম অধিকার, উত্তম অধিকার—এসব নিয়ে শাস্ত্রে আলোচনা রয়েছে।

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিত-সঙ্গলব্ধ্যা।।

এই শ্লোকে বৈষ্ণব-মহাজন তিনি পদ্যানুবাদ করেছেন,—

"হরি হে!
সঙ্গদোষশূন্য, দীক্ষিতাদীক্ষিত, যদি তব নাম গায়।
মানসে আদর, করিব তাঁহারে, জানি' নিজ-জন তা'য়।।

যিনি এখনও সাধন-ভজনপথে প্রবেশ করেন নাই, তার কথা বললেন এখানে।

"দীক্ষিত হইয়া, ভজে তুয়া পদ, তাঁহারে প্রণতি করি।"

কনিষ্ঠাধিকারীর কথা বললেন এখানে। তাদের পরস্পরের ভিতরে এইরকম ব্যবহার। দণ্ডবৎ-প্রণতি, পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা। কুশল জিজ্ঞাসা বললেই একরকম কুশল জিজ্ঞাসা নয়। দেহের কুশল জিজ্ঞাসা, মনের কুশল জিজ্ঞাসা, আত্মার কুশল জিজ্ঞাসা—এই তিনরকম কুশল জিজ্ঞাসা। রাস্তায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, ভায়া হে, ভাল আছ ত'? প্রশ্ন করা হল। কে কার কুশল জিজ্ঞাসা করল? আমরা তার গভীরে প্রবেশ করি না। চলছে একরকম, চলে যাচ্ছে—এরকম উত্তর দিয়ে দেই। কিন্তু কুশল জিজ্ঞাসা কে করল? কার কুশল জিজ্ঞাসা করল? স্থিরভাবে বিচার করলে আমরা দেখব, এক জীবাত্মা অন্য এক জীবাত্মার কুশল জিজ্ঞাসা করছে। এইগুলো বিচারের কথা। যখন দেহাধার হতে জীবাত্মা বিনিষ্ক্রান্ত হচ্ছেন, তখন ত' কুশল জিজ্ঞাসা আর নাই। তাহলে যতক্ষণ দেহাধারে জীবাত্মার অধিষ্ঠান ততক্ষণ কুশল জিজ্ঞসার প্রশ্ন।

"দীক্ষিত হইয়া, ভজে তুয়া পদ, তাঁহারে প্রণতি করি।
অনন্য-ভজনে, বিজ্ঞ যেই জন, তাঁহারে সেবিব হরি।।"

এই অনন্য-ভজনে বিজ্ঞ যেই জন, ইনি হলেন মধ্যমাধিকারী। এরপরে উত্তমাধিকারী ভক্ত মহাভাগবতের কথা বলছেন।

সর্ব্বভূতে সম, যে ভক্তের মতি, তাঁহার দর্শনে মানি।
আপনাকে ধন্য, সে সঙ্গ পাইয়া, চরিতার্থ হইলু জানি।।

উত্তমাধিকারের কথা। সর্ব্বভূতে সম, সমদর্শী সাধু। গীতা-ভাগবতে সমদর্শনের কথা লেখা আছে, সমদর্শী সাধুর বর্ণনাও আছে। তাঁরা কিরকম এ সংসারে থাকেন, চলেন।

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি চ হস্তিনী।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।

সমদর্শন কি? সমদর্শন সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান একটা কথা আছে। এখানে কি বলব বিষ্ঠাও যা, চন্দনও তাই? এইরকম দেখাটাই কি সমদর্শন? নিশ্চয়ই নয়। আবার একরকম সমদর্শনের কথা—মাটি টাকা, টাকা মাটি। আমি টাকাকেও মাটি বলব না, আর মাটিকেও টাকা বলব না। অথচ কথাটা এসেছে। টাকা খোলাম কুচি বলি, এক আসক্তির ক্ষেত্রে বুঝানো হয়েছে। আর বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, একটা গাভীকে, একটা হস্তীকে, একটা চণ্ডালে, একটা কুকুরে যে সমদর্শন, এটা বা কি? সেখানে শাস্ত্র বুঝাচ্ছেন আত্মদর্শন। প্রত্যেক শরীরেই জীবাত্মার অধিষ্ঠান এবং তার সঙ্গে সঙ্গেও পরামাত্মার অধিষ্ঠান সাক্ষীস্বরূপ অণু-পরমাণুর মধ্যেও। 'স্পন্দ' নামে একটা কীট আছে, সাধারণতঃ সেটা দেখা যায় না। তার ভিতরেও জীবাত্মা, পরমাত্মার অধিষ্ঠান। এই দর্শনকে বলে সমদর্শন। ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আমরা একটা

কুকুরকে দেখলে দূর দূর করছি, আবার একজন মহাভাগবত কুকুরটাকে দেখে প্রণাম করছেন। লোকটা কি পাগল, কুত্তাকে দেখে প্রণাম করে? পাগল নন, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি। তিনি ওই কুকুরের শরীরের মধ্যে জীবাত্মার অধিষ্ঠান দর্শন করছেন। শুধু জীবাত্মার দর্শন নয়, তার পাশে সাক্ষীস্বরূপ যে পরমাত্মা আছেন, তাঁরও দর্শন করছেন। দুটোই একইসঙ্গে হয়। আমি কিছুটা দেখলাম, কিছুটা দেখলাম না, এ অস্পষ্ট দর্শন, এটা ঠিক নয়, পূর্ণদর্শন—বাস্তবদর্শন, তত্ত্বদর্শন।

আমাদের শাস্ত্রে যতগুলো কথা বুঝানো আছে তার মধ্যে গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্ শব্দগুলো এসেছে। এগুলো যখন Personified হয় তখনই ভুল করে ফেলি আমরা। Personified হচ্ছে যখন এটা তখনই একটা Gross কিছু হয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃত জগতের স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন একটা বিচারের মধ্যে এসে যাচ্ছে। কিন্তু জিনিষটা তা নয়। Ontological aspect—তত্ত্ববিজ্ঞান দরকার আমাদের। সেইটী আমাদের আলোচ্য বিষয়, সেইটী আমাদের ধ্যান-ধারণা, সেইটীই আমাদের সাধন-ভজন। Morphology—জড়বিজ্ঞান, বস্তুবিজ্ঞান নিয়ে দুনিয়া চলছে। এটার প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা সাধারণ মানুষের প্রায় সকলেরই আছে। কিন্তু নাই যেটা সেইটার অনুশীলন, অভ্যাসের কথা শাস্ত্রে বলছেন। সেটা হল Ontological aspect—তত্ত্ববিজ্ঞান। সেই উপদেশ শাস্ত্রে রয়েছে। আমরা সবসময় সেই তত্ত্ববিজ্ঞানেরই অনুসন্ধান করব।

পাশ্চাত্ত্যদেশ থেকে একটা কথা এসেছে, কথাটা আমাদের দেশের নয়, এটা নিয়ে আলোচনাও হয় মাঝে মাঝে,—"Material science ends in philosophy and philosophy ends in religion." কথাটা কিন্তু খুব চিন্তা করবার। জড়বিজ্ঞান শেষ হয়েছে দার্শনিক বিচারের মধ্যে। দার্শনিক জগৎ যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে ধর্ম্মজগৎ আরম্ভ হয়েছে। তাহলে ধর্ম্মজগৎ কাকে বলে? সে ধর্ম্মটা কি? আলোচনার বিষয় এটা। Material science—জড়বিজ্ঞানের বিচার যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে আরম্ভ হচ্ছে দার্শনিক জগৎ—Philosophy আরম্ভ হচ্ছে। Philosophy কিন্তু দুরকম—আস্তিক্য দর্শন ও নাস্তিক্য দর্শন। দুটোকেই দর্শনের মধ্যে ফেলেছেন। কিন্তু আমি নাস্তিক্য দর্শন চাই না। তুলনামূলক আলোচনা করব কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ। কোন্‌টা কতটুকু বলা, কতটুকু করা প্রয়োজন তা নিয়ে আলোচনা করব। যার যতটুকু ভাল ততটুকু গ্রহণ করব, যেটার যতটা খারাপ আমি ততটা বর্জ্জন করব। কিন্তু আমাকে জেনে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বলছেন দার্শনিক জগৎ যেখানে শেষ হচ্ছে, সেইখানে ধর্ম্মজগতের কথা আসছে। Philosophy ends in religion—ঠিক সেই Religionটা কি? সেই ধর্ম্মটা কি? সেটা আত্মধর্ম্ম ; দেহধর্ম্মও নয়, মনোধর্ম্মও নয়। একথা বুঝাচ্ছেন।

শাস্ত্র বেদনিষ্ঠ ধর্ম্মের কথা বলেছেন। আমাদের সনাতনধর্ম্ম হচ্ছে বেদনিষ্ঠ ধর্ম্ম অর্থাৎ বেদ হল তার মুখ্য প্রমাণ। বেদকে বলা হয়েছে অপৌরুষেয়। কোন মানুষ তৈরী করেন নাই। তাহলে কোথা থেকে কিভাবে এল? ভগবানের নিঃশ্বসিত বাণী। তাকে বলে বেদ। আবার ব্যাখ্যা দিতে গেলে বলা আছে—"পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ম্" বেদ হল পরোক্ষবাদ—Indirect speech। বেদের যে উপদেশ সেটা সোজাসুজি বলা হয় নাই। এটা করলে ভাল, এটা করা ভাল—এইরকম কথাগুলো Passive voice—ভাববাচ্যে বলা হয়েছে। সোজাভাবে বলা হয় নাই। কিন্তু আর যে সব ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে তার অধিকাংশগুলি Direct speech। যেমন—গীতা, ভাগবত। এতে ক্ষমতা অধিক দেওয়া আছে। এর সামান্য কিছু আলোচনা করলে প্রচুর জানা যায়, বুঝা যায়। Direct speechএ ক্ষমতা সবচেয়ে অধিক দেওয়া আছে। এজন্য বলছেন—'পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ম্'।

কি বলছেন সেখানে?—'কর্ম্মমোক্ষায়'। কর্ম্মই ধর্ম্ম কিভাবে হয়? কর্ম্ম অধর্ম্ম হয়ে যাচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে। কেন? চোর চুরি করছে, ডাকাত খুন করছে, লুটতরাজ করছে। এটাও ত' একরকমের কর্ম্ম। কিন্তু এ কর্ম্মের দ্বারা জগতের কোন কল্যাণ হচ্ছে না। Individual কল্যাণ হচ্ছে না, Collective কল্যাণও হচ্ছে না। অথচ জিনিষটা ঘটছে। ওটা ভাল জিনিষ নয়। আবার পরোপকারবৃত্তি নিয়ে যে কর্ম্ম, এটা এক ধরণের। এটাতে কিছু পুণ্য হয়। পুণ্যের ফলে আমরা কোথায় যাব? স্বর্গে। আরও উপরে যদি যেতে ইচ্ছা হয়, তাও যাওয়া যাবে ; কিন্তু সবই বেদের বিধানের মধ্যে স্থানগুলো। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ third dimension, fourth dimensionএ আছে মহঃ, জন, তপঃ সত্য। পরপর সাতটা। সাধারণ লোকের যদি আমি কিছু উপকার করি, তাহলে এই এই স্থানে আমার থাকবার জায়গা হতে পারে। কিন্তু সবগুলো ধ্বংসশীল। মহাপ্রলয়ে এগুলো সব ধ্বংস হয়ে যায়, আবার নূতন করে সৃষ্টি হয়। সুতরাং যেই জায়গায় গেলে বার বার করে আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে, আমার Diversion হচ্ছে, নীচে নেমে আসতে হচ্ছে, সেখানে যাওয়াটা ত' বুদ্ধিমত্তা নয়। এমন জায়গায় যাওয়া উচিত, যেখানে গেলে আর ফিরতে হয় না। সেই জায়গাটা কোন্‌টা? ভগবানের জায়গাটা। যেখানে আমরা ছিলাম পূর্ব্বে।

বাংলাদেশ থেকে যারা ভারতে ঢুকছে, তাদের Evacuee বলা হয়, Displaced person বলা হয়, বাস্তুহারা বলা হয়। শাস্ত্র আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আমরা সবাই বাস্তুহারা যারা এখানে এসেছি। বাস্তুহারা যদি তাহলে বাস্তু আবার খুঁজে পাব কি করে? ঐ প্রশ্ন যদি আসে। আমাদের পূর্ব্বে যে বাস্তু ছিল, সে বাস্তু আমরা ভুলে গেছি। আর সেই বাস্তুর মালিক যিনি তাঁকেও ভুলে গেছি। সেইজন্য আমাদের এখানে খাটতে হচ্ছে, আর ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি সবই হচ্ছে।

আমাদের দাবী মানতে হবে, আমাদের দাবী মানতে হবে—এসব শ্লোগানগুলো আমরা শুনছি। কৃষ্ণ সেখানে বলছেন—তুমি কি কারও দাবী কখনও মেনেছ? তুমি যদি কখনও কারও দাবী মেনেছ, তাহলে তোমার দাবী কেউ মানতে পারে। কিন্তু তুমি কাকে বলছ, সবই ত' একই দলের লোক। কে কার দাবী মানবে? উপরওয়ালারা নিম্নের ব্যক্তিগণের কিছু দাবী মানতে পারেন। এখানে উপরওয়ালা কে? সবাই ত' বাস্তুহারা। কৃষ্ণ এইজন্য অর্জ্জুনকে বলছেন গীতার মধ্যে,—'যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।' যেখানে গেলে তোমাকে আর ফিরে আসতে হবে না, সেখানে চল অর্জ্জুন। তাহলে তোমাকে আর দুঃখ-কষ্ট করতে হবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রজনী প্রভাত হইল। দিনমণির উদয়ে অন্ধকার বিদূরিত হয়, প্রাণে নব আশা, নবীন উদ্দীপনা জাগে—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম অথবা শূন্য, বাতাস, আগুন, জল ও মাটি—এই চক্রাকারে সমস্ত রাশিচক্র আবর্ত্তিত হইতেছে সেই কোন অনাদিকাল হইতে এক অপরিহার্য্য পরিণতির পথে। সেই মহাপ্রলয়ঙ্করী পরিণতিরই এক ঝলক রূপ প্রকৃতিদেবী যেন ইঙ্গিতরূপেই বিংশ শতাব্দীর শেষ বর্ষে মেলিয়া ধরিয়াছিলেন। শতাব্দীর ভয়াবহতম বন্যা যখন একদিকে ভারতভূমির পূর্ব্বপ্রান্তে বঙ্গদেশের গঙ্গা-অববাহিকায় কল্পনাতীত তাণ্ডবতা প্রদর্শন করিতেছিল—তাহার প্রবল ক্ষয়ক্ষতির হিসাব-নিকাশ শেষ হইতে না হইতেই তখন অপরদিকে এক লহমায় একটু মৃৎকম্পে মৃদ্‌গর্ভে সবকিছুকে একেবারে মৃত্তিকায় পরিণতি টানিয়া দিল এই ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তে গুজরাট প্রদেশে। সমস্ত পৃথিবী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল অপরা প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর একটু ভ্রুকুটির খেয়ালে। শত বছর ধরিয়া মানব-মনীষায় সযত্নে গড়া বৈজ্ঞানিক উন্নতির আকাশচুম্বী প্রাসাদ নিমেষমাত্রেই ধরণীতে লুটাইয়া পড়িল—কাহারও কিছু করার ছিল না!

সুন্দর-ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর-সুন্দর সবকিছুর মধ্যেই একটী সূক্ষ্ম যোগসূত্র রহিয়াছে, সমস্ত যোগসূত্র একটী বৃহৎ সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। ইহাই চিরন্তন নিয়ম। সকলে ইহা অনুভব করিতে পারেন না, অভ্যাসের দ্বারাও ইহা দর্শন হয় না। ইহার জন্য চাই নির্ল্লিপ্ত, নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী—স্থির সূর্য্যের মত। রেলভ্রমণের সময় গবাক্ষপথে কত তিক্ত, মধুর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতে সতৃষ্ণ বা বিতৃষ্ণ হইয়া থাকিলে আর গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সম্ভব হইবে না। গবাক্ষপথের ঐসব দৃশ্য বিভিন্ন পর্দ্দার ন্যায় আমাদের লক্ষ্যবস্তুকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। স্থিরভাবে লক্ষ্যভেদ করিতে দেয় না।

এইভাবে পরিভ্রমণের পথে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে আমরা সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বিভ্রান্ত হইয়া প্রতিনিয়ত লক্ষ্যবস্তু হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বনিয়ন্তা,

নিত্য, স্থির বস্তু শ্রীভগবান্‌কেই ভুলিয়া থাকি। ইহাই আমাদের সর্ব্ববিধ দুঃখের মূল কারণ। কিছুতেই আমরা মায়িক অনিত্য বস্তুগুলিকে ভুলিয়া তাঁহার স্মরণ করিব না, ইহাই আমাদের মূল ব্যাধি। এই ব্যাধিগ্রস্ত হইবার ফলে তাঁহার আবির্ভাব ও আবির্ভাব-তিথি যে যুগপৎ অবিচ্ছিন্ন, ইহা আমরা কোনভাবেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

তবুও করুণাময় শ্রীভগবান্ আমাদের প্রতি করুণা করিয়া অবতীর্ণ হন। হতভাগ্য জীব আমরা তাঁহার সেই অবতরণ তিথিকেও নিজেদের অধিকারানুযায়ী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করি ও তাহাকে বিভিন্নপ্রকারে ব্যবহার করি। কেহ তাহাকে জীবিকার্জ্জনের উপায় বলিয়া গ্রহণ করি, কেহ তাহাকে যশ, প্রতিষ্ঠা, অর্থলাভের পথ হিসাবে ব্যবহার করি। কেহ তাহাকে বিলাসিতা বা আলস্যভরে সময় কাটানো বাহুল্য বলিয়া মনে করি। আবার কোনও তত্ত্বদর্শী নিজদের তত্ত্বদর্শনের স্বচ্ছ লেন্সে ইহাকে সেই একমাত্র লক্ষ্যবস্তু প্রাপ্তির পরমোপায় হিসাবে দর্শন করেন। আমরা নানাবিধ জড় কামনা-বাসনায় কালের চক্রে অস্থির বলিয়া নিত্য স্থির বস্তুকে পরিবর্ত্তনশীল ভাবিয়া বিবর্ত্তগ্রস্ত হই।

আমরা যাহাই ভাবিনা কেন নিয়মানুযায়ী যথাসময়েই সেই পুণ্যশ্লোকের পুণ্যতিথি আসিল। মাত্র কয়েকমাস পূর্ব্বেই যে অভূতপূর্ব্ব জলজোয়ারে শ্রীধাম নবদ্বীপ নিমগ্ন হইয়াছিল, ফাল্গুনী-পূর্ণিমার শুভাগমনে আর একবার জনজোয়ারে সমগ্র শ্রীধাম থৈ থৈ করিতে লাগিল।

গত ১৯শে ফাল্গুন (ইং ৩।৩।২০০১), শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে, সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় এবং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের সহৃদয় উপস্থিতিতে বিপুল সংখ্যক সন্ন্যাসী, মঠবাসী এবং গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীমঠে শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন এবং পরিক্রমা সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করিবার জন্য যোগ্যতানুযায়ী প্রায় সকলেই কিছু কিছু সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পরদিবস ২০শে ফাল্গুন (ইং ৪।৩।২০০১), রবিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশচীনন্দনের বিজয়বিগ্রহকে সুসজ্জিত পাল্কীতে আরোহণ করাইয়া সঙ্কীর্ত্তনমুখে সুবিশাল পরিক্রমা-মণ্ডলী শ্রীমঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। গঙ্গাদেবীকে স্পর্শ করিয়া শ্রীমায়াপুরের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণতি করিয়া, শ্রীগোদ্রুম-কাননে স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা-লাভোদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন। বহু বৎসর পর এই বৎসর শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি অনুসন্ধিৎসু ভক্তগণের বিশেষ উৎসাহের কারণ হয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রাকৃত জীবন-চরিত ও তাঁহার অতুলনীয় অবদান কীর্ত্তন এবং তাঁহার কৃপাভিক্ষাপূর্ব্বক পরিক্রমামণ্ডলী শ্রীহরিহরক্ষেত্রে উপস্থিত হন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহরিহরক্ষেত্রের শ্রীবিগ্রহ শ্রীমান্ চোর-কর্ত্তৃক কবলিত হইয়া পুলিসের গৃহে (থানায়)

আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৎসর তিনি স্বমহিমায় স্বগৃহে সদলবলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভক্তহৃদয়ের উৎকণ্ঠা নিরসন করিয়াছেন। ইহার পর সুবর্ণবিহার পরিক্রমা করিয়া সকলে শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপীঠ শ্রীনৃসিংহপল্লীতে উপস্থিত হন। এইস্থানে ভক্তিবিঘ্নবিনাশন ও ভক্তবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনান্তে অগণিত ধামবাসী ও পরিক্রমাকারী ভক্তগণ মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতায় সকলকে চমৎকৃত করেন।

২১শে ফাল্গুন (ইং ৫।৩।২০০১), সোমবার সীমন্তদ্বীপস্থ প্রৌঢ়ামায়াস্থান—পোড়ামা-তলা, বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজন-কুটীর ও সমাধিস্থান দর্শন করিয়া নিদয়া ঘাট হইতে রুদ্রদ্বীপের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবার পর গঙ্গাস্নানপূর্ব্বক চিড়া প্রসাদ পাইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। বর্ত্তমান বর্ষে একাদশী-তিথির উপবাস একদিন পিছাইয়া যাইবার জন্য পরিক্রমাসূচী একটু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল।

২২শে ফাল্গুন (ইং ৬।৩।২০০১), মঙ্গলবার শ্রীকোলদ্বীপস্থ সমুদ্রগড়ে শ্রীভীমসেনের প্রতিনিধি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজের শ্রীমুখে বীররসের পরিবর্ত্তে চাটুবাক্য ও শান্তরস শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী ভীমসেনের পূর্ব্ব প্রতিনিধির অভাব তীব্র অনুভব করিতেছিলেন। অতঃপর অপ্রাকৃত কবি শ্রীল জয়দেবের ভজনস্থলী চাঁপাহাটী পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-গদাধর দর্শন করিয়া যাত্রিগণ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় যথারীতি শ্রীগৌরসুন্দরের অবদান সম্পর্কে অপূর্ব্ব আলোচনা হয়।

২৩শে ফাল্গুন (ইং ৭।৩।২০০১), বুধবার শ্রীঋতুদ্বীপান্তর্গত রাধাকুণ্ডতট, শ্রীজহ্নুদ্বীপান্তর্গত বিদ্যানগরে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শ্রীপাট, শ্রীজহ্নুমুনির অবলুপ্ত আশ্রম এবং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট মামগাছি পরিক্রমা করিয়া তথায় খেচরান্ন প্রসাদ সেবা করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়।

২৪শে ফাল্গুন (ইং ৮।৩।২০০১), বৃহস্পতিবার অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রথম মিলনস্থলী—শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীচৈতন্যবাণী-বিগ্রহ জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, বৈরাগ্য-বিগ্রহ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির, কংসাংশে অবতীর্ণ শ্রীচাঁদকাজির সমাধি ও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী দর্শন, হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও সর্ব্বসাধারণে খেচরান্ন ও পরমান্ন মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীসমিতির সদস্যগণ প্রতি বৎসর যাত্রীসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবার ফলে যাত্রিগণকে সুষ্ঠুভাবে প্রসাদ পরিবেশনের জন্য একটী উপযুক্ত স্থানের অভাব বহুদিন হইতে বোধ করিতেছিলেন। পরম করুণাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ভক্তগণের সেই অভাব বর্ত্তমান বর্ষে দূর করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ও শ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় জগদ্গুরু

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরের অনতিদূরে এবং শ্রীচৈতন্যমঠের পার্শ্বে "*শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট*"-কর্ত্তৃক একটী ভূখণ্ড সংগৃহীত হয়। শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য, সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক এবং

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক মহারাজত্রয় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদ-বিহারীজীউ ও শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেবের জয়ধ্বনি ও ভক্তগণের উচ্চনিনাদে মহামন্ত্র কীর্ত্তন, মহিলাগণের হুলুধ্বনি মুখরিত এক আনন্দঘন পরিবেশে উক্ত সংগৃহীত ভূখণ্ডের শুভ উদ্বোধন করেন। তথায় যাত্রিগণকে সুষ্ঠুভাবে প্রসাদ পরিবেশন করিবার ব্যবস্থা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণও যৎপরনাস্তি আনন্দ অনুভব করেন এবং যাত্রিগণও ইহাতে পরমোল্লসিত হন। এইদিনও শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্যদেবের নিরপেক্ষ উপস্থিতিতে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ন্যায়ে বাৎসরিক পরিক্রমা নির্ব্বিঘ্নেই সমাপ্ত হয়।

২৫শে ফাল্গুন (ইং ৯।৩।২০০১), শুক্রবার শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির শুভাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ সমগ্র দিবসব্যাপী শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ করেন। অপরদিকে নিষ্কপটে শুদ্ধভক্তিধারায় অনুপ্রাণিত হরিভজনেচ্ছু ভক্তগণ অধিকারানুযায়ী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে শ্রীনাম-দীক্ষা গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় শুভক্ষণে সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশচীনন্দনের অভিষেক-ক্রিয়া, অর্চ্চন, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সুসম্পন্ন হয়।

২৬শে ফাল্গুন (ইং ১০।৩।২০০১), শনিবার শ্রীজগন্নাথ বিপ্রের আনন্দোৎসব-উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণের উদ্দেশ্যে শ্রীমঠের মহাপ্রসাদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই মহোৎসবে সর্ব্বসমেত লক্ষাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবসেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে চারজন মঠবাসী বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডি যতিবেষ এবং তিনজন বাবাজী-বেষ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যথাক্রমে ঃ—

পূর্ব্বনাম	বর্ত্তমান-নাম
১। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী	শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোস্বামী মহারাজ
২। শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী	শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমহংস মহারাজ
৩। শ্রীভাগবত ব্রহ্মচারী	শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ
৪। শ্রীগোবিন্দভক্ত ব্রহ্মচারী	শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আশ্রম মহারাজ
৫। শ্রীপরীক্ষিৎ ব্রজবাসী	শ্রীনিতাইদাস বাবাজী মহারাজ
৬। শ্রীনরোত্তম ব্রজবাসী	শ্রীনরোত্তমদাস বাবাজী মহারাজ
৭। শ্রীমনোহর ব্রজবাসী	শ্রীনিমাইদাস বাবাজী মহারাজ

—নামে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মুকুন্দ-সেবাব্রত সর্ব্বতোভাবে সাফল্যলাভ করুন এবং অশেষভাবে জয়যুক্ত হউন।

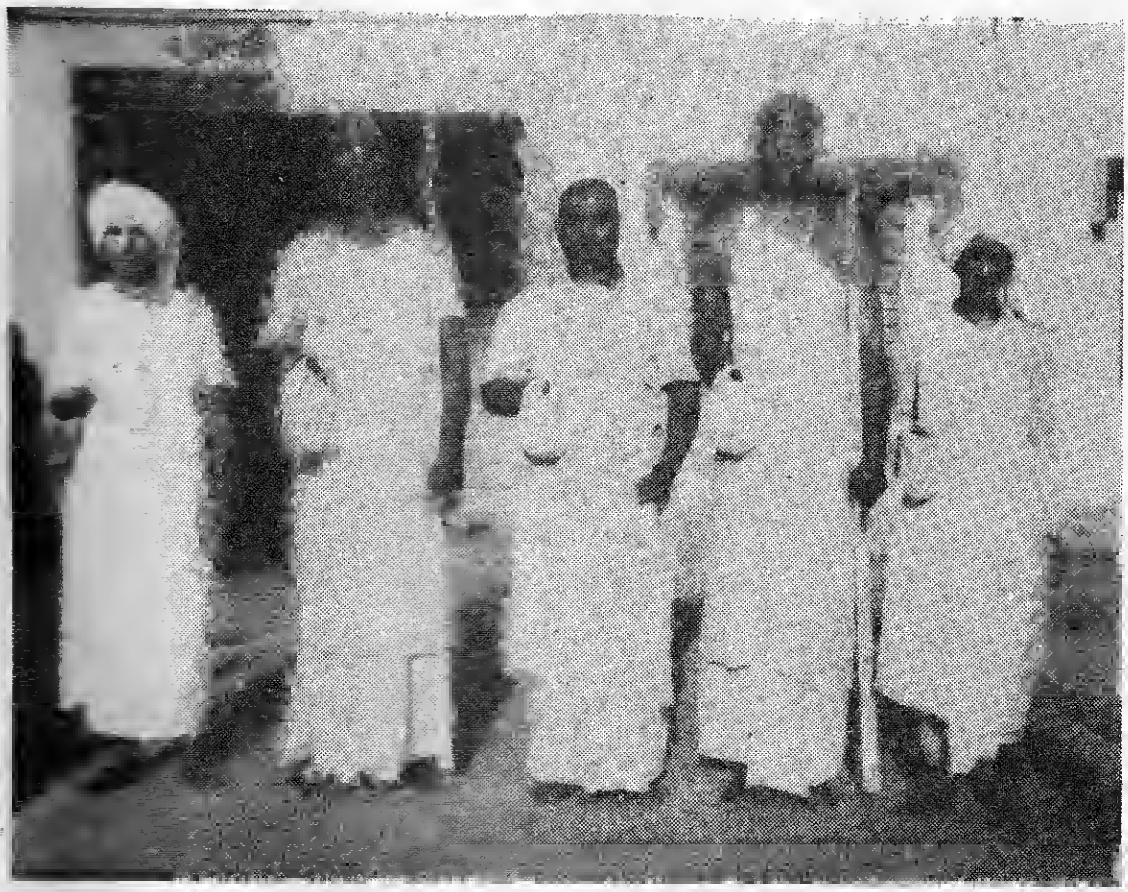

বামদিক হইতে—শ্রীনিতাইদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আশ্রম মহারাজ, শ্রীনরোত্তমদাস বাবাজী মহারাজ

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমার অব্যবহিত পরেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ অপর এক বৃহদনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য উদ্‌যোগ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শ্রীসমিতির হুগলী-জেলান্তর্গত বৈদ্যবাটীস্থ প্রচারকেন্দ্র শ্রীমাধবজীউ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম-পরিক্রমায় অংশগ্রহণকারী মঠবাসী ও গৃহস্থভক্তবৃন্দ পরমোল্লাসে উক্ত মঠে একত্রিত হইতে লাগিলেন। পরমকরুণাময় জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অপার অনুকম্পায়, পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে এবং সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের সুপরিচালনায় শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ অর্চ্চাবতারত্রয়ের প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব গত ৩০শে ফাল্গুন, ১৪০৭ (ইং ১৪।৩।২০০১) বুধবার ও ১লা চৈত্র (ইং ১৫।৩।২০০১) বৃহস্পতিবার দিবসদ্বয় যাবৎ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইলেন।

প্রথম দিবস অপরাহ্নে বিশাল নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। পরদিবস প্রাতঃকালে সঙ্কীর্ত্তনসহযোগে ব্রহ্মদ্রবময়ী গঙ্গাদেবীর পবিত্রোদক আনীত হইলে ক্রমান্বয়ে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, বৈষ্ণব-হোম, বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, অভিষেক, পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, ভোগরাগ এবং আরাত্রিকাদি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। অনন্তর সমাগত প্রায় ত্রিসহস্রাধিক ব্যক্তি শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবজীউর বিচিত্র মহাপ্রসাদ আকণ্ঠ সেবা করিয়া কৃতার্থ হন।

অপরাহ্নে পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের সভাপতিত্বে ধর্ম্মসভা আয়োজিত হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্মের শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ উক্ত ধর্ম্মসভায় যোগদান করিতে না পারায় শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিয়া গেল। যাহা হউক, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ এবং সর্ব্বশেষে সভার সভাপতি মহারাজ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব ও সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে অপূর্ব্ব শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করাইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে পরিপ্লুত করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্দিরের ভূমিপ্রদাতা শ্রীসুবল জানা (শ্রীসুবলসখা দাসাধিকারী) মহোদয় সপরিবারে শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণে ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করায় তাঁহারা শ্রীসমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীসমিতির তথা শ্রীমাধবজীউ গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ, আনুকূল্যকারী সুধী-ভক্তবৃন্দ ও প্রশাসন-বিভাগের সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসার্হ। তাঁহাদের এইরূপ সহযোগিতার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৩শ বর্ষ } ৯ বামন, গর্ভোদশায়ী, ৫১৫ শ্রীগৌরাব্দ
৩২ বৈশাখ, শুক্রবার, ১৪০৮, ইং ১৫/৬/২০০১ { ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীসায়ম্ভুব-মনুকৃত-শ্রীশ্রীভগবন্মহিমা-দশকম্

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে
একাদশেঽধ্যায়ে—১৬-২৩, ২৫-২৬]

শ্রীমনুরুবাচ,—

এবং প্রবর্ত্ততে সর্গঃ স্থিতিঃ সংযম এব চ।
গুণব্যতিকরাদ্রাজন্ মায়য়া পরমাত্মনঃ।। ১।।

(যক্ষগণের বিনাশ দর্শন করিয়া সায়ম্ভুব মনু স্বয়ং আগমনপূর্ব্বক পৌত্র ধ্রুবকে তত্ত্বোপদেশ প্রদানমুখে বলিতে লাগিলেন,—)

হে বৎস! এইরূপে ভগবানের মায়াদ্বারাই গুণসমূহের বৈষম্যবশতঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।। ১।।

নিমিত্তমাত্র তত্রাসীন্নির্গুণঃ পুরুষর্ষভঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং যত্র ভ্রমতি লৌহবৎ।। ২।।

ঈশ্বর গুণাধীশতত্ত্ব। তিনি সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে জড়া প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, নিমিত্তকারণ মাত্র। যেরূপ লৌহ নিশ্চেষ্ট হইলেও নিমিত্তস্বরূপ অয়স্কান্ত মণিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সচেষ্ট হয়, তদ্রূপ এই বিশ্বও ভগবদীক্ষণ-প্রভাবে দেব-মনুষ্যাদিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।। ২।।

স খল্বিদং ভগবান্ কালশক্ত্যা গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্য্যঃ।
করোত্যকর্ত্তৈব নিহন্ত্যহন্তা চেষ্টা বিভূম্নঃ খলু দুর্ব্বিভাব্যা।। ৩।।

কালশক্তিপ্রভাবে গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে, ঈশ্বর স্বীয় শক্তি বিভাগ করিয়া 'অকর্ত্তা' হইয়াও কর্ম্ম করিয়া থাকেন, 'হন্তা' না হইয়াও বিনাশ করেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের চেষ্টা নিশ্চয়ই অচিন্ত্য।। ৩।।

সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ।
জনং জনেন জনয়ন্ মারয়ন্ মৃত্যুনান্তকম্।। ৪।।

কালরূপী ভগবান্ স্বয়ং অনাদি, অনন্ত ও অব্যয়। তিনি প্রাণিদ্বারাই প্রাণী সৃষ্টি করিতেছেন। মৃত্যুদ্বারা চৌরাদিকে সংহার করিয়া 'সংহার-কর্ত্তা' নাম ধারণ করিতেছেন।।৪।।

ন বৈ স্বপক্ষোঽস্য বিপক্ষ এব বা
পরস্য মৃত্যোর্বিশতঃ সমং প্রজাঃ।
তং ধাবমানমনুধাবন্ত্যনীশা
যথা রজাংস্যনিলং ভূতসঙ্ঘাঃ।। ৫।।

মৃত্যুরূপী কালের স্বপক্ষ বা বিপক্ষ কেহই নাই। তিনি সমভাবেই সর্ব্বপ্রাণীতে প্রবেশ করিতেছেন এবং সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিতেছেন। ধূলিপটল যেমন বায়ুর পশ্চাৎ-পশ্চাদ্ধাবিত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মাধীন প্রাণীসকলও স্ব-স্ব কর্ম্মের অধীন হইয়া কালের পশ্চাৎ-পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে।। ৫।।

আয়ুষোঽপচয়ং জন্তোস্তথৈবোপচয়ং বিভুঃ।
উভাভ্যাং রহিতঃ স্বস্থো দুঃস্থস্য বিদধাত্যসৌ।। ৬।।

সর্ব্বশক্তিমান্ কাল আপনিই আপনাতে অবস্থান করিতেছেন। সেইজন্য তাঁহার কাল বা অকাল নাই। তিনি কর্ম্মাধীন জীবগণের মধ্যে কাহারও অকালমৃত্যু বিধান করিতেছেন, কাহাকেও বা কালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিতেছেন।। ৬।।

কেচিৎ কর্ম্ম বদন্ত্যেনং স্বভাবমপরে নৃপ।
একে কালং পরে দৈবং পুংসঃ কামমুতাপরে।। ৭।।

হে রাজন্ (ধ্রুব)! মীমাংসকগণ এই কালকে 'কর্ম্ম', চার্ব্বাকগণ 'স্বভাব', ব্যবহারিকগণ ইহাকে 'কাল', জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহাকে গ্রহাদিরূপ 'দৈব' এবং বাৎস্যায়নাদি ঋষিগণ ইহাকে পুরুষের 'কাম' বলিয়া কীর্ত্তন করেন।। ৭।।

অব্যক্তস্যাপ্রমেয়স্য নানাশক্ত্যুদয়স্য চ।
ন বৈ চিকীর্ষিতং তাত কো বেদাথ স্বসম্ভবম্।। ৮।।

হে বৎস! ঈশ্বর অব্যক্ত, সুতরাং অপ্রমেয়। মহদাদি নানাবিধ শক্তি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়। তাঁহার যে কি বাসনা, তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং স্বসম্ভব ভগবানের বিষয় কেহ বলিতে পারে না।। ৮।।

স এব বিশ্বং সৃজতি স এবাবতি হন্তি চ।
তথাপি হ্যনহঙ্কারো নাজ্যতে গুণকর্ম্মভিঃ।। ৯।।

ঈশ্বরই বিশ্বকে সৃষ্টি করিতেছেন, তিনিই বিশ্বের রক্ষা করিতেছেন এবং তিনি আবার বিশ্বের ধ্বংস সাধন করিতেছেন। কিন্তু তথাপি তিনি নিরহঙ্কার, কোনও প্রকারে গুণ ও কর্ম্মের সহিত লিপ্ত নহেন।। ৯।।

এষ ভূতানি ভূতাত্মা ভূতেশো ভূতভাবনঃ।
স্বশক্ত্যা মায়য়া যুক্তঃ সৃজত্যত্তি চ পাতি চ।। ১০।।

এই ভগবান্ সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বভূতপালক ও সর্ব্বপ্রাণীর কারণ। তিনি স্বীয়শক্তিদ্বারা এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন করিয়া থাকেন।। ১০।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৮ পৃষ্ঠার পর]

সমাধি

১। জ্ঞানী ও সাত্বতগণের সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে পার্থক্য কি?

"সমাধি দুইপ্রকার—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। জ্ঞানিগণের সম্প্রদায়ে সমাধির যে-কিছু ব্যাখ্যা হইয়া থাকুক, সাত্বতগণ অত্যন্ত সহজ-সমাধিকে 'নির্ব্বিকল্প' ও কূট-সমাধিকে "সবিকল্প-সমাধি' বলিয়া থাকেন। আত্মা—চিদ্বস্তু ; অতএব স্বপ্রকাশতা, পরপ্রকাশতা, উভয় ধর্ম্মই তাহাতে সহজ। স্বপ্রকাশ-স্বভাব-দ্বারা আত্মা আপনাকে আপনি দেখিতে পায়। পরপ্রকাশ-ধর্ম্মদ্বারা আত্মেতর সকল বস্তুকে জ্ঞাত হইতে পারে। যখন এই ধর্ম্ম আত্মার স্বরূপ হইল, তখন নিতান্ত সহজ-সমাধি যে নির্ব্বিকল্প, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আত্মার বিষয়-বোধ-কার্য্যে যন্ত্রান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না, এজন্য ইহাতে বিকল্প নাই।"

—কৃঃ সং ৯।২

২। সহজ-সমাধির বিভিন্ন উপলব্ধির স্তর কি কি?

"আত্মা যখন সহজ-সমাধি অবলম্বন করেন, তখন প্রথমে আত্ম-বোধ, দ্বিতীয়ে আত্মার ক্ষুদ্রতা-বোধ, তৃতীয়ে আশ্রয়-বোধ, চতুর্থে আশ্রিত ও আশ্রয়ের সম্বন্ধ-বোধ, পঞ্চমে আশ্রয়ের গুণকর্ম্মাত্মক স্বরূপগত সৌন্দর্য্য-বোধ, ষষ্ঠে আশ্রিতগণের পরস্পর সম্বন্ধ-বোধ, সপ্তমে আশ্রিতগণ ও আশ্রয়ের সংস্থানরূপ পীঠ-বোধ, অষ্টমে তদ্‌গত অবিকৃত-কাল-বোধ, নবমে আশ্রিতগণের ভাবগত নানাত্ব-বোধ, দশমে আশ্রিত ও আশ্রয়ের নিত্যলীলা-বোধ, একাদশে আশ্রয়ের শক্তি-বোধ, দ্বাদশে আশ্রয়-শক্তিদ্বারা আশ্রিতগণের উন্নতি ও অবনতি-বোধ, ত্রয়োদশে অবনত আশ্রিতগণের স্বরূপ-ভ্রম-বোধ, চতুর্দ্দশে তাহাদের পুনরুন্নতিকারণ-রূপ আশ্রয়ানুশীলন-বোধ, পঞ্চদশে অবনত আশ্রিত-জনের আশ্রয়ানুশীলনদ্বারা স্ব-স্বরূপ পুনঃ প্রাপ্তি-বোধ ইত্যাদি অনেক অচিন্ত্যতত্ত্বের বোধোদয় হয়।"

—কৃঃ সং ৯।৫

৩। আচার্য্যগণের হৃদয়ে ভক্তিসিদ্ধান্ত-তত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি কিরূপে সাধিত হয়?

"সমুদ্রশোষণং রেণোর্যথা ন ঘটতে ক্বচিৎ।
তথা মে তত্ত্বনির্দ্দেশো মূঢ়স্য ক্ষুদ্রচেতসঃ।।
কিন্তু মে হৃদয়ে কোঽপি পুরুষঃ শ্যামসুন্দরঃ।
স্ফুরন্ সমাদিশৎ কার্য্যমেতত্তত্ত্বনিরূপণম্।।"

—কৃঃ সং ১।২-৩

স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি

১। ভক্তগণের মুক্তি কয়প্রকার ও তাহাদের স্বরূপ কি?

"ভক্তদিগের মুক্তি দুই প্রকার—অর্থাৎ 'স্বরূপ-মুক্তি' ও 'বস্তু-মুক্তি'। যাঁহারা ভজন-বলে এই জড়জগতেই স্বরূপ-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহাদের দেহান্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই মুক্তি তাঁহাদিগের সেবা আরম্ভ করেন। তাঁহাদের এই অবস্থায় স্বরূপমুক্তি হইয়াছে, আবার দেহত্যাগ হইলেই কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের বস্তুমুক্তি হইবে।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ৮মঃ পঃ

২। আপন-দশা ও স্বরূপ-সিদ্ধি কখন হয়?

"নামস্মরণ, রূপস্মরণ, গুণধারণা, লীলার ধ্রুবানুস্মৃতি এবং লীলাপ্রবেশে কৃষ্ণরসে মগ্ন হওয়া-রূপ সমাধি—এই সমস্ত ক্রমে হইলে আপন-দশা উপস্থিত হয়। স্মরণ ও আপনে অষ্টকাল কৃষ্ণ-নিত্যলীলা-সাধন হয় এবং তাহাতে গাঢ় অভিনিবেশ হইলে স্বরূপসিদ্ধি হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৩। শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাজনিত সুখ ও চিদ্বিলাসগত-লীলার স্ফূর্ত্তি কখন হয়?

"তখন (ভাবাপন-দশায়) স্ব-স্বরূপে ক্ষণে ক্ষণে ব্রজবাস হয়। স্ব-স্বরূপগত

রাধাকৃষ্ণসেবায় বড় সুখোদয় হয়। এমত কি, অনেকক্ষণ ব্রজধামদর্শন ও তথায় স্বরূপাভিমানে অবস্থিতি এবং চিদ্বিলাসগত লীলার স্ফূর্ত্তি হয়।"

—ভজনপ্রণালী', হঃ চিঃ

৪। আসক্তির অবস্থা অতীত হইলেও কখন জীবের স্বরূপসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে?

"আসক্তি গত হইলেও লিঙ্গদেহ থাকা পর্য্যন্ত জড়-সান্নিধ্য থাকে। কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে তাহা অতি শীঘ্রই সমাপ্ত হইয়া থাকে। এ জড়-সান্নিধ্যের নাম বিঘ্ন। যতদিন বিঘ্ন আছে, ততদিন জীব বস্তু-সিদ্ধ হয় না। কিন্তু প্রেম-দশা-প্রাপ্ত রতি হইলেই রস-লাভের যোগ্য হন এবং তাহাতে স্বরূপসিদ্ধি উদিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

৫। স্বরূপসিদ্ধি কি? তাহার সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কি সম্বন্ধ?

"অপ্রাকৃত তত্ত্বের স্বরূপবোধই—"স্বরূপসিদ্ধি"। ইহার নামই প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে প্রেম-অনুশীলনরূপ অভিধেয় ও প্রেমপ্রাপ্তিরূপ প্রয়োজন লাভ হয়।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

৬। দ্বিবিধ ভক্তিসিদ্ধিতে কি অবস্থা লাভ হয়?

"ভক্তিসিদ্ধি দুইপ্রকার—অর্থাৎ স্বরূপ-সিদ্ধি ও বস্তু-সিদ্ধি। **স্বরূপসিদ্ধির সময়ে গোকুলে গোলোক-দর্শন** এবং **বস্তুসিদ্ধির সময়ে গোলোকে গোকুল-দর্শন হয়।**"

—ব্রঃ সং ৫।২

৭। কর্ম্মের চরম ফল কি?

"নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিই কর্ম্মের বাস্তবিক ফল ; অন্য যে ফলশ্রুতি, তাহা কেবল নৈষ্কর্ম্ম-কর্ম্মে রুচি উৎপাদন করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে।"

—'প্রমাণনির্দ্দেশঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১।২৪

৮। 'বস্তুসিদ্ধি' কাহকে বলে?

"কৃষ্ণকৃপা হইলে দেহবিগম-সময়ে বস্তুতঃ সিদ্ধদেহে ব্রজলীলার পরিকর হওয়ার নাম বস্তুসিদ্ধি। ইহাই নামভজনের চরম ফল।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

৯। নিত্যলীলায় প্রবেশটি কি?

"এই অবস্থায় ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতি অবশ্য হইবে এবং হঠাৎ তদিচ্ছাক্রমে স্থূলদেহাপগমে লিঙ্গদেহ নষ্ট হইয়া পড়িবে। পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইতে হইতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত মনোবুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ লিঙ্গদেহ খসিয়া পড়ে। তখন শুদ্ধ চিদ্দেহ স্পষ্ট অনাবৃতভাবে উদিত হইয়া চিদ্ধামে যুগলসেবা করিতে থাকে।"

—'ভজনপ্রণালী', হঃ চিঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯০ পৃষ্ঠার পর]

জীব শক্তিবিশেষ, সেই জীবকে অণু-চৈতন্যরূপে সিদ্ধ না ক'রে ব্রহ্মা বল্‌তে গেলে আমরা জীবব্রহ্মৈকবাদে আবদ্ধ থাক্‌ব।

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ।।"

অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিযোগ উপস্থিত হ'লে ঐ সমস্ত অনর্থ শান্ত হ'য়ে থাকে। তখন জাগতিক প্রয়োজনের চেষ্টা হ'তে বিরত হ'ব; স্বধর্ম্মাদি রক্ষার চেষ্টায় আসুরিক বিচার কর্‌ব না। যখন ভোগ বা ত্যাগের ধর্ম্ম হ'তে অব্যাহতি পাব তখন সমস্ত জগতে সর্ব্বতো-ভাবে কৃষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত হব।

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাক্ষ্যা তথাপরা।"

ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি জীব। অবিদ্যা মায়া অপরা শক্তি। ভগবানের তিনপ্রকার শক্তি—অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। জীবতত্ত্বকে শক্তি বিচার না ক'রে, তটস্থাশক্তি ব'লে না জেনে যদি আমরা ঈশ্বর বিচার করতে যাই, তাহলে ভোক্তার অভিমানে জগৎকে ভোগ্য বোধ ক'রে অচিৎশক্তি-পরিণত জগৎকে আবাহন করি। গোলোকাদির চিন্তা থেমে গিয়ে কালক্ষোভ্যধর্ম্মে অবস্থিত হ'য়ে নিজানুভূতি ধ্বংস কর্‌তে থাকি। আকাশতত্ত্ব ক্ষিত্যাদির আধার, কেবল ভূতাকাশ আশ্রয়ণীয় মনে করে পরব্যোমে যেতে পারি না। স্বরূপের সন্ধান না রাখায় প্রধানের বিচারে স্থাপিত হ'য়ে জড়জগতেই নিজদিগকে মিশিয়ে দিই। হেয় প্রতিফলন ছায়াশক্তিপ্রকটিত জগৎ বহিরঙ্গাশক্তি আকাশদ্বারা বিচ্ছিন্ন। "বিবর্ত্তঃ—সতত্ত্বতোঽন্যথাবুদ্ধিঃ।" রজ্জুতে সর্পবোধ, শুক্তিতে মুক্ত্যজ্ঞান, বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব। ব্যাসের বেদান্তসূত্রে পরিণামবাদ স্বীকৃত। বস্তু বিকৃত হয় না। শক্তিই পরিণত হয়। গুরুদেব ব্যাস পাছে ভ্রান্ত বলিয়া বিচারিত হন সেজন্য গুরুকে রক্ষা কর্‌তে গিয়ে শঙ্কর বিবর্ত্তবাদ স্থাপন কর্‌লেন।

"ব্রহ্মবস্তু বিকৃত হ'য়ে জগৎ হ'লে আর ফিরিতে পারেন না, সুতরাং ইহা বিকার নহে। জগৎ মিথ্যা।"—ইহা মায়াবাদীর বিচার। তদ্রূপবৈভবে নিত্য প্রকটিত বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি স্থানের বিচারে অনাবশ্যকবোধ কূপমণ্ডুকতা। ব্যাসের মূলসূত্রে পরিণামবাদ স্বীকৃত। কেবলাদ্বৈতীর বিচারের সহিত ভক্তিবাদীর বিচার এইখানে পার্থক্য লাভ

ক'রেছে। শঙ্করসূত্রের মধ্যে যেখানে পরিণামবাদ আছে তাহাকে বদলে বিবর্ত্তবাদ স্থাপন ক'রেছেন। বেদে যেখানে বিবর্ত্তবাদ আছে, তাহার প্রয়োগের ভ্রমে এইরূপ অবস্থা। পরিণামবাদে ঈশ্বর বিকৃত হইয়া জগদ্রূপে পরিণত (Pantheism) বল্‌লে ব্রহ্মবস্তুর বিকার হ'য়ে পড়ে। ঈশ্বরের দাম্পত্য ও মানবাদির দাম্পত্য তুল্য। অতএব গুরুর বচন অসম্মাননীয়। এই যুক্তি দেখাইয়া আচার্য্য 'অতত্ত্বতো অন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ' বিচার অবলম্বন ক'রে বিবর্ত্তবাদের প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। তিনি ত' আদিষ্ট।

"অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।"
"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিণা।।"

এই সমস্ত শাস্ত্রীয় বাক্য তার সাক্ষ্য দিতেছে। এইপ্রকার নির্ব্বিশেষবাদেই পঞ্চোপাসনা প্রতিষ্ঠিত। পঞ্চোপাসনার মূল ধর্ম্মাদিলাভের জন্য প্রয়োজন স্বীকার ক'রে ব্রহ্মের একটী রূপ কল্পনা করা। প্রয়োজন-লাভের পর সেই কাল্পনিক রূপের নাশ ও নিরাকার নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্মরূপের অবস্থান। ব্রহ্মমাধ্বপারম্পর্য্যে বিবর্ত্তবাদ গৃহীত হয়েন নাই। শ্রীমধ্ব বলেন,—বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব। জড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণতার সদ্ভাবে ঈশ্বর নহেন। অবিচিন্ত্য চিদৈশ্বর্য্যের পূর্ণতমতা তাঁহাতে আছে। মায়াবাদীর ব্রহ্ম বিষ্ণু অপেক্ষা পরতম-তত্ত্ব। শঙ্কর শব্দের লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে বাস্তববস্তুকে আক্রমণ করিতে চেষ্টাপর।

বস্তুর বিকার অবশ্য অতীব নিন্দিত ব্যাপার। ঈশ্বর কালক্ষোভ্য হ'লে তার উপাসনায় লাভ কি? উপাসক এবং উপাসনার কালক্ষোভ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে। তাহাতে নিত্য শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা কোথায়? এই সন্দেহে তিনি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন ক'রেছেন। প্রকৃত বিবর্ত্তবাদের ব্যাখ্যা বেদে ক'রেছেন—দেহে আত্মবুদ্ধি। আসুর-বর্ণাশ্রমীর বিচারে দেহে আত্মবুদ্ধি ক'রে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ক'রেছেন। পঞ্চোপাসনার মূলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অবস্থিতি। বিষ্ণুকে বঞ্চনা ক'রে বাহ্যপ্রতীতিতে চালিত হ'য়ে (অসুস্থ অবস্থাকে স্বাস্থ্য ধারণা ক'রে) মায়াবাদীদের এইপ্রকার পঞ্চোপাসনার ছলনা। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি।।"

হরিপ্রসঙ্গবিমুখের দিবা নানাভাবে ইন্দ্রিয়তোষণে, রাত্রিতে শয়ন ও স্বপ্নাদি দেখে কেটে যায়। সর্ব্বদা মনোরথে বিচরণ ক'রে ইন্দ্রিয়তোষণ লালসায় ধাবিত হ'য়ে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণমালা বরণ কর্‌তে থাকে। তা' থেকে আর নিবৃত্তি নাই। আজ একরূপ জন্ম, কাল অন্যরূপ আস্বাদন কর্‌তে কর্‌তে হয়রাণ হ'তে থাকে, কোথাও আর শান্তি পায় না। জড়জগতের লোক হরিমন্দির অঙ্কন করে না।

বহ্বীশ্বরবাদের শেষে নিরাকার ব্রহ্ম। কাল্পনিক দেবতা স্বীকার ক'রে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পর তাহার ধ্বংস কর্‌তে হ'বে।

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।"

এই বিচার তা'দের উপলব্ধির বিষয় হয় না। ঈশ্বর অশ্রুতযুক্তির গম্য নহেন, শ্রুতি হইতেই গম্য। ভক্তিরহিত হ'লে দৈব-বর্ণাশ্রমের অস্বীকারে আসুর বর্ণাশ্রমে অবস্থিতি ঘটে। আচার্য্যের ভিতর ও বাহির সমান। তিনি বিত্তাপহারক নহেন। যাঁরা ভাগবত শ্রবণ করেন না তাঁ'দের অদৃষ্টের দোষ। (ক্রমশঃ)

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯২ পৃষ্ঠার পর]

ভাষ্যকারের গুরুপরম্পরা

ভাষ্যকারের গুরুপরম্পরা বিচার করিলে আমরা যে ঐতিহাসিক সত্য উপলব্ধি করি তাহা সংক্ষেপে আপনাদের নিকট বর্ণনা করিতেছি।—তিনি প্রথমতঃ বিরক্ত-শিরোমণি পীতাম্বর দাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করেন। পরে **রাধাদামোদর দাস** নামক একজন কান্যকুব্জবাসী শৌক্র ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত হন। শ্রীরাধা-দামোদর বেদান্ত-স্যমন্তকের লেখক এবং রসিকানন্দ মুরারীর পৌত্র। তিনি অপর একজন কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ শ্রীনয়নানন্দদেব গোস্বামীর নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। **রসিকানন্দ প্রভু** ভাষ্যকারের পাঞ্চরাত্রিক গুরুপারম্পর্য্যে চতুর্থ পূর্ব্বপুরুষ। রসিকানন্দ প্রভু **শ্রীশ্যামানন্দের** শিষ্য। পূর্ব্বে যে নয়নানন্দদেব গোস্বামীর উল্লেখ করিয়াছি তিনি রসিকানন্দ প্রভুবর পুত্র। শ্যামানন্দের গুরু **গৌরীদাস পণ্ডিত**। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু গৌরীদাস পণ্ডিতকে কৃপা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু আচার্য্য হৃদয় চৈতন্যের শিষ্য হইলেও পরবর্ত্তিকালে শ্রীজীব গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপপাদের শিষ্য এবং রূপপাদ শ্রীসনাতনের শিষ্য। শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত সহচর।

ভাষ্যকারের শিষ্যপরম্পরা

শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত পাঞ্চরাত্রিক পরম্পরার

উল্লেখ করিলাম। উদ্ধবদাস, কোথাও বা উদ্ধরদাস নামে ভাষ্যকারের শিষ্যরূপে উল্লেখ দেখা যায়। কাহারও মতে উহারা পৃথক্ ব্যক্তি। সে যাহাই হউক না কেন, উদ্ধবদাসের শ্রীমধুসূদন দাস নামে এক শিষ্য ছিলেন। শ্রীজগন্নাথ তাঁহারই শিষ্য। যিনি সিদ্ধ জগন্নাথদাস নামে কিছুদিন পূর্ব্বে মাথুরমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজকেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভাগবত-পারম্পর্য্যমতে ভজন-শিক্ষায় গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সার্ব্বভৌম জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রকাশ করেন। শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের ভজনগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে দীক্ষামন্ত্রাদি প্রদান করিয়া শিষ্যত্বে বরণ করেন। এই পারম্পর্য্য যাঁহারা স্বীকার করিতে অক্ষম, তাঁহারা তোতারাম বাবাজী মহারাজের উল্লিখিত তের অপসম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত অথবা চতুর্দ্দশ অপসম্প্রদায়ের উৎপত্তিকর্ত্তা।

পাঞ্চরাত্রিক-পারম্পর্য্য ও ভাগবত-পারম্পর্য্য

উল্লিখিত গুরুপরম্পরা হইতে আমরা দেখিতেছি শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীমন্মহাপ্রভু অনুগত শ্যামানন্দ পরিবারভক্ত। আচার্য্য শ্যামানন্দ শ্রীজীব গোস্বামীর আনুগত্য স্বীকার করায় এবং শ্রীজীব একান্ত রূপানুগ বিধায় শ্রীবলদেবও রূপানুগ বৈষ্ণব। যাঁহারা শ্রীবলদেবকে রূপানুগ মনে না করিয়া শ্যামানন্দ পরিবারভুক্ত বলিয়া উন্নত-উজ্জ্বলরসের পরমোচ্চতম সেবা-ভাগের অধিকারী নহেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা প্রকৃতই ভ্রান্ত ও অপরাধী। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীরাধাদামোদর দাসের নিকট পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেও শ্রীবিশ্বনাথ ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। **পাঞ্চরাত্রিক-পারম্পর্য্য ব্যতীত ভাগবত-পারম্পর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। ভাগবত-পারম্পর্য্য ভজন-নিষ্ঠার তারতম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাগবত পারম্পর্য্যে পাঞ্চরাত্রিক-পারম্পর্য্য অনুস্যূত থাকে বলিয়া ভাগবত-পারম্পর্য্যেরই মাধুর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। ইহাতে কালগত ব্যবধান থাকে না। শুদ্ধ-ভক্তির বিচারে পাঞ্চরাত্রিক এবং ভাগবত-সম্প্রদায় উভয় মতই একার্থ-প্রতিপাদক।** চৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—'পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।'—(মধ্য ১৯।১১৯)। প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায় যেরূপ 'শ্রীরূপগোস্বামীর অনুগত জন' পরিচয় দিয়া আচার্য্য শ্রীজীবের চরণে অপরাধরাশি সঞ্চয় করেন, অধুনাতন জাতি-গোস্বামীকুলের উচ্ছিষ্টভোজী কতিপয় সহজিয়া, 'কর্ত্তাভজা', 'কিশোরীভজা' ও 'ভজনখাজা' সম্প্রদায় চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অনুগত অভিমানে ভাষ্যকার শ্রীবলদেবের প্রতি নানাপ্রকার অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া অত্যন্ত ঘৃণিত নরকগামী হইয়া থাকেন।।

---

২ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ ; ১৫ জুন, ২০০১

শ্রীবলদেবের গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীবলদেব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ব্যতীত বহু গ্রন্থের রচয়িতা ও টীকাকর্ত্তা। তিনি 'প্রমেয় রত্নাবলী' নামে একখানি স্বল্পায়তন গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাতে প্রভূত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের জনৈক শিষ্য কৃষ্ণদেব এই গ্রন্থের একটী সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছেন। বেদান্তাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন তাহার নাম 'শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য'। স্বয়ং গোবিন্দদেব তাঁহাকে এই ভাষ্য রচনা করিতে প্রেরণা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই ভাষ্যের নাম 'গোবিন্দভাষ্য'। যে-কালে রামানুজীয় মতাবলম্বিগণ জয়পুরে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির অধিকারপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়গণের বৈষ্ণবাধিকার খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীবলদেবই শ্রীচক্রবর্ত্তী প্রমুখ বৃন্দাবনবাসী প্রাচীন বৈষ্ণবগণের অনুমতিক্রমে জয়পুরে গিয়া তাঁহাদিগকে উক্ত গোবিন্দভাষ্যের বিচারের দ্বারা পরাজিত করেন। সেই জয়পুরেই শ্রীগোবিন্দদেবের নির্দ্দেশ-অনুসারে গোবিন্দভাষ্য রচিত হয়। এই ভাষ্যের একটী টীকাও তিনি রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'সিদ্ধান্তরত্ন' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের অপর নাম 'ভাষ্যপীঠক'। ইহারও এক টী টীকা তাঁহার নিজেরই রচিত। এতদ্ব্যতীত 'সাহিত্য কৌমুদী' নামে একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ নির্ণয়-সাগর-যন্ত্রে কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত 'ব্যাকরণ কৌমুদী' নামে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত না হইয়া বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ ঘেরায় রহিয়াছে। বলদেব তত্ত্বসন্দর্ভের একটী টীকা রচনা করিয়া প্রভূত পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচিত দশখানি উপনিষদ্-ভাষ্যের সকলগুলি পাওয়া না গেলেও ঈশাবাস্যের ভাষ্য কয়েকটী সংস্করণ বৈষ্ণব-করকমল বিভূষিত করিতেছে। 'সিদ্ধান্ত-দর্পণ', 'কাব্য-কৌস্তুভ' নামক গ্রন্থসমূহ তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। ভাষ্যকার গোপালতাপনী-ভাষ্য, কৃষ্ণানন্দিনী টীকা, ছন্দকৌস্তুভ, লঘুভাগবতামৃতের টীকা প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। শুনা যায় তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের একটী টীকাও প্রচারিত ছিল। জয়দেবের চন্দ্রালোক-নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের টীকা ও শ্রীরূপের নাটকচন্দ্রিকার টীকা তিনি রচনা করিয়া বৈষ্ণবজগতে অলৌকিক পাণ্ডিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ভাষ্যকারের রচিত-গ্রন্থের সংক্ষেপ পরিচয় প্রদান করিয়া অদ্য ক্ষান্ত হইতেছি।

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসলীলা সম্বন্ধে বিকৃত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

54A, Jakaria Street, Calcutta-73 নিবাসী পুরুষোত্তম আগরওয়ালা "বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলার দিনে রাসলীলার কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে প্রেরণাদায়ী কৃষ্ণের প্রয়োজন" সম্বন্ধীয় শাস্ত্রবিরুদ্ধ যে Pamphlet ছাপাইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিলি করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অপরাধমূলক ও সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। শাস্ত্রবহির্ভূত যে কোন চিন্তাধারাই ভ্রান্তিজনক এবং সমস্ত অকল্যাণের পরাকাষ্ঠা। কাল্পনিক চিন্তাধারা কখনও বাস্তব সত্যের উদ্‌ঘাটক হইতে পারে না। শাস্ত্র হইতেছে ভগবানের শাসনবাণী—যাহা সমাজকে বিশৃঙ্খলার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া সুশৃঙ্খল করিবার প্রধান হাতিয়ার। শাস্ত্রবিধি-বহির্ভূত জীবনযাপন বা কর্ম্মাচরণই বর্ত্তমান সমাজের বিশৃঙ্খলার প্রধান কারণ। কূয়োর ব্যাঙ যেরূপ কূয়োকে সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করে, কূয়োর বাহিরে বিশাল সমুদ্রের কোন খবরই রাখে না ; তদ্রূপ যাহার কেবল প্রাকৃত চিন্তাধারাকে সার করিয়াছেন, তাহারা কিরূপে সিদ্ধমুনিগণবন্দ্য অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণের রাসলীলার অপার মহিমা অবগত হইবেন? কামুক ব্যক্তি যেরূপ সমস্ত জগৎকে কামিনীময়রূপে দর্শন করেন, তদ্রূপ যাহারা স্ত্রীলোক, অর্থ ও সম্মানের আশায় লুব্ধ, তাহারা তাহাদের ভোগের চশমাদ্বারা কৃষ্ণকে প্রাকৃত ভোগীরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। মায়াবদ্ধ জীব কখনও মায়াধীশ কৃষ্ণকে প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা মাপিয়া লইতে পারে না। জীবের শত শত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ও চেষ্টার দ্বারা কখনও রাধাকৃষ্ণের রাসলীলার অপ্রাকৃতত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। সাধু-গুরুর কৃপাবারিতে সিক্ত হইলেই জীবের নিকট ভগবানের অপ্রাকৃত লীলারহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

পুরুষোত্তম বাবু-কর্ত্তৃক প্রকাশিত দুই পৃষ্ঠা সম্বলিত Pampnletটি আলোচনা করিলেই তাঁহার ভগবত্তত্ত্বে অর্থাৎ অপ্রাকৃততত্ত্বে অজ্ঞানতার প্রতিচ্ছবিটি সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে—ইহা বলাই বাহুল্য। বদ্ধজীবমাত্রেই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব—এই চারিটী দোষের দ্বারা সর্ব্বদাই দোষযুক্ত। তিনি রাধাকে শক্তিরূপা বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে শ্রীরাধার বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠা না করিয়া শক্তিরূপা-স্বরূপে শ্রীরাধার আলাদা মন্দির নির্ম্মাণের পক্ষে মত পোষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, পুরুষের বামপার্শ্ব তাঁহার বিবাহিত স্ত্রীর জন্য সংরক্ষিত, তাই যেহেতু শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিত স্ত্রী নহেন তজ্জন্য তাঁহাকে কোনমতেই শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে বসানো উচিত নহে। বিবাহিত স্ত্রীর জন্য পুরুষের বামপার্শ্ব যে সংরক্ষিত তদনুকূলে তিনি শিবের বামে পার্ব্বতী, রামের বামে সীতা, নারায়ণের বামে লক্ষ্মী প্রভৃতির উদাহরণ

দিয়াছেন। সীতার বনবাসকালে রাজসূয় যজ্ঞের সময় রাম অন্য কোন নারীকে বামপার্শ্বে না বসাইয়া সীতার স্বর্ণমূর্ত্তি বামপার্শ্বে স্থাপনপূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন—ইহা বলিয়া তিনি নিজের অনুকূলে মত পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তাঁহার কাল্পনিক দৃষ্টিতে শ্রীরাধা কেবলমাত্র শক্তিরূপা বলিয়া নির্ণীত হইলেও বাস্তবিকপক্ষে শ্রীরাধা যে মূলা কান্তাশক্তি, সর্ব্বশক্তির অংশিনী, সর্ব্বশক্তি গরীয়সী তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদীয় পুরুষবোধনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—"স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদ্যা প্রকৃতি শ্রীরাধিকা, নিত্য নির্গুণা, স্ব-স্বরূপভূতা সাত্ত্বিকালঙ্কারে পরিশোভিতা, প্রসন্না এবং অশেষ লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যশালিনী।" গৌতমীয় তন্ত্র-মতে—"শ্রীরাধা সাক্ষাৎ কৃষ্ণময়ী, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তিময়ী, কৃষ্ণসম্মোহিনী ও পরাশক্তি।"

মহাজন গাহিয়াছেন,—

উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী।
রাধা-অবতার সবে,—আম্নায়-বাণী।।

শ্রীরাধিকা হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-কান্তাগণ বিস্তার লাভ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর।।
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার।।

পদ্মপুরাণে স্বয়ং শিবঠাকুর দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন,—"তৎ কলা কোটি কোট্যংশ্য দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ" অর্থাৎ "ত্রিগুণাত্মিকা দুর্গা প্রভৃতি শক্তিগণ শ্রীরাধারই কলার কোটি কোটি অংশের এক অংশ।" অথর্ব্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধনী শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"যস্য অংশে লক্ষ্মী-দুর্গাদিকা শক্তিঃ।" শ্রীরাধার বামাংশ হইতে ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষ্মী উৎপন্ন হইয়াছেন।

রাধা বামাংশ সম্ভূতা মহালক্ষ্মী প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা এব নারদঃ।। (নারদপঞ্চরাত্র ২।৩।৬০)

দেবীভাগবতে (৯০।৫০।৪৬-৫০) বৈকুণ্ঠাধিপতি স্বয়ং শ্রীরাধার স্তব করিয়াছেন,—

নমস্তে পরমেশ্বরী রাসমণ্ডলবাসিনী।
রাসেশ্বরী নমস্তেঽস্তু কৃষ্ণপ্রাণাধিক প্রিয়ে।।
নমঃ স্ত্রৈলোক্য জননি প্রসীদ করুণার্ণবে।
ব্রহ্মাবিষ্ণুরাদিভিদেবৈর্বন্দ্য মান পদাম্বুজে।।

নমঃ সরস্বতীরূপে নমঃ সাবিত্রি শঙ্করি।
গঙ্গা পদ্মাবতীরূপে ষষ্ঠি মঙ্গলচণ্ডিকে।।
নমস্তে তুলসীরূপে নমো লক্ষ্মীস্বরূপিণী।
নমো দুর্গে ভগবতী নমস্তে সর্ব্বরূপিণি।।
মূল প্রকৃতিরূপাং ত্বাং ভজামঃ করুণার্ণবাম্।
সংসারসাগরাদস্মানুদ্ধারাম্ব দয়াং কুরুঃ।।

উপরোক্ত স্তোত্রে বৃন্দাবনশ্বরী শ্রীরাধাঠাকুরাণীকে যে সরস্বতী, গঙ্গা, সাবিত্রী, পদ্মাবতী, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, তুলসী, লক্ষ্মী, দুর্গা, ভগবতী প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহা অমূলক নহে, কারণ শ্রীরাধা প্রাণস্বরূপিণী মূলাপ্রকৃতিরীশ্বরী বলিয়া যাবতীয় শক্তিবর্গ তাঁহারই অংশ, অংশাংশ, কলাস্বরূপিণী, ইঁহারা সকলেই তাঁহাতে বিধৃত রহিয়াছেন। এই দেবীর আরাধনা করিলেই সকল শক্তিবর্গের আরাধনা করা হয় এবং সরাসরি গোলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। সকলপ্রকারের শক্তি অপেক্ষা রাধিকা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও সর্ব্বারাধ্যা, এই বিষয়ে কি কোন সন্দেহের অবকাশ আছে?

পুরুষোত্তমবাবু যে শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়া শক্তিরূপে একেলা শ্রীরাধার পূজার অনুকূলে মত পোষণ করিয়াছেন, তাহা পরোক্ষভাবে শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া একেলা শ্রীকৃষ্ণের পূজার মতবাদকেই সমর্থন করে। শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়া শ্রীরাধার পূজা এবং শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা, ইহার চিন্তারও অতীত। ঋক্ পরিশিষ্ট রাধার সহিত কৃষ্ণের অধিক উজ্জ্বলতা বর্ণন করিয়াছেন। "রাধয়া মাধবো দেবো সাধবেনৈব রাধিকা, বিভ্রাজন্তে জনেম্বতি" অথাৎ "শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধব ক্রীড়াশীল দ্যুতিমান। শ্রীমাধবের দ্বারা শ্রীরাধিকা নিজজনসমূহে সর্ব্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছে।" কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধা আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম প্রকাশ। শ্রীরাধা—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিভূতা হ্লাদিনী শক্তি। লীলাবৈচিত্ত্যে যুগল রাধাকৃষ্ণই আমাদের ভজনীয়। লীলা-বিরহিত রাধাকৃষ্ণ-ভজন আমাদের ধারণাতীত। মহাভাবময়ী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ নিত্য ও অচিন্ত্য নবনবানুরাগের ফলস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী কৃষ্ণস্তবে বলিয়াছেন,—"অসমোর্দ্ধা অবিচিন্ত্যৈশ্বর্য্যময়ী শ্রীরাধার সহিত যিনি নিজধামে (গোলোক-বৃন্দাবনে) পরব্রহ্মস্বরূপে নিত্যলীলা করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রহিয়াছে,—

রাধা কৃষ্ণাত্মিকানিত্যং কৃষ্ণোরাধাত্মকো ধ্রুবম্।
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা রাধৈব রাধ্যতে ময়া।।
যঃ কৃষ্ণঃ সাপি রাধা চ যা রাধা কৃষ্ণ এব সঃ।
এবং জ্যোতির্দ্বিধা ভিন্নং রাধামাধব রূপকম্।।

শ্রীনারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"রাধাকৃষ্ণাত্মিকা নিত্যং কৃষ্ণো রাধাত্মকো ধ্রুবম্।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীরাধার প্রতি দুর্গাদেবীর স্তব,—"যথা ক্ষীরেষু ধাবল্যং যথা বহ্নৌ চ দাহিকা ভূবি গন্ধো, জলে শৈত্য তথা কৃষ্ণে স্থিতি তব।" শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি— শাস্ত্রের প্রমাণ।।

শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র শক্তিরূপে শ্রীরাধার পূজা করা যায় কিনা, তাহা সুধী পাঠকবৃন্দ ও পুরুষোত্তম বাবুকে বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

পুরুষোত্তম বাবু শ্রীরাধার মূর্ত্তিকে শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে রাখিয়া পূজা করিবার ঘোর বিরোধী, যেহেতু শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা স্ত্রী নহেন। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহার চিত্তে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার উদয় হইয়াছে। বিষয়টী আলোচনা করিলেই পরিষ্কার হইয়া যাইবে।—

বৈকুণ্ঠেরও পঞ্চাশ যোজন উপরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোলোকধাম, যথায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম নিত্য বিরাজমান। এখানে অনন্তলীল শ্রীগোবিন্দ তাঁহার নিত্য প্রেয়সী, নিত্যলীলাসঙ্গিনী, রাসরাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে নিত্য লীলায়মান। লীলার নিত্য সহচর ও সহচরী ভিন্ন আর কাহারও সেখানে অবস্থান নাই। সেখানে নিত্যকিশোর শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে নিত্যকিশোরী শ্রীরাধাকে বসাইয়া নিত্যমিলনে সখিগণ নিত্যানন্দ লাভ করিয়া আনন্দে নৃত্য করেন। শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্ব, অন্যান্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের রাধাসহ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির রসোপকরণ মাত্র। নিত্যগোলোকে শ্রীরাধার অবস্থান সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

বামপার্শ্বে স্থিতাং তস্য রাধিকাঞ্চ স্মরেৎ ততঃ।
সূচী ন নীলবসনাং দ্রুতহেমসমপ্রভাম্।।

গোলোকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে অবস্থান করিবার একমাত্র অধিকার গোলোকেশ্বরী শ্রীরাধারই, অন্য কাহারও ত' দূরের কথা, স্বয়ং দ্বারকেশ্বরী রুক্মিণীরও সেই সৌভাগ্য লাভ হয় নাই।

রুক্মিণী দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে নিত্যকাল অবস্থান করেন। মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বরাট্‌পুরুষ শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ এবং সীতাঠাকুরাণী তাঁহার নিত্যশক্তি। রাজসূয় যজ্ঞকালে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার নিত্যপ্রেয়সী সীতার স্বর্ণমূর্ত্তি বামপার্শ্বে বসাইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাই ত' স্বাভাবিক। সীতার স্বর্ণমূর্ত্তি (অর্চ্চাবিগ্রহ) ও স্বয়ংসীতা উভয়ই অভিন্ন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে অবশ্যই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে।—

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলান্তর্গত বুঢ়ন গ্রামে যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বুঢ়নে কিছুদিন অবস্থান করিবার পর তিনি শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়া গ্রামে আগমন করেন। শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ পাইয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন এবং আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। ঠাকুরও অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গ লাভ করিয়া গোবিন্দ-রসসমুদ্রের তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন।

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।"

(ভাঃ ১১।২।৪০)

এবম্বিধ ব্রতশীল হইয়া প্রিয়তম শ্রীহরির নামকীর্ত্তনাদি-নিবন্ধন অনুরাগযুক্ত এবং বিগলিতচিত্ত পুরুষ লোকের হাস্য-প্রশংসাদিতে অবধান-শূন্য হইয়া উন্মাদতুল্য উচ্চহাস্য, রোদন, চীৎকার, গীত এবং নৃত্য-বিষয়ে রত হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে যে প্রেমলক্ষণের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শ্রীল ঠাকুরের দেহে প্রকটিত হইত। তিনি গঙ্গার তীরে তীরে হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিষয়সুখে বিরক্ত হইয়া সর্ব্বদাই কৃষ্ণনামে মত্ত রহিতেন। এক মুহূর্ত্তও তিনি কৃষ্ণনাম ছাড়া থাকিতেন না। হরিনাম করিতে করিতে নৃত্য করিতেন। কখনও মত্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতেন, কখনও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেন, আবার কখনও অট্টহাস্য করিতে থাকিতেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। কৃষ্ণভক্তি-বিকারের যতপ্রকার লক্ষণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তৎসমুদায়ই ঠাকুরের দেহে পরিলক্ষিত হইত। তিনি যখন নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিতেন, তখন তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে থাকিত। সেই প্রেমাশ্রুধারা দর্শন করিয়া পাষণ্ডিগণেরও সম্ভ্রম হইত। তাঁহার অশ্রু, কম্প, পুলকাদি দর্শনে ব্রহ্মা-শিবও আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন। ফুলিয়া গ্রামবাসী সকলেরই হরিদাসের প্রতি খুবই শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। ঠাকুরও প্রত্যহ গঙ্গাস্নানান্তে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন।

যবন হইয়াও হরিদাস ঠাকুর হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—ইহা দেখিয়া কাজী খুবই অস্বস্তি বোধ করিলেন। তিনি নবাবের নিকট হরিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন যে,—যবন হইয়া হরিদাস হিন্দুর আচার করিতেছেন, তাহার বিহিত করুন। কাজীর অভিযোগ শুনিয়া পাপমতি মুলুকপতি হরিদাসকে ধরিয়া লইয়া আসিলেন। তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া মুলুকপতির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে যত বন্দী ছিলেন তাঁহারা হরিদাস ঠাকুরের আগমনে খুবই আনন্দ অনুভব

করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে, পরম বৈষ্ণব ঠাকুরের আগমনে তাঁহাদের বন্দী-জীবনের দুঃখ নিশ্চয়ই ক্ষয় হইয়া যাইবে। তাঁহার আজানুলম্বিত ভুজ, কমলনয়ন, সর্ব্বমনোহর অনুপম মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া বন্দীগণ অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং ভক্তিভরে সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

"গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই—তোমার গুণ।।"

তাঁহার দর্শনে সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইল। হরিদাস ঠাকুর বন্দীদের শ্রদ্ধা দেখিয়া মৃদুমন্দ হাস্যে বলিলেন,—"তোমরা এখন যেভাবে আছ সেইরূপ থাক।" তাঁহার দুর্জ্ঞেয় বচন বন্দীগণ বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা খুবই বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন ঠাকুর কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার গুপ্ত আশীর্ব্বাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"আমি তোমাদিগকে যে আশীর্ব্বাদ করিলাম, তাহা তোমরা বুঝিতে পারিলে না। তজ্জন্যই বিষাদগ্রস্ত হইয়াছ। আমি কখনও কাহাকেও মন্দ আশীর্ব্বাদ করি নাই। তোমরা এইপ্রকার বন্দীদশায় পড়িয়া থাকিয়া দুঃখভোগ কর—এইরূপ আমি বলি নাই। আমি বলিয়াছি—এই দুঃখের মধ্যে তোমরা যেরূপ কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ চিন্তা করিতেছ, সেইরূপ চিন্তা যেন জীবনে অনুক্ষণই থাকে। বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া বিষয়ে প্রবিষ্ট হইলে সঙ্গপ্রভাবে তোমাদের চিত্তবৃত্তি কলুষিত হইবে। কারণ, বিষয়ে মত্ত থাকিলে কৃষ্ণপ্রেম হয় না এবং বিষয়াবিষ্ট মন স্ত্রী-পুত্রাদির মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া ভগবচ্চিন্তা হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়। দৈবাৎ কোন ভাগ্যবান্ জীবের ভাগ্যক্রমে যদি সাধুসঙ্গ লাভ হইয়া যায়, তখন সেই সাধুসঙ্গপ্রভাবে বিষয়াবেশ ছাড়িয়া কৃষ্ণভজনের সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। তোমরা বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অহর্নিশ হরিনাম কর এবং তোমাদের কৃষ্ণভক্তি লাভ হউক—ইহাই আশীর্ব্বাদ করিয়াছি। যাহা হউক, তোমাদের কোন চিন্তা নাই। দুই-তিন দিনের মধ্যেই তোমাদের বন্ধন মুক্ত হইবে অর্থাৎ তোমাদের এই বন্দীদশা ঘুচিয়া যাইবে। তোমরা যে স্থানেই থাক না কেন, কৃষ্ণভজন বিস্মৃত হইও না।" এইপ্রকার বন্দীগণের নিত্যকল্যাণ কামনা করিয়া হরিদাস ঠাকুর মুলুকপতির স্থানে উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুরের অনুপম তেজোরাশিবিশিষ্ট রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া নবাব সম্ভ্রমসহকারে পরম গৌরবে তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদান করিয়া বলিলেন,—"ভাই! তোমার এইপ্রকার মতি কেন? কত ভাগ্যফলে তুমি যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এই উচ্চকুলে জন্মিয়াও তুমি হিন্দুর আচার কেন করিতেছ? আমরা হিন্দুকে দর্শন করিয়া ভাত খাই না, আর তুমি সেই বিধর্ম্মীর আচরণ করিতেছ। ইহা খুবই দুঃখের বিষয়! তুমি জাতিধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া যে অন্যায় ব্যবহার করিতেছ, তাহাতে তোমার পরলোকে নিস্তারের কোন উপায় দেখিতেছি না। যাহা হউক, না জানিয়া যাহা কিছু অনাচার করিয়াছ কল্‌মা উচ্চারণ করিয়া সেইসব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।"

হরিদাস ঠাকুর মুলুকপতির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া—অহো বিষ্ণুমায়া! বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"আপনি এসব কি বলিতেছেন? ঈশ্বর কি কাহারও একার? ঈশ্বর হিন্দু-মুসলমান সকলেরই। একই ঈশ্বরকে হিন্দু ও যবনে কেবলমাত্র বিভিন্ন নামে প্রকাশ করে মাত্র। ঈশ্বর আমার চিত্তে যেমনভাবে প্রেরণা দিয়াছেন, আমি তাহাই করিতেছি। হিন্দুদের মধ্যে কেহ কেহ যেমন ব্রাহ্মণ হইয়াও স্বেচ্ছায় যবন হয়, হিন্দুরা তাহার আর কি করে? যে নিজে মরণের দিকে ধাবিত হয়, তাহাকে মারিয়া আর কি ধর্ম্ম হইবে? অতএব আপনি ইহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করুন। আর যদি আমার দোষ থাকে, তাহা হইলে আমাকে শাস্তি প্রদান করুন।

হরিদাস ঠাকুরের এইপ্রকার সুসত্য বচন শুনিয়া সমস্ত যবনের খুবই সন্তোষ লাভ হইল। কিন্তু পাষণ্ডী কাজী মুলুকপতিকে উত্তপ্ত করিবার জন্য বলিল,—"ইহাকে শাস্তি দান করুন। এই দুষ্ট ত' নিজে যাহা হইবার হইয়াছে, সমস্ত যবন-সমাজকে দুষ্ট করিয়া তুলিবে। সুতরাং এই দুষ্ট আপন শাস্ত্র নিজমুখে বলুক, নতুবা ইহাকে ইহার এইপ্রকার দুষ্কর্ম্মের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করুন।" ইহা শুনিয়া মুলুকপতি হরিদাস ঠাকুরকে বলিলেন,—"ভাই! তুমি হিন্দুয়ানি ছাড়িয়া নিজের শাস্ত্র বল। তাহা হইলে তোমার কোন চিন্তা নাই। তাহা না হইলে কাজীগণ তোমায় প্রচুর শাস্তি দিবে। তাহাদের উৎপীড়নে তোমাকে সেই বলিতে হইবে, তবে কেন নিজে অপমানিত হইবে? তুমি কল্‌মা উচ্চারণ কর।"

হরিদাস ঠাকুর বলিলেন,—"সবার হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে ঈশ্বরই রহিয়াছেন। তিনি যাহাকে যাহা করান সে সেইমতই কার্য্য করিয়া থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কেহই কিছু করিতে পারে না। তিনি সকলের পরিচালক এবং কর্ম্মফলদাতা—ইহা ভালভাবে জানিবেন। জীব মিথ্যা অভিমানে মত্ত হইয়া অহঙ্কারপূর্ব্বক নিজকে কর্ত্তা মনে করে এবং কর্ম্ম করিয়া থাকে। কিন্তু ভগবদিচ্ছাই বলবতী। আপনাদের কথায় আমি আমার নিষ্ঠা বা কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তিনি বলিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।।"

ঠাকুরের এইপ্রকার দৃঢ়তা দেখিয়া এবং সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচার শ্রবণ করিয়া মুলুকপতি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কাজীকে কি করা যাইবে জিজ্ঞাসা করিলে, দুষ্ট কাজী বাইশ বাজারের প্রত্যেক স্থানে গিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে করিতে তাঁহার প্রাণনাশ করিতে বলিল। ইহাই উপযুক্ত দণ্ড। যদি বাইশ বাজারে মারিলেও জীবন না যায় অর্থাৎ যদি জীবিত থাকেন তবে তাঁহাকে জ্ঞানী, সত্যবাদী বলিয়া জানা যাইবে। আর যদি মরিয়া যান তবে ত' হিন্দুয়ানি করিবার উপযুক্ত দণ্ডই পাইয়া গেল।" কাজীর কথায় নবাব পাইকদিগকে ডাকিয়া হরিদাস ঠাকুরকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত

করিতে আদেশ করিলেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যু না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন মারিতে থাকে। যবন হইয়া হিন্দুয়ানি করিলে মৃত্যুই তাহার এইপ্রকার পাপ হইতে নিষ্কৃতির উপায়।

কাজীর কথায় নবাবের আজ্ঞায় দুষ্টপাইকগণ হরিদাস ঠাকুরকে ধরিয়া লইয়া গেল এবং বাইশ বাজারে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতে লাগিল। ঠাকুর কৃষ্ণস্মরণপূর্ব্বক নামানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছেন, কোনও দুঃখের প্রকাশ নাই। তাঁহার প্রতি এইপ্রকার নির্ম্মম অত্যাচারে সজ্জনগণ অত্যন্ত দুঃখ পাইতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন—সুজনের প্রতি এইরূপ দ্রোহাচরণে সমস্ত রাজ্য উচ্ছন্নে যাইবে। অনেকে যবনগণের পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন—যেন তাহারা ঠাকুরকে অল্প করিয়া মারে। তজ্জন্য তাঁহারা তাহাদিগেকে বক্‌শিসেরও লোভ দেখাইলেন। কিন্তু সেই পাপীগণের চিত্ত এতই কঠোর ছিল যে, তাহারা তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বাজারে বাজারে ক্রোধমনে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতে লাগিল। তাহাদের এইপ্রকার অত্যধিক প্রহার সত্ত্বেও ঠাকুর কোনপ্রকার দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। বরং তিনি মনে মনে ঐ সকল দুর্ভাগাদের কল্যাণচিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা ত' করিলেনই, এমনকি, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন,—

"এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ।।"

যাহা হউক, বাইশ বাজারে ক্রমে ক্রমে প্রহার করিলেও ঠাকুরের মৃত্যু হইল না দেখিয়া পাষণ্ডগণ বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিল—এক বাজারে মারিলেই লোকে মরিয়া যায়, কিন্তু ইঁহাকে বাইশ বাজারে এমন নির্ম্মমভাবে প্রহার করা সত্ত্বেও ইহার মৃত্যু হওয়া ত' দূরের কথা, ক্ষণে ক্ষণে হাসিতেছেন। তাহাদের মনে ভীতির উদ্রেক হইল এবং তাহারা ভাবিল—ইনি নিশ্চয়ই পীর হইবেন। তখন তাহারা ভয়ে বিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিল,—"হরিদাস, তুমি কে? আমরা আশ্চর্য্য হইলাম—এত প্রহারেও তোমার মৃত্যু হইল না! কাজী ইহা কোনমতেই বিশ্বাস করিবে না। ফলে কাজী আমাদেরই প্রাণনাশ করিবে।" তখন ঠাকুর হাসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—"যদি আমি বাঁচিয়া থাকিলে তোমাদের খারাপ হয়, তাহা হইলে আমি এখনই মরিতেছি।" এই বলিয়া তিনি আবিষ্ট হইয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ঠাকুর অচেষ্ট হইয়া গেলেন। তাঁহার আর শ্বাস পড়িতেছে না। যবনগণ ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং তাঁহাকে মুলুকপতির স্থানে লইয়া আসিল। মুলুকপতি তাঁহাকে মাটী দিয়া সমাধি দিতে বলিলে কাজী মাটী দিতে নিষেধ করিয়া বলিল,—ইহাকে মাটী দিলে পরলোকে ইহার ভাল গতি হইবে। বরং ইহাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হউক। ইহাতে সে চিরকাল দুঃখ পাইবে।"

কাজীর এইপ্রকার বচন শুনিয়া যবনগণ তাঁহাকে ধরিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে লইয়া গেল। কৃষ্ণসেবাসুখ-সমাধিতে নিমগ্ন ঠাকুর নিশ্চল হইয়া রহিলেন। তাঁহার দেহে বিশ্বম্ভরের অধিষ্ঠান হইল। এইভাবে ঠাকুর গঙ্গায় ভাসিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি চৈতন্য পাইয়া তীরে আসিয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে কুলিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এইপ্রকার অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়া যবনগণের হিংসা দূরীভূত হইল এবং তাহাদের মন ফিরিয়া গেল। তাঁহাকে পীরজ্ঞান করিয়া তাহারা সকলে প্রণাম করিল। হরিদাসের বন্দনার ফলে তাহারা উদ্ধার পাইয়া গেল। ঠাকুর বাহ্যদশায় ফিরিয়া আসিয়া নবাবকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। মুলুকপতি নবাব হরিদাসের অতিমর্ত্ত্য শক্তি বা ঐশ্বর্য্যমহিমা দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং সম্ভ্রমে হাতজোড় করিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন—"প্রভো! তুমি মহাপীর, সিদ্ধ মহাপুরুষ। তোমার সমজ্ঞান হইয়াছে—ইহা সত্য সত্যই জানিলাম এবং আরও জানিলাম যে তুমি সত্য সত্যই সিদ্ধিলাভ করিয়াছ। তোমার দর্শনের জন্য আমি এখানে আসিলাম। প্রভো! তুমি ত' সমদর্শী। তোমার শত্রু, মিত্র কেহ নাই। তোমাকে কে চিনিতে পারিবে! আমি বড় অভাগা, দুর্জ্জন। আমার পাপের সীমা নাই, আমি তোমার চরণে যে কি-প্রকার অপরাধ করিয়াছি তাহা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে গোফায় থাকিয়া ভজন কর। অথবা তোমার যেখানে ইচ্ছা স্বেচ্ছায় তুমি গমন কর।"—এই বলিয়া নবাব ঠাকুরকে পীর বা সিদ্ধ মহাপুরুষজ্ঞানে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া চরণ বন্দনা করিতে লাগিলেন।

অদোষদর্শী প্রভু যবনগণকে ক্ষমা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে কুলিয়াস্থ ব্রাহ্মণসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাসকে দর্শন করিয়া কুলিয়ার ব্রাহ্মণগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। ঠাকুর আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, পুলকাশ্রু ও প্রলয়—অষ্টসাত্ত্বিক ভাব উদিত হইল। তিনি প্রেমোন্মত্ত হইয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে স্থির হইলে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলেন। ব্রাহ্মণগণ ঠাকুরের প্রতি অত্যাচারে খুবই দুঃখিত ও মর্ম্মাহত ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিলেন। বরং বলিলেন,—"আমি নিজ কর্ণে দুর্ব্বৃত্তগণকর্ত্তৃক প্রভুর নিন্দা শ্রবণ করিয়াছি। ঈশ্বর আমাকে তাহার শাস্তি করিয়াছেন। ভালই হইল। আমার এত বড় দোষ ক্ষমা করিয়া ঈশ্বর আমাকে অল্প শাস্তি করিয়াছেন। কারণ বিষ্ণুনিন্দা শ্রবণে কুম্ভীপাক নরকলাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন—এই বলিয়া তিনি বিপ্রগণের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন হইলেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ ; ১৫ জুন, ২০০১

বিগ্রহ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৯ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি। ইহাই তাঁহার স্বয়ংরূপ। গোপবেশধারী অর্থাৎ গো-পালক বা রাখালবেশধারী ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ।

'স্বয়ংরূপ' 'স্বয়ংপ্রকাশ',—দুইরূপে স্ফূর্ত্তি।

স্বয়ংরূপে—এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০/১৬৬)

স্বয়ংমূর্ত্তি দ্বিবিধ—(১) স্বয়ংরূপ ও (২) স্বয়ংপ্রকাশ। ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ংরূপ। কারণ, তাঁহার এই রূপ অন্য কোনও রূপকে অপেক্ষা করে না। ইহাই ভাগবতামৃতের অভিমত।

শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর। চিন্ময় জগতে কালিক কোন ভেদ নাই। সেখানে নিত্য বর্ত্তমান কাল বিরাজিত। তাই শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নূতন কিশোররূপে বর্ত্তমান। যিনি নিত্যকিশোর, তাঁহাকে দেখিলে কখনই পনর বৎসরের অধিক বলিয়া মনে হয় না। এই নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের উপাস্য।

কখন বা কিরূপ অবস্থায় ভক্ত দিব্য নবকিশোর মূর্ত্তির সাক্ষাৎ লাভ করেন?

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্-
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।। (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ ১০৭)

যখন শ্রীকৃষ্ণে ভক্তের ভক্তি স্থিরতরা অর্থাৎ দৃঢ়া থাকে, তখন ভক্ত দিব্যকিশোরমূর্ত্তি দেখিতে পান। শুদ্ধা দৃঢ়ভক্তিতে নিত্যকিশোর মূর্ত্তিকে স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায়। মাধুর্য্যময়ী শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারিলে দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই ভক্তের সম্মুখে উদিত হন।

নট্ (নৃত্য করা) + অ = নট্। যিনি নৃত্য করেন তিনি নট্ অর্থাৎ নর্ত্তক। নটের মধ্যে যিনি 'বর' অর্থাৎ উত্তম, তিনি নটবর। নটবরবেশে সজ্জিত শ্রীমূর্ত্তি দর্শন কেমন? কেমন তাঁহার লীলা?

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধূনানমব্জং কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্।।

"তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) বর্ণ শ্যামল ও পরিধানে পীতবসন বর্ত্তমান ছিল। তিনি বনমালা, শিখিপুচ্ছ, ধাতু এবং প্রবালদ্বারা নটবরবেশে সজ্জিত হইয়া একহস্ত সহচরের স্কন্ধদেশে স্থাপনপূর্ব্বক অন্য হস্তে লীলাকমল সঞ্চালন করিতেছিলেন। তাঁহার কর্ণদ্বয়ে উৎপল, কপোলযুগলে অলকা এবং মুখপদ্মে সুমধুর হাস্য শোভা পাইতেছিল।" (ভাঃ ১০/২৩/২২)।

অনুরূপ,—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ।। (ভাঃ ১০/২১/৫)

(তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ) চূড়ায় শিখিপুচ্ছভূষণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার পুষ্প, পরিধানে কনকবর্ণ অর্থাৎ উজ্জ্বল পীতবসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী অর্থাৎ পঞ্চবর্ণপুষ্প গ্রথিতা মালা ধারণ করিয়া অধরসুধা অর্থাৎ অধরামৃতদ্বারা বংশীছিদ্র পূরণ করিতে করিতে নটবরবেশে স্বীয় পদাঙ্কিত শঙ্খ-চক্রাদি শোভিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন।

গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবররূপই নরলীলার অনুরূপ অর্থাৎ যোগ্য। এই রূপধারী ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত অন্যস্বরূপে সর্ব্বোত্তম নরলীলা সম্ভব নয়। শাস্ত্রে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। নারায়ণের বক্ষঃবিলাসিনী লক্ষ্মীও ব্রজেন্দ্রনন্দনের নরলীলার মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। দ্বিভুজ ব্রজেন্দ্রনন্দন কুরুক্ষেত্রে যখন নটবরবেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তখন নিত্যকান্তা ব্রজগোপীগণ মনক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন এবং "গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর" রূপ দর্শনে লালায়িত হইয়াছিলেন। ললিতমাধব নাটকম্-গ্রন্থে উল্লেখ আছে,—"আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভির্যাসাং হন্ত! চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি।"

"একদিবস পশুপেন্দ্রনন্দন বিশাল ভুজচতুষ্টয় শোভমান নারায়ণ মূর্ত্তি প্রকটন করিলে তাহাতে ঐ গোপীদিগের অনুরাগ সঙ্কুচিত হইয়াছিল।"

ইহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, নারায়ণমূর্ত্তি অপেক্ষা, এমন কি, শ্রীকৃষ্ণের অন্য মূর্ত্তি অপেক্ষা গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর নটবররূপেরই মাধুর্য্য অধিক।

কৃষ্ণের মধুর রূপ, শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ।। (চৈঃ চঃ মঃ ২১/১০২)

দ্বিভুজ চিরকিশোর মুরলীধর শ্রীবিগ্রহ-মাধুরী এমনই অপরিমিত যে, ইহার এক কণিকা ত্রিভুবনকে প্লাবিত করে অর্থাৎ ত্রিভুবনস্থ সকল প্রাণীকে ঐ মাধুরী আস্বাদনের জন্য লোভ জাগ্রত করিয়া আকর্ষণ করে।

রূপ দেখি' আপনার, কৃষ্ণের হইল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যাঁর নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এইরূপ নিত্য তার ধাম।। (চৈঃ চঃ মঃ ২১/১০৪)

নিজের রূপমাধুরী নিজেই আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের তীব্র বাসনা। শ্রীকৃষ্ণ নিজের রূপ নিজে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন।

অপরিকলিত পূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপুরঃ।
অয়মহমপিহন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব।।

"আহা! আমার কি গুরুতর আশ্চর্য্য মাধুর্য্য, ইহা পূর্ব্বে কখনও নিরীক্ষিত হয় নাই, অধিক কি বলিব যদ্দর্শনে এই আমিও লুব্ধচিত্ত হইয়া সকৌতুকে শ্রীরাধার ন্যায় উপভোগ করিতে বাসনা করিতেছি।" (ললিতমাধব নাটকম্ ৮/৩৪)।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী উপভোগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজের রূপে নিজে মুগ্ধ হইয়া শ্রীরাধার ন্যায় নিজের রূপমাধুর্য্য উপভোগ করিতে বাসনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ এমনই চমৎকারিতায় পূর্ণ, এমনই মাধুর্য্যমণ্ডিত, এমনই সৌন্দর্য্যবিভূষিত, এমনই চিত্তাকর্ষক যে, যেরূপে স্বয়ং কৃষ্ণও মুগ্ধ।

'ভক্ত্যে' ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০/১৬৪)

কৃষ্ণ-বিগ্রহ নিত্যবস্তু এবং একই বিগ্রহে তাঁহার অনন্ত স্বরূপ বিদ্যমান। এক নিত্য বিগ্রহে অনন্ত স্বরূপ অনুভূত হয় একমাত্র ভক্তিতে। "গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর"—অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই এস্থলে একই বিগ্রহ বলা হইয়াছে। অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে একই বিগ্রহে তিনি অনন্ত স্বরূপে বিরাজিত।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।। (ভাঃ ২/৯/৩২)

উক্ত শ্লোকে 'অহম্' পদটি তিনবার ব্যবহৃত হইয়াছে। পদটির তিনবার উক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণেরই নির্দ্ধারণ সূচিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় অর্থাৎ সমস্তেরই মূল তিনি।

'অহমেব'-শ্লোকে 'অহম্'—তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য-বিগ্রহের স্থিতির নির্দ্ধার।। (চৈঃ চঃ মঃ ২৫/১১২)

শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের মালিক শ্রীকৃষ্ণ। যে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নিত্যবিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীবিগ্রহ অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান। 'অহম্'-পদের তিনবার উক্তিদ্বারা ইহাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

" 'অহমেব'-পদের 'এব'-কারের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কর্ত্তার সত্তা এবং নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও ধামাদি চিদ্বৈচিত্র্যবিহীন তত্ত্ববস্তুর সত্তাকে নিরাস করা হইল।" (শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের টীকা—ভাঃ ২য় স্কন্ধ)।

"যে 'বিগ্রহ' নাহি মানে, 'নিরাকার' মানে।
তারে তিরস্করিবারে করিলা নির্দ্ধারণে।। (চৈঃ চঃ মঃ ২৫/১১৩)

যাঁহারা নিত্য সাকার স্বরূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বীকার করেন না, বরং নিরাকার পরব্রহ্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তিনবার 'অহম্'-শব্দের উল্লেখ করিয়া দৃঢ়তার সহিত প্রতিপন্ন করা হইল যে পরব্রহ্ম সাকার।

অর্চ্চা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে শিলা-বুদ্ধি অপরাধ। কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তির প্রতি যাহারা শিলা-বুদ্ধি করিয়া অপরাধ করে তাহারা পাষণ্ড। এই পাষণ্ডগণকে শিক্ষাদানার্থে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ।। (চৈঃ চঃ অঃ ৬/২৯৪)

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীবিগ্রহে ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণে ভেদরহিত। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি না করিয়া আগ্রহভরে পূজা করাই বাঞ্ছনীয়। ব্যাকুলতাই সেবার প্রাণ। কারণ ব্যাকুলতা ব্যতীত কৃষ্ণসেবা হয় না। আর কৃষ্ণসেবা যথার্থ না হইলে কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি অসম্ভব।

শ্রীরাধা-বিগ্রহ ঃ—

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি' মানি।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪/৬২)

সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাংশে হ্লাদিনী। চিচ্ছক্তি আনন্দের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলে হ্লাদিনী শক্তিরূপে কথিত হইয়া থাকে। লীলা-বিলাসের মধ্য দিয়া আনন্দ সম্ভোগের ইচ্ছা করিলেন শ্রীকৃষ্ণ। এই ইচ্ছা পূরণের নিমিত্ত তাঁহার হ্লাদিনী-শক্তিকে প্রকাশ করিয়া মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিলেন। শ্রীরাধা এই মূর্ত্তিমতী। শ্রীরাধা হ্লাদিনীশক্তি-প্রধানা। সেই কারণে শ্রীরাধা হ্লাদিনীর মূর্ত্তিরূপা বিগ্রহা।

"রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।"

(চৈঃ চঃ আঃ ৪/৯৬)

কেবল শক্তিরূপে শক্তি অমূর্ত্ত। কিন্তু শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে শক্তি মূর্ত্ত। অমূর্ত্ত-শক্তি মূর্ত্ত অধিষ্ঠাত্রীরূপে বিরাজ করেন। শক্তিমানের মধ্যে অমূর্ত্ত শক্তির অবস্থিতি। মূর্ত্তরূপে শক্তি শক্তির অধিষ্ঠাত্রী। শ্রীরাধা হ্লাদিনীশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহা। হ্লাদিনীশক্তি শক্তিরূপে অমূর্ত্তা। কিন্তু পূর্ণতমা হ্লাদিনীশক্তি যখন মূর্ত্তরূপ ধারণ করিলেন, তখন সেই মূর্ত্তরূপ হইলেন পূর্ণতমা হ্লাদিনীশক্তির পূর্ণতমা অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীরাধা। মূর্ত্তশক্তি-রূপে শ্রীরাধা নিত্যা শ্রীবিগ্রহা। তিনি কেবলমাত্র হ্লাদিনীশক্তির নয়, সন্ধিনী ও সম্বিৎ শক্তিরও অধিষ্ঠাত্রীদেবী অর্থাৎ হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ শক্তিত্রয় পরস্পর সম্পর্কিত হওয়ায় শ্রীরাধা ত্রিশক্তি সমন্বিতা মূর্ত্ত বিগ্রহা, যদিও হ্লাদিনীশক্তি প্রধানা। (ক্রমশঃ)

—শ্রীভবদ্বন্ধু দাসাধিকারী

বিবৃতি ও প্রার্থনা

(১)

পিতৃপাশে মূর্খ পুত্র নিজ দুঃখ ভাষে।
গোপনেতে তাহা শুনি' অন্যে যদি হাসে।।
উপায় কি আছে তার, নিরূপায় হ'য়ে।
অবশ্য জানা'বে দুঃখ লজ্জা তেয়াগিয়ে।।

(২)

সেই ভাব ল'য়ে আজি সাহসী হইয়া।
বলিব মনের কথা সব বিস্তারিয়া।।
ইথে যত অপরাধ হইবে আমার।
পিতা ভিন্ন ক্ষমিবার কার অধিকার??

(৩)

ব্যাখ্যা আমি শুনিয়াছি "বিশ্রম্ভ সেবার"।
কাছে থাকি' অন্তরঙ্গ সেবা অধিকার।।
দূর হ'তে সসম্ভ্রমে সেবা নহে কভু।
তাহা হ'তে প্রীত নহে কভু গুরু প্রভু।।

(৪)

"জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে।।
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভক্তগণে।।

(৫)

জীবন না অন্ত হ'তে যদি এই দীন।
করিতে পারিত তাঁর সেবা কিছুদিন।।
সার্থক হইত তার মানব জনম।
সৌভাগ্য কোথাও নাহি আছে এর সম।।

(৬)

"স্বল্পো হি কালঃ বহবশ্চ বিঘ্নাঃ" একথা।
ভাবিয়া হৃদয়ে পাই নিদারুণ ব্যথা।।
যোগ্যতা তাহাতে মোর কিছুমাত্র নাই।
কি গুণ আমাতে আছে যাতে সেবা পাই।।

(৭)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের বা যোগ্যতা শূদ্রের।
কিছুমাত্র নাহি আছে এই অধমের।।
তবে কিসে প্রভু-সেবা লভিবারে চাই।
সেবাকার্য্যে অন্ত্যজের অধিকার নাই।।

(৮)

ইহা ছাড়া অন্য বিঘ্ন আছে বহুতর।
নিবেদিব তাহা আমি নিম্নে এর পর।।
পরিব্রাজকের বেশে, প্রভু যায় দেশে দেশে।
তাঁ'র অন্তরঙ্গ-সেবা মিলিবে বা কিসে।।

(৯)

অলসের, কপটের, এই চিন্তা-ধারা।
গৃহব্রত মূল বিঘ্ন হয় ইহা ছাড়া।।
সেই গৃহকূপ হ'তে উদ্ধার কি মতে।
বদ্ধজীব আমি পাব, না পারি বুঝিতে।।

(১০)

নিরুপায় হ'য়ে প্রভু তোমা ডাকি তাই।
অহৈতুকী কৃপা ছাড়া অন্য গতি নাই।
হৃদয়ের এই কথা সহজানন্দের।
আকাশকুসুম একি মূঢ় ভাবুকের।।

—শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৮০ পৃষ্ঠার পর]

উক্ত শ্লোকে 'ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত'-বাক্যটী বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। সদ্‌গুরু-বাক্যে, ভগবদ্বাক্যে, সচ্ছাস্ত্র-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাকেই প্রকৃত আস্তিক্য বলা হয় এবং সেই শ্রদ্ধাহীনতাই নাস্তিক্য। অসূয়া—অনাদর, গুণে দোষারোপ, দ্বেষ বা ক্রোধার্থে ব্যবহৃত হয়। যে অপ্রাকৃত গুরুদেবের বাক্য ভক্তের কর্ণ-রসায়ন, যাঁকে দর্শন করলে মনে কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়, যিনি প্রকৃত বেদজ্ঞ—সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ববেত্তা, যিনি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যপূর্ণ ও সর্ব্বদা কৃষ্ণ-স্মরণরত, সেই গুরুদেবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করা মহাপরাধ। তাঁর গুণে দোষারোপ করলে তাঁকে অবজ্ঞা বা নিন্দা করা হয়। গুরু-বাক্যে দোষ-দর্শন শ্রদ্ধাহীনতা ও তাহাই নাস্তিকতা।

শ্রীগুরুদেবকে ও ভগবান্‌কে নিন্দার ফল সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলেছেন,—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ।। (ভাঃ. ১০।৪।৪৬)

অর্থাৎ—"আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, লোক ও আশীর্ব্বাদ—এ সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তুই মনুষ্যের মহদতিক্রম হতে নাশ হয়ে যায়।"

শাস্ত্র আরও বলেছেন,—পাপ-মলিনচিত্তে শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি ও সদ্‌গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না ; যথা—

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরৌ তথা।।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-বাক্য)

যে-পর্য্যন্ত জীবহৃদয় বিষয়াসক্তি ও পাপরাশিতে মলিন থাকে, সে-পর্য্যন্ত শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি এবং সদ্‌গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না।"

শাস্ত্র এবং গুরুদেব উভয়ই চিন্ময় অপ্রাকৃত বস্তু এবং গুরুদেবই শাস্ত্রজ্ঞান দিতে সমর্থ। বদ্ধজীবের হৃদয় পাপে মলিন থাকাকালে সদ্‌গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি ও শাস্ত্রের বাণীতে নানা দোষ দর্শন করে শাস্ত্রে অবিশ্বাসী হয়।

এক্ষণে শ্রীশঙ্করাচার্য্য জগদ্‌গুরু শ্রীব্যাসদেবের সূত্রে দোষ দর্শন করে তাঁকে ভ্রান্ত বলায় শঙ্করাচার্য্য কি পাপ-মলিন চিত্ত এবং গুরু-ব্যাসদেবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেছেন?—এরূপ প্রশ্ন উত্থিত হয়। তিনি গুরু ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলায় তাঁর প্রতি অনাদর বা অবজ্ঞা হয় না কি? তদুত্তর এই যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রীশঙ্করাবতার—তিনি সামান্য বদ্ধজীব নন। যখন এই পৃথিবীতে বুদ্ধের শূন্যবাদের প্রচারে নাস্তিকতা বিস্তার লাভ করল, তখন ভগবান্ ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও বেদের প্রমাণিকত্ব স্থাপনের জন্য শঙ্করকে বিশেষ শক্তি সঞ্চার করে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। ভগবান্ তাঁকে মোহ-শাস্ত্র প্রণয়নদ্বারা ভগবদ্‌স্বরূপ প্রকাশের বিরুদ্ধ কল্পিত যুক্তি-জাল বিস্তার করে রুদ্ররূপ (সংহার-মূর্ত্তি) প্রকাশ করত তাঁর নিজ ভগবৎস্বরূপকে আবৃত করতে আদেশ করলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রীভগবানের বিশেষ আজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে তৎ মনোঽভীষ্ট পূরণের জন্য ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতির ভাষ্যে শ্রীগুরু-ব্যাসদেবের অসম্মত 'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপন করে বহির্ম্মুখ জনগণকে বঞ্চনা করেন। দ্বাদশ মহাজনগণের অন্যতম শ্রীশঙ্করই শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ। যে পরম বৈষ্ণব সর্ব্বদা পবিত্র, তাঁর মধ্যে কি পাপ প্রবেশ করতে পারে? যাঁর দর্শনে পাপী জীবের পাপ অন্তর্হিত হয়, সেই মহাবৈষ্ণব শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য গুরু-ব্যাসকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করতে পারেন না। বাহ্যবিচারে যাকে পাপ বলা হয়ে থাকে, তা যদি ভগবানের জন্য কৃত হয়—তাহাই ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত ; যথা ভক্তিসন্দর্ভ-বাক্য—"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।" শ্রীমদ্ভাগবতে (১০ম স্কন্ধ, ৮৯ অঃ) ভৃগুমুনির উপাখ্যানে বৈষ্ণবতত্ত্ব জীবের অগম্য বলে প্রতীয়মান হয়।

বিষ্ণুতত্ত্ব যেন অবিজ্ঞাত বেদবাণী।
এই মত বৈষ্ণবেরো তত্ত্ব নাহি জানি।।
সিদ্ধবৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যবহার।
না বুঝি নিন্দিয়া মরে সকল সংসার।।
সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যবহার।
সাক্ষাতে দেখহ ভাগবত-কথা সার।।
বৈষ্ণব-প্রধান ভৃগু—ব্রহ্মার নন্দন।
অহর্নিশ মনে ভাবে যাঁহার চরণ।।
সে প্রভুর বক্ষে করিলেন পাদাঘাত।
তথাপি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ দেখহ সাক্ষাৎ।।

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।৩১০-৩১৪)

উক্ত পয়ারের ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখেছেন,—"ভগবৎসেবাপর ভক্ত ভগবানের বিশ্রম্ভ সেবক। সাধারণ লোক বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হয়ে তা বুঝে উঠতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের ভৃগু-চরিত্র বর্ণনে কৃষ্ণভক্তের লোকাতীত মর্য্যাদা-লঙ্ঘনের কথা বর্ণিত হয়েছে। ভৃগু ভগবানের বক্ষে পদাঘাত করিতে শঙ্কিত হন নাই। ভক্তবৎসল ভগবান্ সাধারণ বিচারে ভৃগুকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হলেও তদ্দ্বারা ভৃগুর ভগবৎসেবার অতি বিশ্রম্ভভাব ও অত্যাসক্তি প্রকটিত হয়েছে। মূঢ় জনগণ প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝে ভৃগুর অনুকরণে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে ব্যস্ত হন।" ভৃগুর গর্হিত কার্য্য যেমন লোকচক্ষে ভক্তজনোচিত হয় নাই, তেমনই শ্রীশঙ্করাচার্য্য-কর্ত্তৃক বিষ্ণুর আবেশাবতার জগদ্গুরু ব্যাসের ভাষ্যের বিপরীত কল্পিত অর্থ করে ভগবন্মহিমা ক্ষুণ্ণ করা লোকচক্ষে ভক্তজনোচিত হয় নাই বলে বিবেচিত হয়। যাঁরা বিষ্ণুর পরমপদের উত্তমত্ব বুঝতে পারেন না, তাঁদের তা জানাবার জন্যই আবেশাবতার-সূত্রে ভৃগুমুনির কার্য্য ভগবদিচ্ছায় সম্পন্ন হয়েছিল। মায়াবাদাচার্য্য শ্রীশঙ্করও ভগবদিচ্ছায় ও ভগবদাজ্ঞায় নিজ দাস্যভাব গোপন করে ব্যাসদেবের দোষদর্শন ও ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলে রুদ্রের আবেশাবতারের অভিনয় করেছিলেন। কৃষ্ণ যেমন নিজ-মহিমা ও ভক্ত-মহিমা প্রকাশার্থে ভৃগুর হৃদয়ে প্রেরণাদ্বারা নিজবক্ষে পদাঘাত করিয়েছেন, তেমনই ভগবৎপ্রেরণাবলেই শ্রীশঙ্করাচার্য্য অত্যন্ত অসৎশাস্ত্র নাস্তিকতাপূর্ণ মায়াবাদ প্রচার করে ব্রহ্মকে মায়ার অভিভাব্য করতে প্রয়াসী হয়ে জগতের বহির্ম্মুখ-সৃষ্টি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত করার উদ্দেশে মায়াবাদীয় মায়াময় মতের আবাহন করত বিমুখ-মোহন-লীলার অবতারণা করেন। ব্যাসদেবের শুদ্ধ-মতকে অহেতুক অবৈধ দোষ না দিলে শ্রীশঙ্করের কল্পিত মত মায়াবাদের প্রতি লোকে আকৃষ্ট হবে না বিবেচনা করে শঙ্করকর্ত্তৃক গুরু ব্যাসদেবও ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হন। শঙ্করাচার্য্য পাষণ্ড-মত

প্রচারার্থ নিজেই ভ্রান্ত ভাষ্যকাররূপে ও ভ্রান্ত-পথ-প্রদর্শকরূপে আত্মপ্রকাশ করত বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেও বেদ-বিরোধী মতবাদ প্রচারদ্বারা ব্রহ্মসূত্রার্থের আচ্ছাদন করায় তাঁর মত ও পথ শূন্যবাদী, নিরীশ্বর, বেদনিন্দক বৌদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর নাস্তিকতাপূর্ণ। ব্যাসানুগত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আচার্য্যশঙ্করকে সাক্ষাৎ শঙ্কর (শিব) রূপে মান্য করলেও তাঁর মত ও পথ শ্রীব্যাস-বিরোধী হওয়ায় তাহা স্বীকার করেন না। ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌমকে জানিয়েছেন,—শঙ্করাচার্য্যের অসুরমোহন-লীলা ভগবানের আদেশেই সংঘটিত হয়েছে, ইহাতে তাঁর কোন দোষ নাই। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৫ পৃষ্ঠার পর]

সেখানে তোমার পূর্ব্ববাস্তু ছিল, সে বাস্তু তুমি ভুলে গেছ বর্ত্তমানে, সেখানে চলে যাও। কথাটা—Back to God and back to home, our eternal home। সেটা ব্যাখ্যা করলে কি হবে? Baikuntha is our heritage, earth but a players stage. তাহলে কি করা হবে? কি করব আমরা? ভুল হয়ে গেছে, ভুল করে ফেলেছি। সেইজন্য Diversion। ভুল সংশোধন করতে হবে। ভুল সংশোধন মানে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া। চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। সবটাই সম্ভব। তবে শুধু চেষ্টা করলেই কি হবে? আর কি কিছুর দরকার নাই, প্রয়োজন নাই ওর ভিতরে? আরও কিছু প্রয়োজন আছে। মানুষের প্রচেষ্টা, সাধক-সাধিকার প্রচেষ্টা, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎকরুণা কৃপাপ্রার্থী। এইটা করলে হবে।

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে।।
অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে।।

তাহলে আমাকে চেষ্টা করতে হবে, যদিও সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎকরুণাপ্রার্থী আমি। তাহলে কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান্ টগবান্ মানি না, কিচ্ছু মানি না, তাহলে আমার পক্ষে কোন ব্যবস্থা সে নেয় না। ভগবানকে না মানা মানে Guardianকে না মানা। সে Guardian কি? Supreme Guardian। Supreme spiritual guardian, তাঁর নাম হচ্ছে ভগবান্। তাঁকে অস্বীকার করা হয়। এইখানে, এই জগতে চলছে এইরূপ। আমার nearest guardian মাতা-পিতাকে না মানলে

চলছে না, মুনিঋষিগণকে না মানলে চলছে না, স্কুল-কলেজের যাঁরা শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন, তাঁদের না মানলে চলছে না। এগুলো ত' discipline। পরমার্থটাও discipline। Higher discipline, highest discipline—এর নামই পরমার্থ। শাস্ত্রে এ কথা বলছেন। তত্ত্ববিজ্ঞান লাভ করতে গেলে যে যে বিষয়বস্তু শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া আছে, সেগুলো আমাদের সম্পূর্ণ পালন করা উচিত। তা না হলে আমরা বাস্তব ফল পাচ্ছি না। যদি কোন জায়গায় ফাঁক থেকে যায়, তাহলে ফল মিলবে না ঠিক। সেটা ঠিক ঠিকভাবে Follow করা চাই। এতে উপকার আছে। আত্মবৃত্তি জাগরণ, আত্মবৃত্তি উন্মেষের জন্য যে যে ব্যবস্থাগুলো শাস্ত্রে দেওয়া আছে, সবগুলো আমাদের প্রয়োজন কম-বেশী।

প্রথমমুখে সেখানে বলেছেন, ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করতে গেলে "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ।" আহারশুদ্ধি চাই। আহারশুদ্ধিতে আমাদের সব চলে গেছে। এটা কি কথা, আর কি কোন কথা নাই? এটাই ত' প্রথম কথা। প্রথমমুখেই আহারশুদ্ধি দরকার। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা মুখশুদ্ধি গ্রহণ করি। 'মুখশুদ্ধি' বলে একটা কথা আছে। যারা মুখটা অশুদ্ধি করেন, তাদের মুখশুদ্ধির দরকার হয়। কিন্তু যাঁরা প্রসাদ—মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন, তাঁদের আর মুখশুদ্ধির প্রয়োজন হয় না, যদিও কথাটা Irony—ব্যঙ্গ করে বললাম। যাঁরা প্রসাদভোজী, তাঁদের মুখ সবসময় শুদ্ধ। যাঁরা সবসময় হরিনাম গ্রহণ করেন, ভগবানের নাম গুণগান করেন, তঁশদের মুখ সবসময় শুদ্ধ। তাঁরা সবসময় ভগবৎকথা শ্রবণ করেন, তাঁদের সবসময় কর্ণশুদ্ধি হয়ে আছে। কর্ণবেধ যে সংস্কার তা তাঁদের হয়ে আছে। যাঁরা সবসময় ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন, ভক্তের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন, তাঁদের চক্ষুশুদ্ধি হয়ে আছে। যাঁরা প্রসাদ সেবা করেন, তাঁদের আর আলাদা মুখশুদ্ধির দরকার হয় না। এটা শাস্ত্রেরই উক্তি।

তাহলে কি করব? চেষ্টা করতে হবে ঠিক ঠিকভাবে বুঝবার জন্য, ঠিক ঠিক ভাবে Follow করবার জন্য। এতে কিছু ত্যাগ স্বীকার আছে। কষ্ট করলে কেষ্ট পায়—কথাটা আছে। সাধন-ভজন করতে গেলে কিছু ক্লেশ ত' আছে। সেটুকু ক্লেশ আমাদের মেনে নিতে হবে। এমনি সংসারে দেখা যায় কোন একটা ছেলে, বা কোন একটা মেয়ের দারুণ অসুখ। হাজার হাজার টাকা তার পিছনে খরচ হয়ে গেল, কিন্তু তাকে সুস্থ করা যাচ্ছে না। তখন মা-বাবা দুজনেই সন্তানকে নিয়ে গেলেন কোন সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে। দেখুন ত' বাবা আমার এই ছেলেটা সুস্থ হবে কি না? সাধু বললেন, সুস্থ হতে পারে। কি করলে সুস্থ হবে? আমি ত' হাজার হাজার টাকা খরচ করেছি, কিছু হল না। তখন সাধুবাবা বললেন,—একটা ব্যবস্থা আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ছেলের মাকে,—তোমার সবথেকে ভাল পছন্দের খাওয়ার জিনিস কি বল, যেটা না হলে তোমার চলে না রোজ? বললেন,—প্রত্যেকদিন রামরম্ভা আমার দুটো দরকার।

তখন সাধুবাবা বললেন,—ঐ রামরম্ভা দুটো খাওয়া ছাড়তে হবে তোমাকে জীবনের মত। তারপরে ছেলের বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনার কোন্‌টা খুব পছন্দ? তিনি বললেন,—আমার পাকা আম বারমাস একটা করে চাই। সাধুবাবা বললেন,—আপনাকে ঐ পাকা আম খাওয়া ছাড়তে হবে জীবনের মত। সবথেকে রুচিকর যে দুটো ফল তা তাঁরা ছেড়ে দিলেন। ছেলে আস্তে আস্তে সুস্থ হতে লাগল। ছেলের সুস্থতার জন্য মা-বাপ ত্যাগ স্বীকার করলেন জীবনের মত। জীবনে আর সেটা খাওয়া যাবে না। সন্তানের কল্যাণকামনায়, সন্তানের সুস্থতার কামনায় যদি অভিভাবক, অভিভাবিকা এটুকু কষ্ট স্বীকার করতে পারেন, তাহলে সাধন-ভজনের জন্য, ভগবানের প্রীতিকামনায়, ঈশ্বরের প্রীতিকামনায় আমরা কেন একটু ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী হব না। এ প্রশ্ন করেছেন শাস্ত্রে। একই উদাহরণ। প্রয়োজন আছে এটুকু ত্যাগ স্বীকারের। বহু লোকে করেছে, করছে, করবে। কার জন্য করব ত্যাগ স্বীকার? যাঁর জন্য ত্যাগ স্বীকার করব তিনি কি অবুঝ ব্যক্তি? তাঁর ভিতরে কি দয়া-মায়া নাই? স্নেহ-মমতা নাই? কিছুক্ষণ আগে একটা কীর্ত্তন হল 'প্রেমের ঠাকুর গোরা', 'দয়াল নিতাই দয়াল গৌর।' তাহলে স্নেহ-মমতা আছে ত', দয়াদাক্ষিণ্য আছে ত' তাঁর মধ্যে।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" কথাটা গীতায় আছে। আমি যতটুকু ত্যাগ স্বীকার করব কারও জন্য, তিনিও আমার জন্য ততটুকু ত্যাগ স্বীকার করবেন। তার থেকেও বেশী করেন ভগবান্—এটাই বলা আছে। আমরা যদি এক পা এগিয়ে যাই, তাহলে ভগবান্ দশ পা এগিয়ে আসেন। এমন উদাহরণও দেওয়া আছে। তাহলে আমার লোকসান কোথায়? আমি যে কষ্ট স্বীকার করছি জীবনে, সাধন-ভজনে, এতে ত' আমার লোকসান নাই। গীতার মধ্যে একটা শ্লোক আপনারা সকলে পড়ে থাকবেন,—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।।

কেন এ শ্লোকের অবতারণা। কেন এ কথা কৃষ্ণ বলছেন অর্জ্জুনকে? অর্জ্জুন আমি তোমাকে যে সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ করতে যাচ্ছি, এটা যদি তুমি অনুশীলন কর জীবনে, যদি তুমি এটা অভ্যাস কর—আত্মানুশীলন, তাহলে তোমার কোন ক্ষতির কারণ নাই, লোকসান হবে না তোমার, সবটাই লাভ। সবটাই লাভ, কিরকম সেটা বুঝিয়ে দাও। Fixed deposit, একটুও লোকসান হবে না। 'নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি' —এতে কোন ক্রমভঙ্গের সম্ভাবনা নাই তোমার। এখান থেকে করতে হবে, ওখান থেকে আরম্ভ করতে হবে, এত অপেক্ষা করতে হবে, ওসব কিছু নয়। যখনই তুমি সুযোগ পাচ্ছ, তখনই তুমি আরম্ভ কর। কালবিলম্ব কর না। "তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ।" 'তূর্ণম্'-শব্দ ব্যবহার করা আছে, একটুও সময় নষ্ট করবে না। সময় নষ্ট

করলে তোমার লোকসান। তাহলে কি হল কথাটা? 'প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে'—এতে তোমার লোকসানের কোন কথা নাই, সবটাই লাভের কথা। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।।" এই সনাতন ধর্ম্ম—আত্মধর্ম্মের যদি সামান্য অল্প অংশও যদি তুমি অনুশীলন কর তোমার জীবনে, তুমি মহান ভয় থেকে ত্রাণ লাভ করবে। মহান ভয় কি? সবথেকে বড় ভয় কি এ সংসারে?—মৃত্যু ভয়। 'ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—মহান ভয় থেকে তুমি ত্রাণ লাভ করবে। ঠিক এই একই কথা ভাগবতে আছে। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধেও ঠিক এইরকম শ্লোক আছে।—

ব্রহ্মংস্তথাপি পৃচ্ছামো ধর্ম্মান্ ভাগবতাংস্তব।
যান্ শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ।।

সেখানেও এই একই ধরণের কথা বলছেন। 'মহতো ভয়াৎ', আর এখানে বলছেন 'সর্ব্বতো ভয়াৎ'। একই কথা। সমস্ত শাস্ত্রে Common factor, Universal Truth, Axiomatic Trurh। সেখানে সব জায়গায় একই রকম ধরণের কথা। এদিক-ওদিক হবে না। একই রকম শ্লোক। গীতার মধ্যে একটা শ্লোক আছে—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।"

অর্জ্জুন, আমাকে আমার ভক্ত ভক্তি করে যা জিনিষ দেয়, আমি খুব আদর করে, যত্ন করে সেটা গ্রহণ করি। শুধু গ্রহণ করা নয়, 'অশ্নামি'—খাই। তুমি সব জিনিষ খাও? হ্যাঁ, খাই। সবটা কি করে খাও? এই যে পত্র বলছে, পত্রটা তুমি কি করে খাও? ভক্ত যদি প্রেমাবিষ্ট অবস্থায় পাতা দিয়ে দেয় ভগবানকে, ভগবান্ খেয়ে নেবেন? বললেন,—হ্যাঁ, খেয়ে নেবেন। ওটা পাতা নয়, ভক্তের শ্রদ্ধার্ঘ্য। কিন্তু আপনারা পাতা বলে অন্য কিছু মনে করবেন না। এটা ডালপালা নয়। এখানে পাতা মানে তুলসীপত্র। যে পত্র না দিলে ঠাকুরের ভোগ হচ্ছে না, সেইরকম জিনিষটা। "ছাপ্পান্ন ভোগ আর ছত্রিশ ব্যঞ্জন। বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি।।" সেই পত্র হল তুলসী-পত্র। ভগবান্ গ্রহণ করেন। ফুল দিলে ভগবান্ খেয়ে ফেলবেন? বললেন,—হ্যাঁ, খাবেন। ভক্ত ভালবেসে দিচ্ছে ত'। আর ফুল ত' খাওয়া যায়। বকফুল, কুমড়ো ফুল ত' বড়া করে খাওয়া যায়। আবার কৃষ্ণের খুব একটা প্রিয় ফুল আছে, সে ফুলটা কি? বকফুল। কার্ত্তিকমাসে যদি কৃষ্ণকে বকফুলের মালা গেঁথে গলায় দেওয়া যায়, তাহলে তিনি ভীষণ সন্তুষ্ট হন তার প্রতি। আবার ওটা বড়া ভেজে ঠাকুরকে দেওয়া যায়। এক ভক্ত মালা গেঁথেছিলেন ওরকম ভগবানের জন্য, অপেক্ষা করলেন সারাদিন, কিন্তু ভগবান্ এলেন না। তখন বলছেন, "আসেন কৃষ্ণ গলায় দেব। না আসেন ত' ভেজে খাব।।" তার মানে বড়া ভেজে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে তিনি খাবেন। তিনি ত' ঠাকুরকে না দিয়ে খাবেন না। তা পুষ্প যদি ভগবান্‌কে ভক্ত দিয়ে দেন, তাহলে তিনি গ্রহণ করবেন। ভগবানের সঙ্গে নিশ্চয় ঠাট্টা, তামাসা করা উচিত নয়।

আজকাল কিছু বাজে চিন্তাবিশিষ্ট ব্যক্তি বসে আছেন, যারা ভগবানকে পরীক্ষা করে নিতে চান। পরীক্ষা কোথায় আমরা দেব, আমরা পরীক্ষার্থী, পরীক্ষার্থিনী, আমরা সবসময় ভগবানের কাছে ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যের পরীক্ষা দেব। কিন্তু আমরা পরীক্ষা না দিয়ে ভগবানের পরীক্ষা নিতে যাচ্ছি আগে। আহাম্মুক সব, বোকার দল। কেউ কেউ বলছেন, আমি ভগবানকে যা মনে করব, তাই তিনি। বলি, কি রকম মনে করব? আমি যদি ভগবানকে ছাগল মনে করি? এইসব যৌক্তিকতা, নাস্তিকতা আজকাল বাজারে আসছে। ভগবানকে ছাগল মনে করে তিনি গাছের ডালপালা দিতে যাচ্ছেন! ভগবানের কি অভাব পড়ে গেছে?

নিশ্চয়ই তাঁর কোন অভাব নাই। যদি কারও অভাব থাকে, তার অভাব পূরণ করা যায়। স্বীয়লাভে সন্তুষ্ট আপ্তকাম যদুপতি ভগবান্ কৃষ্ণ। তাঁর কোন অভাব নাই এবং শাস্ত্রে ভগবান্ নিজেই বলছেন,—"স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।" যাঁর কোন অভাব নাই, তাঁর আবার অভাব পূরণ করার কি প্রয়োজন আছে? ভগবানের কোন অভাব নাই। কিন্তু ভক্তের ভক্তিমাখা জিনিষ, শ্রদ্ধার জিনিষ, শ্রদ্ধার্ঘ্য যেটা, সেটা গ্রহণ করবার জন্য ভগবান্ ক্ষুধার উদ্রেক করাচ্ছেন। দাও, দাও, আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে, এই করছেন। সকলের কাছে নয়, কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে। আমরা ত' ভগবানের কোন অভাব পূরণ করতে পারি না। ভগবান্‌কে বড়লোক করে দেব, তা ত' নয়। সব জিনিষটা বুঝতে হবে। তাঁকে অবহেলা করা, অবজ্ঞা করা উচিত নয়। তাঁর সঙ্গে যদি খুব ভাল Intimacy—ঘনিষ্ঠতা থাকে, তাহলে ঠাট্টা, রহস্য করা যায়। তবে সে অধিকার ত' আলাদা। প্রথম অধিকার ত' তা নয়। প্রথম অধিকার দাস্যভাব। ভগবান্ প্রভু, মালিক ; আমরা তাঁর সেবক-সেবিকা। এভাবে ত' সেবা করতে হবে। তারপরে একটু Higher standerd সখ্যভাব। সেখানে অবশ্য ঠাট্টা, তামাসা, রহস্য করা যায়। তাতে ভুল বুঝাবুঝি—Misunderstanding নাই। ভগবান্‌ও ভুল বুঝবেন না, ভক্তও ভুল বুঝবেন না। আর এক Stage উপরে, সেখানে হচ্ছে বাৎসল্য প্রেম। ভগবানকে পুত্রজ্ঞানে সেবা। Forth stageএ বলছেন, ভগবান্‌কে পতিরূপে সেবা। ব্রজগোপীগণ, ব্রজবধূগণ যেভাবে সেবা করেছেন, সেই সেবার কথা বলেছেন। যা নিয়ে আলোচনা করেছেন কবি জয়দেব তাঁর গ্রন্থে। তাঁর গ্রন্থের কি নাম?—'গীতগোবিন্দম্'। তাতে আলোচনা করেছেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'-গ্রন্থে আলোচনা করেছেন যে কথা, তা অতি উচ্চস্তরের কথা। অধিকার যাঁর আছে, তাঁর ত' কোন অসুবিধা নাই। অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে কিছু ক্ষমাপ্রার্থনা, অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা নাই। অধিকারী ব্যক্তি মানে, যিনি বা যাঁরা ভগবানকে ভুল বুঝেন নাই। ভগবান্ কখনও ভক্তকে ভুল বুঝেন না, আর একান্ত ভক্ত ভগবানকে কখনও ভুল বুঝেন না। পরস্পরের ভুল বুঝাবুঝি নাই। সেটা শাস্ত্রে বিচার করেছেন।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।" আমাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে যেটা দিচ্ছে 'মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ' তা আমি খাই অতি আদরের সহিত। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে খাই না, অতি আদর-যত্নসহকারে খাই। এই একই শ্লোক ভাগবতে আছে। যদি জিজ্ঞাসা করি কেন আছে? লেখক ত' একই ব্যক্তি, সুতরাং থাকতেই পারে। একই কথা দুজায়গায় থাকতেই পারে। আমি বা আর পাঁচজন বলবেন,—এটা পুনরুক্তি। কিন্তু এটা হতেই পারে, যেহেতু এটা Universal Truth, Axiomatic Truth—নিত্যসত্য ব্যাপার, Common factor ওটা। সব শাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তুগুলো এক—Common। এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন।

শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অপার কৃপাশীর্ব্বাদে ও বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের সেবানুগত্যে শ্রীসমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠের অষ্টম বার্ষিকী মহোৎসব গত ১৬ই চৈত্র, ১৪০৭ (ইং ৩০।৩।২০০১) শুক্রবার হইতে ১৮ই চৈত্র (ইং ১।৪।২০০১) রবিবার পর্য্যন্ত সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উৎসবে বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

১৬ই চৈত্র শুক্রবার যথারীতি মঙ্গলারতি ও প্রভাতী কীর্ত্তন হয়। তৎপশ্চাৎ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বৈকাল ৪ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহ লইয়া বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-রাধাবিনোদ-বিহারীজীউর জয়গান তথা পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমাপূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে উপস্থিত হয়। শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে ভক্তগণ বিধানচন্দ্র মার্কেটে উপনীত হন। তথায় শ্রীগোকুলদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপীযূষ সাহা ও শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ ভোগরাগ ও আরতির ব্যবস্থা করিয়া ভক্তগণকে ফল-মিষ্টাদিদ্বারা আপ্যায়িত করেন।

নগর-সঙ্কীর্ত্তনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর সন্ধ্যারতি হয়। তৎপশ্চাৎ শ্রীনাট্য-মন্দিরে আয়োজিত ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রপন্ন পরিব্রাজক মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে পর যথাক্রমে পূজ্যপাদ

শ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিচকোর সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ভাগবত মহারাজ এবং পরিশেষে সভাপতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন পরিব্রাজক মহারাজ "শ্রীবৈষ্ণবসেবা ও শ্রীহরিনাম" সম্পর্কে ভাষণ প্রদানপূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

১৭ই চৈত্র শনিবার যথারীতি মঙ্গলারতি ও প্রভাতী কীর্ত্তনান্তে পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ বন মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বৈকাল ৪ ঘটিকায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিজয়-বিগ্রহ লইয়া অগণিত ভক্তগণসহ নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। উক্ত নগর-সঙ্কীর্ত্তনে ভক্তগণের নৃত্য-কীর্ত্তন শহরবাসিগণের বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল। পরে উক্ত শোভাযাত্রা বেনাচিতি বাজারস্থ 'মডেলা ফার্নিচার'এর মালিক শ্রীপ্রদীপ কুমার সাহা মহাশয়ের বাসভবনে উপনীত হয়। তথায় প্রদীপবাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ভক্তপ্রাণা শ্রীমতী বন্দিতাদেবী শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর ভোগরাগ ও আরতির বিশেষ ব্যবস্থা করেন। তৎপশ্চাৎ তাঁহারা ফল-সরবৎ ও মিষ্টাদিদ্বারা ভক্তগণের সন্তোষ বিধান করেন। তদনন্তর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা স্থানীয় শ্রীশ্রীহরিসভা-মন্দির দর্শন এবং পরিক্রমা করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপশ্চাৎ ধর্ম্মসভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

১৮ই চৈত্র, রবিবার যথারীতি মঙ্গলারতি ও প্রভাতী কীর্ত্তনান্তে পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিজীবন আচার্য্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ এবং শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর ভোগরাগাদি অন্তে প্রায় পঞ্চসহস্রাধিক ব্যক্তিকে সুস্বাদু মহাপ্রসাদদ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

সন্ধ্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় আয়োজিত ধর্ম্মসভায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রপন্ন পরিব্রাজক মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীযুক্ত এন, এন, সেন (Executive Director, project, D.S.P.) প্রধান অতিথি এবং শ্রীযুক্ত জগদীশ দণ্ডবৎ (Dy. chief personnel manager, D.S.P.) বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সনাতন ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহারা মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর পূর্ব্বদিনের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত বক্তৃমহোদয়গণের বক্তৃতান্তে পূজ্যপাদ শ্রীল সভাপতি মহারাজ তাঁহার ভাষণে সনাতন ধর্ম্মই যে বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং ইহা যে সর্ব্বজীবের পালনীয় তাহা ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে মঠরক্ষক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ এই উৎসবে যোগদানকারী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণকে যথাযোগ্য অভিবাদন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসভা ও দিবসদ্বয় নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রায় দুর্গাপুরবাসিগণের

অধিকাংশই "শ্রীভগবানের ভক্তি ব্যতিরেকে যে জীবের গত্যন্তর নাই" তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন।

বলাবাহুল্য, এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ তথা শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের সেবাপ্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসার্হ।

—নিজস্ব সংবাদ

পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক তথা অস্মদীয় শিক্ষাগুরুদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ অত্যন্ত সাফল্যের সহিত পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য অস্মদীয় পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ ও সমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক অস্মদীয় অন্যতম শিক্ষাগুরু শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের শুভেচ্ছা পাথেয়রূপে লইয়া শ্রীল মহারাজ ৩১।৩।২০০১ তারিখে দিল্লী হইতে রওনা হইয়া থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্কক্ পৌঁছান। তথায় ২।৪।২০০১ তারিখে অর্থাৎ শ্রীরামনবমী-তিথিতে মধ্যাহ্নে শ্রীরামচন্দ্রের মহাভিষেক ও শ্রীরামলীলা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে চরণামৃত ও অনুকল্প প্রসাদদ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। সায়ংকালীন ধর্ম্মসভাতে শ্রীরামাবতারের কারণ, বনবাস, শ্রীধাম নবদ্বীপান্তর্গত মোদদ্রুম দ্বীপে (মামগাছিতে) শ্রীরামসীতার কথোপকথন, শ্রীগৌরলীলার সূচনা, সবংশ রাবণ উদ্ধার ও সীতার পাতাল প্রবেশ ইত্যাদি সুন্দরভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণন করিয়া এমন করুণ রসের উদ্রেক করেন যে, সমস্ত সভা অশ্রুপূরিত নেত্রে শ্রবণ করিতে থাকেন এবং পরে প্রতি বৎসর এই তিথি ব্যাঙ্ককে পালন করিবার জন্য বারম্বার প্রার্থনা করেন। থাইল্যাণ্ডে প্রচারসেবায় সহায়তা করিয়া সপরিবার শ্রীগৌরেন্দু দাসাধিকারী শ্রীসমিতির কৃপাভাজন হইয়াছেন।

থাইল্যাণ্ডে প্রচার সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজ ৩।৪।২০০১ তারিখে জাপানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। জাপানের রাজধানী টোকিওতে দুইদিনব্যাপী ধর্ম্মসভায় শ্রীল মহারাজ শ্রীএকাদশী-ব্রতের বিজ্ঞান সম্মত ও ভক্তিসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এতৎপ্রসঙ্গে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যানের মাধ্যমে যাগযজ্ঞ অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠতা, ভক্তের উৎকর্ষতা, বৈষ্ণবের দীনতা ও মহানুভবতার প্রতি বিশেষ আলোকপাত করেন। জাপানে প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া ৪।৪।২০০১ তারিখে শ্রীল মহারাজ আমেরিকার পঞ্চাশতম রাজ্য হাওয়াই-এর রাজধানী হনলুলুতে অবতরণ করেন। হাওয়াই-এ এক পক্ষকাল অবস্থানকালে শ্রীল মহারাজ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থের শ্রীল জীব গোস্বামী

ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকার হিন্দীতে ভাবানুবাদ এবং সহজবোধ্য একটী বৃত্তি লিখিতে শুরু করিয়াছেন। হাওয়াইতে শ্রীল মহারাজ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা, সৎসঙ্গ-মহিমা, শ্রীকৃষ্ণলীলায় যোগমায়া দেবীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তথায় বিভিন্ন দিবসে ভক্তগণের কিছু প্রশ্নোত্তরপর্ব্বে শ্রীল মহারাজের বক্তব্য নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।—

গোবিন্দদাসী—মহারাজজী! আমরা আমাদের গুরুদেবের (শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ) মুখে শুনিয়াছি জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র ১০৮ বারেরও অধিক পাঠ করিয়াছেন। আপনিও এখানে আসিলে প্রতিবারই প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা আলোচনা করেন। ইহার কারণ কি?

শ্রীল মহারাজ—হ্যাঁ, শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধে আপনি ঠিকই শুনিয়াছেন। কোন প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিতে হইলে একেবারেই লম্ফ প্রদান করিয়া আরোহণ সম্ভব নহে। নীচের তলা হইতেই ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী ভক্তের যে শ্রেণীবিভাগ দেখাইয়াছেন, তাহা হইল—সকাম ভক্ত শ্রীধ্রুব মহারাজ, জ্ঞানীভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ, শুদ্ধভক্ত শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ, প্রেমীভক্ত শ্রীহনুমান, প্রেমপর ভক্ত পাণ্ডবগণমধ্যে শ্রীঅর্জ্জুন, প্রেমাতুর ভক্ত শ্রীউদ্ধব। শ্রীধ্রুব মহারাজ রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় ভগবদ্ভজন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ তদ্রূপ নহেন। ভগবান্ দিতে চাহিলেও তিনি নিচ্ছেন না, নিতে চাচ্ছেন না। এমন কৌশল করিয়া ভগবানের সহিত কথা বলিতেছেন। শ্রীনৃসিংহদেব ভক্তের ভক্তিতে পরাজিত হইয়া বলিলেন প্রহ্লাদ! তুমি জিতিলে, আমি হারিলাম। এখান হইতেই ভজনের কথা শুরু হইয়াছে। প্রথমে প্রহ্লাদ-শিক্ষায় শিক্ষিত হই, পরে অন্য কথা। তজ্জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ এত অধিকবার প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ করিয়াছেন। এর আরও গম্ভীর রহস্য আছে, পরে ব্যাখা করিব।

ধৃষ্টদ্যুম্ন দাস—মহারাজজী! আপনি ত' শ্রীউদ্ধব পর্য্যন্ত প্রেমাতুর ভক্তের কথা বলিলেন, ব্রজবাসিগগণের কথা ত' একবারও বলিলেন না। ইহার কারণ কি? এর কোন গূঢ় রহস্য আছে কি?

শ্রীল মহারাজ—ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীসনাতন গোস্বামী ব্রজবাসিগণকে ভক্তগণের শ্রেণীভুক্ত করেন নাই। তজ্জন্য আমিও গৌড়ীয় গুরুবর্গের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াই ব্রজবাসিগণকে ভক্তশ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করিবার দুঃসাহস করি নাই।

জগদ্ধাত্রী—মহারাজজী! ব্রজবাসিগণ যদি ভক্ত নন, তাহলে তাঁহারা কে?

শ্রীল মহারাজ—ব্রজবাসী পূর্ব্বোক্ত ভক্তগণের আরাধ্য, ভক্তকুলমুকুটমণি ব্রজবাসিগণ। যিনি যতবেশী ব্রজবাসিগণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি তত শ্রেষ্ঠ ভক্তমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। ভক্তপ্রবর উদ্ধব ব্রজবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

কৃষ্ণপ্রিয়াগণকে "আসামহো চরণরেণু" এবং "বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুম্" শ্লোক-দ্বয়ে বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অত্যধিক প্রিয়পাত্র হইলেন ও প্রেমাতুর ভক্তের পদবী লাভ করিলেন।

হাওয়াইতে প্রচার সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজ সদলবলে কানাডা রওনা হইতেছেন। সেখানে শ্রীল মহারাজ ভ্যাঙ্কুবর এবং সল্ট স্প্রিং আইস্‌ল্যাণ্ড-এ ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারী, সস্ত্রীক শ্রীরূপমনোহর দাসাধিকারী, সস্ত্রীক শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী ও শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী হাওয়াইতে প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়া শ্রীসমিতির বিশেষ প্রশংসার্হ হইয়াছেন।

শ্রীল মহারাজকে প্রচারসেবায় সহায়তা করিবার জন্য শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ সদলবলে বিগত মার্চ্চের শেষ সপ্তাহে আমেরিকা, শ্রীপাদ বন মহারাজ ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড জার্ম্মান, ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি, শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে, শ্রীকিশোরমোহন কানাডা, শ্রীমতী শ্যামরাণী (কেবলমাত্র মহিলাগণ) আমেরিকায় এবং শ্রীরামচন্দ্র দাসাধিকারী আমেরিকাস্থ হুস্টনে ভারতীয় প্রধান অঞ্চলে প্রচার করিতেছেন। এই প্রচারপার্টিগুলি কোথাও শ্রীল মহারাজের পূর্ব্বে এবং কোথাও বা নূতন নূতন স্থানে প্রচার করিতেছেন। প্রত্যেকটী পার্টি কোন না কোন স্থানে শ্রীল মহারাজের সঙ্গে যোগদান করিবেন এবং অধিকাংশস্থলে স্বতন্ত্র প্রচার করিবেন।

২০।৪।২০০১—২৬।৪।২০০১ পর্য্যন্ত কানাডা প্রচার সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজ পুনরায় আমেরিকায় পদার্পণ করিবেন। ২৭।৪।২০০১—৪।৬।২০০১ পর্য্যন্ত আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি. সি., ইউগেন, সান্‌ফ্রান্সিস্কো, ব্যাজার, লস্ এঞ্জেলস্, হুস্টন, আলাচুয়া প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিবেন। শ্রীল মহারাজ ইউরোপ, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ইটালীতে প্রচার করিয়া ২৯।৬।২০০১ তারিখে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ভারতে কিছুদিন অবস্থান করিয়া পুনরায় ১৫।৭।২০০১ হইতে ২৫।৭।২০০১ পর্য্যন্ত রাশিয়ায় প্রচারে যাইবেন। কেবলমাত্র শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের প্রচারপার্টি ব্যতীত সকলেই শ্রীল মহারাজের সঙ্গেই ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ স্ক্যানডিনাভিয়া অর্থাৎ ডেনমার্ক, ফিন্‌ল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া রাশিয়া এবং তথা হইতে শ্রীল মহারাজের সহিত ২৫।৭।২০০১ তারিখে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

রাশিয়া প্রচারান্তে ভারতে শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব-তিথি, শ্রীবলদেব-পূর্ণিমা, শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী ইত্যাদি ব্রত পালনান্তে শ্রীল মহারাজ পুরুষোত্তম-ব্রত পালনের জন্য শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে রওনা হইবেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধুসঙ্গে শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে

শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-উদ্‌যাপন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৮ (ইং ১৫।৬।২০০১)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিঃসৃতধারায় সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ এবং সমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের উপস্থিতিতে আগামী ১৫ই আশ্বিন, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ (ইং ২/১০/২০০১) মঙ্গলবার হইতে ২৯শে আশ্বিন, (ইং ১৬/১০/২০০১) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে।

এতদুপলক্ষে আগামী ১৪ই আশ্বিন (ইং ১/১০/২০০১), সোমবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে শুভযাত্রা করা হইবে।

অতএব, এই পুরুষোত্তম-ব্রতে যোগদানেচ্ছু ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন ব্যক্তিগণকে উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

নিয়মাবলী

যাত্রিগণের দুইবেলা মহাপ্রসাদ ও রেলভাড়া প্রভৃতির জন্য প্রত্যেককে ১,৫০১্ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। ১৫ই শ্রাবণ, (ইং ৩১/৭/২০০১) মঙ্গলবারের মধ্যে ৫০০্ টাকা জমা দিয়া আসন সংরক্ষণ করিতে হইবে। অবশিষ্ট ভিক্ষা যাত্রার পূর্ব্বেই জমা দিতে হইবে।

মশারীসহ হাল্কা বিছানা, থালা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন। পাণ্ডা বিদায় ব্যয় যাত্রিগণকে বহন করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা

ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-

মহোৎসবে আহ্বান

(পুরীধামের প্রথানুসারে)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৮ (ইং ১৫।৬।২০০১)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিঃসৃতধারায় সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আগামী ৬ই আষাঢ়, ১৪০৮ (ইং ২১।৬।২০০১) বৃহস্পতিবার হইতে ১৬ই আষাঢ়, ১৪০৮ (ইং ১।৭।২০০১) রবিবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট্ মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী প্রদত্ত হইল।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

সেবাপঞ্জী

১। ৬ই আষাঢ় (ইং ২১।৬।২০০১), বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন, আরতি ও বক্তৃতা।

২। ৭ই আষাঢ় (ইং ২২।৬।২০০১), শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন এবং মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। ৮ই আষাঢ় (ইং ২৩।৬।২০০১), শনিবার—শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা; অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনযোগে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যায় আরাত্রিক, সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৪। ৯ই আষাঢ় (ইং ২৪।৬।২০০১), রবিবার হইতে ১১ই আষাঢ় (ইং ২৬।৬।২০০১), মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৫। ১২ই আষাঢ় (ইং ২৭।৬।২০০১), বুধবার—হেরাপঞ্চমী-দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

৬। ১৩ই আষাঢ় (ইং ২৮।৬।২০০১), বৃহস্পতিবার হইতে ১৫ই আষাঢ় (ইং ৩০।৬।২০০১), শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে বক্তৃতা।

৭। ১৬ই আষাঢ় (ইং ১।৭।২০০১), রবিবার—অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সাধারণ-মহোৎসব।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে উক্ত সমিতির "সভাপতি-আচার্য্য" অথবা "সাধারণ-সম্পাদক"-এর নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

☐ **"শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট"** এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয় দান 80 জি ধারায় আয়কর-মুক্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫০শ বর্ষ } ১১ শ্রীধর, সঙ্কর্ষণ, ৫১৫ শ্রীগৌরাব্দ { ৫ম সংখ্যা
৩১ আষাঢ়, রবিবার, ১৪০৮, ইং ১৬/৭/২০০১

সানুবাদং

শ্রীপৃথুমহারাজ-কৃতঃ শ্রীশ্রীহরি-স্তবঃ

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে বিংশতিতমোঽধ্যায়ে—২৩-৩১]

শ্রীপৃথুরুবাচ,—

বরান্ বিভো ত্বদ্বরদেশ্বরাদ্ বুধঃ
কথং বৃণীতে গুণ-বিক্রিয়াত্মনাম্।
যে নারকাণামপি সন্তি দেহিনাং
তানীশ কৈবল্যপতে বৃণে ন চ ॥ ১॥

(অনন্তর পৃথু-মহারাজ বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরির পূজার নিমিত্ত বিবিধ সামগ্রী আহরণ-পূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত-ভক্তিযোগে তাঁহার চরণ-কমল বন্দনমুখে স্তব করিতে লাগিলেন,—)

পৃথু কহিলেন,—হে বিভো! যাঁহাদিগের বরদান করিবার ক্ষমতা আছে, আপনি সেই ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও ঈশ্বর। কোন্ বিবেকী ব্যক্তি এতাদৃশ আপনার নিকট

দেহাভিমানি-ব্যক্তিগণের ভোগ্য বরপ্রার্থনা করেন? হে পরমেশ! ঐ সকল ভোগ্যবস্তু নরকবাসি-দেহধারিগণেরও আছে। হে মুকুন্দ! সেইসকল ঘৃণিত তুচ্ছ ভোগ্যবস্তু আমি প্রার্থনা করি না।। ১।।

না কাময়ে নাথ তদাপ্যহং ক্বচি-
ন্ন যত্রযুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ।। ২।।

হে নাথ! যে মোক্ষপদে মহত্তম ভাগবতগণের অন্তর্হৃদয় হইতে মুখমার্গদ্বারা বিনিঃসৃত ভবদীয় পাদপদ্ম-সুধার যশোগান শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, আমি সেই মোক্ষপদও প্রার্থনা করি না। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার গুণ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিবার জন্য আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন,—ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বর, আমি অন্য কিছুই চাই না।। ২।।

স উত্তমঃশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো
ভবৎপদাম্ভোজ-সুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃত-তত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ।। ৩।।

হে উত্তমঃশ্লোক! মহাজনগণের মুখ-নিঃসৃত ভবদীয় পাদপদ্ম-মকরন্দ-কণা-সম্পৃক্ত অনিল কুযোগিগণেরও পুনরায় তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া থাকেন। অতএব আমার জন্য অন্য বরে প্রয়োজন কি?? ৩।।

যশঃ শিবং সুশ্রব আর্য্যসঙ্গমে
যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তে সকৃৎ।
কথং গুণজ্ঞো বিরমেদ্বিনা পশুং
শ্রীর্যৎ প্রবব্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া।। ৪।।

হে মঙ্গলকীর্ত্তে! যে ব্যক্তি মহাজনগণের সাহচর্য্যে আপনার মঙ্গলপ্রদ যশ একবারও কোন প্রকারে শ্রবণ করেন, তিনি যদি একেবারে পশু না হইয়া একটুও সারগ্রাহী হন, তাহা হইলে তিনি আর তাহা হইতে বিরত হইতে পারেন না, কারণ লক্ষ্মীদেবীও নিখিলগুণ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় আপনার যশোশ্রবণকেই প্রকৃষ্টরূপে আশ্রয় করিয়াছেন।। ৪।।

অথাভজে ত্বাখিল-পুরুষোত্তমং
গুণালয়ং পদ্মকরেব লালসঃ।
অপ্যাবয়োরেকপতিস্পৃধোঃ কলি-
র্ন স্যাৎ কৃত-তচ্চরণৈকতানয়োঃ।। ৫।।

অতএব লক্ষ্মীর ন্যায় সমুৎসুক হইয়া আমিও আপনাকে ভজনা করিব। আপনি পুরুষোত্তম ও সর্ব্বগুণাকর। হে নাথ! কমলা ও আমি, আমরা উভয়ে একপতি আপনার কামনা করিব এবং উভয়েই আপনার পাদারবিন্দে মনকে একভাবে নিযুক্ত রাখিব ; তাহাতে আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবে না।। ৫।।

জগজ্জননন্যাং জগদীশ বৈশসং
স্যাদেব যৎকর্ম্মণি নঃ সমীহিতম্।
করোষি ফল্গুপ্যুরু দীনবৎসলঃ
স্ব এব ধিষ্ণ্যেঽভিরতস্য কিং তয়া।। ৬।।

হে জগদীশ! জগজ্জননী লক্ষ্মীর সহিত বিরোধ অবশ্যই হইবে ; কারণ, আমিও জগজ্জননীর ন্যায় ভবদীয় সেবা করিতে চেষ্টা করিব, ইহা ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু আমি সেই বিরোধের জন্য পশ্চাৎপদ নহি ; কারণ আপনি দীনবৎসল, সুতরাং আপনার ভক্তকৃত-তুচ্ছকার্য্যকেও আপনি যথেষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিবেন ; আর আপনি যখন পরমানন্দস্বরূপেই অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং লক্ষ্মীতেও আপনার তত প্রয়োজন নাই।। ৬।।

ভজন্ত্যথ ত্বামত এব সাধবো
ব্যুদস্ত-মায়াগুণ-বিভ্রমোদয়ম্।
ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং
নিমিত্তমন্যদ্ভগবন্ ন বিদ্মহে।। ৭।।

হে ভগবন্! আপনি দীনবৎসল বলিয়াই সাধুব্যক্তিগণ আপনাকে ভজন করিয়া থাকেন। আপনাতে মায়াগুণের বিলাসজনিত কোন কার্য্যই নাই। হে ভগবন্! আপনার পাদপদ্মসেবা ভিন্ন সজ্জনের অন্য কোন প্রয়োজন দেখিতে পাই না।। ৭।।

মন্যে গিরং তে জগতাং বিমোহিনীং
বরং বৃণীষ্বেতি ভজন্তমাত্থ যৎ।
বাচা নু তন্ত্র্যা যদি তে জনোঽসিতঃ
কথং পুনঃ কর্ম্ম করোতি মোহিতঃ।। ৮।।

আপনি "বর প্রার্থনা কর"—এই যে কথাটী বলিয়াছেন, তাহা জগতের মোহকারিণী। হে নাথ! মনুষ্য যদি আপনার বাক্যরূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধই না হইবে, তাহা হইলে সে কি-প্রকারেই বা পুনঃ পুনঃ মায়ামুগ্ধ হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে থাকিবে?? ৮।।

ত্বন্মায়য়াদ্ধা জন ঈশ খণ্ডিতো
যদন্যদাশাস্ত ঋতাত্মনোঽবুধঃ।
যথাচরেদ্বাল-হিতং পিতা স্বয়ং
তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিতুম্।। ৯।।

হে ঈশ! অজ্ঞ মনুষ্য আপনার মায়ার দ্বারা নিশ্চয়ই বিমুগ্ধ, যেহেতু তাঁহারা অদ্বয়তত্ত্ব সত্যস্বরূপ আপনা হইতে পৃথক করিয়া তাহাদের ভোগের নিমিত্ত পৃথক্ লোক-পুত্রাদি কামনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যেরূপ পিতা নিজে নিজেই বালকের হিত-চেষ্টা করেন, সেইরূপ আপনারও স্বয়ংই আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞব্যক্তির মঙ্গল চিন্তা করা যোগ্য হইতেছে।। ৯।।

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য

স্মার্ত্ত ও পরমার্থ-ভেদে শাস্ত্র দ্বিবিধ

'স্মার্ত্ত', 'পরমার্থ'-ভেদে বৈদিক আর্য্য-শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিভাগের অধিকারী তাঁহারা স্বভাবতঃ 'পরমার্থ'-শাস্ত্রে রুচিপ্রাপ্ত নন। নিজ-নিজ রুচি অনুসারেই মানবের বিচার, সিদ্ধান্ত, ক্রিয়া ও জীবনের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। স্মার্ত্তগণ নিজ-নিজ রুচিসম্মত শাস্ত্রে অধিকতর বিশ্বাস করেন। পারমার্থিক শাস্ত্রে তাঁহাদের সেরূপ অধিকার না থাকায় সেরূপ আস্থাও প্রকাশ করেন না। এরূপ বিভাগের কর্ত্তা—বিধাতা। সুতরাং ইহাতে জগৎপাতার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, সন্দেহ নাই। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি সে-উদ্দেশ্য এই—স্বীয় স্বীয় অধিকারে স্থিত থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয়। অধিকার-চ্যুত হইলেই পতন হয়। মানবগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে কর্ম্মাধিকার ও ভক্ত্যধিকার-বশে দ্বিবিধ অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। যে-পর্য্যন্ত মানবের কর্ম্মাধিকার থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার স্মার্ত্ত পথই শ্রেয়ঃ। কর্ম্মাধিকার অতিক্রম করত যখন তিনি ভক্তি-অধিকারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার পারমার্থিক পথে স্বভাবতঃ রুচি জন্মে। এতন্নিবন্ধন বিধাতা স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ শাস্ত্র করিয়াছেন।

স্মার্ত্ত-শাস্ত্রের বিধিবিধান—কর্ম্মপর

স্মার্ত্ত-শাস্ত্র মানবগণকে সর্ব্বদা কর্ম্মাধিকারে নিষ্ঠা লাভ করাইবার চেষ্টায় অনেক প্রকার বিধি-বিধান করিয়াছেন। এমত কি, সেইসকল বিধি-বিধানে বিশেষ নিষ্ঠা দিবার জন্য পরমার্থ-শাস্ত্রের প্রতি অনেকস্থলে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র এক হইলেও লোকের নিকট ইঁহার দুইপ্রকার ভাব। অধিকার-নিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল হয় না। তাই শাস্ত্র স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া প্রতীত।

অধিমাস সৎকর্ম্ম-হীন, ইহার নামান্তর মলমাস

বৎসরকে দ্বাদশ ভাগে বিভাগ করিয়া, দ্বাদশ মাসে স্মার্ত্ত-শাস্ত্র সর্ব্বসৎকর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমগত সমস্ত কর্ম্মই যখন দ্বাদশ মাসে বিভক্ত হইল, তখন 'অধিমাস' কর্ম্মহীন মাস হইয়া গেল। অধিমাসে কোন সৎকর্ম্ম নাই। চান্দ্র ও সৌর মাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটী করিয়া মাস বাদ দিতে হয়। * সেই মাসটীর নাম অধিমাস। স্মার্ত্তগণ অধিমাসকে মলমাস বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। মলিম্লুচ (চোর), মলিন-মাস ইত্যাদি নাম দিয়া অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পরমার্থ-শাস্ত্রে অধিমাস শ্রেষ্ঠ ও হরি-ভজনোপযোগী

এদিকে পরমারাধ্য পরমার্থ-শাস্ত্র অধিমাসকে পরমার্থ-কার্য্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করেন। জীবন অনিত্য। জীবনের কোন অংশ বৃথা যাপন করা উচিত নয়। সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ হরিভজনে থাকাই জীবের কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে যে অধিমাস হয়, তাহাও হরিভজনের উপযোগী হউক—ইহাই পরমার্থ-শাস্ত্রের নিগূঢ় চেষ্টা। আবার যখন কর্ম্মিগণ ঐ মাসকে সমস্ত সৎকর্ম্মশূন্য বলিয়া জানিলেন, তখন সর্ব্বজীবের উদ্ধারের জন্য পরমার্থ-শাস্ত্র সেই কালকে ভজনের বিশেষ উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। পরমার্থ-শাস্ত্র বলেন যে,—হে জীব! কেন অধিমাসে হরিভজনে আলস্য কর? এই মাস শ্রীমদ্ গোলোকনাথ-কর্ত্তৃক সর্ব্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে। এমত কি কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহাপুণ্য মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই মাসে বিশেষ ভজন বিধির সহিত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণার্চ্চন কর। সমস্ত লাভ হইবে।

অধিমাসের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য এবং ইহার 'পুরুষোত্তম' আখ্যা প্রাপ্তি

নারদীয় পুরাণে অধিমাসের মাহাত্ম্য একত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। দ্বাদশ মাসের আধিপত্য ও আপনার অপমান বিচার করিয়া অধিমাস বহুকষ্টে বৈকুণ্ঠে গমন করত নিজ দুঃখ শ্রীনারায়ণকে জানাইয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠ-পতি কৃপা করিয়া অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মলমাসের আর্ত্তি শ্রবণ করত দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন,—

অহমেতৈর্যথা লোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।
অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্ব্বে যে গুণা ময়ি সংস্থিতাঃ।
মৎসাদৃশ্যমুপাগম্য মাসানামধিপো ভবেৎ।।

---

* শ্রীসূর্য্য-সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে,—ষড়বহ্নি-ত্রিহুতাশাঙ্কাতিথয়শ্চাধিমাসকাঃ। খচতুষ্ক সমুদ্রাষ্ট কুপঞ্চ রবিমাসকাঃ।। অর্থাৎ এক মহাযুগে অধিমাস ১৫৯৩৩৩৬ ও রবি মাস ৫১৮৪০০০০ । অতএব রবিমাণে মাসাদি ৩২।১৬।৪ অন্তর একটী একটী অধিমাস হয়।

জগৎপূজ্যো জগদ্বন্দ্যো মাসোঽয়ং তু ভবিষ্যতি।
সর্ব্বে মাসাঃ সকামাশ্চ **নিষ্কামোঽয়ং** ময়া কৃতঃ।।
অকামঃ সর্ব্বকামো বা যোঽধিমাসং প্রপূজয়েৎ।
কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্।।
কদাচিন্মম ভক্তানামপরাধেতি গণ্যতে।
পুরুষোত্তম-ভক্তানাং নাপরাধঃ কদাচন।।
য এতস্মিন্মহা মূঢ়া জপ-দানাদি-বর্জ্জিতাঃ।
সৎকর্ম্ম-স্নান-রহিতা দেব-তীর্থ-দ্বিজ-দ্বিষঃ।।
জায়ন্তে দুর্ভগা দুষ্টাঃ পর-ভাগ্যোপজীবিনঃ।
ন কদাচিৎ সুখং তেষাং স্বপ্নেঽপি শশশৃঙ্গবৎ।।
যেনাহমর্চ্চিতো ভক্ত্যা মাসেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমে।
ধন-পুত্র-সুখং ভুংক্ত্বা পশ্চাদ্গোলোকবাসভাক্।।

ইহার অর্থ এই যে,—হে রমাপতি! আমি যেরূপ এই জগতে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও লোকে **পুরুষোত্তম** বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আমাতে যে-সমস্ত গুণ আছে সেই সমস্তই এই অধিমাসে অর্পিত হইল। আমার সদৃশ হইয়া এই **অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি** হইল। এই মাস জগৎ পূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস সকাম। **এই মাসটী নিষ্কাম**। যিনি অকাম হইয়া বা সর্ব্বকাম হইয়া এই মাসের পূজা করেন, তিনি সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। আমার ভক্তদিগের কদাচিৎ অপরাধ হয়, এই **পুরুষোত্তম-মাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না**। যে-সকল মহামূঢ় এই অধিমাসে জপ-দানাদি বর্জ্জিত, সৎকর্ম্ম ও স্নানাদি-রহিত এবং দেব-তীর্থ ও দ্বিজগণের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেইসকল দুষ্ট দুর্ভাগা পরভাগ্যোপজীবি হইয়া স্বপ্নেও কিছুমাত্র সুখ পায় না। এই পুরুষোত্তম-মাসে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চন করেন, তিনি ধন-পুত্রাদি-সুখ-ভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হন।

পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর ইতিহাস বর্ণন

পুরুষোত্তম-মাসের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে অনেকগুলি পৌরাণিক প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। দ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে 'মেধা'-ঋষির কন্যা ছিলেন। দুর্ব্বাসা-প্রোক্ত 'পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য' শুনিয়াও তিনি ঐ মাসকে অবহেলা করেন, তাহাতে সে-জন্মে কষ্ট ও দ্রৌপদী-জন্মে পঞ্চপতির অধীন হন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত পুরুষোত্তম-মাস-ব্রত আচরণ করিয়া সমস্ত বনবাস-দুঃখের পার প্রাপ্ত হন। যথা ঃ—

এবং সর্ব্বেষু তীর্থেষু ভ্রমন্তঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
পুরুষোত্তম-মাসাদ্য-ব্রতং চেরুর্ব্বিধানতঃ।।

তদন্তে রাজ্যমতুলমবাপুর্গতকণ্টকম্।
পূর্ণে চতুর্দ্দশে বর্ষে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপয়া মুনে।।

পুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে বাল্মীকি-কথিত ধৃঢ়ধন্বা রাজার বৃত্তান্ত

দৃঢ়ধন্বা রাজার বৃত্তান্তও পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্তে পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। বাল্মীকি মুনি দৃঢ়ধন্বার প্রশ্নমতে যে ব্রত-প্রকরণ বলিয়াছিলেন, তাহা নারদ শ্রীনারায়ণ-ঋষির নিকট বদরিকাশ্রমে শ্রবণ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ ব্রাহ্মণের আহ্নিক-বিধি নিরূপিত আছে, তদ্রূপ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে পুরুষোত্তম-সেবকের কর্ত্তব্য বিধান করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে স্নান-বিধি

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে স্নান-বিধানে বলিয়াছেন যে,—

সমুদ্রগা নদী-স্নানমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্।
বাপী কূপ-তড়াগেষু মধ্যমং কথিতং বুধৈঃ।
গৃহে স্নানং তু সামান্যং গৃহস্থস্য প্রকীর্ত্তিতম্।।

শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতী স্নান করিয়া—

সপবিত্রেণ হস্তেন কুর্য্যাদাচমন-ক্রিয়াম্।
আচম্য তিলকং কুর্য্যাদেগাপী-চন্দন-মৃৎস্নয়া।।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং দণ্ডাকারং প্রকল্পয়েৎ।
শঙ্খ-চক্রাদিকং ধার্য্যং গোপী-চন্দন-মৃৎস্নয়া।।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-পূজাই পুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য

শ্রীকৃষ্ণ-পূজাই পুরুষোত্তম-মাসে কর্ত্তব্য, যথা—

পুরুষোত্তম-মাসস্য দৈবতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্।।

বাল্মীকি কহিলেন,—হে দৃঢ়ধন্বা! পুরুষোত্তম কৃষ্ণই পুরুষোত্তম-মাসের অধিদেবতা। অতএব সেই মাসে প্রতিদিন ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে ষোড়শ উপচারে পূজা করিবে। যথা—

ষোড়শোপচারৈশ্চ পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্।

শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলোপাসনাই কর্ত্তব্য, যথা—

আগচ্ছ দেব দেবেশ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।
রাধয়া সহিতশ্চাত্র গৃহাণ পূজনং মম।।

পুরুষোত্তম-মাসে অকরণীয়

এই শাস্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে-সমস্ত বিধি-নিয়ম লিখিত হইয়াছে,

সে-সমস্ত সর্ব্ব বর্ণধর্ম্মপরায়ণ ধার্ম্মিক লোকের পালনীয়। গ্রন্থ-শেষে নৈমিষ-ক্ষেত্রে শ্রীসূত গোস্বামী ঋষিগণকে এই বলিয়াছেন,—

ভারতে জনুরাসাদ্য পুরুষোত্তমমুত্তমম্।
ন সেবন্তে ন শৃণ্বন্তি গৃহাসক্তা নরাধমাঃ।।
গতাগতং ভজন্তেহত্র দুর্ভগা জন্মজন্মনি।
পুত্র-মিত্র-কলত্রাপ্ত-বিয়োগাদ্দুঃখভাগিনঃ।।
অস্মিন্মাসে দ্বিজশ্রেষ্ঠা নাসচ্ছাস্ত্রান্যুদাহরেৎ।
ন স্বপেৎ পর-শয্যায়াং নালপেৎ বিতথং ক্বচিৎ।।
পরাপবাদান্ন ব্রূয়ান্ন কথঞ্চিৎ কদাচন।
পরান্নঞ্চ ন ভুঞ্জীত ন কুর্ব্বীত পরক্রিয়াম্।।

ভারতে জন্ম-লাভ করত গৃহাসক্ত নরাধমগণ শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-কথা শ্রবণ এবং ঐ ব্রত পালন করে না। দুর্ভাগাগণ জন্মজন্ম মরণ-ভোগ করে এবং পুত্র-মিত্র-কলত্র ও নিজ-জনের বিয়োগ-জনিত দুঃখভাগী হয়। এই পুরুষোত্তম মাসে হে দ্বিজবরগণ! বৃথা কাব্যালঙ্কারাদি অসৎ-শাস্ত্র আলোচনা করিবে না। পর-শয্যায় শয়ন এবং অনিত্য বিষয়ালাপ করিবে না। পরনিন্দা বাক্যালাপ করিবে না। পরান্ন ভোজন ও পরকার্য্য করিবে না।

পুরুষোত্তম-মাসে করণীয়

বিত্তশাঠ্যমকুর্ব্বাণো দানং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে।
বিদ্যমানে ধনে শাঠ্যং কুর্ব্বাণো রৌরবং ব্রজেৎ।।
দিনে দিনে দ্বিজেন্দ্রায়-দত্ত্বা ভোজনমুত্তমম্।
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে ব্রতী ভোজনমাচরেৎ।।
ইন্দ্রদ্যুম্নঃ শতদ্যুম্নো যৌবনাশ্বো ভগীরথঃ।
পুরুষোত্তমমারাধ্য যযুর্ভগবদন্তিকম্।।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন সংসেব্য পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্ব সাধনতঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বার্থফলদায়কঃ।।
গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিনম্।
গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকাপ্রিয়ম্।।
কৌণ্ডিন্যেন পুরাপ্রোক্তমিমং মন্ত্রং পুনঃ পুনঃ।
জপন্মাসং নয়েদ্ভক্ত্যা পুরুষোত্তমমাপ্নুয়াৎ।।
ধ্যায়ন্নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
লসৎ পীত-পটং রম্যং সরাধং পুরুষোত্তমম্।।
ধ্যায়ং ধ্যায়ং নয়েন্মাসং পূজয়ন্ পুরুষোত্তমম্।
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা স্বাভীষ্টং সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ।।

বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। ধন থাকিলে শাঠ্য করা রৌরব গমনের কারণ হয়। প্রতিদিন বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম ভোজন দিবে। ব্রতী নিজে দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন করিবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন, শতদ্যুম্ন, যৌবনাশ্ব ও ভগীরথ পুরুষোত্তম আরাধনা করিয়া ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত পুরুষোত্তম-সেবা করিবে। এই পুরুষোত্তম-সেবা সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বার্থ ফলদায়ক। 'গোবর্দ্ধনধরম্' প্রভৃতি মন্ত্রটী পূর্ব্বে কৌণ্ডিন্য মুনি পুনঃ পুনঃ জপ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে জপ করিয়া পুরুষোত্তম প্রাপ্ত হইবে। নবঘন দ্বিভুজ মুরলীধর পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত নিয়ত ধ্যান করিতে করিতে পুরুষোত্তম-মাসকে যাপিত করিবে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এরূপ ধ্যান করেন, তিনি সকল অভীষ্ট লাভ করেন।

স্বনিষ্ঠ, পরনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ পরমার্থির কৃত্য

পরমার্থী তিনপ্রকার অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল **স্বনিষ্ঠ পরমার্থির** পক্ষে বিধেয়। **পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী** স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট 'কার্ত্তিক-মাস-ব্রত-পালন'-নিয়মানুসারে 'পুরুষোত্তম-ব্রত-পালন' করিতে অধিকারী। **নিরপেক্ষ-ভক্তগণ** ঐকান্তিকী প্রবৃত্তিদ্বারা 'শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-সেবন' নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যানুসারে 'শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন'-দ্বারা সমস্ত পবিত্র মাসগুলি যাপন করিয়া থাকেন। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে চরমোপদেশে বিষ্ণুরহস্য-বাক্য,—

ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্তানাং সদৈব বিমলা মতিঃ।
পরিতোষয়তে বিষ্ণুং নোপবাসো জিতাত্মনঃ।।

যাঁহাদের মতি ভক্তিপূত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে অনাসক্ত, তাঁহাদের মতি স্বভাবতঃ বিমলা, সুতরাং তাঁহারা জিতাত্মা। সর্ব্বসময়েই স্বাভাবিকী ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করেন। উপবাসাদি তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির কারণ হইতে পারে না।

একান্তিদিগের স্বাভাবিক রুচি ও করণীয়

অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী একান্তিদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন,—

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরম-প্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে।।
ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
স্যাদিচ্ছ্যেষাং স্বতন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ।।
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হিতে।
ইত্যাদ্যেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং লিখিতং হি তৎ।।

একান্ত ভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণস্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়। প্রায় তাঁহারা এই দুই অঙ্গ ব্যতীত আর অন্য কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না। পরম প্রীতির সহিত উক্ত অঙ্গদ্বয় পালন-করণে এতদূর আগ্রহ যে, অন্য কৃত্যসকল তাঁহাদের রুচি সংগ্রহ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্ঘ্রিসেবা কোন বিশেষ ভাবের সহিত করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা প্রবলা হয় ; সুতরাং কিছু স্বতন্ত্রতার সহিত এবং স্বীয় রসের অনুকূলভাবে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-সেবাই তাঁহাদের বিধি হয়। ঋষিগণ যে-সকল বিধি বিধান করিয়াছেন, তাহাতে একান্তী ভক্তদিগের বিধিবাধ্য ভাব নাই। স্বয়ং প্রবৃত্তি-ভাবই স্বভাবতঃ বর্ত্তমান হয়। ইহাই একান্ত ভক্তদিগের মাহাত্ম্য।

কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন না থাকায় অধিমাস ভক্তের প্রিয়

ভক্তগণ স্বনিষ্ঠ, পরনিষ্ঠিত ও একান্ত ভাবভেদে যথাধিকার শ্রীপুরুষোত্তম-মাস পালন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগবান্ ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। সুতরাং অধিমাস ভক্তমাত্রেরই প্রিয় মাস, যেহেতু ঘটনাক্রমে ঐ মাসে কোন কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন আসিয়া ভক্তির ব্যাঘাত করিবে না।

(সজ্জনতোষণী ১০ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা)

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৮ পৃষ্ঠার পর]

বিশ্ব সত্য, জীব ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ তত্ত্ব। তা'দের মধ্যে উন্মুখতা ও বিমুখতাভেদে বহু তারতম্য। অন্যথারূপ তাগ ক'রে স্বরূপাবস্থানই মুক্তি, তাহা বিষ্ণুর পাদপদ্মের সেবা লাভ। সদাচারী হরিজন হওয়া আবশ্যক। ষড়্গোস্বামীর মত একই। কোনপ্রকার অনৈক্য নাই। কিন্তু প্রাকৃত-সহজিয়াগণ গোস্বামি-মত বুঝতে না পেরে, ভোগ-বুদ্ধিতে বিচার কর্‌তে গিয়ে গোস্বামিগণের মতের মধ্যে অনৈক্য দেখে থাকেন। যাঁরা সর্ব্বক্ষণ চব্বিশ ঘণ্টাই হরিসেবায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পে'রেছেন, তাঁ'দের কাছে গোস্বামীদের মতে ভেদদর্শন নাই।

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।।"

আমরা রাধাকুণ্ডে এসেছি হরিজন দর্শন কর্‌তে। বিষয়ী, ভোগী, কুভোগী বা ফল্গুত্যাগীদের দর্শনের জন্য আসি নাই। কেবল বৈষ্ণবসেবা সুষ্ঠুরূপে কর্‌বার জন্য এখানে আসা। অনেকের কেবলা ভক্তির আশ্রয়ের অভাবে কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রার আদরে সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা ঘটেছে। শাস্ত্র বলেন,—উত্তর ভারতে কদাপি বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়, কিন্তু দ্রাবিড়ে ভূরিশঃ। সাত্বতসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ই দাক্ষিণাত্য হইতে আবির্ভূত হইয়া জগতে প্রচারিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু অবন্তীদেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের গীতের অনুসরণই হরিসেবাব্রত-প্রাপ্তির একমাত্র পন্থা বিচার ক'রে স্বয়ং আচরণদ্বারা জীবগণকে শিক্ষা দিলেন।

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব।।"

আমাদের দৈববর্ণাশ্রমের চূড়ান্ত বিচার ভিক্ষুক-বেশ কৃষ্ণচরণ-সেবার প্রধান উপকরণ মাত্র। নিষ্কিঞ্চন না হ'লে কৃষ্ণভজন হয় না।

'পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষগ্রহণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসারতারণ।।"

বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবার্থ বাস দরকার। অন্যাভিলাষ থাক্‌লেই অন্ধতামসে পতন হ'ল। মাথুরমণ্ডল অন্যাভিলাষীর স্থান নহেন।

শ্রুতিমধ্যে বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদের কথা আছে। শাঙ্করবিচারে বিবর্ত্তবাদ যথাযথস্থানে প্রযুক্ত হয় নাই। আচার্য্যশঙ্করের আশঙ্কা হ'ল—পরিণামবাদে ব্রহ্মবস্তু বিকৃত হ'য়ে জগতে পরিণত হ'লে দোষযুক্ত হ'য়ে পড়েন। সুতরাং গুরু ব্যাসদেবকে ভ্রান্তসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত করা হ'ল। "তদনন্যত্বমারম্ভণং শব্দাদিভ্যঃ"—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতির উদাহরণ দিয়ে পরিণামবাদকে দোষযুক্ত বিকারবাদ ব'লে শঙ্কর বিতর্ক ক'রেছেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রহ্মসূত্রের বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতিরূপ পঞ্চাঙ্গন্যায়-বিচারে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র তাঁর অবিচিন্ত্য শক্তির কার্য্যবিকাররূপে এই পরিণামবাদ স্বীকৃত হ'য়েছে। 'সতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।' একটী সত্যতত্ত্ব থেকে যখন আর একটী সত্যতত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তখন তাহা বিকার বা পরিণাম। ব্রহ্ম একটী সত্যবস্তু, তাঁ' থেকে জীব একটী সত্যবস্তু ও মায়ারাজ্য ব্রহ্মাণ্ড একটী সত্যবস্তু পৃথগ্‌রূপে হয়েছে, এই বুদ্ধিই ব্রহ্মের বিকার বা পরিণাম। "ঐতদাত্মামিদং সর্ব্বম্" এই ছান্দোগ্য-বাক্যে ব্রহ্মই যে জগৎ

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। "পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রূয়তে" শ্বেতাশ্বতরের এই বাক্যে ব্রহ্মের অবিচিন্ত্যশক্তির কথা বলা হ'য়েছে। সেই শক্তি জগদ্রূপে পরিণত হ'লে আর বস্তুবিকাররূপ দুর্ব্ব্যাখ্যা হৃদয়কে গ্রাস কর্‌তে পারে না। তা'তে ব্রহ্মের বিকারিত্বের আশঙ্কাও আসে না। 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।' 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়', 'সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ, ঐতদাত্মমিদং সর্ব্বম্' এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্ম স্বীয় পরাশক্তিক্রমে চিজ্জড়াত্মক জগদ্রূপে পরিণত হ'য়েছেন, এই বিচারই আসে। ব্রহ্ম উপাদান এবং জীব ও জড় উপাদেয়তত্ত্ব। পরিণামবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধের অসদ্ভাবে জগৎ ও জীবকে পৃথক্ সত্যতত্ত্ব ব'লে বোধ হয় না। শঙ্কর ব্রহ্মের বিকারিত্বের ভয়ে রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিতে রজতবুদ্ধি প্রভৃতি উদাহরণ দিয়ে জীব ও জগৎকে কাল্পনিক মিথ্যা প্রমাণ কর্‌লেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নশ্বর হ'লেও জগৎ সত্যবস্তু, আবার জীব ত' চিৎকণ সত্যবস্তু।

মাণ্ডুক্য প্রভৃতি শ্রুতিতে বিবর্ত্তবাদের যে-সমস্ত স্থূল উল্লেখ করা হ'য়েছে সেগুলি দেহে আত্মবুদ্ধিমাত্র। স্থূলদেহ মাতাপিতা হইতে জাত, তার সঙ্গে সূক্ষ্ম দেহরূপ উপাধিও থাকে। দেহী আত্মবস্তু, স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় আনত্মতত্ত্ব আবরণমাত্র। ইহাতে অস্মিতা আরোপ অন্যায়।

"অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।"

যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতির নাম বিবর্ত্ত। বদ্ধজীব সেই বিবর্ত্তবুদ্ধিতে দূষিত। এইরূপ বিবর্ত্তদোষ মূল বিশ্বতত্ত্বে ও জীবতত্ত্বে আরোপ করা নিতান্ত আহাম্মুখতা। ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তির অপলাপ কর্‌লে এইপ্রকার ভ্রমের উদয় হয়। বাস্তব বস্তুর তটস্থা পরাশক্তিজাত। ইহার সহিত অপরা শক্তিজাত স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির ঐক্য মানা বিবর্ত্ত। জগৎ সত্যই। আত্মবস্তুতে অনাত্মবস্তু আছে—ইহাই ভ্রান্তি। ভাগবত বলেছেন,—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।"

দেহে, অনাত্ম উপাধিতে আত্মবুদ্ধিকে গো-গর্দ্দভের মস্তিষ্কবিকার ব'ললেন। পরিণামবাদই ব্যাসের স্বীকৃত। বিবর্ত্তবাদে জীবব্রহ্মৈক্যবাদ ও বিশ্বের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত কর্‌বার চেষ্টা বালচাপল্যমাত্র। পরিণামবাদে বিশ্ব সত্য, অথচ নশ্বর এবং শক্তির পরিণামে সমস্ত জীব ও বিশ্বের উৎপত্তি। ভগবদ্বস্তুর অনন্ত শক্তি তাহা মানববিচারে অচিন্ত্য। অচিৎশক্তি-পরিণত হইয়া ভগবদিচ্ছায় বিশ্ব এবং চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠাদি নিত্যপদার্থ। বস্তুবিকার নহে, শক্তিবিকার। চিচ্ছক্তি বিকারলাভ কর্‌লেও নিত্যবৈশিষ্ট্যযুক্ত। অচিৎশক্তির পরিণতিতে অনিত্য বৈচিত্র্য। অচিৎশক্তি বিকারযোগ্যা। চিচ্ছক্তির পরিণতি নিত্যবস্তুর প্রাকট্য বিধান করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আষাঢ়, ১৪০৮ ; ১৬ জুলাই, ২০০১

পুরুষোত্তম-ব্রত

পুরুষোত্তম-মাস ও মলমাস

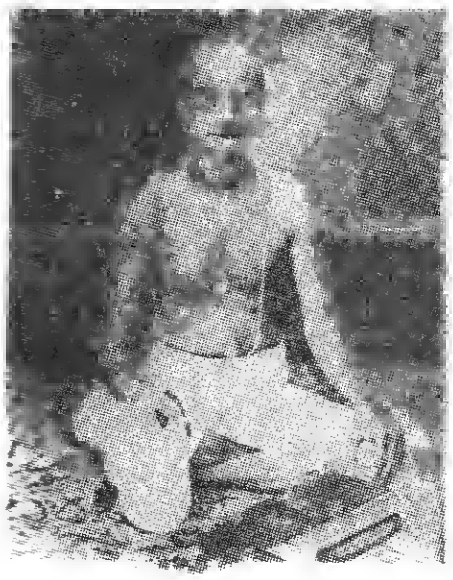

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে পুরুষোত্তম-মাসেই পুরুষোত্তম-ব্রত হইয়া থাকে। স্মার্ত্তগণ এই মাসকে মলমাস বা অধিমাস বলিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, ইহাকে 'মলিম্লুচ' (চোর), মলিন মাস ইত্যাদি নাম দিয়া এই অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই মাসে কোন শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে না ; তজ্জন্যই ইহা মাসের মধ্যে মলস্বরূপ। সুতরাং সাধারণতঃ তাঁহারা ইহাকে মলমাস বলিয়াই লোকের নিকট পরিচিত করিয়াছেন। স্মার্ত্তগণের এইরূপ বিচার বৈষ্ণবগণ কখনই অনুমোদন করেন না।

শাস্ত্রও আমাদের দেশে দুইপ্রকার পরিলক্ষিত হয়। নিজ নিজ রুচি-অনুসারে লোক শাস্ত্রের উক্তিসকল গ্রহণ করিয়া থাকে। তজ্জন্য পারমার্থিক শাস্ত্র স্মার্ত্ত-শাস্ত্র হইতে পৃথক্। যাঁহারা নিতান্ত ভোগপ্রবণতার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মমার্গে প্রবেশ করেন, তাঁহারাই স্মার্ত্তশাস্ত্রের বহুমানন করেন। এই স্মার্ত্ত-মতেই মলমাসে বা অধিমাসে একমাস-কাল নিষ্ক্রিয় হইয়া জীবনযাপন করিতে হয়। শরীর ও মন নিষ্ক্রিয় হইলেই তাহাতে শয়তান কারখানা খুলিয়া বসে। শয়তানের কর্ম্মি[illegible] উৎপীড়িত করিবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ।

বৈষ্ণবগণ একমুহূর্ত্তও হরিসেবা ব্যতীত কালক্ষেপ করেন না। 'অব্যর্থকালত্ব' বৈষ্ণব-মাত্রেরই ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে একটী প্রধান অঙ্গ। শ্রীপুরুষোত্তম-মাস ২ বৎসর, ৮ মাস, ১৬ দিন, ৪ ঘণ্টার পরে একবার আবির্ভূত হন। সুতরাং বৈষ্ণবগণের পক্ষে ইহা মলমাস নহে, পরন্তু প্রচলিত দ্বাদশ মাস অপেক্ষা সর্ব্বোত্তম অধিমাস। এমন কি, সৌর-গণনায় দ্বাদশ মাসের মধ্যে বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ—তিন মাস মহাপুণ্যমাস বলিয়া কথিত হইলেও তদপেক্ষা এই অধিমাসের শ্রেষ্ঠত্ব নারদীয় পুরাণের একত্রিংশ অধ্যায়ের বচনানুসারে স্বীকৃত হইয়াছে।

পুরুষোত্তম মাস সম্বন্ধে নারদীয় পুরাণ

সৌর দ্বাদশ মাসের সহিত চান্দ্র-রাশিস্থিত মাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাস, ১৬ দিন, ৪ ঘণ্টা পরে একটী চান্দ্রমাস অর্থাৎ এক অমাবস্যা হইতে অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত একটী অতিরিক্ত উন্নততম মাস স্বীকার করিতে হয়। স্মার্ত্ত-মতে ইহাই বৎসরের

মল। এই অধিমাসের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নারদীয় পুরাণে একটী আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। তাহাতে অধিমাসের প্রতি স্মার্ত্ত-কর্ম্মিগণের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া অধিমাস বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের নিকট অভিযোগ আনয়ন করেন। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ তাহার অভিযোগ শ্রবণ করিয়া স্মার্ত্ত-কর্ম্মিগণের ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিতভাবে তাহার প্রতিকারের জন্য অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অধিমাসের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন,—

অহমেতৈর্যথা লোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।
অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্ব্বে যে গুণা ময়ি সংস্থিতাঃ।
মৎসাদৃশ্যমুপাগম্য মাসানামধিপো ভবেৎ।।
জগৎপূজ্যো জগদ্বন্দ্যো মাসোঽয়ং তু ভবিষ্যতি।
সর্ব্বে মাসাঃ সকামাশ্চ নিষ্কামোঽয়ং ময়া কৃতঃ।।

* * * *

যেনাহমর্চ্চিতো ভক্ত্যা মাসেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমে।
ধনং-পুত্রং-সুখং ভুংক্ত্বা পশ্চাদ্গোলোকবাসভাক্।।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আমি যেরূপ এজগতে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও সমস্ত জগতে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আমাতে যে-সমস্ত গুণ আছে সেই সমস্তই এই অধিমাসে অর্পিত হইল। আমার সদৃশ হইয়া এই অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি হইবে। এই মাস জগৎপূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস সকাম, এই মাসটী নিষ্কাম অর্থাৎ কামী জীবমাত্রই ফল-কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রচলিত দ্বাদশ চান্দ্রমাসে নানাপ্রকার কাম্যকর্ম্মে লিপ্ত হয়, ইহাতে সকাম পুরুষগণের কোন কামনার পূর্ত্তি না থাকায় এই মাস নিষ্কাম। সুতরাং নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তগণ এই পুরুষোত্তম মাসে ভক্তিপূর্ব্বক আমার অর্চ্চন করিলে আপনা হইতেই ধন-পুত্রাদি সুখভোগ অবাঞ্ছিতরূপে তাহাদিগকে আশ্রয় করিবে এবং অবশেষে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারা নিত্যানন্দময় গোলোকবাসী হইবেন।

সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের প্রার্থনাক্রমে অধিমাসের সর্ব্বোত্তমতা আত্মমঙ্গলেচ্ছু প্রাণিগণের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। সর্ব্বশাস্ত্র-তাৎপর্য্যবিৎ বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণ তজ্জন্যই অধিমাসকে 'পুরুষোত্তম' মাস জ্ঞান করিয়া এই মাসে পুরুষোত্তম-ব্রত পালন করিয়া থাকেন। এই ব্রতে কার্ত্তিক-ব্রতের যাবতীয় নিয়মই সর্ব্বতোভাবে পালনীয় ; আহার-বিহারাদি সম্বন্ধে একই বিধি অবলম্বনীয়। তাহা ছাড়া এই ব্রতের বিধি-নিষেধ বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করিলে জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য' ও 'শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য' প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিবেন।

সাত্ত্বিক শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যদি কোন শাস্ত্রে অধিমাসকে মলমাস বা মলিম্লুচ বা মলিনমাস বলিয়া উল্লেখ থাকে, তবে বৈষ্ণবগণ তাহা কেন মানিবেন না? এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই অধিমাস 'পুরুষোত্তম মাস' বলিয়াও শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন্ শাস্ত্রের প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহাই এস্থলে বিচার্য্য। অষ্টাদশ পুরাণ তিন ভাগে বিভক্ত—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণই সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে শ্রেষ্ঠ। সাত্ত্বিক পুরাণের অন্তর্গত নারদীয় পুরাণ অধিমাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'পুরুষোত্তম' মাস আখ্যা দিয়াছেন। সুতরাং আমরা সাত্ত্বিক পুরাণের প্রমাণকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছি। স্মার্ত্তগণের অভিরুচি-অনুসারে রাজসিক-তামসিক পুরাণের বাক্য গ্রহণে আমরা অসমর্থ। তবে যে-স্থলে সাত্ত্বিক পুরাণের অনুসরণ করিয়া রাজসিক-তামসিক পুরাণ যে-যে বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই। কারণ, রাজসিক-তামসিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সত্ত্বগুণে উন্নীত করিবার উদ্দেশ্যও উহাতে নিহিত আছে।

সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণই শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠত্ব ও অপকৃষ্টত্বের পরিচয় ফলের দ্বারাই নির্ণীত হয়। যে গুণের ফল শ্রেষ্ঠ, সেই গুণই শ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে গীতা-শাস্ত্র আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায় ভালরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে আর কোনরূপ সন্দেহ নাই। সত্ত্বগুণই নির্ম্মল—জ্ঞান ও সুখের সঙ্গ প্রদান করিয়া ঊর্দ্ধগতি দান করে। রজস্তমোগুণ জীবকে নিম্নগামী, দুঃখময় ও অজ্ঞান-অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। এস্থলে গীতার দুই-একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া পাঠক-বর্গের কৌতূহল নিবৃত্তি করিতেছি।—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখ-সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান-সঙ্গেন চানষ।।
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভবম্।
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।।
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্।।
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্য-গুণ-বৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ।।

(গীঃ ১৪।৬-৮, ১৬, ১৮)

গীতা সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী সকলেই সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহা সাক্ষাৎ গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-বাণী বলিয়া ইহাকে বেদের ন্যায় গীতোপনিষৎ জ্ঞান করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীগীতোপনিষদের

উক্ত বাক্যসমূহ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সাত্ত্বিকগুণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহার দ্বারা বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জীবের কর্ম্মাগ্রহিতা প্রবল হইয়া থাকে। এই কর্ম্মই জীবের বন্ধনের কারণ। তাহা হইলে লোভ, নানাপ্রকার কামনা, সদসৎ ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। এই সম্বন্ধে গীতাও তারস্বরে আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ।। (গীঃ ১৪।১২)

গীতার প্রমাণানুসারে কেহ হয়ত' বলিবেন, সত্ত্বগুণই শ্রেষ্ঠ ও সাত্ত্বিক শাস্ত্রের প্রমাণই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণীয় ; কিন্তু নারদীয় পুরাণখানি যে সাত্ত্বিক পুরাণ, তাহার প্রমাণ কি? তৎসম্বন্ধে আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সন্দেহ নিরসন করিতেছি। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে কোন্ কোন্ পুরাণ কি কি গুণান্বিত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।—

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বরাহং শুভদর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ।।
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত।।
মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত।।

অর্থাৎ, অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে মনীষিগণ বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, মঙ্গলময় ভাগবত পুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং বরাহপুরাণ—এই ছয়টী পুরাণকে 'সাত্ত্বিক' বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণ—এই ছয়টী 'রাজসিক' এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ—এই ছয়টী 'তামসিক' বলিয়া কথিত হয়।

এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ রাজসিক পুরাণের অন্যতম। রজস্তমোগুণান্বিত ব্যক্তিগণকে সাত্ত্বিক শাস্ত্রে আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই সাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রসমূহের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদি সাত্ত্বিক পুরাণের অন্তর্গত কোন পুরাণ সাত্ত্বিক পুরাণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন, তাহা হইলে রজস্তমোগুণান্বিত ব্যক্তিগণ তৎক্ষণাৎ যুক্তি উত্থাপন করিয়া বলিতেন,—নিজ নিজ মহিমায় সকলেই গৌরবান্বিত হইতে ইচ্ছা করে ; সুতরাং সাত্ত্বিক শাস্ত্র নিজ মহিমা ত' কীর্ত্তন করিবেই; অতএব উহা গ্রহণীয় নহে। এস্থলে রাজসিক পুরাণ সাত্ত্বিক পুরাণের মহিমা কীর্ত্তন করায় স্ব-মহিমা-কীর্ত্তনের দোষ আরোপিত হইল না।

অতএব অধিমাসকে আমরা মলমাসরূপে গ্রহণ না করিয়া সাত্ত্বিক পুরাণের বাক্যানুসারে 'পুরুষোত্তম-মাস' বলিয়াই ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিব। ইহা সর্ব্বশুভ-কর্ম্মের আকর-স্বরূপ এবং এই মাস স্বভাবতঃই সর্ব্ববাঞ্ছিত ফলপ্রসূ।

অধিমাসকে মলমাস বলার অযৌক্তিকতা

যদি একই শাস্ত্রকর্ত্তার বিভিন্ন মত একস্থানে পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে কোন্‌টী গ্রহণীয়, এ সম্বন্ধে আরও বিচার করা আবশ্যক। শাস্ত্রের বিরোধ-ক্ষেত্রে যুক্তিই একমাত্র সঙ্গতি স্থাপন করে।—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যা বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন-বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।।"

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইলেও আমরা যুক্তির দ্বারাও ইহা স্থাপন করিতে পারি যে, অধিমাসকে 'মলমাস' বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ এই অধিমাস চান্দ্রমাসের অভাব-পূরণকারী। শুধু তাহাই নহে, ইহা সৌরবর্ষের মিলন-কর্ত্তা। যিনি অভাব পূরণ করেন, তাহাকে হেয় জ্ঞান করা দুর্নৈতিকতা মধ্যে পরিগণিত। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ মলের দ্বারা অভাব পূরণ করিতে গেলে যুক্তিবাদী নৈতিকগণ তাহা মানিয়া লইবেন কেন? যে চন্দ্র সূর্য্যালোকে প্রদীপ্ত হইয়া আত্মগরিমা ব্যক্ত করিয়া থাকেন, সেই চন্দ্রের গতি ৩২ মাসে হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে তাহার সূর্য্যের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রবলা হয়। এই অধিমাস সৌর-বর্ষের সহিত চান্দ্র-বর্ষের মিলনকারী। সুতরাং এই মিলনকারী অধিমাসকে সর্ব্বোত্তম 'পুরুষোত্তম' জ্ঞান না করিয়া 'মল' বা 'মলিম্লুচ' জ্ঞান করিলে নৈতিকগণ উপহাস করিবেন। 'মলিম্লুচ'-শব্দের অর্থ চোর। 'চোরের রাত্রিবাসে' যে মিলন, তাহা সর্ব্বত্রই উপহাস্যাস্পদ ও ঘৃণ্য। সুতরাং স্মার্ত্তমতে অধিমাসকে মলিম্লুচ বা মলমাস বলিয়া গণ্য করা কোনমতে যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রবন্ধাবলী

এবং শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত

তত্ত্ববিবেক ও ভক্তিতত্ত্ববিবেক

সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসলীলা সম্বন্ধে বিকৃত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীরাধা কৃষ্ণেরই নিত্যপ্রেয়সী। ভৌমবৃন্দাবনে লীলা করিবার জন্য নিত্যগোলোক হইতে প্রাণপ্রিয়া শ্রীরাধার সহিত নিত্যসহচরী ও নিত্যসহচরগণকে সঙ্গে লইয়া লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত গোলোকের সমস্ত লীলা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভৌম বৃন্দাবন ও গোলোকের লীলার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ভৌম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণই বৃন্দাবনচন্দ্র এবং শ্রীরাধাই বৃন্দাবনেশ্বরী। বৃন্দাবনাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বেই বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার অবস্থান নিত্য, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? "কোন সময়ে কোন ভক্ত নাকি অজ্ঞানে অজান্তে রাধাবিগ্রহকে শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে বসাইয়া ভুল করিয়াছিলেন এবং কালক্রমে জনসাধারণও অজ্ঞানে ভক্তির ভিত্তিতে সেই ভুলটা মানিয়া লইয়া চলিতেছেন"— পুরুষোত্তম বাবুর এই কষ্টকল্পনার অর্থ কি? কল্পনাপ্রসূত বিচারধারাকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইবেন না। তিনি একজায়গায় লিখিয়াছেন,— "চৈতন্যকালে মুঘল ও ফিরিঙ্গিরা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র ও হিন্দু সংস্কৃতিকে বিকৃত করিবার উদ্দেশ্যে তখনকার দিনের হিন্দু পণ্ডিতদের ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদের দ্বারা কৃষ্ণের বামপার্শ্বে রাধাকে প্রেমিকারূপে স্থাপন করাইয়া রাজনৈতিক ফায়দা লুটিয়াছিলেন এবং তাহারা এই উপায়ে কৃষ্ণের চারিত্রিক দোষ সৃষ্টি করিয়া নিজেদের বিজয়ী জ্ঞানে আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন।" কৃষ্ণের বামপার্শ্বে রাধাকে বসাইবার ব্যাপারে তিনি দুই জায়গায় দুইরকম মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। মন্তব্যদ্বয় সামঞ্জস্যহীন হইলে অবশ্যই তাহা ভ্রান্ত ও পরিত্যজ্য। পুরুষোত্তম বাবুর অনুমান, প্রায় ৫০০ বৎসর আগে চৈতন্যমহাপ্রভুর সময় থেকে রাধাগোবিন্দ কল্পনা আরম্ভ হইয়াছিল ; কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যের উদ্দেশ্য রাধাকে বামপার্শ্বে প্রতিষ্ঠা করিবার ছিল না। তিনি কাল্পনিক মনগড়াকথা বলিয়া নিজেকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। স্বয়ং নন্দনন্দন কৃষ্ণই কলিযুগে যুগল কিশোর-কিশোরী রাধাগোবিন্দের (রাধাকৃষ্ণের বামপার্শ্বস্থিতা) ভজন শিক্ষা দেওয়ার জন্য গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শাস্ত্রে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীরাধাগোবিন্দ হিন্দু পণ্ডিতদিগের দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থে সৃষ্ট কোন কাল্পনিক দেবদেবী নহে, অনাদির আদি হইতেই তাঁহারা তাঁহাদের নিত্য সহচর ও নিত্য সহচরী এবং তাঁহাদের অনুগতজনদ্বারা নিত্য গোলোক-বৃন্দাবনে সেবিত হইতেছেন, ইহাই সিদ্ধান্তিত কথা। কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে পরমপ্রেয়সী রাধা। রাধা কৃষ্ণের

বামপার্শ্বে আছেন বলিয়া কৃষ্ণের নাম 'মদনমোহন'। রাধিকার সর্ব্বস্ব বলিয়া কৃষ্ণের এক নাম 'রাধানাথ' এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণস্বরূপা বলিয়া রাধার এক নাম 'কৃষ্ণপ্রাণবল্লভা'। অতএব কৃষ্ণের বামপার্শ্বে রাধা অবস্থান করিলে কৃষ্ণের চারিত্রিক দোষ ঘটিবার অবকাশ কোথায়?

পুরুষোত্তমবাবু লিখিয়াছেন,—"রাধা যেহেতু রুক্মিণী প্রভৃতির ন্যায় কৃষ্ণের বিবাহিত স্ত্রী নহে, সেইহেতু কৃষ্ণের বামপার্শ্বে রাধাকে বসাইলে শিষ্টাচারের মাপদণ্ডে কৃষ্ণের সকল মর্য্যাদা ধূলোয় গড়াগড়ি যায়।" এই প্রসঙ্গ উঠাইতে গিয়া তিনি নিজের বাক্যে নিজেই ঠকিয়া যাইবেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ রাধাকে 'কৃষ্ণপত্নী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—"রাধা বামাংশভাগেন মহালক্ষ্মীর্বভুব সা, স্বয়ং রাধা কৃষ্ণপত্নী কৃষ্ণঃ বক্ষঃ স্থলাস্থিতা (ব্রঃ বৈঃ পুঃ প্রকৃতিখণ্ড ৪৮৯ অঃ)। বেদে কৃষ্ণকে রাধাপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথা,—"স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্ব্বাহো বীর যস্য তে, বিভূতিরস্তু সূনৃতা (ঋক্ ১।৩০।৫, অথর্ব্ব ২০।৪৫।২)।" শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে আবার কৃষ্ণকে জগতের পিতা এবং রাধাকে জগতের মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। যথা,—

শ্রীকৃষ্ণ জগতাং তাতো, জগন্মাতা চ রাধিকা।
পিতুঃ শতগুণা মাতা বন্দ্যা, পূজ্যা, গরীয়সী।।

অতএব স্বামী-স্ত্রী অথবা পিতা-মাতার বিচারেও যদি রাধাকে কৃষ্ণের বামপার্শ্বে বসানো হয়, তাহাতে কি তাঁহার কোন আপত্তি আছে?

পুরুষোত্তমবাবু প্রশ্ন তুলিয়াছেন,—"কৃষ্ণের সহিত বিবাহিত স্ত্রী রুক্মিণীর নিশ্চয়ই মনোমালিন্য হইয়াছিল, তাহা না হইলে তিনি কিরূপে রুক্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া বিনা বিবাহে রাধাকে প্রেমিকারূপে অঙ্গীকার করিয়া বামপার্শ্বে স্থান দিয়াছিলেন?" মনোধর্ম্মিগণ এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকেন। ইহ জগতে সুখ-দুঃখ, নিন্দা-প্রশংসা, ভাল-মন্দ সমস্তই প্রাকৃত মনের ব্যাপার। গোলোক, বৃন্দাবন, দ্বারকার সকল ব্যাপারই চিন্ময়, তথায় প্রাকৃত মনের প্রবেশের কোন অধিকার নাই। অতএব দ্বারকায় কৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর মনোমালিন্যের সম্ভাবনা কোথায়? পঞ্চমুখ্যরসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মধুর রস, সেই মধুররসের স্বকীয়া ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রুক্মিণী। তিনিও পরমরসস্বরূপা, সর্ব্বসৌভাগ্যশালিনী রাধার পদধূলি লাভ করিবার জন্য অহর্নিশ বাঞ্ছা করেন। শ্রীরাধার হৃদয়-মন্দিরে বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের চরণ নিত্য বিদ্যমান। রাধারাণীর প্রগাঢ় কৃষ্ণ-প্রেমের ছায়া স্পর্শ করিবার ক্ষমতা রুক্মিণীর কোনকালে নাই। নিকসিত হেম নির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমস্বরূপিণী রাধার কথা চিন্তা করিয়া দ্বারকেশ্বরী স্বর্ণখচিত সিংহাসনে কৃষ্ণচরণে লুণ্ঠিত হইয়া একদিন মূর্চ্ছাও গিয়াছিলেন। কৃষ্ণের প্রিয়াগণের মধ্যে রুক্মিণী অপেক্ষাও

রাধারাণী শ্রেষ্ঠা, তাহা আদিপুরাণ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৮-৯ শ্লোকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়। যথা,—

বারণস্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে।
রুক্মিণী দ্বারবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে।।
তত্রাতি রাধিকা শশ্বদতি প্রাণপ্রিয়া হরে।
কিমহং বর্ণয়ে ভাগ্যং রাধায়াঃ পরমাদ্ভুতম্।।

কৃষ্ণের বামপার্শ্বে স্থিতা রাধার সৌভাগ্য দ্বারকেশ্বরী রুক্মিণী পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়াছেন এবং ইহা শ্রবণ করিয়া পুরুষোত্তমবাবুর কৃষ্ণের সুনির্ম্মল চরিত্রের প্রতি সন্দেহের অবসান ঘটিবে—আশা করা যায়।

তিনি লিখিয়াছেন,—"পুরুষের বামপার্শ্ব তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর জন্য সংরক্ষিত থাকা প্রয়োজন।" আমরা চাকুরি, গাড়ী এবং আরও বহু কিছুর সংরক্ষণ সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছি ; কিন্তু পুরুষের বামপার্শ্ব বিবাহিত স্ত্রীর জন্য সংরক্ষণ করিবার ব্যাপারে তাঁহার আন্দোলন দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। ভাল করিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, ইহজগতে কোন কিছুরই সংরক্ষণ স্থায়ী নহে। চক্ষের সম্মুখে যে বস্তুগুলিকে সংরক্ষিত অর্থাৎ আমার ভোগের বস্তু বলিয়া মনে করিতেছি, দুইদিন পরে আমাকে সবকিছু ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। কোনকিছুই আমার সঙ্গে যাইবে না। এই জড়জগতে যে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব—ইহা ঔপাধিক। মায়িক কর্ম্মফলানুসারে কেহ স্ত্রী, কেহ পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পুরুষের পক্ষে বিবাহিত স্ত্রীর সম্পর্ক যেরূপ নিত্য নহে, তদ্রূপ বিবাহিত স্ত্রীর পক্ষেও পুরুষের সম্পর্ক অনিত্য। মৃত্যুকালে পুরুষ স্ত্রীকে বা স্ত্রী পুরুষকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। মরণশীল পুরুষের পক্ষে মরণশীল বিবাহিত স্ত্রীর জন্য বামপার্শ্ব সংরক্ষণ কোনকালে সম্ভবপর নহে। মায়াতে বহুতর অধর্ম্ম ও তুচ্ছ স্পৃহা থাকে। মায়িক স্বভাববশতঃ লোকে আপনাকে পুরুষ জ্ঞান করে। শুদ্ধ চিৎস্বভাবে কৃষ্ণের পুরুষপরিকর ব্যতীত সকল জীবই স্ত্রী। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রকৃতি বলিয়া জীবসমূহের পরিচয় দিয়াছেন। মায়াবদ্ধ জীব নিজকে পুরুষ অভিমানে স্ত্রী-সম্ভোগ করিবার যে চেষ্টা করেন, তাহা অত্যন্ত নিন্দার্হ। ভগবানের বস্তু ভোগ করিবার কাহারও অধিকার নাই। স্বরাট্‌পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব রাধার জন্যই নিত্যকাল সংরক্ষিত আছে ও থাকিবে, কিন্তু মরণশীল পুরুষের পক্ষে তাহার বামপার্শ্ব বিবাহিত স্ত্রীর জন্য সংরক্ষিত করিবার প্রচেষ্টা 'ভস্মে ঘি ঢালিবার' ন্যায় নিষ্ফল চেষ্টামাত্র।

তিনি লিখিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ, রাধা ও গোপিনীদের রাসলীলা ভুল প্রচারিত প্রেমের গল্পের থেকেই সৃষ্টি হইয়াছে। রাসলীলা পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের একটী কামুক ও ব্যভিচারী চেহারা ফুটাইয়া তোলায় বর্ত্তমানে হিন্দুধর্ম্মের যুবক-যুবতীরা পথভ্রষ্ট হইয়া কুৎসিত ভালবাসায় মত্ত হইতেছে। অনেক কবি ও সিনেমা কৃষ্ণ-রাধার সম্বন্ধকে

রাস্তার ধারে অভিসারের রূপে যে নিম্নস্তরে টানিয়া আনিয়াছে, তাহা কৃষ্ণভক্তের পক্ষে চরম অপমানজনক। ব্যভিচারপূর্ণ রাসলীলার অতি সত্বর সংস্কার আবশ্যক, নতুবা সাধারণ মানুষ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলিবে।" এখন রাধাকৃষ্ণের রাসলীলার বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। আলোচনা করিলে তাঁহার সকল ভুল ধারণা ভাঙ্গিয়া যাইবে।

রাসলীলা প্রেমময়ী, প্রাকৃত কামময়ী নহে, উহা হৃদয়ের কাম দূর করিবার ঔষধ-স্বরূপ ও কন্দর্পদর্পহারী। সপ্তপ্রকার গৌণরস ও পঞ্চবিধ মুখ্যরসের মধ্যে মধুর রস শ্রেষ্ঠ ও মধুর রসের মধ্যে পরকীয়া ভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান।।
পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।। (চৈঃ চঃ)

ব্রজেশ্বর কৃষ্ণই পারকীয় মধুর রসের আধার ও উৎস। চিদ্বিলাস একটী রহস্যমণি, তাহাতে পারকীয় মধুর রস সেই মণির মধ্যে কৌস্তুভবিশেষ। রাসলীলাতেই পারকীয় মধুর রসের পূর্ণতম প্রকাশ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পতিভাবে দ্বারকাপুরে ও উপপতিভাবে ব্রজপুরে নিত্যলীলা করেন। পরকীয়া ব্যতীত মধুর রসের পূর্ণ বিকাশ হয় না। সম্বন্ধযোগে পুরবনিতাদিগের রস কুণ্ঠিত, শুদ্ধ প্রেমযোগে ব্রজবাসিনীদিগের রস অকুণ্ঠ এবং কৃষ্ণের অধিক সুখ বিধান করে। যে স্ত্রীলোক অন্তরঙ্গ অনুরাগবশে ইহলোক, পরলোক উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন—যে বহিরঙ্গ বিবাহাদি লৌকিক ধর্ম্মের অপেক্ষা রাখে না—সেই পরকীয়া। ব্রজবধূগণই শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া। কৃষ্ণই যেস্থলে নায়ক, সেইস্থলে পরকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ হয় না। সামান্য জীব মোহ, আলস্য, ভ্রম, কামোগ্রতা, রুক্ষরসত্ব, চাঞ্চল্য, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, শ্রান্তি ও আরাম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, জগদ্ভ্রম, বিষমত্ব ও পরাপেক্ষা—এই অষ্টাদশবিধ দোষে দোষযুক্ত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাদশ মহাদোষ-রহিত, সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সত্য বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপিণী। সামান্য কোন জীব যেখানে নায়ক পদবী প্রাপ্ত হন, সেখানেই ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আসিয়া পড়ে। সুতরাং পরকীয় ভাব সেখানে নিতান্ত হেয়, এজন্য পরকীয় পুরুষ ও পরকীয়া রমণীর সংযোগকে নিতান্ত হেয় বলিয়া মুনিগণ স্থির করিয়াছেন। আগম শাস্ত্রে উপপতিতে যে লঘুত্ব নির্ণীত হয়, তাহা প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। **(ক্রমশঃ)**

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

❑❑❑❑

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৯ পৃষ্ঠার পর]

ঠাকুর গঙ্গাতীরে নির্জ্জন গোফা তৈয়ারী করিয়া বাস করিলেন এবং প্রত্যহ দিবারাত্রি অপতিতভাবে তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সেই গোফা যেন শুদ্ধসত্ত্বময় বৈকুণ্ঠভবনে পরিণত হইল। সেই গোফায় একটী বিষধর মহাসর্প ছিল। সেই সর্পের জ্বালা কেহই সহ্য করিতে পারিত না। ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য যে-সকল ভক্ত আসিতেন তাঁহারা কেহই বিষের জ্বালায় সেখানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতেন না। হরিদাসের আশ্রমে কেন এত বিষের জ্বালা কেহই বুঝিতে পারিতেছেন না। অবশেষে গ্রামবাসী বৈদ্যগণ আসিয়া বুঝিলেন—সেই গোফায় এক মহানাগ রহিয়াছে। তাহারই বিষের জ্বালায় সেখানে কেহই থাকিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা স্থির করিলেন—ঠাকুরের এই গোফায় সর্পের সঙ্গে থাকা ঠিক হইবে না। তাঁহার অন্যত্র যাওয়াই উচিত। সকলে আসিয়া ঠাকুরের নিকট মহাসর্পের কথা ও তাহার বিষের জ্বালার কথা নিবেদন করিয়া তাঁহাকে অন্যস্থানে আশ্রয় লইবার জন্য বলিলে ঠাকুর কহিলেন,—"আমি ত' এখানে অনেকদিন আছি। কোথায় আমি ত' কোন বিষের জ্বালা অনুভব করি নাই। যাহা হউক তোমরা যখন দুঃখ পাইতেছ, তখন আমি আগামীকল্য এখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইব। যদি সত্য সত্য কেহ এই গোফার মধ্যে থাকেন, তিনি যদি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া না যান, তবে আমি নিশ্চয়ই অন্যত্র যাইব। তোমাদের কোন চিন্তা নাই। তোমরা অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর।"

এদিকে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ঠাকুর গোফা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন শুনিয়া সেদিন সন্ধ্যার সময় সকলের সমক্ষে সেই মহানাগ গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া অবনতমস্তকে চলিয়া গেল। মস্তকে শোভমান মহামণিযুক্ত সেই ভয়ঙ্কর অদ্ভুত পীত, নীল-শুক্লবর্ণবিশিষ্ট সর্পকে দেখিয়া সকলেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন। গোফা ত্যাগ করিয়া সর্প চলিয়া গেলে সেখানে আর কোন জ্বালা রহিল না। বিপ্রগণ তখন স্বস্তিবোধ করিলেন। হরিদাস ঠাকুরের এতাদৃশ যোগৈশ্বর্য্য প্রভাব দর্শন তৎপ্রতি বিপ্রগণের শ্রদ্ধাভক্তি আরও বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইল।

একদিন এক ধনীর গৃহে এক সর্পক্ষত ডঙ্ক অর্থাৎ সাপুড়ে নৃত্য করিতেছিল। দৈবাৎ হরিদাস ঠাকুর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং একপার্শ্বে থাকিয়া সেই নৃত্য দর্শন করিতে থাকেন। মন্ত্রবলে সেই ডঙ্কে বাসুকির অধিষ্ঠান হয়। সাপুড়ের সঙ্গিগণ করুণরাগে কালিয়হ্রদে কৃষ্ণের কালিয়নাগ দমন-লীলা গান করিতে থাকিলে হরিদাস কৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সম্বিৎ পাইয়া হুঙ্কার করিতে করিতে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপ্রাকৃত ভাবাবেশ দেখিয়া ডঙ্ক সসম্ভ্রমে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। হরিদাস কৃষ্ণ-প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি কৃষ্ণগতপ্রাণ হওয়ায় তাঁহার দেহে

পুলক-অশ্রু-কম্প প্রভৃতির প্রকাশ হইল। তৎ সন্দর্শনে তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার চারিদিকে সকলেই কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন সেই ডঙ্ক হাতজোড় করিয়া সসম্ভ্রমে একপার্শ্বে থাকিয়া ঠাকুরের নৃত্য দর্শন করিতেছিল। ঠাকুরের ভাব সম্বরণ হইলে ডঙ্ক অর্থাৎ সেই সাপুড়ে পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিল। ঠাকুরের এইপ্রকার শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবাবেশ দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহার পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সমুপস্থিত এক ঢঙ্গ বিপ্র অর্থাৎ বিপ্রাধম চিন্তা করিল,—"বাঃ, এ ত' বেশ মজার ব্যাপার। এখানে ত' সকলেই নির্ব্বোধ, বর্ব্বর ও মূর্খ দেখিতেছি। দেখি, আমিও এইপ্রকার নৃত্য করিব। তাহা হইলে সকলে আমাকে ভক্তি করিবে। আমি ইহাদের সকলের নিকট বিশেষ সম্মান পাইব।" এই ভাবিয়া সেইক্ষণে সে কৃত্রিম ভাব প্রকাশ করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল এবং কৃত্রিমভাবে মূর্চ্ছিতের ন্যায় ভাব দেখাইতে লাগিল। সেই ডঙ্কের নৃত্যস্থানে যেইমাত্র সে পড়িয়া গেল সেই ডঙ্ক তখন ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে প্রচণ্ডভাবে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। বেত্রের প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া সেই ঢঙ্গী বিপ্র 'বাপ' 'বাপ' বলিয়া সেইস্থান হইতে পলায়ন করিল। তখন ডঙ্ক মহানন্দে নিশ্চিন্তে নৃত্য করিতে লাগিল।

ইহা দর্শনে সকলে বিস্মৃত হইলেন এবং ডঙ্ককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ব্যাপার! হরিদাস ঠাকুরের নৃত্যকালে তুমি হাতজোড় করিয়া একদিকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলে। আর এই বিপ্রকেই বা তুমি অকরুণভাবে বেত্রাঘাত করিয়া জর্জ্জরিত করিলে কেন? তখন সেই ডঙ্কের মুখে বিষ্ণুভক্ত নাগরাজ আবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন,— "তোমরা যাহা জানিতে চাহিতেছ তাহা অতি গূঢ় ও রহস্যপূর্ণ। ইহা সাধারণতঃ বলা যায় না। তথাপি তোমাদের অতিশয় আগ্রহ নিবন্ধন বলিতেছি, শ্রবণ কর।

হরিদাস ঠাকুরের আবেশ দেখিয়া তোমরা তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভক্তি করিয়াছিলে এবং তাঁহার পদধূলি লইয়াছিলে। তাহা দেখিয়া ঐ ভণ্ড, ধূর্ত্ত বিপ্রাধমের মাৎসর্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়। সে জড় প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ঠাকুরের প্রতি হিংসা, দ্বেষ ও ঈর্ষা করিয়া কৃত্রিমভাবে ভাবের অনুকরণ করিয়াছিল। তাহার এতবড় স্পর্দ্ধা যে, সে আমার নৃত্যসুখ ভাঙ্গিতে চায়। হরিদাস ঠাকুরের প্রতি তাহার এই অপরাধের জন্য আমি তাহার উপযুক্ত শাস্তিস্বরূপ তাহাকে বেত্রাঘাত করিয়া জর্জ্জরিত করিয়াছি। ঐ সকল দাম্ভিকের ভগবৎপ্রীতি বিন্দুমাত্র নাই। এই যে তোমরা হরিদাসের নৃত্য দেখিলে, উহাদ্বারা সর্ব্ববন্ধ নাশ হইবে। তাঁহার নৃত্যে স্বয়ং কৃষ্ণ আসিয়া মিলিত হইয়াছেন এবং নৃত্য করিয়াছেন। ঐ নৃত্যদর্শনে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড পবিত্রীকৃত হইয়া থাকে। ঠাকুরের হৃদয়ে সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান। তিনি সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলবিধানকারী। এমন মহাজনগণের দুর্ল্লভ সঙ্গ যদি ক্ষণকাল কাহারও লাভ হয় তবে তাহার অবশ্যই কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হইবে। ব্রহ্মা-শিবাদি সকলেই তাঁহার দুর্ল্লভ সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। জাতি-কুলসমূহের কোনই মূল্য নাই—তাহা বুঝাইবার জন্য ঠাকুর নীচকুলে

আবির্ভাব গ্রহণ করিবার লীলাবিষ্কার করিয়াছেন। অধমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ বিষ্ণুভক্ত হইলে তিনি সকলেরই পূজ্য হইবেন আর উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কৃষ্ণভজন না করেন, তবে তাহাকে নিশ্চয়ই নরকগামী হইতে হইবে।

শাস্ত্রের বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদনকল্পে ঠাকুরের এই আবির্ভাব। দেবতাগণ পর্য্যন্ত তাঁহার স্পর্শবাঞ্ছা করিয়া থাকেন "গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন।" তাঁহার দর্শনেই সকল জীবের অনাদিকালের পুঞ্জীভূত কর্ম্মবন্ধন অনায়াসেই মুক্ত হইয়া যায়। অনন্তকাল ধরিয়া অনন্তমুখেও ঠাকুরের অসীম অনন্ত অবার মহিমার কথা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। হরিদাসের নাম উচ্চারণমাত্রই জীবের পরমপদ লাভ ঘটে। এই বলিয়া সর্পাবিষ্ট ডঙ্ক মৌন হইলেন। নাগমুখে ঠাকুরের এইপ্রকার মহিমা শ্রবণ করিয়া সকলেই অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন।

যাহা হউক, হরিদাস ঠাকুর মনের আনন্দে সর্ব্বক্ষণই উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। হরিনদী-নামক গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিত। সে মহা অপরাধী ও দুর্জ্জন ছিল। সে একদিন হরিদাসকে দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া ডাকিয়া কহিল,—"ওহে হরিদাস! কি ব্যাপার! তুমি এ সব কি আরম্ভ করিয়াছ? উচ্চৈঃস্বরে কেন নাম লইতেছ? ইহার কারণ কি? শাস্ত্রে হরিনাম জপ্য বলিয়াছেন। মনে মনে হরিনাম জপ করিতে হয়। তোমাকে এই প্রকার ডাকিয়া ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম লইতে কে শিক্ষা দিল? ইহা কোন্ শাস্ত্রে আছে? পণ্ডিতগণের বিচার-সভায় তোমাকে ইহার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। তাঁহাকে বিচার-সভায় আহ্বান করিলে তৃণাদপি সুনীচ দৈন্যের মূর্ত্তবিগ্রহ হরিদাস ঠাকুর দৈন্য করিয়া বলিলেন,—"আমি আর নাম-তত্ত্ব কি জানি। আপনারাই হরিনামের মহত্ত্ব জানেন। অথাপি আপনাদের আদেশ পালনের জন্য আমি যতটুকু জানি ততটুকুই বলিতেছি। শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—উচ্চ করিয়া হরিনাম গ্রহণ করিলে শতগুণ পুণ্য লাভ হয়। উচ্চসঙ্কীর্ত্তন দোষের ত' নয়ই, বরং সর্ব্বগুণের আকর। বেদ-ভাগবত প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রেই উচ্চসঙ্কীর্ত্তনের মহিমা ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে।।" (ভাঃ ১০।৩৪।১৭)

লোকে যাঁহার নামমাত্র উচ্চারণ করিয়াই সমস্ত শ্রোতা এবং নিজকে সদ্যই পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই আপনার পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়া সে ব্যক্তি যে সর্ব্বতোভাবে সকলকে শোধন করিবে—এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি?

পশু-পক্ষী-কীটাদি কথা বলিতে পারে না। উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্ত্তন করিলে পর তাহারা সেই নাম শ্রবণ করিতে পারে এবং এই শ্রবণের দ্বারাই তাহারা উদ্ধার লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারিবে। হরিনাম মনে মনে জপ করিলে কেবলমাত্র জপকারীর নিজের মঙ্গল হয় ; কিন্তু উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা সমগ্র প্রাণীর উপকার

সাধন হয়। সমস্ত শাস্ত্রেই উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে শতগুণ ফললাভের কথা বলিয়াছেন।

"জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ।।"

যিনি হরিনাম জপ করেন, তাঁহা হইতে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা সঙ্গতই বটে। জপকর্ত্তা কেবলমাত্র নিজকে পবিত্র করেন ; কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তনকারী ব্যক্তি নিজকে এবং শ্রোতৃগণকে অর্থাৎ সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন।

সুতরাং নামজপকারী অপেক্ষা নামকীর্ত্তনকারী শতগুণে শ্রেষ্ঠ। মনে করুন, কেহ নিজে পোষণ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত এবং কেহ কেবলমাত্র নিজের পোষণ-চিন্তা না করিয়া সর্ব্বদাই বহুলোকের পোষণের চেষ্টা করিতেছেন—এই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বিচার করিয়া দেখুন। সুতরাং পরহিতকারী উচ্চসঙ্কীর্ত্তন করা কি করিয়া দোষের বিষয় হইল বলুন।

ঠাকুরের এইপ্রকার সৎসিদ্ধান্তপূর্ণ শাস্ত্রযুক্তি শ্রবণ করিয়া সেই বিপ্র ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিতে লাগিল,—"দেখ! কলির কি-প্রকার প্রভাব! এখন হরিদাস দর্শনকর্ত্তা হইল। কালে কালে বেদপন্থা নাশ হইয়া যাইবে দেখিতেছি। কলিযুগের শেষে অধম শূদ্র বেদ ব্যাখ্যা করিবে—শাস্ত্রে বলিয়াছেন। শেষে আর কেন, এখনই ত' তাহা দেখিতেছি।" বিপ্র ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল,—"হ্যাঁরে হরিদাস! তুই এভাবে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিস্ এবং অপরকে ভোগা দিয়া ঘরে ঘরে ভাল-মন্দ ভোজন করিয়া উদর ভরণের ভালই ব্যবসা করিতেছিস্। তুই যে ব্যাখ্যা করিলি, তাহার সত্যতা যদি না হয়, তাহা হইলে তোর নাক-কান কাটিয়া ফেলাইব।" বিপ্রাধমের এই কথা শুনিয়া ঠাকুর ঈষৎ হাসিলেন এবং তাহাকে কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া উচ্চ করিয়া হরি হরি বলিতে বলিতে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

হরিদাসের প্রতি নিন্দাবাক্য প্রয়োগকারী অপরাধী পাষণ্ডী সেই বিপ্রাধমের বসন্ত হইল এবং বসন্তে তাহার নাসিকা খসিয়া পড়িল। ঠাকুরের চরণে অপরাধের ফল সঙ্গে সঙ্গেই ফলিয়া গেল। ঠাকুর কোন কিছু না বলিলেও কৃষ্ণ তাহার উচিত শাস্তি প্রদান করিলেন। বিষয়ে সংসার মগ্ন দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় দুঃখে ভরিয়া গেল এবং কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে হরিদাস ঠাকুর বৈষ্ণবদর্শন ও বৈষ্ণবসঙ্গ লাভের জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সমস্ত ভক্তবৃন্দ খুবই প্রফুল্লিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাই তাঁহাকে প্রাণাধিক প্রিয়জ্ঞানে আদর করিয়া রাখিলেন। সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী তাঁহার প্রতি পরম প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

পরমারাধ্যতম শ্রীরূপানুগাচার্য্যবর

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের

১০৩তম শুভাবির্ভাব-বাসরে

ভক্তি-অর্ঘ্য

জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান, তুমি আমাদের নাথ,
আজি এ তিথিতে তোমার চরণে করি কোটি প্রণিপাত।
তোমার প্রজ্ঞান—প্রেমময় জ্ঞান,
বিজ্ঞানাপেক্ষাও তাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান,
বৈকুণ্ঠধামের ঊর্দ্ধে বিরাজিত প্রেমসেবাময় স্থান,
সেথা হ'তে তুমি আসিলে হেথায় করিতে মোদেরে ত্রাণ।। ১।।
পরমতত্ত্ব 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামে ব্যাপকতা ধর্ম্ম রয়,
'বন্দে গুরূন্'-শ্লোকেতে তাহারই পে'য়ে থাকি পরিচয়।
ষট্‌তত্ত্বরূপে প্রভু গৌরহরি
গুরুদ্বয় সাথে সদা বিলাসকারী,
হেন গুরু তুমি নহ মর্ত্ত্য জন, তুমি গৌর-পরিজন,
চৈতন্য-চরণ লভিতে সতত মাগি তব কৃপা-কণ।। ২।।
বিশ্ব-হিতে রত প্রভুপাদ-প্রেষ্ঠ গুরুরূপী মহাজন.
রূপানুগ-ধারা পুনঃ নবভাবে কৈলে বিশ্বে প্রচলন।
শ্রীগৌর-বিহিত কীর্ত্তন-ভজন,
শিখা'লে মোদেরে করি' সুযতন,
রূপানুগ হ'য়ে সাধন-ভজনে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন,
রূপ-কৃপা পে'তে তোমার চরণ পূজি আজি অনুক্ষণ।। ৩।।
শ্রীরূপ-ছাত্র শ্রীজীব-অনুগত বলদেবাচার্য্যপাদ,
তাঁ'র অনুগত শ্রীভক্তিবিনোদ, তদনুগ প্রভুপাদ।
তাঁ'দের বৈশিষ্ট্য জানা'লে মোদেরে,
উদাত্ত ভাষণ ও লেখনী-দ্বারে,
বেদান্ত দর্শনের প্রতি সূত্রের নাম-পর ব্যাখ্যা করি',
নামের মহিমা ঘোষিলে ভুবনে,—তুমি রাধা-অনুচরী।। ৪।।
'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-গ্রন্থ রচিলে পাষণ্ড-দলন তরে,
'বৈষ্ণব-বিজয়'-গ্রন্থ লিখিয়াছ মায়াবাদ নাশিবারে।
তের সংখ্যক অপসম্প্রদায়েরে
বিখণ্ডিলে ঊনচল্লিশ প্রকারে,

অপসম্প্রদায়ের বহু দোষ-ত্রুটী করিলে আবিষ্কার,
তব সিদ্ধান্তে বিদূরিত হ'ল কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-অন্ধকার।। ৫।।

তব বিরচিত 'আরতি-কীর্ত্তনে' ব্রজবন-চিত্র আঁকা,
রূপ-যূথে তুমি বিনোদ-মঞ্জরী, তুমি রাধা-স্নেহাধিকা।
উচ্চাধিকার বিনা ব্রজরস-কথা,
শুনিবার কা'রও নাহি যোগ্যতা,
হেন বাণী মোরা তোমার শ্রীমুখে শুনিয়াছি বহুবার,
তোমার বিশুদ্ধ ভকতি-সিদ্ধান্ত অতীব চমৎকার।। ৬।।

তোমার 'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' ব্যাপ্ত ভুবনময়,
সমিতির বহু শাখামঠ আজি বিদেশে স্থাপিত রয়।
তব কৃপাশীর্ব্বাদে পুষ্ট ন্যাসী-মণি—
'শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ স্বামী',
পাশ্চাত্ত্যের নানাদেশের লোকেরে শুনাইলা গৌর-বাণী,
তাঁহার প্রচারে মুগ্ধ বিশ্বজন, তিনি সর্ব্বগুণে গুণী।। ৭।।

'শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী' তব প্রিয় শিষ্যবর,
তাঁ'র ভক্তিসিদ্ধান্ত-স্ফূর্ত্তি নেহারি' দিলে আচার্য্যের ভার।
তিনি দম্ভ-মান-শূন্য ক্ষমাসুন্দর
তব মনঃবাঞ্ছা পূরণে তৎপর,
তাঁ'র দাস্যে রহি' তোমার চরণ বন্দি আজি অনিবার,
প্রণমিয়া সেই দীক্ষাগুরু-পদে মাগি গৌর-শিক্ষাসার।। ৮।।

গুরু-পূজা নিত্য ও তাত্ত্বিক পূজা, দেবপূজা সম নয়,
দেবতার সাথে জীবের সম্বন্ধ কভু নাহি নিত্য রয়।
পিতৃ-মাতৃ-দেব পূজা-উৎসব
কালের গতিতে নাশ হ'বে সব,
গুরু-শিষ্যের আত্মিক সম্বন্ধ জন্মজন্মান্তরেও রয়,
তব পূজাদ্বারা কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি অতীব সুলভ হয়।। ৯।।

জয় মণ্ডিত গুণ-লীলা তব, গাহি সদা তব জয়,
তব জয়গানে টুটে অনায়াসে দুঃখ-শোক-মোহ-ভয়।
আমি দুরমতি মহা অপরাধী
নাহি এ জগতে মো-সম পাতকী,
হেন পতিতেরে করিয়া করুণা দিয়াছ চরণে ঠাঁই,
তোমার মত পতিতপাবন গুরু কভু ত' দেখি নাই।। ১০।।

আমি বদ্ধজীব, তব গুণাবলী বর্ণিতে শকতি নাই,
আত্ম শোধিতে তব গুণরাশির এককণা শুধু গাই।
কৃষ্ণনাম সেবায় সদা ছিলে ব্রতী,
প্রচারিলে তুমি রূপানুগ-ভক্তি,
একদা দুর্ব্বৃত্তের নিপীড়ন সহি' রক্ষিলে গুরু-প্রাণ ;
তব গুরুভক্তি ও গুরুসেবা র'বে ধরামাঝে অম্লান।। ১১।।
সাধনে বিশেষ বল লভিবারে পূজি তব শ্রীচরণ,
জীবনে-মরণে তব স্মৃতি যেন জাগে মনে অনুক্ষণ।
মম হৃদি-মাঝে বিরাজি' সতত
তোমার সেবায় কর নিয়োজিত,
জ্ঞানে-অজ্ঞানে ক্ষমি' অপরাধ তার' এই অধম দাসে,
অন্তকালে মোরে দিয়া দরশন রেখো তব পদ-পাশে।। ১২।।
তুমি মোর প্রভু, আমি তব দাস—ইহা জানি মনে-প্রাণে,
এই 'ভক্তি-অর্ঘ্য' নিবেদি তোমারে আজি পূত অনুষ্ঠানে।
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্ব তোমার স্বরূপ,
তব পদযুগ আমার সম্পদ্,
তব চরণের ভজন-পূজন করেছি জীবন-সার,
অনন্ত প্রণতি রাখি তব পদে, কৃপা যাচি অনিবার।। ১৩।।

শ্রীগুরু-কৃপাপ্রার্থী—
—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

বিগ্রহ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৩ পৃষ্ঠার পর]

হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা শ্রীরাধা অমূর্ত্তশক্তিরূপে শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে নিত্যা অবস্থিতা এবং মূর্ত্তশক্তিরূপে নিত্য শ্রীবিগ্রহা। সুতরাং মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত শক্তিরূপে শ্রীরাধা যুগপৎ নিত্য—যাহা অচিন্ত্যনীয় ও অনির্ব্বচনীয়।

এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৩৯)

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যামৃত সম্পূর্ণরূপে পান করিতে যিনি সমর্থা তিনি শ্রীরাধা। অন্য পরিকরগণও মাধুর্য্যামৃত পান করেন ঠিকই, কিন্তু সে আস্বাদন আংশিক। "এই মাধুর্য্য একা রাধিকা স্বীয় আশ্রয়গত প্রেমদ্বারে আস্বাদন করেন।" (অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য)। এই কারণে শ্রীরাধা প্রেমময়ী বিগ্রহা।

কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম-রত্নের আকর।
অনুপম-গুণগণ পূর্ণ কলেবর।। (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৮০)

শ্রীরাধিকাই মূর্ত্তিমান কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু। কৃষ্ণপ্রেমরূপ বিশুদ্ধ রত্নের আকর শ্রীরাধা। তাঁহার সমস্ত সত্ত্বাই কৃষ্ণপ্রেমে বিমণ্ডিত। তাঁহার স্বরূপ ও দেহ অভিন্ন বস্তু। তাঁহার স্বরূপই দেহ। তাঁহার দেহ অনুপম গুণে পূর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমময়।

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা না চান্যা।
(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১১।১২২)

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ভূমি কে? একমাত্র শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ভূমি। শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী কে? অনুপমগুণা শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র প্রেয়সী, অন্য কেহ নহেন।

প্রেমের 'স্বরূপ-দেহ'—প্রেমের ভাবিত।
কৃষ্ণের 'প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠ' জগতে বিদিত।। (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৬১)

শ্রীরাধা প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি—প্রেমের প্রতিমা। তাঁহার প্রেমের স্বরূপ যাহা তাহাই তাঁহার দেহ। তাঁহার দেহ—প্রেমবিভাবিত অর্থাৎ প্রেমই তাঁহার দেহ নির্ম্মাণের উপাদান। কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমা প্রিয়া শ্রীরাধা। এই কারণে 'প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠ'রূপে শ্রীরাধা জগতে সুবিদিতা। শ্রীরাধিকায় 'প্রেমোৎকর্ষপরাকাষ্ঠা' প্রদর্শিত হয়।

"তদেবং পরমমধুরপ্রেমবৃত্তিময়ীষু তাস্বপিতৎসারাংশোদ্রেকময়ী শ্রীরাধিকা তস্যা-মেব প্রেমোৎকর্ষপরাকাষ্ঠায়া দর্শিতত্বাৎ।" (কৃষ্ণসন্দর্ভঃ ১৮৯ অনুচ্ছেদ)

শ্রীবৃন্দাবনের সাক্ষাৎ মাধুরী শ্রীরাধা। তিনি মহাভাবময়ী গোপীগণের শিরোমণি-স্বরূপা। পরমমধুর প্রেমের বৃত্তি মহাভাব। এই মহাভাব গোপীগণের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে থাকায় তাঁহারাও প্রেমবৃত্তিময়ী। কিন্তু শ্রীরাধাই সেই পরমমধুর প্রেমবৃত্তির সারাংশ—উদ্রেকময়ী। সেই কারণে প্রেমের পরম পরাকাষ্ঠা মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিদ্যমান। শ্রীরাধা প্রেমোৎকর্ষরূপিণী মাদনাখ্য মহাভাবময়ী শ্রীবিগ্রহা।

শ্রীরাধা মহাভাবের মূর্ত্তবিগ্রহ এবং মহাভাবের অধিষ্ঠাত্রী। মহাভাবই তাঁহার স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দঘনবস্তু আর শ্রীরাধা প্রেমঘন বস্তু। মহাভাবই, মহাভাবদ্বারাই গঠিত। আর সেই কারণেই ঘনীভূত মহাভাবদ্বারা শ্রীরাধার দেহেন্দ্রিয়াদি গঠিত। সুতরাং শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপ বিগ্রহা।

মহাভাবস্বরূপ শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৬৯)

শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের পূর্ণতম অনুভব একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিদ্যমান। হ্লাদিনীর সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম পরিণতি হইল প্রেম। প্রেমের সার অর্থাৎ প্রেমের গাঢ়তম অবস্থার নাম ভাব। ভাবের পরমকাষ্ঠা অর্থাৎ ভাবের পূর্ণতম অভিব্যক্তির নাম মহাভাব, যাহা তাঁহার প্রেমের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই কারণে শ্রীরাধা মাদনাখ্য-মহাভাবের বিগ্রহ-স্বরূপা।

ভক্তের অভীষ্ট, সেবা ও উপাসনাভেদে উপাস্যের মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের পার্থক্য প্রদর্শিত হয়।

শ্রীগৌরবিগ্রহ ঃ—

স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণই হইলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।। (চৈঃ চঃ আঃ ২।১০৯)

সেই কৃষ্ণ অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের অপর কোন স্বরূপের আগমন হয় নাই। ব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরূপে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব।

নন্দসুত বলি' যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি।। (চৈঃ চঃ আঃ ২।৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহাকে নন্দসুত বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে সেই নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, সান্দ্রানন্দ-বিগ্রহ, স্বয়ং ভগবান্‌রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। সেই কৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি'।।
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঁই।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৫৬-৫৭)

লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত রাধা ও কৃষ্ণের দুই দেহ। সেই রাধা ও কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে একই বিগ্রহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিগ্রহ।

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতিরূপ হলাদিনীশক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্বপ্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্য-তত্ত্বরূপে প্রকট। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতিদ্বারা সুবলিত সেই কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দরকে প্রণাম করি। (অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য)।

কিভাবে রাধার ভাব ও দ্যুতি লইয়া স্বয়ং কৃষ্ণ গৌরসুন্দর হইলেন? শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ ভাবময় বিগ্রহ—ভাবসমন্বিত বিগ্রহ। সুতরাং তাঁহাদের বিগ্রহ ও ভাবের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এবং তাঁহাদের বিগ্রহ ও ভাব উভয়ই শুদ্ধসত্ত্ব। ভাব ও বিগ্রহের সম্মিলিতরূপ হইল ভাবময় বিগ্রহ। একটী ব্যতিরেকে অন্যটী গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ভাব গ্রহণ করিতে হইলে বিগ্রহকে গ্রহণ করিতে হয় ; আবার বিগ্রহ গ্রহণ করিতে হইলে ভাবকেও গ্রহণ করিতে হয়। সে-কারণে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে কেবলমাত্র ভাব বা কেবলমাত্র

বিগ্রহ অর্থাৎ দ্যুতি বা কান্তি দিলেন না—নিজের ভাব ও দ্যুতি উভয়ই দিয়া মাধুর্য্যলীলাময় শ্যামসুন্দরকে ঔদার্য্যলীলাময় শ্রীগৌরসুন্দর করিলেন। প্রতি অঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া শ্রীরাধা শ্যামসুন্দরকে গৌরসুন্দর করিলেন। আবার স্বীয় চিত্তদ্বারা কৃষ্ণের চিত্তকে পরিমার্জ্জিত করিয়া স্বীয় ভাব কৃষ্ণকে দিলেন। এইভাবে কৃষ্ণ রাধার ভাব ও দ্যুতি লইয়া গৌরসুন্দররূপে আবির্ভূত হইলেন। সুতরাং রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দর।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

শ্রীগৌরহরি—শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলিত তনু হইয়া শ্রীরাধিকার প্রণয়মহিমা কি-প্রকার, শ্রীরাধাকর্ত্তৃক আস্বাদিত অসমোর্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য কি-প্রকার এবং তাঁহার মনে স্বসুখবাঞ্ছা বিন্দুমাত্র না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকে সেবাদ্বারা আনন্দিত করিয়া তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষাও যে অধিক সুখোদয় হয়, তাহাই বা কিরূপ—এই তিনটী বিষয় আস্বাদন করিয়াছেন।

এই তিনটী গূঢ় বিষয় আস্বাদনের নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুতে অবতীর্ণ হন।

যাঁহাকে প্রেম নিবেদন করা হয়, তিনি সেই প্রেমের বিষয় ; আর যিনি প্রেম নিবেদন করেন, তিনি প্রেমের আশ্রয়। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম নিবেদন করেন। সুতরাং শ্রীরাধা নিবেদিত প্রেমের আশ্রয়, আর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিবেদিত প্রেমের বিষয়।

"(১) শ্রীকৃষ্ণ 'বিষয়-বিগ্রহ' বলিয়া 'আশ্রয়-বিগ্রহ' শ্রীরাধিকার প্রণয়মহিমা অনুভব করিতে অসমর্থ। (২) 'বিষয়-বিগ্রহ' শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের মাধুর্য্য কিভাবে 'আশ্রয়-বিগ্রহ' শ্রীরাধিকাকর্ত্তৃক আস্বাদিত হয়, তাহা বিষয়-বিগ্রহরূপে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে আস্বাদন সম্ভবপর নহে। দর্পণে স্বীয় প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের ইচ্ছা উদয় হইলেও 'বিষয়-বিগ্রহ'রূপে তাহা আস্বাদন করিতে পারেন না, তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত একান্ত প্রয়োজনীয় আশ্রয়-বিগ্রহের ভাব। (৩) স্বসুখ-বাসনা বিন্দুমাত্র না থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমে শ্রীরাধিকার যে সুখের উদয় হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণসুখ হইতেও অধিক।"

এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাব নহে তাহা আস্বাদন।।
রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে।।
রাধাভাব অঙ্গীকরি' ধরি' তার বর্ণ।
তিনসুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।২৬৬-২৬৮)

ব্রজলীলায় স্বয়ং কৃষ্ণের রসাস্বাদনে অপূর্ণতা রহিয়া গেল। সেই অপূর্ণতার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটিল নবদ্বীপ-লীলায়। উপরিউক্ত তিনটী গূঢ় বিষয় আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ

নবদ্বীপলীলায় অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীরাধা আশ্রয়-জাতীয় ভাবের দ্বারা কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা করিয়া আশ্রয়-জাতীয় সুখ আস্বাদন করেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমসেবা লাভ করিয়া বিষয়-জাতীয় সুখ আস্বাদন করেন। আবার কৃষ্ণ রাধার প্রেমসেবা লাভ করিয়া বিষয়-জাতীয় সুখ আস্বাদন করেন। তিনি বুঝিলেন বিজাতীয় ভাবের দ্বারা অর্থাৎ বিষয়-জাতীয়-ভাবের দ্বারা আশ্রয়-জাতীয় সুখ লাভ সম্ভব নয়। রাধাপ্রেমের আশ্রয় ব্যতিরেকে তাঁহার অপূরিত তিন বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। শ্রীরাধার আশ্রয়জাতীয় সুখ লাভ করিতে হইলে তাঁহারই ভাব কান্তি অঙ্গীকার করিতে হইবে। তজ্জন্য কৃষ্ণ রাধিকার ভাব ও কান্তি (বর্ণ) অঙ্গীকার করিলেন। শ্রীরাধার ভাব চিত্তে ধারণ করিয়া এবং কান্তি দেহে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান কলিতে নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীরাধার গৌরকান্তিদ্বারা আচ্ছাদিত "গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর" হইলেন গৌরসুন্দর। (ক্রমশঃ)

—শ্রীভবদ্বন্ধু দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৩ পৃষ্ঠার পর]

গুরুতত্ত্ব প্রথমে বললেন। তারপরে বললেন বৈষ্ণবতত্ত্ব। বৈষ্ণবতত্ত্ব মানে ভক্ততত্ত্ব। যিনি গুরু তিনি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, তত্ত্বদর্শী। তাহলে আবার বৈষ্ণবতত্ত্ব কেন আসছে? দরকার হচ্ছে? শিক্ষাগুরু-তত্ত্ব। এঁদের সকলের কাছ থেকে আমি শিক্ষা নিতে পারি, সকলের কাছ থেকে আমি উপদেশ আহরণ করতে পারি আমার জীবনে। বৈষ্ণবতত্ত্ব মানে তাই। তাঁরা বিভিন্নরূপে আছেন—শিক্ষাগুরুরূপে আছেন, বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুরূপে আছেন, ভজনগুরুরূপে আছেন। কিন্তু মহান্তগুরু শব্দটা ব্যবহার হয়েছে দীক্ষাগুরুর ক্ষেত্রে। আর ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে যখন প্রেরণা দিচ্ছেন তখন তাঁকে বলা হচ্ছে চৈত্ত্যগুরু। এসব তত্ত্বদর্শনগুলো বুঝানো হয়েছে। এইজন্য ভক্তের সাহায্য দরকার আমার, বৈষ্ণবের সাহায্যও দরকার আমার। সোজাসুজি যদি আমি যেতে চাই, যাওয়ার ক্ষমতা নাই আমার, সেখানে মাধ্যম—Media দরকার হচ্ছে। Medium দরকার হচ্ছে এবং সেই Mediumকে বলছেন Transparent medium, not opaque medium। সদ্‌গুরুকে বলছেন Transparent medium। সোজাসুজি যদি আমি Application—দরখাস্ত করি ভগবানের কাছে, ভগবান্ নেবেন না। আমার দরখাস্ত মঞ্জুর—grant হবে না। কিন্তু সেই দরখাস্তের পাশে যদি Remark কিছু থাকে লাল কালির, তাহালে সেটা গ্রাহ্য হবে তাড়াতাড়ি। এইজন্য শাস্ত্রে কথা এসেছে, পদাবলীর মধ্যে কথা এসেছে,—

"বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়।।"

Recommendation দরকার। Recommendation ছাড়া দরখাস্ত গ্রাহ্য হচ্ছে না। তাহলে Recommendation-এর প্রয়োজন আছে। আমি যে উপরওয়ালার কাছে

যাব, Recommendation ছাড়া হচ্ছে না। সেজন্য বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রয়োজন আছে পাশাপাশি। এঁদের দুজনকে নিয়ে এগোচ্ছি। কোথায়? ভগবানের কাছে। ভগবান্ যেমন অন্তর্যামী, ভগবান্ যেমন কৃপালু, দয়ালু ; গুরু-বৈষ্ণবগণও তেমন দয়ালু, কৃপালু। কোন অংশে কম নয়। শাস্ত্রে বুঝানো হয়েছে। ভগবান্‌কে তাহলে কি দরকার হচ্ছে? তাড়াতাড়ি এ জিনিষটা পাওয়ার জন্য। লাইনটা আছে। Process, Procedure যা আছে সেটা মেনে নিয়ে আমাকে অগ্রসর হতে হবে ত'। উল্টোপাল্টা করলে ত' হবে না।

ধ্রুব কঠোর তপস্যা করছিলেন। ভীষণ কষ্টকর। কিন্তু ভগবান্ আসছেন না তার কাছে। কথাটা ত' মিথ্যা নয়। মা সুনীতির কথায় তিনি তপস্যা করতে গেলেন—পদ্মপলাশলোচন হরির আরাধনা করতে গেলেন। কঠোর তপস্যা, কি কায়ক্লেশ! ভগবান্ আসছেন না। শেষকালে ভগবান্‌ই নারদঋষিকে বলছেন,—আচ্ছা নারদ, তুমি ত' দুনিয়ার সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছ। বীণা তাঁর হাতে আছে, সে বীণাতে মূর্চ্ছনা দিতে হয় না, সে বীণা আপনা হতে বাজে। কি বাজে বীণাতে? তারকব্রহ্ম নাম—মহামন্ত্র।

"নারদ মুনি, বাজায় বীণা, রাধিকারমণ-নামে।
নাম অমনি, উদিত হয়, ভকত-গীত সামে।।"

তাঁর বীণা আপনিই সাম গান করছে। ভগবান্ বলছেন, তুমি দুনিয়ার সব লোকের উপকার করে বেড়াচ্ছ, একটা ছেলে সে কঠোর তপস্যা করছে, একটু নজর তুমি তার প্রতি দিচ্ছ না কেন? নারদঋষি বললেন, অত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলার কি দরকার, সোজাসুজি বলেন না ঠাকুর। তখন ভগবান্ বললেন,—আমি ধ্রুবের কথা বলছি। নারদ বললেন,—ও আচ্ছা। ধ্রুবের কাছে গেছেন। কোথায়? মথুরায়, ধ্রুবটীলায়। ধ্রুব যেখানে তপস্যা করেছিলেন সেটা রয়েছে এখনও। ধ্রুব, আমি এসেছি। এই নাও মন্ত্র। এই মন্ত্র জপ কর তুমি। এই মন্ত্র জপ করতে করতে তোমার অভিলষিত যে পদ্মপলাশ হরি, তিনি আসবেন, তোমাকে দর্শন দেবেন। এই মন্ত্র জপ করতে করতে তোমার সাধনে সিদ্ধিলাভ। এই বলে নারদঋষি চলে গেলেন। সেই মন্ত্র সাধন করতে লাগল ধ্রুব। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র। এখানে বলতে দোষ নাই। 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।'—এই মন্ত্র। পদ্মপলাশলোচন হরি কিছুদিন পরে হাজির হলেন।

ধ্রুব আমি এসেছি। ধ্রুব ভগবানের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে চাচ্ছে। কিন্তু ছেলেটা ত' অ, আ, ক, খ শেখেনি। লেখাপড়া করেনি ত'। স্তব-স্তুতি করবে কি করে? কিন্তু তার অন্তরাত্মা স্তব করতে চাইছে। ভগবান্ বুঝতে পারলেন, অন্তর্যামী ত' তিনি। ধ্রুব কিছু বলতে চায় আমাকে। বাক্‌শক্তি ঠিক নাই, শব্দবিন্যাস নাই। ভগবানের হাতে শঙ্খ আছে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান্। ধ্রুবের কপালে ঠেকিয়ে দিলেন শঙ্খ। শঙ্খ ঠোকানোর অর্থ কি? যাবতীয় বৈদিক জ্ঞান সব প্রবেশ করল ধ্রুবের হৃদয়ে, অন্তরে। সঙ্গে সঙ্গে কত শ্লোকে ধ্রুব স্তব করল। ছেলেটা ত' অ, আ, ক, খ শেখেনি। আর এই শ্লোকগুলো গড়্‌গড়্ করে বলে যাচ্ছে কি করে? ভগবৎকৃপা, তাতেই সব এসে গেছে। যাবতীয় বৈদিক জ্ঞান অন্তরে, হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। লেখাপড়া তার হয়ে গিয়েছে। না পড়েই পণ্ডিত! ভগবৎকৃপাই হচ্ছে বড়। "কাকেরে গরুড় করে ঐছে দয়াময়।" সে

ভগবান্ এইরকম। লেখাপড়া করতে হল না। Graduation দরকার হয় না, Post graduation দরকার হয় নাই, সব এসে গেছে। স্তব করে বলছে কি সে? ঠাকুর, আমি ত' তোমার দর্শনের অভিলাষ করে বসেছিলাম। তা তুমিই পাঠিয়েছ নারদঋষিকে। "তব নিজজন; কোন মহাজনে, পাঠাইয়া দিলে তুমি।" নারদঋষি আমাকে মন্ত্র দিয়ে গেছেন, আমি মন্ত্র সাধন করেছি, তারপর তুমি এসেছ। তাহলে তুমি সোজাসুজি আসতে পার না, বুঝা গেল। তিনি সোজাসুজি এলেন না, তিনিও মাধ্যমকে অবলম্বন করে আসছেন। আগে গুরুকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমাকে উপদেশ করেছেন, মন্ত্র-উপদেশ করেছেন। আমি মন্ত্র সাধন করেছি, তারপর আমি সিদ্ধিলাভ করেছি।

ধ্রুব বলছেন,—"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহম্।' ক্ষত্রিয়ের বাচ্চা আমি, বাপের কোলে উঠব, বাবা আমাকে কোলে নেয় নাই, এই হল আমার রাগ, মান-অভিমান। বিমাতা আমাকে উল্টোপাল্টা কথা বলে দিয়েছে। সেইজন্য আমার মা সুনীতির কাছে কান্নাকাটি করেছি। মা বললেন,—দেখ বাবা, তুই ত' বড় ছেলে, (ধ্রুবের একটা ভাই ছিল, তার নাম উত্তম) সিংহাসন ত' তোরই, তাহলেও পদ্মপলাশলোচন হরির আরাধনা করলে তোর সব ইচ্ছা পূরণ হবে। আমি স্থান—রাজসিংহাসন পাওয়ার জন্য তোমার তপস্যা করেছি।

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং না যাচে।।"

কিন্তু দেবতাও মুনঋষিগণের বাঞ্ছিতধন তুমি, তোমাকে পেয়ে গেছি আমি, তোমার কৃপাপ্রভাবে তোমাকে আমি পেয়েছি। "কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নম্"। মহাসমুদ্রের তীরে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো কি করে? রঙ বেরঙের পাথর, ঝিনুক ইত্যাদি সব কুড়িয়ে বেড়ায়। আমি এই করছিলাম ; কিন্তু পেয়ে গেছি দিব্যরত্ন তোমাকে। "স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে"—তুমি আমাকে বর দেবে বলছ, আমি চাই না কিছু তোমার কাছে। ঠাকুর অনেক কষ্ট করেছি, আর তুমিও বোধ হয় আমার জন্য অনেক কষ্ট পেয়েছ। পার্থিব জগতের কোন বিষয়বস্তু দিয়ে তুমি আর আমাকে ভুলিও না। আমার যাতে ভগবদ্ভক্তি হয়—এই আশীর্ব্বাদ করুন আমাকে, আমি অন্য কোন বিষয়বস্তু প্রার্থনা করি না তোমার কাছে। সাধনক্রম এইরকম।

রাজসিংহাসন পাওয়ার জন্য, বাপের কোলে উঠবার জন্য তপস্যা করতে গেছে ধ্রুব, কিন্তু ভগবান্‌কে দর্শন করে সমস্ত কিছু কামনা-বাসনা চলে গেছে তার। না, না, না, চাই না। "দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।" কৃষ্ণ বলছেন,—আমার ভক্ত যদি মুক্তি কামনা করে, আমি যদি তাকে মুক্তি দিতে চাই, সে নেবে না। মুক্তি চাইতে গিয়ে যদি আমি তোমাকে হারিয়ে ফেলি ঠাকুর, তা হবে না, আমি চাই না। কিন্তু ভগবান্ ত' দিয়ে দেন ওটা। আইনের কথা ত' ওটা, আশীর্ব্বাদও দিয়ে দেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক করে দিলেও ভগবানের আবার আশীর্ব্বাদ থাকে। এটাতে আমার কোন অহঙ্কার নাই। যা দিয়েছি তোমাকে, তুমি তা নিয়ে সেবা কর, তা নিয়ে তুমি সৎকার্য্যে লাগাও, সৎব্যয় কর—এটা ভগবান্ বলে দেন। অহঙ্কার ত' সর্ব্বনাশের মূল। যে কোন বিষয়ে

যদি আমাদের দম্ভ, দর্প, অভিমান, অহঙ্কার এসে যায়, তাহলে সাধন-ভজন সব পণ্ড হয়ে যায়। সেইজন্য সাধন-ভজনের ভয়ানক বড় শত্রু হচ্ছে এই অভিমান, অহঙ্কার, দম্ভ, দর্প। সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে অনেকে বলছেন, আমি সব ত্যাগস্বীকার করতে পারি, কিন্তু একটা ত্যাগস্বীকার করতে পারব না। কি জিনিষ? লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা। সাধুসন্তগণও পারছেন না। মুস্কিল্ হয়ে যাচ্ছে সেখানে। মানুষ সব ছাড়তে পারে, কিন্তু প্রতিষ্ঠাশা ছাড়তে পারে না। যদি কেউ ছাড়তে না পারছেন, তাহলে তার মঙ্গল কোথায়? অন্তর্যামী ভগবান্ মুচ্‌কি হাসেন, এ সব ছেড়েছে, কিন্তু যেটা ছাড়তে হয় সেটা ছাড়তে পারে নাই। সাধন-ভজন করতে গিয়ে ভয়ানক বাধা-বিপত্তি। লোকে মনে করেন, আমি ভগবানকে খুব ভালবাসি, কিন্তু তা লোক দেখানোর ব্যাপার নয়। নিরালা, নিভৃতে আমার দুঃখ-কষ্ট আমি ভগবানকে নিবেদন করব। যদি আমি ভালবাসি তা লোককে জানিয়ে নয়। এ শিক্ষাও আছে। যদি তার ভিতরে মান, অভিমান, অহঙ্কার এসে গেল, তাহলে সব গেল। কেননা, অহঙ্কার পতনের মূল—Pride goeth before fall. কথাটা রয়েছে। সাধন-ভজনের ক্ষেত্রগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা যার সাধন-ভজন করতে যাচ্ছি তিনি অবুঝ নন। যথেষ্ট স্নেহ-মমতা তাঁর আছে। তিনি ভক্তবৎসল, তিনি আশ্রিতজনপালক, তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। এসব বিশেষণগুলো আছে। কিন্তু পরীক্ষা ত' আমি দেব আগে। ভগবানের পরীক্ষা নেওয়ার অধিকার ত' আমার নাই। আমি পরীক্ষা দেব সবসময়। আমার ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যের পরীক্ষা সবসময় আমি দিয়ে যাব। ভগবানকে পরীক্ষা করার ক্ষমতা আমার নাই। যদি তিনি অধিকার দেন, তুমি আমাকে পরীক্ষা কর, তখন আমি তাঁর কৃপায় পেয়ে গেছি অধিকার। কিন্তু আমি ত' অহঙ্কার করতে পারি না। সে শিক্ষা রয়েছে সাধন-ভজনক্ষেত্রে।

পরম স্নেহময়, পরম প্রেমময় সেই ভগবান্। এ সংসারে শাস্ত্রীয় যে বিধি-নিষেধগুলো আছে, এগুলোর পরে অনেক ভাল ভাল কথা আছে। এর পরে কি আছে? সাধনভক্তি, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে। যে জিনিষে ভক্তের সব তন্ময়তা, উদাসীনতা, কোথায় তার সংসার, আর কোথায় তার কি, সব পড়ে থাকল। বৈষ্ণবদর্শন করতে গিয়েছিলেন একজন। কে? নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু ভক্ত মুকুন্দ। গদাধর পণ্ডিতকে নিয়ে গেছেন। তিনি দেখছেন, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি খাট-পালঙ্কের পরে বসে আছেন কি Lord styleএ। গদাধর পণ্ডিতের মনে মনে এই ভাবটা হচ্ছে। গদাধর পণ্ডিত কে? রাধারাণী তিনি। যে-সে ব্যক্তি নন তিনি। কৃষ্ণশক্তি তিনি, তাঁকে নিয়ে গেছেন গৌরশক্তি গদাধর। এ ত' আচ্ছা বৈষ্ণবদর্শন করতে এলাম। এত ভোগী, চরম ভোগী! মুকুন্দ বুঝতে পেরেছেন যে গদাধর ভুল বুঝছেন, তখন তিনি একটা শ্লোক বলতে আরম্ভ করলেন,—

"অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়া পায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেমঃ।।

মানে বুঝতে পারলেন না।

রাক্ষসী পুতনা শিশু খাইতে নির্দ্দয়া।
ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লঞা।।
তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে।
না ভজে অবোধ জীবে হেন দয়ালুরে।।
ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য।।

এমন দয়ালু ভগবান্ তাঁকে ছেড়ে কার ভজনা করব? কাকে ভালবাসব। এই শ্লোক বলবার সঙ্গে সঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারে খাট-পালঙ্ক থেকে পড়ে গিয়ে তিনি অজ্ঞান। তখন গদাধর বললেন,—আরে, আমি ত' অপরাধ করে ফেলেছি! আমি বুঝতে পারি নাই এঁকে, এঁর ভিতরের ভাবটা বুঝতে পারি নাই। আর যাঁকে পরীক্ষা করতে গেছেন তিনি কিন্তু তাঁর পূর্ব্বলীলায় বাবা। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—ইনি হচ্ছেন পূর্ব্বলীলায় গদাধরেরই বাবা—রাধারাণীর বাবা বৃষভানুরাজা। ব্যাপার কিরকম! তারপর ওখান থেকে মনে মনে ক্ষমা চেয়ে চলে গেলেন। মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে ব্যবস্থা চাইছেন। এরকম বৈষ্ণবদর্শন করতে গেলাম, আমি অপরাধ করে ফেলেছি, আমি ত' চিনতে পারি নাই, বুঝতে পারি নাই। আমার এই অপরাধ থেকে কিভাবে মুক্তি হবে? তখন মহাপ্রভু বললেন,—দেখ, যার কাছে অপরাধ হয়, যদি তার আনুগত্য স্বীকার কর, তার শিষ্যত্ব স্বীকার কর, তাহলে সব দোষ-ত্রুটী ক্ষমা হয়ে যায়। তাহলে আমি এঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করব। শিষ্যত্ব স্বীকার করা মানে নিজের বাবার অধীনতা স্বীকার করব। ব্যাপাটা হল এই। ছেলে ত'। বাহ্য-ব্যবহার দেখে সবসময় বুঝতে পারা যায় না। একজন প্রেমিক ভক্তকে বুঝতে পারা যায় না। তাঁরা ত' ধরা দেবেন না কারো কাছে। দিতে চান না, দেবেন না। এটাই হল রীতি। শাস্ত্রে এসব কথাগুলো ত' ভালভাবে বুঝানো আছে।

পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৭ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীল মহারাজ হাওয়াই প্রচার সমাপ্ত করিয়া কানাডায় পৌঁছান। তথায় ভ্যাঙ্কুবার এবং সল্ট্ স্প্রিং আইস্ল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় শ্রীগুরুতত্ত্ব, সদ্গুরুকরণের আবশ্যকতা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের কারণ, সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব, প্রকৃত সুখলাভের উপায়, বৈদিক সংস্কৃতি কি, বৈদিক সংস্কৃতিই একমাত্র নিত্য সনাতন, অন্যান্য সংস্কৃতি ক্ষণস্থায়ী প্রভৃতি বিষয়ে সাতদিন বক্তৃতা প্রদান করেন। সল্ট্ স্প্রিং-এ জনৈক মহিলা ভক্ত শ্রীল মহারাজকে কিছু প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে তিনি যাহা উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ বর্ণন করিতেছি,—

প্রশ্ন—স্বামিজী! আপনি Iskcon ভক্তদের পুনরায় দীক্ষা প্রদান করিতেছেন কেন? এটা কি উচিত?

শ্রীল মহারাজ—আমি কখনই পুনর্দীক্ষা প্রদান করি নাই। সাধু-গুরু-শাস্ত্রবাক্যানুসারে যাহা করণীয় তাহাই করি মাত্র। শাস্ত্রে ত' স্পষ্টভাবেই উল্লেখ আছে—(১) যদি কেহ

সর্ব্বদা বৈষ্ণবগণের সমালোচনা করে থাকে, বিনা কারণেই বৈষ্ণবগণের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে, (২) শুদ্ধভক্তি ছাড়িয়া অন্য পথাবলম্বী, (৩) কন্যাসদৃশ নিজ শিষ্যার সহিত কদর্য্য ব্যবহার এবং যে ভক্তিপথ হইতে পতিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের গুরুত্ব কোথায়? তাহাদের অনুগামীরা আসিয়া পারমার্থিক সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে সাহায্য করাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় শুদ্ধ পারমার্থিক দীক্ষা বলে, পুনর্দীক্ষা বলে না।

প্রশ্ন—Iskconএর ভক্তগণ মনে করেন, শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করা বেশ্যাবৃত্তি, এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি?

শ্রীল মহারাজ—Iskcon মানে কি আপনারা জানেন? সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ করুন। যিনি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের দ্বারা ভাবিত তিনিই Iskconist, কেবলমাত্র তথাকথিত সংস্থার সহিত যুক্ত থাকিলেই Iskconist হওয়া যায় না। Iskconএর প্রথম সদস্য হইলেন আদিগুরু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে বংশীর মাধ্যমে কামগায়ত্রী মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে আজ পর্য্যন্ত ভগবান্ হইতে কেহই সরাসরি দীক্ষালাভ করেন নাই। আমরা তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গর্ব্ববোধ করিয়া থাকি। যাঁহারা বলিয়া থাকেন,—"পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ ব্যতীত অন্য কোন শুদ্ধভক্তের নিকট হরিকথা শ্রবণ বেশ্যাবৃত্তি" তাঁহারা কি শ্রীল স্বামী মহারাজের নিকট হরিকথা শুনিতেছেন? আমি বলিব না, যদি তাঁহারা সত্য সত্যই স্বামিজীর নিকট হরিকথা শুনিতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহারা পতিত হইতেন না। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে, তাঁহারা যেন ভক্তিপথ হইতে পতিত হইবার প্রতিযোগিতা করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলিয়া রাখি, শ্রীল গুরুদেবকে সমাধি দেওয়ার অধিকার সৎশিষ্যের আছে, অন্য কাহারও নাই। আপনারা জানেন কি, শ্রীল স্বামী মহারাজ কাহাকে সমাধি দেওয়ার আদেশ দিয়াছিলেন? অতএব আমিই একমাত্র ওনার সৎ শিক্ষাশিষ্য। আমার বা আমাদের শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিকট হরিকথা শ্রবণ করাকে যাঁহারা অনুচিত মনে করেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে বেশ্যা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন—অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম যে শিক্ষা দিয়াছেন (প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান, ভোগরাগাদি প্রভৃতি) তাহার সহিত আপনাদের প্রদর্শিত শিক্ষা ভিন্নরূপ কেন?

শ্রীল মহারাজ—মদীয় শিক্ষাগুরুদেব প্রাথমিক অবস্থায় আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য দেখিয়া কৃপাপরবশ হইয়া কিছু ছাড় (Concession) দিয়াছিলেন মাত্র। সময়াভাবে সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা প্রদান করিতে না পারায় আপনাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আমাকে এবং আমা হইতে সাহায্য লইবার জন্য আপনাদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন। Tape ministryতে খোঁজ করিয়া দেখিলে তাঁহার কণ্ঠস্বরে ইহা শুনিতে পাইবেন। (১) প্রাতঃকালে মঙ্গলারতির সময় গুর্ব্বষ্টক কেন, এ ত' আরতির পূর্ব্বে হওয়া উচিত। (২) শ্রীকৃষ্ণের বা মহাপ্রভুর আরতির সময় নৃসিংহদেবের আরতি কেন? (৩) ভোগ নিবেদনের সময় 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়', 'নমো মহাবদান্যায়' প্রভৃতি কেন? এর তাৎপর্য্য জানেন কি? (১) প্রথমে শ্রীগুরুদেবের প্রতি নিষ্ঠা হউক, পরে মঙ্গলারতি। আমরা সর্ব্বত্রই

আমাদের শ্রীবেদান্ত সমিতিতে প্রথমে গুর্ব্বষ্টক ও পরে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-বিরচিত মঙ্গলারতি কীর্ত্তন করি। অন্যান্য সমস্ত গৌড়ীয় মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মঙ্গলারতি কীর্ত্তন করেন। (২) শ্রীনৃসিংহদেব সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক। তাঁহার কৃপায় বিঘ্ন কিছু পরিমাণে দূরীভূত হইলেই তবে স্বয়ং অবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু বা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আরতির অধিকারী হইবেন। (৩) দীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত কেবলমাত্র হরিনাম গ্রহণের পর কেহ ভোগ নিবেদনের অধিকার লাভ করিতে পারেন না। প্রাথমিক অবস্থায় আপনাদিগকে কিছু না বলিলে আপনারা ভবিষ্যতে ভোগ লাগাইবেন না বা পদ্ধতি শিক্ষা করিবেন না। যেমন মাকে রান্না করিতে দেখিয়া ছোট বালিকাও রান্না করিতে চায়। মা তাহাকে কিছু সব্জীর খোসা, ধূলা-বালি ইত্যাদি দিয়া রান্না করিতে বলেন। তদ্রূপ তিনিও আপনাদিগকে এইরূপ কিছু শিক্ষা দিয়াছেন। উনি জানিতেন, ভবিষ্যতে আপনারা যোগ্য হইলে ভোগ নিবেদন-পদ্ধতি শিখিয়া যথাযথভাবে ভোগ নিবেদন করিবেন। যেমন পূর্ব্বোক্ত বালিকা যোগ্যা হইয়া প্রকৃত পাকশালায় গিয়া রান্না করে, তদ্রূপ আপনারা যোগ্য হইয়া যথাযথভাবে সমস্ত বৈষ্ণব-আচার-ব্যবহার করিবেন। আপনাদের অনেকেই আমাদের শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে বৈষ্ণব-আচার শিক্ষালাভ করিয়া শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে ভোগ নিবেদন করিয়া থাকেন।

কানাডার প্রচার সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজ আমেরিকাস্থ ইউগেনে পৌঁছান। ২৭।৪।২০০১—১।৫।২০০১ পর্য্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসভায় শরণাগতি, শ্রীরূপশিক্ষা, কলিযুগের সাধ্য-সাধন, লোভোৎপত্তির লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। শরণাগতি আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীল মহারাজ সপ্তম গোস্বামী শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্ত্তন ব্যাখ্যা করিয়া অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে বুঝাইয়া দেন।

তন্নাম-রূপ-চরিতাদি সুকীর্ত্তনানু স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগী-জনানুগামী কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্।।

শ্রীল মহারাজ বলেন,—বৈষ্ণবধর্ম্ম আনুগত্য ধর্ম্ম। আনুগত্য ব্যতীত কেহই এই ধর্ম্মে অগ্রসর হইতে পারে না। ইহা দেখাইবার জন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামী তিনবার 'অনু'-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন সুকীর্ত্তনানু, তদনুরাগী, জনানুগামী। 'হরের্নাম'-শ্লোকে 'হরের্নাম' শব্দ তিনবার এবং 'নাস্ত্যেব'-শব্দ তিনবার ব্যবহার দেখা যায়। তদ্রূপ এখানেও তিনবার 'অনু'-শব্দের ব্যবহারদ্বারা আনুগত্যধর্ম্ম সুস্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে।

কানাডাতে প্রচার-সেবায় সহযোগিতা করিয়া কুমারী গোবিন্দ দাসী, শ্রীগুরুদত্ত দাসাধিকারী ও শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী এবং ইউগেনে সপরিবার শ্রীপুষ্পদন্ত দাসাধিকারী শ্রীসমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ইউগেনে প্রচার সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজ তিনদিনের জন্য সান্ ফ্রান্সিস্কোতে প্রচার করেন। তথায় ব্রাহ্মী স্থিতি, হরিকথায় রুচি নইলে পণ্ড সেই শ্রম, শ্রীনামকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। ব্রাহ্মী স্থিতি আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীল মহারাজ স্বয়ং প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন,—বর্ত্তমান জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় পারমার্থিক সমস্যা কি?—

ব্রাহ্মী স্থিতি। সদ্‌গুরুর নিকট হইতে হরিনাম দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বেশ কয়েক বৎসর ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীরূপে ভজন করিতে করিতে ভজনপথ ছাড়িয়া চলিয়া যায় কেন? ইহার বহু কারণ রহিয়াছে,—(১) সৎসঙ্গের অভাব, (২) বৈষ্ণবগণের সমালোচনা, (৩) ব্রাহ্মীস্থিতি। প্রথম দুইটী সহজে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তৃতীয় পরিস্থিতিতে ভজন করিতে করিতে সাধক এমন এক স্থিতিতে পৌঁছান যখন তাহার জড়জগতের প্রতি আসক্তি হ্রাস হইয়া যায়, কিন্তু তখনও পরমার্থে বিশেষ রুচি আসে নাই। এইসময় সৎসঙ্গ একান্ত আবশ্যক। জড়জগৎ ও পারমার্থিক জগতের কোনদিকেই বিশেষ আসক্তি নাই, নিরপেক্ষ অবস্থায় থাকিয়া সাধক উন্নত সৎসঙ্গের অভাবে এই ব্রাহ্মীস্থিতি হইতে ভজন ছাড়িয়া পুনঃ জড়জগতে প্রবেশ করে।

শ্রীরাধাকান্ত দাসাধিকারী ও শ্রীমতী রতিকলা দেবী এখানকার প্রচারে বিশেষ সাহায্য করিয়া শ্রীসমিতির কৃপাভাজন হইয়াছেন।

অতঃপর ৪।৫।২০০১—১১।৫।২০০১ তারিখ পর্য্যন্ত আটদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় যোগদান করিবার জন্য শ্রীল মহারাজ Badgerএ পৌঁছান। প্রতি বৎসর এই স্থানটিতে বিশ্বের প্রায় প্রধান প্রধান পঞ্চাশটী দেশের ভক্তগণ আসিয়া যোগদান করেন। এখানে ভক্তির স্বরূপ, শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-ব্রত পালন, প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত 'প্রভুপাদ' সবথেকে বেশী কেন প্রহ্লাদ-চরিত্র আলোচনা করিতেন—তাহার বিশদ ব্যাখ্যা, দশমূল তত্ত্ব, শ্রীরামানন্দ রায়ের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁহার জীবন-চরিত্র ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত কথোপকথন, অন্নকূট-মহোৎসব প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। স্থানীয় ভক্তবৃন্দ প্রতিদিন শিক্ষামূলক নাটিকা অভিনয় করিয়া ধর্ম্মসভার আকর্ষণ আরও বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

শ্রীনির্গুণ দাসাধিকারী ও সপরিবার শ্রীনন্দগোপাল দাসাধিকারী এখানকার প্রচারসেবায় সহযোগিতা করিয়া শ্রীল মহারাজের বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীল মহারাজ ১১।৫।২০০১—১৩।৫।২০০১ পর্য্যন্ত লস্ এঞ্জেলসে শ্রীরায় রামানন্দ-সংবাদ প্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনা করেন। শ্রীউপানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঋষভদেব দাসাধিকারী এখানকার প্রচারসেবায় সহায়তা করিয়া শ্রীসমিতির বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন।

অনন্তর সপ্তাহব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত কথামৃত যজ্ঞের জন্য শ্রীল মহারাজ ১৪।৫।২০০১ তারিখে হুস্টনে পৌঁছান। এখানে অধিকাংশ বক্তৃতা ভারতীয় রাষ্ট্রভাষায় হইয়াছে। সকল অনুষ্ঠান দুর্গাবাড়ী সোসাইটিতে হওয়ার জন্য কিছু কিছু অংশ বাংলা ভাষাতেও হইয়াছে। বহির্ভারতে এই প্রথম শ্রীল মহারাজ বঙ্গভাষায় কোন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। এখানকার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল,—শ্রীব্যাস-নারদ-সংবাদ, সূত-শৌনক-সংবাদ, প্রহ্লাদ-চরিত্র, বৃত্রাসুর উপাখ্যান, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং ব্রহ্মমোহন-লীলার রহস্য। দুর্গাবাড়ী সোসাইটির জনৈক উদ্যোক্তা ও সম্পাদক শ্রীল মহারাজকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন,—

প্রশ্ন—এখানে বহু স্বনামধন্য বক্তা আসিয়াছেন, কিন্তু কেহই শ্রীমদ্ভাগবতের অধিবেশনের সময় ঠিক ঠিক বলিতে পারেন নাই, আপনি কৃপাপূর্ব্বক বাংলা ভাষাতেই উহার উত্তর দিলে ধন্য হইব।

শ্রীল মহারাজ—আমি অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি এবং শাস্ত্রে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিতেছি,—

শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটী প্রধান অধিবেশন এ পর্য্যন্ত হইয়াছে। (১) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের ৩০ বৎসর পর শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ সংবাদ, (২) প্রথম অধিবেশনের দুইশত বৎসর পর বা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের ২৩০ বৎসর পরে দ্বিতীয় অধিবেশন গোকর্ণ-ধুন্ধুকারী-সংবাদ, (৩) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের ২৬০ বৎসর পরে অথবা দ্বিতীয় অধিবেশনের ৩০ বৎসর পর অথবা প্রথম অধিবেশনের ২৩০ বছর পরে দেবর্ষি-নারদের অনুরোধে চতুঃসন শ্রীমতী ভক্তিদেবী ও তাঁহার পুত্র জ্ঞান-বৈরাগ্যের জন্য ভাগবত অধিবেশন করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন—শ্রীমদ্ভাগবতের লক্ষণ কি?

শ্রীল মহারাজ— ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রূপ-সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীল জীব গোস্বামী মৎস্যপুরাণ হইতে তত্ত্বসন্দর্ভে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি,—

যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ।
বৃত্রাসুর বধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে।।

অর্থাৎ যে গ্রন্থে গায়ত্রী মন্ত্রের আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মের বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং যাহাতে বৃত্রাসুর-বধ প্রসঙ্গ আছে, উক্ত গ্রন্থকেই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়া জানিবে।

প্রশ্ন—সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধারের উপায় কি?

শ্রীল মহারাজ—পদ্মপুরাণ হইতে শ্রীল জীব গোস্বামী তত্ত্বসন্দর্ভে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই বলিতেছি,—

অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদিচ্ছসি ভবক্ষয়ম্।।

অর্থাৎ শ্রীগৌতমঋষি অম্বরীষ মহারাজকে বলিতেছেন,—হে অম্বরীষ মহারাজ! যদি সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধার লাভ করিতে চান, তাহা হইলে কালাকাল বিচার না করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামি-কথিত শ্রীমদ্ভাগবত নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং অনুশীলন করুন।

হুস্টনে প্রচারসেবায় সহায়তা করিয়া সপরিবার শ্রীতরুণকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণদাস দাসাধিকারী, শ্রীঅরুণ বর্ম্মা, শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী ও সস্ত্রীক শ্রীসুশীল অগ্রবাল শ্রীসমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

অতঃপর শ্রীল মহারাজ আলাচুয়াতে ২২।৫।২০০১—২৮।৫।২০০১ তারিখ পর্য্যন্ত Festival of unerstanding শীর্ষক ধর্ম্মসভায় যোগদান করেন। এখানে বর্ত্তমান জগতের সমস্যা ও সমাধানের উপায়, সাধনভক্তি, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের চরিত্র, শ্রীসনাতন গোস্বামীর চরিত্র ও জীবে দয়া প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন।

সস্ত্রীক শ্রীজলাকর দাসাধিকারী ও সস্ত্রীক শ্রীরমেশ দাসাধিকারী এখানকার প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়া শ্রীসমিতির কৃপাভাজন হইয়াছেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আষাঢ়, ১৪০৮ ; ১৬ জুলাই, ২০০১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৩শ বর্ষ } ১৩ হৃষীকেশ, গর্ভোদশায়ী, ৫১৫ শ্রীগৌরাব্দ
৩২ শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৪০৮, ইং ১৭/৮/২০০১ { ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপৃথুমহারাজকৃতা গো-ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মণ্যদেব-স্তুতিঃ

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একবিংশতিতমেঽধ্যায়ে—২১-৩৩]

শ্রীরাজোবাচ,—

সভ্যাঃ শৃণুত ভদ্রং বঃ সাধবো ইহাগতাঃ।
সৎসু জিজ্ঞাসুভির্ধর্ম্মমাবেদ্যং স্বমনীষিতম্।। ১।।

(যজ্ঞ-সভাস্থিত প্রজাবৃন্দও সভ্যগণের হর্ষোৎপাদন করিয়া শ্রীপৃথু মহারাজ শ্রবণ-মধুর মনোহর গম্ভীরার্থযুক্ত স্বীয় অনুভবসিদ্ধ বাক্যসমূহ সকলের উপকারের জন্য অব্যাকুলচিত্তে বলিতে লাগিলেন,—)

রাজা পৃথু কহিলেন,—হে সভ্যগণ, হে সমাগত সাধুগণ, আপনারা সকলেই আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আপনাদের মঙ্গল হউক। ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের সমীপে স্ব-স্ব-মনোভিলাষ ব্যক্ত করা উচিত ; তজ্জন্যই আমি আপনাদিগের নিকট আমার বিচারিত বিষয় ব্যক্ত করিতেছি।। ১।।

অহং দণ্ডধরো রাজা প্রজানামিহ যোজিতঃ।
রক্ষিতা বৃত্তিদঃ স্বেষু সেতুষু স্থাপিতা পৃথক্।। ২।।

পরমেশ্বর আমাকে ইহজগতে প্রজাদিগের শাসন, ধর্ম্মসংরক্ষণ, জীবিকাপ্রদান ও পৃথক্ পৃথক্ বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্মমর্য্যাদা-স্থাপনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।। ২।।

তস্য মে তদনুষ্ঠানাদ্ যানাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ।
লোকাঃ স্যুঃ কামসন্দোহা যস্য তুষ্যতি দিষ্টদৃক্।। ৩।।

সর্ব্বধর্ম্মসাক্ষি-ভগবানের প্রসন্নতাক্রমে যে-সকল পুণ্যলোক-প্রাপ্তির কথা বেদজ্ঞগণ বর্ণন করিয়াছেন, প্রজারক্ষণাদি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা আমারও যেন সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ লোক লাভ হয়।। ৩।।

য উদ্ধরেৎ করং রাজা প্রজা ধর্ম্মেষ্বশিক্ষয়ন্।
প্রজানাং শমলং ভুঙ্‌ক্তে ভগঞ্চ স্বং জহাতি সঃ।। ৪।।

যে রাজা প্রজাগণকে স্ব-স্ব-ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান না করিয়া তাঁহাদিগের নিকট কর-মাত্র গ্রহণ করেন, তিনি প্রজাদিগের পাপভাগী হন এবং তাঁহার সকল ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হয়।। ৪।।

তৎ প্রজা ভর্ত্তৃপিণ্ডার্থং স্বার্থমেবানসূয়তঃ।
কুরুতাধোক্ষজধিয়স্তর্হি মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ।। ৫।।

অতএব **হে প্রজাবৃন্দ, তোমরা অসূয়ারহিত হইয়া ভগবান্ শ্রীঅধোক্ষজে মনঃসংযোগ কর।** আমি তোমাদের ভর্ত্তা। পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের ন্যায় তোমরা যদি আমার পারলৌকিক-মঙ্গলের জন্য স্বধর্ম্মে অবস্থান কর, তাহা হইলেই আমার প্রতি তোমাদের যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইবে।। ৫।।

যূয়ং তদনুমোদধ্বং পিতৃ-দেবর্ষয়োঽমলাঃ।
কর্ত্তুঃ শাস্তুরনুজ্ঞাতুস্তুল্যং যৎ প্রেত্য তৎফলম্।। ৬।।

হে পিতৃদেব ও ঋষিগণ, আপনারা বিবেকী, আমার বাক্য অনুমোদন করুন ; যেহেতু কর্ত্তা, শিক্ষাদাতা ও অনুমন্তার পরলোক তুল্যফল লাভ হয়।। ৬।।

অস্তি যজ্ঞপতির্নাম কেষাঞ্চিদর্হসত্তমাঃ।
ইহামুত্র চ লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নাবতাঃ ক্বচিদ্ভুবঃ।। ৭।।

হে পূজ্যতমগণ, কাহারও মতে যজ্ঞপতি-নামক একজন পরমেশ্বর আছেন ; তাহা না হইলে ইহ ও পরকালে সমুজ্জ্বল ভোগভূমি এবং ভোগসাধন শরীর-সকলই বা দৃষ্ট হইবে কেন? ৭।।

মনোরুত্তানপাদস্য ধ্রুবস্যাপি মহীপতেঃ।
প্রিয়ব্রতস্য রাজর্ষেরঙ্গস্যাস্মৎপিতুঃ পিতুঃ।। ৮।।

ঈদৃশানামথান্যেষামজস্য চ ভবস্য চ।
প্রহ্লাদস্য বলেশ্চাপি কৃত্যমস্তি গদাভৃতা।। ৯।।
দৌহিত্রাদীনৃতে মৃত্যোঃ শোচ্যান্ ধর্ম্ম-বিমোহিতান্।
বর্গ-স্বর্গাপবর্গাণাং প্রায়েণৈকাত্ম্যহেতুনা।। ১০।।

(মৃত্যু-দৌহিত্র বেণ প্রভৃতি ধর্ম্মবিমূঢ় ও শোচ্যব্যক্তিগণ ব্যতীত) মহারাজ মনু, উত্থানপাদ, ধ্রুব, রাজর্ষি প্রিয়ব্রত, আমার পিতামহ অঙ্গরাজ, ব্রহ্মা, শিব, প্রহ্লাদ, বলি এবং এতাদৃশ অন্যান্য মহাত্মগণের মতেও ভগবান্ আছেন ; যেহেতু ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম,—ত্রিবর্গ এবং স্বর্গ ও মোক্ষ,—এ সমস্তই তৎকৃপাধীন (অর্থাৎ সমস্ত-ফলপ্রাপ্তির মূলেই এক অদ্বয় ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই)।। ৮-১০।।

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতি
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ।। ১১।।
বিনির্দ্ধূতাশেষ-মনোমলঃ পুমা-
নসঙ্গ-বিজ্ঞানবিশেষ-বীর্য্যবান্।
যদঙ্ঘ্রিমূলে কৃতকেতনঃ পুন-
র্ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে।। ১২।।
তমেব যূয়ং ভজতাত্মবৃত্তিভি-
র্মনোবচঃকায়গুণৈঃ স্বকর্ম্মভিঃ
অমায়িনঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
যথাধিকারাবসিতার্থসিদ্ধয়ঃ।। ১৩।।

যাঁহার চরণ-সেবাভিরুচি বিষ্ণুপদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃতা গঙ্গার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিদিন সংসারতাপ-দগ্ধ জীববৃন্দের জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত বুদ্ধিমল সদ্য বিনষ্ট করিয়া দেয়, যিনি সেই ভগবানের চরণমূল আশ্রয় করিয়াছেন, যাঁহার অশেষ মনোবল বিধৌত হইয়াছে, সেই পুরুষ বৈরাগ্যসহিত ভক্তিযোগদ্বারা বিজ্ঞান (ভগবৎ-সাক্ষাৎকার)-রূপ বীর্য্য লাভ করিয়া পুনরায় আর ক্লেশাবহ সংসারগতি প্রাপ্ত হন না। অতএব হে প্রজাগণ, তোমরা সিদ্ধিলাভ-বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া অধিকারানুসারে নিষ্কপটে নিজ নিজ অধ্যাপনাদি স্বধর্ম্ম, এবং কায়, বাক্য, মন, গুণ ও স্বকর্ম্মাদিদ্বারা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সেই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ভজন কর।। ১১-১৩।।

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে যে-সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহা বাল্মীকি-কর্ত্তৃক এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

হবিষ্যান্ন কাহাকে বলে

"হবিষ্যান্ন চ ভুঞ্জীত প্রযতঃ পুরুষোত্তমে।
গোধূমাঃ শালয়ঃ সর্ব্বাঃ সিতা মুদ্গা যবাস্তিলাঃ।।
কলায় কঙ্গুনী-বারা বাস্তুকং হিলমোচিকা।
আদ্রকং কাল-শাকঞ্চ মূলং কন্দঞ্চ কর্কটীম্।।
রম্ভা সৈন্ধব-সামুদ্রে লবণে দধি-সর্পিষি।
পয়োঽনুদ্ধৃত-সারঞ্চ পনসাম্র-হরিতকী।।
পিপ্পলী-জীরকঞ্চৈব নাগরং চৈব তিন্তিড়ী।
ক্রমুকং লবলী-ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবম্।।
অতৈলং-পক্কং মুনয়ো হবিষ্যং প্রবদন্তি চ।
হবিষ্য-ভোজনং নৃণামুপবাস-সমং বিদু।।"

পুরুষোত্তম-ব্রতী হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন। গোধূম্র, শালি-তণ্ডুল, মুদ্গ, যব, তিল, মটর, কাঙ্গনী-তণ্ডুল, উড়ী-তণ্ডুল, বাস্তুক-শাক, হিলমোচিকা শাক, আদ্রক, কাল-শাক, মূলক, কন্দমূল, কাঁকুড়, রম্ভা, সৈন্ধব ও সামুদ্র-লবণ, দধি, ঘৃত, অনুদ্ধৃত-দুগ্ধসার, পনস, আম্র, হরিতকী, পিপ্পলী, জীরক, শুঁঠ, তেঁতুল, ক্রমুক, আতা, আমলকী-ফল, ইক্ষুজাত চিনি, মিশ্রি, অতৈল-পক্ক ব্যঞ্জনাদি-দ্রব্য—এই সমস্ত হবিষ্যান্ন। উপবাস ও হবিষ্যান্নে একই প্রকার ফল।

পরিত্যজ্য বস্তু ও আচরণ

"সর্ব্বামিষাণি মাংসঞ্চ ক্ষৌদ্রং সৌবীরকং তথা।
রাজমাসাদিকং চৈব রাজিকা মাদকং তথা।।
দ্বিদলং তিল-তৈলঞ্চ তথান্নং শাল্য-দূষিতম্।
ভাব-দুষ্টং ক্রিয়া-দুষ্টং শব্দ-দুষ্টং বর্জ্জয়েৎ।।
পরান্নঞ্চ পরদ্রোহং পর-দার-গমং তথা।
তীর্থং বিনা প্রয়াণঞ্চ পরদেশং পরিত্যজেৎ।।
দেব-বেদ-দ্বিজানাঞ্চ গুরু-গো-ব্রতিনাং তথা।
স্ত্রী-রাজ-মহতাং নিন্দাং বর্জ্জয়েৎ পুরুষোত্তমে।।"

সর্ব্বপ্রকার মৎস্য, ও আমিষ, মাংস, মধু, কুলকর্কটী-ফল, রাই-সর্ষপ এবং সমস্ত মাদক-দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। দ্বিদল অর্থাৎ চনকাদি ডাল, তিল-তৈল, কাঁকরযুক্ত

অন্ন, ভাবদুষ্ট, ক্রিয়া-দুষ্ট ও শব্দ-দুষ্ট দ্রব্যসকল বর্জ্জন করিবে। পরান্ন-ভোজন, পরদ্রোহ, পরদার-গমন, তীর্থযাত্রা-বিনা দূরদেশ ও পরদেশ-গমন পরিত্যাগ করিবে। পুরুষোত্তম-মাসে দেবতা, বেদ, গুরু, গো, ব্রতী, স্ত্রীলোক, রাজা ও মহজ্জনের নিন্দা পরিত্যাগ করিবে।

আমিষ কাহাকে বলে

"প্রাণ্যঙ্গমামিষং চূর্ণং ফলে জম্বীরমামিষম্।
ধান্যে মসূরিকা প্রোক্তা অন্নং পর্য্যুসিতং তথা।।
অজা-গো-মহিষী-দুগ্ধাদন্য-দুগ্ধাদি-চামিষম্।
দ্বিজ-ক্রীতা রসাঃ সর্ব্বে লবণং ভূমিজং তথা।।
তাম্র-পাত্রস্থিতং গব্যং জলং চর্ম্মণি সংস্থিতম্।
আত্মার্থং পাচিতং চান্নমামিষং তদ্বুধৈঃ স্মৃতম্।।"

জন্তুর অঙ্গোদ্ভূত চূর্ণ—আমিষ, ও ফলের মধ্যে জম্বীর অর্থাৎ গোঁড়ানেবু—আমিষ। ধান্যের মধ্যে মসূরিকা ও পর্য্যুসিত অন্ন—আমিষ। অজা, গো, মহিষের দুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধই আমিষ। ব্রাহ্মণের বিক্রীত সর্ব্বপ্রকার লবণ ও ভূমিজাত লবণ, তাম্র-পাত্রস্থিত গব্য, চর্ম্মস্থিত জল ও নিজের জন্য পাচিত অন্ন—আমিষ-মধ্যে গণিত।

বর্জ্জনীয় দ্রব্যাদি

"রজস্বলাং ত্যজন্ ম্লেচ্ছ-পতিতৈর্ব্রাত্যকৈঃ সহ।
দ্বিজ-দ্বিট্ বেদ বাহ্যৈশ্চ ন বদেৎ পুরুষোত্তমে।।
এভিঃ দৃষ্টং চ কাকৈশ্চ সূতকান্নং চ যদ্ভবেৎ।
দ্বিপাচিতং চ দগ্ধান্নং নৈবাদ্যাৎ পুরুষোত্তমে।।
পলাণ্ডুং লশূনং মুস্তাং ছত্রাকং গৃঞ্জনং তথা।
নালিকং মূলকং শীঘ্রং বর্জ্জয়েৎ পুরুষোত্তমে।।
যদ্-যদ্ যো বর্জ্জয়েৎ কিঞ্চিৎ পুরুষোত্তম-তুষ্টয়ে।
তৎপুনর্ব্রাহ্মণে দত্ত্বা ভক্ষয়েৎ সর্ব্বদৈব হি।।"

রজস্বলা, ম্লেচ্ছ, পতিত, ব্রাত্য-ব্যক্তি, দ্বিজ-দ্বেষী, বেদ-বাহ্য,—এইসকলের সহিত আলাপ করিবে না। এইসকল ব্যক্তির দৃষ্ট এবং কাক-দৃষ্ট-অন্ন, সূতকান্ন, দ্বিপাচিত-অন্ন ও দগ্ধান্ন খাইবে না। পলাণ্ডু, লসুন, মুস্তা, ছত্রাক, গাজর, নালিতা, কেমুক-নামক-মূলক, শজিনা—এই সমস্ত বর্জ্জন করিবে। পুরুষোত্তম-মাস বিগত হইলে ঐ বর্জ্জিত দ্রব্যসকল ব্রাহ্মণকে দিয়া ভক্ষণ করিবে।

পুরুষোত্তম, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসত্রয়ের একই কৃত্য ও ত্রিবিধ ব্রত

"ব্রহ্মচর্য্যমধঃ শয্যাং পত্রাবল্যাঞ্চ ভোজনম্।
চতুর্থকালে ভুক্তিং চ প্রকুর্য্যাৎ পুরুষোত্তমে।।

কুর্য্যাদেতাংশ্চ নিয়মান্ ব্রতী "কার্ত্তিক-মাঘয়োঃ"।
পুণ্যেহ্নি প্রাতরুত্থায় কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ।।
গৃহ্লীয়ান্নিয়মং ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণঞ্চ হৃদি স্মরন্।
উপবাসস্য নক্তস্য চৈকভুক্তস্য ভূপতে।।
এবঞ্চ নিশ্চয়ং কৃত্বা ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ।"

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ অমৈথুন, অধঃশয্যা, পত্রাবলিতে ভোজন, চতুর্থযামে ভোজন পুরুষোত্তম-মাসে প্রশস্ত। কার্ত্তিক এবং মাঘেও এইসকল নিয়মে ব্রত করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া পৌর্ব্বাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়ে স্মরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি গ্রহণ করিবে। ব্রত তিন প্রকার অর্থাৎ উপবাস, নক্তহবিষ্যান্ন-গ্রহণ ও এক-ভোজন—ব্রতীর পক্ষে যেটী কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া এই ব্রত আচরণ করিবে।

পুরুষোত্তম-মাসে শ্রীভাগবত-শ্রবণ ও ব্রত-পালনের ফল

"শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা শ্রোতব্যং পুরুষোত্তমে।।
তৎপুণ্যং বচসা বক্তুং বিধাতা হি ন শক্নুয়াৎ।
শালগ্রামার্চ্চনং কার্য্যং মাসে শ্রীপুরুষোত্তমে।।
এতন্মাস ব্রতং রাজন্ শ্রেষ্ঠং ক্রতুশতাদপি।
ক্রতুং কৃত্বাপ্নুয়াৎ স্বর্গং গোলোকং পুরুষোত্তমে।।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ক্ষেত্রাণি সর্ব্বদেবতাঃ।
তদ্দেহে তানি তিষ্ঠন্তি যঃ কুর্য্যাৎ পুরুষোত্তমম্।।"

পুরুষোত্তম-মাসে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ শ্রবণ করিবে। ভাগবত-শ্রবণের পুণ্য বিধাতাও বলিতে পারেন না। ভক্তগণ শ্রীশালগ্রামশিলায় অর্চ্চন করিবেন। এই মাসে ব্রত, শত ক্রতু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা, ক্রতু করিয়া স্বর্গলাভ হয় ; (কিন্তু) যিনি পুরুষোত্তম-ব্রত করেন, তাঁহার দেহে সকল তীর্থ, ক্ষেত্র ও দেবতাগণ থাকেন।

দীপ-দান ও তাহার ফল

"কর্ত্তব্যং দীপ-দানঞ্চ পুরুষোত্তম-তুষ্টয়ে।
তিল-তৈলেন কর্ত্তব্যং সর্পিষা বৈভবে সতি।।
তয়োর্ম্মধ্যে ন কিঞ্চিত্তে কাননে বসতোঽধুনা।
ইঙ্গুদ্বীজেন তৈলেন দীপঃ কর্য্যস্ত্বয়ানঘ।।
যোগো জ্ঞানং তথা সাংখ্যং তন্ত্রাণি সকলান্যপি।
পুরুষোত্তম-দীপস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।।"

পুরুষোত্তম-তুষ্টির জন্য দীপ দান করা কর্ত্তব্য। বৈভব থাকিলে ঘৃত-প্রদীপ, নতুবা

তিল-তৈল-প্রদীপ দেওয়া বিধেয়। হে মণিগ্রীব! তোমার বনবাসে ঘৃত ও তিল-তৈল পাওয়া যাইবে না। তুমি ইঙ্গুদি-তৈলে দীপ দান কর। অষ্টাঙ্গ-যোগ, ব্রহ্মজ্ঞান, সাংখ্য-জ্ঞান এবং সমস্ত তান্ত্রিক-ক্রিয়া—পুরুষোত্তম-মাসে দীপদানের ষোড়শী কলারও তুল্য হয় না।

পুরুষোত্তম-মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, নবমী ও অষ্টমী তিথির বিশেষ ক্রিয়া-প্রকরণ

এই ব্রত-উদ্‌যাপন সম্বন্ধে বাল্মীকি বলিলেন,—হে মহারাজ! কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী, নবমী অথবা অষ্টমী তিথিতে পুরুষোত্তম-মাসে এই ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে হয়। বিশুদ্ধ ভক্ত-ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাহিত-মনে উদ্‌যাপন করিতে হয়। পঞ্চ-ধ্যানের দ্বারা অতিসুন্দর সর্ব্বতোভদ্র রচনা করিবে। চারিটী কলস মণ্ডলোপরি স্থাপনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে চতুর্ব্ব্যূহ-প্রীতি-কামনায় শ্রীফলান্বিত করিবে। সদ্বস্ত্র-বেষ্টিত পানদ্বারা চতুর্ব্ব্যূহ স্থাপন করিবে। **শ্রীরাধা-মাধবকে কলসের সহিত স্থাপন করিবে। বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ বৈষ্ণবাচার্য্যকে বরণ করিবে।** চতুর্ব্ব্যূহ জপ করিয়া—চতুর্দ্দিকে চারিটী দীপ প্রজ্জ্বলিত করিবে।

অর্ঘ্য-মন্ত্র ও নমস্কার-মন্ত্র

ক্রমে শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত সপত্নীক নারিকেলাদি অর্ঘ্য দান করিবে। **অর্ঘ্য-মন্ত্র,—**

"দেব দেব নমস্তুভ্যং পুরাণ-পুরুষোত্তম।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিত হরে।।"

এই মন্ত্র বলিয়া **নমস্কার** করিবে,—

"বন্দে নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
পীতাম্বরধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম্।।"

নীরাজন, ধ্যান ও পুষ্পাঞ্জলি-মন্ত্র

তদন্তরে তিল-হোম করিয়া নীরাজন করিবে। **নীরাজন-মন্ত্র** এই,—

"নিরাজয়ামি দেবেশমিন্দীবর-দলচ্ছবিম্।
রাধিকা-রমণ প্রেম্‌ণা কোটি-কন্দর্প-সুন্দরম্।।"

অথ **ধ্যান মন্ত্র,—**

"অঙ্গজ্যোর্তিরনন্ত-রত্ন-রচিতে সিংহাসনে সংস্থিতম্।
বংশীনাদ-বিমোহিত-ব্রজবধূ বৃন্দাবনে সুন্দরম্।।
ধ্যায়েদ্ রাধিকয়া সকৌস্তুভমণি-প্রদ্যোতিতোরস্থলম্।
বাজদ্‌রত্ন-কিরীট-কুণ্ডলধরং প্রত্যগ্র-পীতাম্বরম্।।"

ধ্যান করিয়া **পুষ্পাঞ্জলি** অর্পণ করিবে ও এই মন্ত্রে নমস্কার করিবে,—

"নৌমি নবঘন-শ্যামং পীতবাসসমচ্যুতম্।
শ্রীবৎস-ভাসিতোরস্কং রাধিকা-সহিতং হরিম্।।"

ব্রতের শেষ-কৃত্য ও নিয়ম-ভঙ্গের বিধি

পরে ভক্ত-ব্রাহ্মণে পূর্ণপাত্র দান করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে দান করিবে। এই সময়ে উপযুক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে ভাগবত দান করিবার বিধি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকে সংপুটিত কাংস্য-পাত্র দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত-পায়স ভোজন করাইবে। পরে সকলকে অন্ন বিভাগ করিয়া দিয়া স্বজনের সহিত ভোজন করিবে। উদ্‌যাপন করিয়া ব্রত-নিয়ম পরিত্যাগ করিবে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

****

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭২ পৃষ্ঠার পর]

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।।"

ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া—তিনশক্তি। ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তিরূপে পরিণত হয়। প্রাকৃত জগতে উদাহরণরূপে একটী নিধি আছে। তাহার নাম চিন্তামণি (Alchemist stone) তত্ত্বসাগরে উল্লিখিত হ'য়েছে,—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।।"

রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা কাঁসাও সোণায় পরিণত হয়। চিন্তামণির স্পর্শে প্রাকৃত জগতের ধাতুগুলি সুবর্ণে পরিণত হয়, তথাপি তাহার কোনপ্রকার ক্ষয়াদি বিকার নাই। সেইপ্রকার অচিন্ত্যশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ নিজে কোনরূপ বিকার লাভ না করে অন্য বস্তুকে বিকৃত ক'রছেন। বস্তুর বিকার নহে, শক্তির বিকারে পরিবর্ত্তনীয় নানাবিধ বস্তু। জগতে যদি এমন বস্তু থাকে যে নিজে বিকৃত না হ'য়েও অপর বস্তুকে বিকৃত কর্‌তে পারে, তবে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের যে ঐ ধর্ম্ম থাক্‌বে তা'তে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? অনেকে বিপরীত পক্ষ ক'রে বলেন যে, প্রাকৃতজগতে চিন্তামণি নামে কোন পদার্থ ঐরূপ শক্তিমান্ নাই, উহা কাল্পনিকমাত্র। যদি ঘটনা তাহাও হয়, তথাপি অচিন্ত্যশক্তিশালী ভগবানে কেন থাকবে না?

কর্‌তে পারে, তবে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের যে ঐ ধর্ম্ম থাক্‌বে তা'তে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? অনেকে বিপরীত পক্ষ ক'রে বলেন যে, প্রাকৃতজগতে চিন্তামণি নামে কোন পদার্থ ঐরূপ শক্তিমান্ নাই, উহা কাল্পনিকমাত্র। যদি ঘটনা তাহাও হয়, তথাপি অচিন্ত্যশক্তিশালী ভগবানে কেন থাকবে না?

শঙ্কর উপনিষদ্ হ'তে চারিটীমাত্র বাক্যকে মহাবাক্যরূপে স্থাপন ক'রেছেন,—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো, সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" এখন জিজ্ঞাস্য, বেদের অপর বাক্যগুলি মহাবাক্য নহে কেন? প্রণবই ঈশ্বরের স্বরূপ, সুতরাং তাহাই মহাবাক্য, যেহেতু তাহা হ'তে সমগ্র বেদ জাত। প্রণব সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের উদ্দেশ করে। 'তত্ত্বমসি' বেদের একাংশবাক্য মাত্র। কেবল নিজ কার্য্যসিদ্ধির জন্য ইহাকে মহাবাক্য বলা হল কি? যুগপৎ সিদ্ধ বস্তুগুলির একাংশ নিয়ে বিচার কর্‌বার অধিকার কা'র আছে? অভিধা—মুখ্যবৃত্তি, লক্ষণা—গৌণবৃত্তি। সমস্ত বেদান্তেই ভগবৎপদার্থ লক্ষ্য হইয়াছে। Denotation—মুখ্যবৃত্তি, Connotation—গৌণবৃত্তি। লক্ষণার আশ্রয়ে বিচার ক'রে মুখ্যবৃত্তির আচ্ছাদন করাটা কেবল গৌণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হ'য়ে করা। বেদবাক্যের প্রমাণ করতে অন্য প্রমাণের অবাশ্যকতা নাই। ইনি স্বতঃপ্রমাণ-শিরোমণি। কিন্তু গৌণবৃত্তি কর্‌তে গেলে ঐ বেদের স্বতঃপ্রমাণতা থাকে না, অন্য প্রমাণসাপেক্ষ্য হ'য়ে পড়ে। প্রণব মুখ্যার্থে ভগবদ্বোধক, সবিশেষধর্ম্ম-বিশিষ্ট। পরমেশ পুরুষোত্তম। তদীয় নিষ্ঠা অধিষ্ঠান বাদ দিয়ে নিঃশক্তিক ব্রহ্মবাদ স্থাপন কর্‌তে গৌণপথে অনেক বিতণ্ডা ক'রে কাল্পনিক অর্থ স্থাপন ক'রতে হ'য়েছে।

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।।"

ভগবদ্বস্তু সবিশেষ, নির্ব্বিশিষ্ট বস্তু পৃথক্। মহাপ্রভু বেদান্তের প্রত্যেক অধিকরণ থেকে পঞ্চাঙ্গন্যায়দ্বারা মায়াবাদের ভুল দেখিয়ে দিলেন। মায়াবাদি-শাখা ও তত্ত্ববাদ-শাখায় ব্যাখ্যা-ভেদ আছে। তত্ত্ববাদে মুখ্যার্থ গ্রহণ ক'রে সমস্ত সূত্রে বিষ্ণুর পারতম্য ব্যাখ্যাত ও স্থাপিত হ'য়েছে। কিন্তু মায়াবদিগণ গৌণার্থ অবলম্বন ক'রে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রেছেন। মাধ্বভাষ্য ও রামানুজ-ভাষ্যাদির প্রচার উত্তর ভারতে ছিল না। প্রভু প্রত্যেক অধিকরণ মুখ্যার্থে ব্যাখ্যা ক'রে সূত্রার্থে কৃষ্ণপরতা প্রমাণ ক'রে দিলেন। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মধাম হ'তে পার্থক্য স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং পৃথক্ অবস্থান করেন। ভগবানের বাসস্থান ও ভগবান্ পৃথক্। ধামদর্শন ও ভগবদ্দর্শন স্বতন্ত্র। তথাপি একই জিনিষ বিভিন্ন শক্তি দৃষ্ট হ'চ্ছে। ধাম কিরণ বা আশ্রয়। কিরণমালী ও কিরণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। ধামের চিদ্‌গুণ ও ধামাধিপের অন্যপ্রকার চিদ্‌গুণ। পরতত্ত্ব পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত। অবরতাদি দোষগুলি—মায়াগন্ধগুলি তদীয় স্বরূপের ঐশ্বর্য্যে নাই। ইহজগতের ঐশ্বর্য্য তদীয় মায়াশক্তিদ্বারা নিরূপিত। সকল বেদেই ভগবানের সহিত প্রত্যেক বস্তুর সম্বন্ধ প্রদর্শিত

হ'য়েছে। জড়জগতের সম্বন্ধ ক্ষণভঙ্গুর। ভগবত্তায় যে ঈশ্বরতা আছে তাহাতে মায়াগন্ধ নাই। এদেশে আমরা যে-সব ঐশ্বর্য্য পাই, তাহা মাপা যায়, কিন্তু চিৎস্বরূপের ঐশ্বর্য্য নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ ও মুক্ত। যাহা স্বরূপ নহে তাহার ঐশ্বর্য্যে অবরতা, হেয়তা, অনুপাদেয়তা আছে। ভগবানের সহিত প্রত্যেক বেদ্যবস্তুর সম্বন্ধ আছে। ব্রহ্ম নিঃশক্তিক বলিলে চিচ্ছক্তিরও শূন্যতা বুঝায়। জগৎটা অচিচ্ছক্তির পরিণতি। মায়াবাদীরা ভগবানের চেতনশক্তি মানে না। ক্রিয়াহীনের চেতনার পরিচয় কিরূপে আসে? ইচ্ছাহীন যিনি তিনি নির্ব্বিশেষ। শ্রুতি ব'লেছেন,—

"পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।।"

"তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি তা মানি।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি।।"

ভগবানের নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ দুইটী অবস্থা। মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ অবস্থা মানিলেন, কিন্তু সবিশেষতত্ত্বটী মানিলেন না কেন? ইহাতে যে কিছু উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তাহা সামান্য বুদ্ধিমানই বুঝ্‌তে পারেন। তাঁ'র পরা ও অপরা, চিৎ ও অচিৎ দুই শক্তি যুগপৎ বর্ত্তমান থেকে তাঁর লীলা প্রকাশিত ক'রছে। অচিৎপরিণত জগৎ থেকে চিৎপরিণত বৈকুণ্ঠে তুমি যে'তে অসমর্থ ব'লে স্বরূপের অর্দ্ধ মানিতেছ, অপরার্দ্ধ মানিতেছ না। বিমুখমোহনের জন্য ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায় আর কি হ'তে পারে?

'ভগবান্ প্রাপ্তিহেতু যে করি' উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের সহায়।।'

ভগবদ্বস্তু-প্রাপ্তির অভিধেয়-বিচারে নবধা ভক্তির অধিষ্ঠান। (ক্রমশঃ)

❑❑❑

শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসলীলা সম্বন্ধে বিকৃত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮১ পৃষ্ঠার পর]

রসনির্য্যাস আস্বাদনের জন্য সাক্ষাৎ অবতারী কৃষ্ণের সম্বন্ধে কথিত হইতে পারে না। এই পরকীয়া যেখানে একমাত্র ব্রজধামে শ্রীরাধা এবং তদীয় কায়ব্যূহ স্বরূপিণী চিন্ময়ী গোপীগণের সঙ্গে লীলা পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা, সেখানেই ইহা সুরস। অন্যত্র সর্ব্বত্রই অনিত্যের হেয়তা সংস্পর্শে কুরস সৃষ্টি করিয়া থাকে। নিত্য বিষয়বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—মধুর রসের আশ্রয়বিগ্রহ গোপীগণের ভোক্তৃস্বরূপে অবস্থিত হইবার যোগ্য। বদ্ধজীবের ন্যায় তাহাদের কোন অচিৎ-সুলভ দোষের কথা নাই অর্থাৎ প্রপঞ্চে নিত্যবশ্যতত্ত্ব আশ্রয়জাতীয় জীবগণ আপনাদিগকে

পুরুষ বা ভোক্তাভিমানে যে স্ত্রীলোকের বা প্রকৃতির সঙ্গ করে, তাহাই দূষণীয়। কিন্তু যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের মূল পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত যে লীলা করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রাপঞ্চিক হেয়ত্বের বা অবৈধ ব্যবহারের কোনই সম্ভাবনা নাই। এই লীলায় অতিক্ষুদ্র মায়োপাধিক বিবাহবিধির স্থান নাই। শ্রীকৃষ্ণ অসমোর্দ্ধ ও মাধুর্য্যের মূর্ত্তবিগ্রহ। শ্রীরাধাও তেমনই মহাভাব ও মহাপ্রেমের দিব্য ছবি। উভয়ের মিলনে উন্নতোজ্জ্বল রসের অনির্ব্বচনীয় শোভা। গোপীপ্রধানা গোলোকেশ্বরী শ্রীরাধাঠাকুরাণী সেই গোবিন্দের নিত্য স্বরূপশক্তি, তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের পরদারাভিগমনের কোন প্রশ্নই উঠে না। ভগবানের ডাকে সাড়া দিতে হইলে সংসারবন্ধন শিথিল করিয়া বাহির হইতে হয়, ইহাই পরকীয়া অভিসার। মুনিগণও যে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহারাও রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা দর্শন করিয়া করযোড়ে স্তব করিতে করিতে আনন্দপ্রকাশ করেন। আচরণ ত' দূরের কথা, অধিকারী ব্যতীত অন্য কেহই অতি উন্নত রাসলীলার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ করিলে ধ্বংস অনিবার্য্য। প্রাকৃত কবি, লেখক, সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটারের পরিচালকগণ ও প্রযোজকগণই বর্ত্তমানযুগের যুবক-যুবতীদের সুপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া কুৎসিৎ ভালবাসায় অর্থাৎ গোপন অভিসারের নিম্নস্তরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। প্রাকৃত কবিকণ্ঠে অপ্রাকৃত জগতের রাসলীলার নায়ক-নায়িকা রাধাকৃষ্ণকে প্রাকৃত জগতের নায়ক-নায়িকার স্তরে সীমাবদ্ধ করিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছেন। পুরুষোত্তমবাবুর উচিত সেইসকল প্রাকৃত কবিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, যাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাধাকৃষ্ণের রাসীলাকে লইয়া কেহ ছিনিমিনি খেলিতে ভবিষ্যতে সাহস না পায়।

পুরুষোত্তম বাবু লিখিয়াছেন,—"ঠাকুর ও গুরুজনের এমন সৎব্যবহার দেখানো দরকার যাহাতে জনসাধারণ তাহা অনুকরণ করিবার উৎসাহ পাইয়া সৎপথে চলিতে পারে।" তিনি 'অনুকরণ' ও 'অনুসরণ'-শব্দ দুইটীর মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য আছে, তাহা জানেন না। অনুকরণের অপর নামই 'ঢং'। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ অনুকরণ করিলে জীবের ধ্বংস অনিবার্য্য। জীবের আচরণ কিরূপ হইবে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরূপে আসিয়া তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ এক অঙ্গুষ্ঠদ্বারা সাতদিন যাবৎ গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন, দাবানল পান করিয়াছিলেন, দ্বারকায় ষোড়শসহস্র মহিষীর ঘরে ষোড়শসহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, রাসক্রীড়ায় অনেক মূর্ত্তি হইয়া গোপিকাগণের সঙ্গে লীলা করিয়াছিলেন—ইহা কি বদ্ধজীব কখনও অনুকরণ করিতে সক্ষম হইবে? স্বয়ং শিবঠাকুর সমুদ্রোত্থিত বিষ কৃষ্ণের আদেশে কণ্ঠে ধারণ করিয়া 'নীলকণ্ঠ' নাম ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শিব ছাড়া অন্য কোন বদ্ধজীব কণ্ঠে বিষধারণ করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। পরম বৈষ্ণব শিব কখনও গাঁজা, ভাং প্রভৃতির নেশায় আসক্ত নহেন। দক্ষ প্রজাপতি শিবকে

গাঁজাখোর, ভাংখোর প্রভৃতি বলিয়া নিন্দা করায় ছাগমুণ্ড প্রাপ্ত হয়, ইহা ত' কাহারও অজানা নহে। সেই শিবঠাকুরও বংশীবটে সুন্দরী গোপীবেশ ধারণপূর্ব্বক রাসলীলাতে প্রবেশ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু বিজাতীয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শিবকে রাসলীলায় প্রবেশের অধিকার দেন নাই। এমন কি, স্বয়ং লক্ষ্মীঠাকুরও বেলবনে কঠোর তপস্যা করা সত্ত্বেও রাসলীলায় প্রবেশের অধিকার লাভ করেন নাই।

পুরুষোত্তম বাবু 'রাধা'নামের ব্যাপারেও লিখিয়াছেন,—"সমস্ত মহাভারত ও ভাগবতে রাধার কোন নাম উল্লেখ নাই। কৃষ্ণ অতি বাল্যকালে বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়াছিলেন, আর কোনদিন সেখানে ফিরিয়া আসেন নাই। অতএব কখন তিনি রাধাসহ গোপীগণের সঙ্গে রাসলীলা করিলেন? শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রামো হরে রামো রামো রামো হরে হরে।।' এই মহামন্ত্র জপ করিতেন, তাহাতেও ত' রাধার নাম উল্লেখ নাই।" কিন্তু রাধা-নামের ব্যাপারে সন্দিহান হইবোর কোন কারণ নাই। মহাভারত হইতেছে পঞ্চমবেদ। 'রাধা' নামের মহিমা যে বেদে রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। বেদ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ বেদব্যাসের দ্বারাই জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। বেদব্যাস বেদ ও বিভিন্ন পুরাণাদিতে 'রাধা' নামের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভাগবতগ্রন্থ তত্ত্বশাস্ত্র হইয়াও রসসমুদ্র। রসিকলোকের বিচারে রসতত্ত্ব সকলই তাহাতে আছে। শ্রীরাধানাম ও সকল গোপীগণের ভাব ও পরিচয় ভাগবতে গূঢ়রূপে আছে। অনধিকারী ব্যক্তিকে দূরে রাখিবার জন্য গূঢ়রূপে ঐ সকল কথা শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন। শ্রীভাগবত গ্রন্থ সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি, নিগমশাস্ত্রের ফলস্বরূপ। ভাবুক বা রসিক ব্যতীত আর কেহই ভাগবতরস পানের অধিকারী নন। 'বরিষ্ঠাং সর্ব্বযোষিতাং" অর্থাৎ সকল কৃষ্ণযোষিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠা—শুকদেবের এই উক্তির দ্বারা ভাগবতে যে গোপীশিরোমণি রাধিকাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। ভজন-রহস্য যেখানে-সেখানে হাটে-বাজারে খুলিয়া দেখান ভজনবিজ্ঞের কর্ত্তব্য নহে। যাহা ভজন-রহস্যের পরাকাষ্ঠা, সেই আশ্রয়বিগ্রহ রাধার নাম শ্রীভাগবত রহস্যের সম্পুটে সংরক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ভাগবতে রাধার নাম নাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জাগতিক সাধারণ ব্যক্তি ত' দূরের কথা, যাহাদের চিত্ত ভগবানের ঐশ্বর্য্যরসে আবদ্ধ, তাঁহারাও পরমরস চমৎকারী মাধুর্য্যসীমা শ্রীরাধার নাম ভাগবতে দেখিতে পাইবেন না।

শ্রীকৃষ্ণ অতি বাল্যকালে কখনও বৃন্দাবন ত্যাগ করেন নাই। তিনি কৈশোরাবস্থাতেই রাধাসহ গোপীদের সঙ্গে বৃন্দাবনে রাসলীলা করিয়াছিলেন। গোলোক ও ভৌমবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা হইতেছেন নিত্য কিশোর-কিশোরী। নিত্য কিশোর কৃষ্ণের বয়স ১৫ বৎসর ৯ মাস ৭ দিন এবং নিত্য কিশোরী রাধার বয়স ১৪ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন। নিত্য কিশোর ও নিত্য কিশোরী অবস্থাতেই রাধাকৃষ্ণ নিত্যকাল বৃন্দাবনে রাসলীলা

করেন। 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রে 'রাম' এর পরিবর্ত্তে পুরুষোত্তমবাবু 'রামো' লিখিয়াছেন। এই 'রামো' নাম মূল মহামন্ত্রে নাই। 'হরা'-শব্দের সম্বোধন পদ 'হরে'। শাস্ত্র 'হরা'-শব্দে রাধিকাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিতে সক্ষম হন নাই।

রাধাপ্রেমে নিখিলব্রহ্মাণ্ডনাথ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ বশীভূত। উহা নিত্যসত্য, পরমহংসকুলচূড়ামণিগণের পরম আরাধ্য। উদ্ধবের ন্যায় পরমভাগবতও এই গোপীপ্রধানা শ্রীরাধাদিসহ গোপীপদরেণু প্রার্থনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—'আসামহো চরণরেণু'। অপ্রাকৃত চিন্ময়ভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে সুপবিত্র শ্রীরাধার নাম লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে গুঞ্জরিত। এখানে আকাশে-বাতাসে, নদী কলতানে, পাখীর কলতানে, ভ্রমরের গুঞ্জনে—সর্ব্বত্রই 'শ্রীরাধে' ধ্বনিতে মুখরিত। এখানে যাবতীয় সেবাকার্য্যের সাঙ্কেতিক শব্দ 'জয় রাধে'। প্রেমভক্তির জননী রাধারাণীর নামগ্রহণ ব্যতীত কোন সেবাপূজা ভজনাদি সুসম্পন্ন হয় না। শয়নে-স্বপনে, নিদ্রা-জাগরণে রাধানামই ধামবাসিগণের জপমালা। এমন কি, শ্যামসুন্দরের জিহ্বাগ্রে রাধিকা নাম। শ্রীরাধার প্রেম অসমোর্দ্ধ। রাধার প্রেম-ঋণ শোধ করিবার জন্য কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ হইলেন, তথাপি আজও ঋণ শোধ হয় নাই, হইবেও না কোনদিন। প্রেম নিবেদনের ক্ষেত্রে রাধারাণীর প্রেমের উৎকর্ষতা, প্রেমের গাঢ়তা, প্রেমের মহিমা ও প্রেমের মাধুর্য্য অত্যধিক। সকল আরাধনার উর্দ্ধে রাধার আরাধনা। সকল আরাধনার সারাৎসার শ্রীরাধাপদদাস্যে। শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে শ্রীরাধার আনুগত্য অপরিহার্য্য। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নামই আমার কীর্ত্তনীয়, শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহই আমার দর্শনীয়, শ্রীরাধাকৃষ্ণের যশঃগাথাই আমার শ্রবণীয়, শ্রীরাধাকৃষ্ণ আমার স্মরণীয়, শ্রীরাধাকৃষ্ণ আমার একমাত্র আরাধ্য হউক—ইহাই পরিশেষে পরমকরুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রার্থনা করি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

****

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৫ পৃষ্ঠার পর]

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন,—"হরিদাস! তুমি আমাকে দর্শন কর। আমার নিজ দেহ অপেক্ষাও তুমি আমার অতি প্রিয়—জানিও। পাপিষ্ঠ যবনগণ তোমাকে এক কষ্ট দিয়াছে—তাহা স্মরণ করিয়া এখনও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তোমাকে যখন দুষ্টগণ বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিয়াছিল, তখন আমি বৈকুণ্ঠ হইতে চক্র হস্তে লইয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহাদের মঙ্গলের চিন্তা করিবার জন্য আমার চক্র বিফল হইয়া ফিরিয়া যায়। তাহাদিগকে আর মারিতে

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ শ্রাবণ, ১৪০৮ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০১

পারি নাই। তখন আমি স্বয়ং তোমার পৃষ্ঠে অবস্থান করিয়া আমি নিজেই বেত্রাঘাত খাইয়াছি। এই চিহ্ন দেখ। এই বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বেত্রাঘাতের চিহ্ন দেখাইলেন। প্রভুমুখে এই কথা শুনিয়া হরিদাস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আর বাহ্যজ্ঞান নাই। প্রভু তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া তাঁহার নিজস্বরূপ প্রদর্শন করাইলেন। সেই রূপ দর্শন করিয়া হরিদাস ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরে মহা আবেশ হইল। তিনি মহাপ্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি প্রভুর দাসের দাস হইবার প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার ভক্তগৃহের কুকুর করিয়া রাখুন—এই বর প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—"হরিদাস! তোমার সঙ্গে একদিনও যাহার বাস করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, অথবা অতি অল্প সময়ও তুমি যাহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছ, সে অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি সর্ব্বদাই তোমার শরীরে বিরাজ করিতেছি। তোমার প্রতি যাহার শ্রদ্ধা আছে, সে আমাকেই শ্রদ্ধা করে। তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব। আমি তোমাকে অপরাধশূন্য শুদ্ধা ভক্তি বর দান করিলাম।" মহাপ্রভুর হরিদাস ঠাকুরের প্রতি এই বরদান শ্রবণ করিয়া ভক্তমণ্ডলী সহর্ষে জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন। ঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবতে বলিয়াছেন,—

"কেহ বলে,—চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস।
কেহ বলে,—প্রহ্লাদের যেন পরকাশ।।"

জীবের কল্যাণের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাস ঠাকুরকে নাম প্রচারের আদেশ করিয়াছিলেন।

"শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস ।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা।।
ইহা বই আর না বলিবা বলাইবা।
দিবা অবসানে আসি আমারে কহিবা।।"

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ভজনপথের পথপ্রদর্শক। তিনি জীবের কুচিন্তাকারী মনকে সংযত করাইয়া থাকেন এবং তাহাদের যাবতীয় দুর্গতি দূরীভূত করাইয়া ভজনময় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এমনকি, নিত্যানন্দ প্রভু জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিবার জন্য হরিদাস ঠাকুরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন,—"হরিদাস! জগাই-মাধাইর দুর্গতি দেখ! ইহাদের নিস্তারের কোন উপায় দেখিতেছি না। তোমাকে যবনগণ প্রাণান্ত করিয়া মারিয়াছিল, তথাপি তুমি তাহাদের কল্যাণচিন্তা করিয়াছিলে। সুতরাং তুমি যদি এই দুইজনের কল্যাণ কামনা কর, তবেই ইহাদের উদ্ধার হয়। নতুবা ইহাদের উদ্ধারের কোন উপায় নাই।" শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার ভক্তগণের

নিকট শতমুখ হইয়া হরিদাস ঠাকুরের গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সুতরাং এমনই নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মহিমা।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর গৃহত্যাগ করিয়া বেনাপোলের বনের মধ্যে নির্জ্জনে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ভজন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ তুলসীর সেবা এবং তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। তাঁহার এইপ্রকার ভজনাদর্শ দেখিয়া গ্রামস্থ সকলেই পূজ্যজ্ঞানে তৎপ্রতি শ্রদ্ধাশীল হইলেন। সেই দেশের অধ্যক্ষ ছিল রামচন্দ্র খান। সে মহাপাষণ্ড ও বৈষ্ণববিদ্বেষী ছিল। হরিদাসকে সকলে সম্মান করে, পূজ্যজ্ঞান করে—ইহা সে সহ্য করিতে পারিল না। তাঁহাকে কি-প্রকারে অপমান করা যায়, তজ্জন্য সে খুব সচেষ্ট হইয়া উঠিল। সে বেশ্যাগণকে ডাকিয়া আনিয়া বৈরাগী হরিদাসের বৈরাগ্য নাশ করিবার জন্য বলিলে বেশ্যাগণের মধ্যে একটী সুন্দরী যুবতী বেশ্যা তিনদিনের মধ্যে হরিদাসের মন হরণ করিবে বলিয়া কথা দিল।

সেই বেশ্যা সুন্দরভাবে সাজসজ্জা করিয়া রাত্রিকালে হরিদাসের ভজনকুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে প্রথমে তুলসীকে প্রণাম করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে প্রণাম করিল এবং সুমধুরস্বরে কহিতে লাগিল,—"বাঃ ঠাকুর! তোমার কি অপরূপ পরম সুন্দর রূপ। তোমায় দেখিয়া আমি ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িয়াছি। তুমি আমাকে অঙ্গীকার না করিলে আমি আর এ জীবন রাখিব না।" হরিদাস ঠাকুর তাহার এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—"আমি তোমাকে নিশ্চয়ই অঙ্গীকার করিব। কিন্তু শোন, আমি নিয়ম করিয়াছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সংখ্যানাম কীর্ত্তন সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ তুমি এখানে বসিয়া নামকীর্ত্তন শ্রবণ কর। নাম সমাপ্ত হইলেই তোমার মনোবাঞ্ছা আমি পূরণ করিব।" এই বলিয়া তিনি নাম করিতে লাগিলেন। বেশ্যা দূরে বসিয়া নাম শ্রবণ করিতে লাগিল। নামকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভাত হইয়া গেল। প্রাতঃকাল হইল দেখিয়া বেশ্যা সেদিন ফিরিয়া গেল এবং রামচন্দ্র খানকে বলিল,—"হরিদাস আমায় সঙ্গদান করিবে বলিয়াছে, চিন্তা নাই।" দ্বিতীয়দিন রাত্রিতে পুনরায় সে হরিদাসের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিদাস তাহাকে বলিলেন,—"গতকল্য তুমি দুঃখ পাইয়াছ। কি করিব, নামসংখ্যা পূরণ হইল না। আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না। আজ অবশ্য তোমাকে অঙ্গীকার করিয়া তোমার ইচ্ছা পূরণ করিব। আমি নামসঙ্কীর্ত্তন করিতেছি। তুমি শ্রবণ কর। নাম পূর্ণ হইলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" তখন সেই বেশ্যা তুলসীকে প্রণাম করিয়া দ্বারে বসিয়া ঠাকুরের শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ করিতে লাগিল। হরিনাম শুনিতে শুনিতে সেদিনও রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সে অস্থির হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া ঠাকুর তাহাকে বলিলেন,—"আমি একমাসে কোটি নামযজ্ঞ করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছি এবং তাহা প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম—আজই নাম-যজ্ঞ শেষ হইবে। কিন্তু সমস্ত রাত্রি নাম লইয়াও শেষ

হইল না। আগামীকল্য নিশ্চয়ই নাম-যজ্ঞ শেষ হইবে। তখন স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে মিলিত হইতে পারিব ও তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করিব।" বেশ্যা অগত্যা সেদিন ফিরিয়া গেল এবং রামচন্দ্র খানকে সমূহ বলিল এবং তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল যে, সে নিশ্চয়ই কার্য্যে সফল হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সময়মত সে ঠাকুরের নিকট আসিল এবং তুলসীকে ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া দ্বারে বসিল। ঠাকুরের শ্রীমুখে নাম শ্রবণ করিতে করিতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। হরিদাস ঠাকুরের দুর্ল্লভ সঙ্গপ্রভাবে বেশ্যার মন ফিরিয়া গেল। সে ঠাকুরের চরণে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া গেল এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল,—"প্রভো! আমি বড় অপরাধিনী। রামচন্দ্র খাঁনের কথাতেই আমি আপনাকে ভ্রষ্ট করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। সারাজীবন আমি কতই না পাপ করিয়াছি। প্রভো! আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার করুন। আর আমার কোন উপায় নাই।" হরিদাস ঠাকুর বলিলেন,—"উঠ! আমি সবই জানি। অজ্ঞ, মূর্খের ব্যবহারে আমার কোন দুঃখ নাই। সেইদিনই আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতাম, কিন্তু কেবল তোমার জন্যই তিনদিন আমাকে এখানে থাকিতে হইল।" বেশ্যা ঠাকুরের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার কি কর্ত্তব্য এবং কি উপায়ে তাহার যাবতীয় ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন,—"তোমার গৃহের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া দাও এবং এই কুটীরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ কর। এখানে তুলসীর সেবা করিও এবং নিরন্তর নামকীর্ত্তন করিও। ইহাতেই শীঘ্রই তুমি কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিতে পারিবে।" এই বলিয়া তাহাকে নাম উপদেশ দিয়া ঠাকুর হরি হরি বলিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। সেই বেশ্যা তাঁহার গুরুদেব হরিদাসের আজ্ঞায় গৃহে সঞ্চিত যাহা কিছু সামগ্রী ছিল তৎসমস্তই ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া দিলেন এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়া এক বস্ত্রে সেই ঘরে প্রত্যহ দিবারাত্রি তিনলক্ষ নাম করিতে লাগিলেন। উপবাসী থাকিয়া তুলসীর সেবা করিতে লাগিলেন এবং নামভজনে সিদ্ধি লাভ করিলেন। তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইল। তিনি প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী পরম মহান্তী হইলেন। সকল প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তাঁহার দর্শনের জন্য আসিতে লাগিলেন। বেশ্যার এইপ্রকার উদ্ধারলাভ ও সাধুচরিত্র দেখিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বেশ্যাকে উদ্ধার করিয়া বেনাপোল হইতে সপ্তগ্রামের অন্তর্গত চাঁদপুরে শ্রীবলরাম আচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলরাম আচার্য্য সপ্তগ্রামের অধিপতি হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদারের পুরোহিত ছিলেন। তিনি যখন চাঁদপুরে বলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তখন শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর বাল্যাবস্থা। তিনি হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন করিতে গেলেন। ঠাকুর তাঁহার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিলেন। সেই কৃপাই রঘুনাথের চৈতন্যপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ হইয়াছিল।

একদিন বলরাম আচার্য্য হরিদাস ঠাকুরকে মজুমদারের সভায় লইয়া গেলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে বহু সম্মান করিয়া সভায় বসাইলেন। তাঁহারা দুই ভাই মহাপণ্ডিত ছিলেন। সেই সভায় বহু ব্রাহ্মণ, সজ্জন, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল। হরিদাসের নামভজনের কথা সকলেই বিদিত ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী নামতত্ত্বের বিচার বা নাম-মহিমার কথা উঠাইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—নাম হইতে জীবের পাপ ক্ষয় হয় এবং মোক্ষলাভ হয়। ইহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন,—না, না, নামের কিন্তু এই দুইটী ফল নয়। নামের ফলে কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। মুক্তি ও পাপনাশ কেবল নামের আনুষঙ্গিক ফল। যেমন সূর্য্যের উদয় না হইতে হইতেই অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়, চোর, প্রেত, রাক্ষসাদির ভয় নাশ হইয়া যায়, সেইপ্রকার নামোদয়েই পাপাদি সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়। এমন কি, নামাভাস হইতে মুক্তি অনায়াসে লভ্য হইয়া থাকে। কৃষ্ণ সেই মুক্তি দিতে চাহিলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না।

সেই সভায় গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। হরিদাসের কথিত নামাভাসে মুক্তি হয় শুনিয়া সে আর সহ্য করিতে পারিল না। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাগতকণ্ঠে হরিদাসের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক পণ্ডিত সমাজের নিকট বলিল,—"দেখিতেছি হরিদাস একজন ভাবুকমাত্র। ইহার কোন শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত জ্ঞান নাই। কোটি কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি পাওয়া যায় না। আর এই ভাবুক বলিতেছে কিনা, নামাভাসমাত্রেই মুক্তিলাভ হইবে।" হরিদাস ঠাকুর তাহার এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"কেন আপনি ইহাতে সংশয় করিতেছেন? শাস্ত্রে নামাভাসেই মুক্তির কথা বলিয়াছেন। অজামিল তাহার প্রমাণ। ভক্তির নিকট মুক্তি অতীব তুচ্ছ। তজ্জন্যই ভক্তগণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। শাস্ত্রে দেখা যায়,—

"ত্বৎ সাক্ষাৎ করণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধি স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মণ্যপি জগদ্‌গুরো।।"

(হরিভক্তিসুধোদয় ১৪।৩৬)

হে জগদ্‌গুরো! আমি তোমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আহ্লাদরূপ বিশুদ্ধ সমুদ্রে অবস্থিতি লাভ করিতেছি। আর সমস্ত সুখ আমার নিকট গোষ্পদ-স্বরূপ বোধ হইতেছে। গোষ্পদে অর্থাৎ গরুর পদচিহ্নে যে গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে জল থাকে, তাহা সমুদ্রে তুলনায় অতি ক্ষুদ্র।"

ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া গোপাল চক্রবর্ত্তী ক্ষিপ্ত হইয়া বলিল,—"নামাভাসে কোনদিন মুক্তি সম্ভব নয়—ইহা সুনিশ্চয় কথা।" হরিদাস বলিলেন,—"নিশ্চয়ই নামাভাসে মুক্তি হইবে। যদি নামাভাসে মুক্তি না হয়, তাহা হইলে আমি আমার নাক

কাটিয়া দিব।" ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিলেন। মজুমদার গোপালকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন। বলরাম আচার্য্য তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—"তুই মহামূর্খ। তুই ভক্তির মহিমা কি-প্রকারে জানবি? হরিদাস ঠাকুরকে তুই এইরূপ অপমান করলি, তোর সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। তোর কল্যাণের কোন আশা নাই। সভার সকলেই ঠাকুরের পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে অদোষদর্শী ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—"আপনাদের আর ইহাতে কি দোষ আছে। এই ব্রাহ্মণ অজ্ঞ। ইহার মন তর্কনিষ্ঠ। নাম-মাহাত্ম্য তর্কের দ্বারা উপলব্ধি হয় না। তার্কিক এই ব্রাহ্মণ কি করিয়া তত্ত্বকথা জানিতে পারিবে। আমি কিছু মনে করি নাই। আমার সম্বন্ধে আপনাদের কোন দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। আপনারা গৃহে যান। কৃষ্ণ আপনাদের মঙ্গল করুন।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

☆☆☆☆

বিগ্রহ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯২ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীগৌরসুন্দর রায় রামানন্দের নিকট নিজের স্বরূপত্ব ও রাধাভাবদ্যুতিময়ত্বের উদ্দেশ্যাদি অকপটে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

"গৌর অঙ্গ নহে, মোর—রাধাঙ্গস্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন।।
তাঁরে ভাবে ভাবিত করি' আত্ম-মন।
তবে নিজ-মাধুর্য্য করি আস্বাদন।।" (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৮৬-২৮৭)

গৌরসুন্দর বলিতেছেন,—আমার অঙ্গ প্রকৃতপক্ষে গৌরবর্ণ নহে। তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি অঙ্গদ্বারা আমার প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আছেন বলিয়া তাঁহার গৌরবর্ণ অঙ্গকান্তিতে আমার দেহ গৌরবর্ণ ধারণ করিয়াছে। আমি সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, যাহার ব্যতীত আর কাহাকেও শ্রীরাধা স্পর্শ করেন না। সুতরাং শ্রীরাধার স্পর্শনই প্রমাণ করে আমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। আমি শ্রীরাধার কেবল কান্তি গ্রহণ করি নাই, তাঁহার ভাবও গ্রহণ করিয়াছি। তাই তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া স্বমাধুর্য্যরস আস্বাদন করিতেছি।

ভক্তের উপাস্য ও সেবাভেদে আরাধ্যবস্তুর মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যভেদ ঃ—

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে এক বিগ্রহে অনন্ত বৈচিত্রী ধারণ করেন। একরূপে তিনি বহুরূপী, আবার বহুমূর্ত্তিতে তিনি একমূর্ত্তি। "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্।"

(ভাঃ ১০।৪০।৭)। ভগবৎস্বরূপ বিভিন্ন। সকল ভাবের অবস্থিতি শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব স্বরূপে অর্থাৎ তাঁহার বিগ্রহে। আবার সকল ভাবের মূর্ত্তরূপ ভগবৎস্বরূপ তাঁহার বিগ্রহে বিরাজমান।

"এক ঈশ্বর—ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ।।" (চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৫৬)

বিভিন্ন ভক্তের ভাব বিভিন্ন প্রকার। তাই তাঁহাদের উপাসনা ও উপাস্যবস্তু বিভিন্ন। যিনি কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁহার উপাসনা কৃষ্ণের প্রতি। যিনি নারায়ণের সেবা করেন, তিনি নারায়ণের ধ্যান করেন। কেহবা শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করেন। আবার কেহবা শ্রীনৃসিংহদেবের পূজারী। কিন্তু এক ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার একই দেহে কৃষ্ণভক্তকে কৃষ্ণরূপে, নারায়ণভক্তকে নারায়ণরূপে, রামভক্তকে রামচন্দ্ররূপে ও নৃসিংহভক্তকে নৃসিংহরূপে দর্শন দিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ এক ও অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। সেই এক ভগবানের একই দেহেই অনন্ত বৈচিত্রীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপ রাম-নারায়ণ-নৃসিংহ প্রভৃতি ভগবৎস্বরূপসমূহ অবস্থিত। এক ও অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ মুরলীধর বিগ্রহ। এক বিগ্রহেই তিনি নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি বিগ্রহ দেখান, পৃথক্ কোন বিগ্রহে নহে। যেহেতু তিনি অনন্ত রসবৈচিত্রীর আধার, সেহেতু তাঁহার পক্ষেই একই বিগ্রহে নানাপ্রকার রূপ প্রদর্শন করা সম্ভব।

'পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে।।
নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার, যত আছে আর।।
সবে আসি' কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১০-১২)

যে কালে পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, সেইকালে তাঁহার বিগ্রহে সকল অবতার আসিয়া মিলিত হন। সকল ভগবৎস্বরূপই শ্রীকৃষ্ণের অংশ। নারায়ণ চতুর্ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ; মৎস্যাদ্যবতার অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম্মাদি লীলাবতার ; যুগমন্বন্তরাবতার অর্থাৎ যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার সকলই কৃষ্ণের অঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার অংশাদি-খণ্ডরূপ ভগবদবতারসকল আশ্রয় করিয়া থাকেন।

"হে ভূমন! ক্রোড়ীকৃতানন্তমূর্ত্ত্যাত্মক শ্রীমূর্ত্ত্যে! অয়ং ভাবঃ—একমপি মুখ্যং ভগবদ্রূপং যুগপদনন্তরূপাত্মকং ভবতি। ★★ ততো যদা যাদৃশং যেষামুপাসনাফলোদয়-ভূমিকাবস্থানং, তদা তথৈব তে পশ্যন্তি। ★★ দৃষ্টান্তশ্চ যথৈকমেব পট্টবস্ত্রবিশেষ-পিঞ্ছাবয়ব বিশেষাদিদ্রব্যং নানাবর্ণময় প্রধানৈকবর্ণমপি কুতশ্চিৎ স্থানবিশেষাদ্ দত্ত-

চক্ষুষো জনস্য কেনাপি বর্ণবিশেষেণ প্রতিভাতীতি। অত্রাখণ্ডপট্টবস্ত্রবিশেষাদি-স্থানীয়ং নিজপ্রধানভাসান্ত-ভাবিততত্ত্বদ্রূপান্তরং শ্রীকৃষ্ণরূপং তত্তদ্বর্ণচ্ছবিস্থানীয়ানি রূপান্তরানীতি জ্ঞেয়ম্।"

"হে ভূমন! আপনার শ্রীমূর্ত্তিতে অনন্তমূর্ত্তি ক্রোড়ীকৃত। ভাবার্থ এইপ্রকার, যথা—শ্রীভগবানের একটী মাত্র মুখ্যরূপ একই কালে অনন্তরূপাত্মক হইয়া থাকে। ★★ অতএব যাঁহারা যখন যে-প্রকার উপাসনার ফলোদয় ভূমিকায় অবস্থিত, তখন তাঁহারা সেইরূপই দেখিয়া থাকেন। ★★ এস্থলে দৃষ্টান্ত—একমাত্র পট্টবস্ত্র বিশেষ ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় অবয়ববিশেষাদিদ্রব্যে রঞ্জিত নানাবর্ণ হইয়াও প্রধানতঃ এক (ময়ূরকণ্ঠি) বর্ণই, তথাপি উহা স্থানবিশেষ হইতে দৃষ্টিপাতকারী লোকের চক্ষুতে বর্ণবিশেষ বলিয়া প্রতিভাত হয়। এক্ষেত্রে নিজপ্রধান দীপ্তির অন্তর্ভূত ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিলক্ষিত। শ্রীকৃষ্ণরূপ অখণ্ড পট্টবস্ত্র বিশেষের স্থানীয় (অর্থাৎ উহা তাঁহার রূপের উপমাস্থল), আর তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপকে সেই সেই বর্ণস্থানীয় বলিয়া জানিতে হইবে।" (ভগবৎসন্দর্ভ ৪০)

"মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ।। (শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

মণি যেমন বিভাগক্রমে নীলপীত প্রভৃতি বর্ণযুক্ত হইয়া বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তদ্রূপ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানভেদহেতু বিভিন্নরূপে প্রকটিত হন। এখানে মণি অর্থাৎ বৈদুর্য্যমণি, নীলপীতাদি যাহার গুণ। এই মণি বিভিন্ন বর্ণে পরিদৃষ্ট হয়। একদিক হইতে দেখিলে পীতবর্ণ দেখায়, অন্যদিক হইতে দেখিলে নীলবর্ণ দেখায়। অর্থাৎ স্থান-কাল-দিক ভেদে বৈদুর্য্যমণির বর্ণ ভেদরূপে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বৈদুর্য্যমণি সকল সময়ে একই থাকে। তদ্রূপ ধ্যানভেদে, ভাবভেদে, উপাস্যবস্তুভেদে বিভিন্ন ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেন। অথচ শ্রীকৃষ্ণ একই থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ লীলাময়। ব্রজে, দ্বারকায় ও পরব্যোমে তিনি লীলা করেন। শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র লীলার সহায়ক হইলেন শ্রীরাধা। তিনি কান্তাভাবেই শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করেন। এ কারণে তাঁহাকেও বহুরূপে আত্মপ্রকট করিতে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত ভগবৎস্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণকে অনন্ত কান্তারস আস্বাদন করাইবার জন্য শ্রীরাধাও অনন্ত কান্তারূপ ধারণ করিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ—রসামৃতসিন্ধু, শ্রীরাধা—অখণ্ডরসবল্লভা। ব্রজে, দ্বারকায় ও পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণ এক এক রূপে লীলা করিয়াছেন। শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই রূপের কান্তারূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করিয়াছেন। আবার একই ধামেও তিনি নিজকে বহুমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। যেমন, ব্রজে ললিতা, বিশাখাদি গোপনারীগণ শ্রীরাধারই প্রকাশ। কেবলমাত্র তাহাই নহে, দ্বারকায় ও মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের কান্তা মহিষীগণও শ্রীরাধার প্রকাশ। সুতরাং শ্রীরাধিকা হইতেই সকল কান্তাগণের বিস্তার অর্থাৎ আবির্ভাব।

"কৃষ্ণ-নারায়ণ, যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী-লক্ষ্মী-ভেদ নাহি হয় একরূপ।।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ।
গোপী-লক্ষ্মী-ভেদ নাহি, জানিহ 'স্বরূপ'।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৫৩-১৫৪)

শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ শ্রীনারায়ণ। সে-কারণে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণের মধ্যে ভেদরহিত। তাঁহারা স্বরূপতঃ এক। তদ্রূপ শ্রীলক্ষ্মী ও গোপী অর্থাৎ শ্রীরাধার মধ্যে কোন ভেদ নাই। স্বরূপতঃ তাঁহারা এক। শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে যেমন শ্রীনারায়ণরূপে বিরাজমান, তদ্রূপ গোপী শ্রীরাধাও বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের বক্ষলগ্না কান্তা লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতেছেন। আবার নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ অংশ, শ্রীকৃষ্ণ অংশী। তেমনই শ্রীলক্ষ্মীও শ্রীরাধার বিলাসরূপ অংশ, শ্রীরাধা অংশিনী। মূল কান্তাশক্তি শ্রীরাধা মাধুর্য্যস্বরূপে গোপীদেহে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদন করেন এবং ঐশ্বর্য্যদেহে লক্ষ্মীরূপে নারায়ণের সঙ্গাস্বাদন করেন। শ্রীরাধাই বৈকুণ্ঠে শ্রীলক্ষ্মীরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। সুতরাং মূল কান্তাশক্তি শ্রীরাধা ব্রজে সখী-মঞ্জরীরূপে, দ্বারকায়-মথুরায় মহিষীরূপে এবং বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীরূপে একই বিগ্রহে নানাকার রূপ ধারণ করিয়াছেন।

"অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি।
সর্ব্ব অবতার-লীলা করি' সবারে দেখাই।।"

(চৈঃ চঃ আঃ. ৫।১৩৩)

পূর্ণতম স্বয়ং ভগাবন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। সুতরাং তাঁহার মধ্যে সকল ভগবৎস্বরূপই বিদ্যমান। তাই তিনি সকল ভগবৎস্বরূপের লীলা তাঁহার শ্রীগৌরবিগ্রহদ্বারা দর্শন করাইয়াছেন। নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, বরাহ, মৎস্য, শিব, লক্ষ্মী, ভগবতী প্রভৃতি সকল ভগবৎ-স্বরূপে লীলা নিজের চৈতন্যবিগ্রহদ্বারা প্রকট করিয়াছেন।

যে ভক্ত যে মন্ত্রে তাঁহার ইষ্টকে ধ্যান করিয়াছেন, সেই ভক্ত শ্রীগৌরবিগ্রহে তাঁহার ইষ্টকে দর্শন করিয়াছেন। এক গৌরবিগ্রহ ; কিন্তু এক গৌর বিগ্রহে বিভিন্ন ভক্ত বিভিন্ন মূর্ত্তি দর্শন করেন। ভক্তবৎসল ভগবান্। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" গীতার (৪।১১) এই শ্লোকের প্রকাশকল্পে শ্রীগৌরসুন্দর বিভিন্ন ভক্তের নিকট নানাকাররূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।

"বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন।
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৮।৬০)

"কৃষ্ণ-শুক্ল-বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুইজন চতুর্ভুজ, দুই দিগম্বর।।

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শ্রীহল-মুষল।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ দেখে মকর-কুণ্ডল।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৮।৬৪-৬৫)

একদিবস শচীমাতার গৃহে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু ভোজন করিতে বসিলেন। ভোজনের দৃশ্যটী যেন কৌশল্যার গৃহে সাক্ষাৎ রাম ও লক্ষ্মণ একত্র বসিয়া ভোজন করিতেছেন। শচীমাতা দেখিলেন কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণময় পাঁচ বৎসরের দুইটী দিগম্বর শিশুকে। একটীর বক্ষে কৌস্তুভ, অপরটীর হস্তে হল-মুষল। শচীমাতা গৌর-নিতাই-এর অঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামের চিহ্নাদি দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।

"দেখে বীরাসনে বসি' আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-ধর।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২।২৬০)

সারারাত্রিব্যাপী কীর্ত্তনে নিদ্রাসুখভঙ্গ হেতু পাষণ্ডিগণের ক্রোধ প্রকাশ। বিশেষ করিয়া শ্রীবাসের বিরুদ্ধে ক্রোধভরে রাজরোষরূপ জনরব প্রচারে তাহারা প্রমত্ত হইয়া উঠিলে মহাপ্রভু নৃসিংহার্চ্চনরত শ্রীবাসের গৃহে গমন করিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী স্বীয় চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য্যময় নারায়ণ মূর্ত্তি দর্শন দিয়া শ্রীবাসকে কৃপাশ্বাস-বাণী প্রদান করিয়াছিলেন। **(ক্রমশঃ)**

—শ্রীভবতারণ দাসাধিকারী

ব্যর্থতা

(১)

কবি যদি কাব্যে তাঁ'র না করে বর্ণন,
অচ্যুতের গুণগাথা চিত্ত রসায়ন।
গোবিন্দ-বিশ্রামস্থলী সাধুর হৃদয়,
ভক্ত-হৃদি বৃন্দাবনে হরি বিরাজয়।
কাব্যে যদি নাহি থাকে বৈষ্ণব-বন্দন,
বৃথা, বৃথা, বৃথা সেই কাব্যানুশীলন।।

(২)

কর্ম্মিগণ নিরবধি জগতের তরে,
নিজে কর্ম্মকর্ত্তা ভাবি' করম আচরে ;
মুকুন্দ-সেবন-যজ্ঞে না করে যতন,
তাঁহার প্রীতির লাগি' নাহিক সাধন।

ভক্তিহীন কর্ম্মরাজি নিতান্ত অসার,
ব্যর্থতা আনিয়া দেয়—বৃথা অহঙ্কার।।

(৩)

জ্ঞানদৃপ্ত নরকুল ভক্তিরে ত্যজিয়া,
অজ্ঞান-তিমিরে সদা চলিছে ধাইয়া ;
যে জ্ঞানের দ্বারা নহে উপাসিত হরি,
সে' তুচ্ছ জ্ঞানের মূল্য নয় কাণাকড়ি।
জ্ঞান যবে আনুগত্য করে ভক্তিসনে,
তখনি সংযোগ হয় মণি ও কাঞ্চনে।।

(৪)

যত ধন আছে হেথা—মালিক মাধব,
তাঁহার পূজায় যদি না লাগে এ সব ;
অর্থরাশি হয় শুধু অনর্থের মূল,
বিস্মৃতি আনিতে কিছু নয় এর ভুল।
কনক সার্থক হয় মাধব-সেবনে।
অন্যথা জড়ীয় ভোগে বাঁধে নরগণে।।

(৫)

জীবনের যত চেষ্টা—সহস্র সাধনা,
ভক্তি অনুকূল যদি লভয়ে চেতনা ;
তবেই সার্থক হয় শত অনুষ্ঠান,
নহিলে ব্যর্থতা ভরা সকল বিধান।
যাহা কিছু—সব কাজ ভক্তি-অনুকূলে,—
সলিল সিঞ্চিত হয় মহীরুহ-মূলে।।

(৬)

বিদ্যা, ধন, কুল, মান, সৌন্দর্য্য অপার,
না লাগিলে কৃষ্ণ ভোগে কিবা মূল্য তা'র?
জয়দৃপ্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কার যত,
রোষভরে বিশ্ব ধ্বংসে হ'তেছে উদ্যত।
মনীষিগণের যত শ্রেষ্ঠ অবদান,
কৃষ্ণার্থে নিযুক্ত হ'লে লভে যোগ্যস্থান।।

(৭)

সকলের স্বার্থগতি শ্রীশ্যামসুন্দর,
স্বার্থ হয় পরমার্থ ; উদ্যম নিকর,

যদি কৃষ্ণসেবা-লক্ষ্যে হয় প্রধাবিত,
অপূর্ব্ব সাফল্যরত্নে জীবন ভূষিত।
একই উদ্যম যদি অন্য লক্ষ্য ধরে,
বিপুল ব্যর্থতা স্তূপ আবাহন করে।।

****

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৮ পৃষ্ঠার পর]

যথা,—

আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক-শাস্ত্র কৈল।। (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৮০)

সুতরাং শ্রীশঙ্করাচার্য্য-রচিত শাস্ত্র-ভাষ্যসকল শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত বাণী অনুসারে নাস্তিকতায় কলুষিত বলে প্রতিপন্ন হয়।

সৃষ্টির আদিতে শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদের আবির্ভাব করান। বেদ ব্রহ্মার হৃদয়ে আবির্ভূত হওয়ার পর শ্রীবেদব্যাসের হৃদয়কে দ্বার করতে জগতে প্রকাশিত হন। "বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুম" (ভাঃ ৬।১।৪০) "বেদ নারায়ণ হতে নিশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে আবির্ভূত হন বলে তাহা সাক্ষাৎ নারায়ণ, স্বয়ম্ভূ ও স্বপ্রকাশবস্তু। সেই বেদার্থ স্পষ্টীকৃত করাবার জন্যই ইতিহাস ও পুরাণাদির আবির্ভাব।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শ্রীশঙ্কর গুরু ব্যাসকে ভ্রান্ত বলেছেন, কিন্তু ব্যাসদেব হতেই বেদাদি শাস্ত্র প্রকটিত হন। ব্যাসদেব ভ্রান্ত হলে তাঁর মন, বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তিও স্বাভাবিকভাবে ভ্রমাত্মক হয়ে পড়ে। শ্রীনারায়ণ হতে শ্রীব্রহ্মা, শ্রীব্রহ্মা হতে শ্রীনারদ, শ্রীনারদ হতে শ্রীব্যাস—এইরূপ ক্রমপন্থায় শ্রীব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের বীজস্বরূপ "চতুঃশ্লোকী" প্রাপ্ত হন। শ্রীব্যাসদেব ভ্রান্ত হলে তাঁর ভ্রমাত্মক মন, বুদ্ধি ও স্মৃতিপটে আবির্ভূত বেদ-ভাগবতাদি শাস্ত্রসমূহ ভ্রান্তিপূর্ণ হয়ে পড়ে। কিন্তু শাস্ত্র ত' ব্রহ্মের শাব্দিক অবতার। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেছেন,—"ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা"। 'জগৎ মিথ্যা'—কথাটি বিবর্ত্ত হতে উদিত হয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন,—"জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয়" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭৩)। এক্ষণে যেহেতু ব্রহ্ম সত্য, সেইহেতু ব্রহ্মের শাব্দিক অবতার শাস্ত্রও সত্য হয়ে যায়। শাস্ত্র যে ভগবন্মূর্ত্তি, তাহা শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলেছেন,—"শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমাভে শাশ্বতী তনু" (ভাঃ ৬।১৬।৫১) অর্থাৎ "শব্দব্রহ্ম বেদ এবং পরম ব্রহ্ম এ জগতের প্রকাশক ও কারণরূপে প্রসিদ্ধ হলেও উভয়ই আমার সনাতন মূর্ত্তি।"

বেদাদি শাস্ত্র সত্য হলে শাস্ত্রের স্মর্ত্তা ব্যাসদেব সত্য অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ শ্রাবণ, ১৪০৮ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০১

অতএব শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে জগদ্‌গুরু ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলা নাস্তিকতা। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (১৬।২৪) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন,—"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।" অর্থাৎ কার্য্য ও অকার্য্যের ব্যবস্থা-বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। শাস্ত্র ভ্রান্ত হলে উক্ত ভগবদ্বাক্যও ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১।৭।১৩২) শ্রীমহাপ্রভু বলেছেন,—"স্বতঃ প্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি।" বেদ স্বতঃপ্রমাণ, বেদ প্রমাণ করতে অন্য কোন শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। বেদ স্বয়ং প্রকাশিত বাস্তব সত্য (Self revealed Truth)। সুতরাং নিরপেক্ষ শব্দপ্রমাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই শব্দপ্রমাণ ভ্রান্ত হলে কোথায় অভ্রান্ত সত্য খুঁজে পাওয়া যাবে? শাস্ত্র অভ্রান্ত সত্য না হলে শাস্ত্রের উপদেশ কে শুনবে, আর কেই বা বিশ্বাস করে শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করবে? ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-চতুষ্টয় বিবর্জ্জিত ত্রিকালজ্ঞ মুনি-ঋষিগণ শাস্ত্রের বক্তা এবং স্বয়ং ভগবানেরও উপদেশ শাস্ত্রের মধ্যে উল্লিখিত আছে। তাই শাস্ত্র ভ্রান্ত হতে পারে না, পরন্তু শাস্ত্রই ব্রহ্ম-বিষয়ে একমাত্র বক্তা।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-বিরচিত 'তত্ত্বমুক্তাবলী'-গ্রন্থের ২৯-৩০ শ্লোক এস্থলে আলোচনীয় ;—

"বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং প্রমেয়মাস্তে খলু তত্র তত্র ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদস্ততস্তদ্বিষয়ী করোতি।।
সত্যং ত্বসত্যপি জ্ঞানমর্থে শব্দঃ করোতি হি।
কিমুত ব্রহ্মনীশানে সচরাচর-কর্ত্তরি।।"

অর্থাৎ—"বেদসকল ও স্মৃতিসকল প্রমাণমধ্যে পরিগণিত। সেই সকল শাস্ত্রে প্রমেয় বস্তুর অর্থাৎ যাহা প্রমাণ করতে হবে, সেই ব্রহ্ম বস্তুর নিশ্চিতরূপে উক্তি হয়েছে। 'সর্ব্ব বেদদ্বারা আমিই বেদ্য'—এই সিদ্ধ শাস্ত্র-বাক্য এ বিষয়ে প্রমাণ-স্বরূপ; অতএব বেদই একমাত্র ব্রহ্ম-বিষয়ে বক্তা হচ্ছেন।"

"মায়াবাদরূপ অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা বিষয়কে শব্দদ্বারা যখন ব্যক্ত করা হতে পারে, তখন সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট চরাচরের কর্ত্তা ব্রহ্মকে শব্দ কেন সংস্থাপন করতে পারবে না?"

শ্রীশঙ্করাচার্য্য গুরু ব্যাসদেবের বাক্যে দোষ দিয়ে ও তদ্বাক্য অস্বীকার করে শাস্ত্রের নবীন-পথপ্রদর্শক ও উপদেষ্টারূপে নিজেকে প্রচার করত শুদ্ধভক্তিপথ হতে ভগবদিচ্ছায় নিজেকে যেমন দূরে সরিয়ে রেখেছেন, তেমনই তাঁর মতাদর্শে আকৃষ্ট জনগণ শুদ্ধভক্তিপথ হতে অবশ্যই চিরতরে বিচ্যুত হবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই।

শঙ্করাচার্য্য তাঁর বৌদ্ধমতপ্রবণ পরমগুরু গৌড়পাদের বৌদ্ধমতকেই অনুসরণ করে মায়াবাদের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে প্রয়াসী হয়েও গৌড়পাদের 'মাণ্ডুক্যোপনিষৎ'-কারিকায় নিজ পরমগুরুর লেখনীর কিছু অংশ স্বমতে ব্যাখ্যা করেন। আচার্য্য শঙ্কর তাঁর পরমগুরুদেবের প্রতি আনুকূল্যভাব প্রদর্শন না করে তদ্বিপরীতভাবে তাঁর লেখনীর

দোষ দর্শন করেন। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব পরমব্রহ্মের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রমুখ মায়াবাদিগণ স্বীকার করেন না। বেদ-বাক্যের অর্থ-নিরূপণে যেরূপ লক্ষণা অবলম্বন না করে একমাত্র অভিধাবৃত্তি অবলম্বন করাই সমুচিত, তদ্রূপ সদ্‌গুরুদেবের আদেশ ও উপদেশ-বাক্যে এবং লেখনীতে লক্ষণাবৃত্তিমূলা টীকা-টিপ্পনী না করে "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া"—এই শাস্ত্র-বাক্য অনুসরণ করে চলাই বিঘসাশী শিষ্যের একান্ত কর্ত্তব্য। 'অনুগতিরেব সিদ্ধিঃ'—এই শাস্ত্রবাণী বিঘসাশী শিষ্যমাত্রেই মান্য করে থাকেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য গুরুদেবের প্রতি তদনুরূপ অনুকূল আচরণ করেন নাই। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবর তাঁর "মায়াবাদের জীবনী" গ্রন্থে লিখেছেন,—"শঙ্করমতে গুরু যখন ব্রহ্মজ্ঞানশূন্য অবিদ্যাগ্রস্থ, অর্থাৎ অনবগত মূর্খ, তখন গুরুর দোষ দর্শনে আর আপত্তি কি? যে গুরুকে শাস্ত্রে "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈঃ" বলে বর্ণন করেন, তাঁকে শঙ্কর বলেন,—'অনবগতৌ ব্রহ্মাত্মভাবং স্যাৎ।' (অজ্ঞানবোধিনী)।" আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদীয় শিক্ষাধারায় গুরুকে উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও নিন্দা করা হয়ে থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হতে জানা যায়,—ভগবান্ কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ, বেদান্ত-ভাষ্য 'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রভৃতি শাস্ত্র প্রকাশ করে সেই শাস্ত্ররূপে, শাস্ত্রার্থ-প্রদর্শক গুরুদেবরূপে এবং চৈত্ত্যগুরু (অন্তর্যামী)-রূপে উদিত হয়ে মায়ামুগ্ধ জীবের হৃদয়ে 'আমার প্রভু' বা 'আমার পরিত্রাতা'—এইরূপ জ্ঞান প্রকাশ করত নিজ তত্ত্ব অবগত করান। যথা,—

শাস্ত্র-গুরু-আত্মা-রূপে আপনারে জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা—জীবের হয় জ্ঞান।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৩)

কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের মতে গুরুদেব ভ্রান্ত, গুরুদেব-কৃত শাস্ত্রের ভাষ্য ভ্রান্ত এবং ব্রহ্ম ভ্রান্ত বলে বিবেচিত হওয়ায় সেই ভ্রান্তিপূর্ণ গুরু, শাস্ত্র ও ব্রহ্ম (অন্তর্যামী) মায়ামুগ্ধ জীবের হৃদয়ে উদিত হলে সত্যিকারের নিরুপাধিক বাস্তব ভগবদ্‌জ্ঞান প্রকাশিত হতে পারে কি? বরং তৎপরিবর্ত্তে জীবের হৃদয়ে অবাস্তব মায়িক উপাধিযুক্ত জ্ঞান তথা অজ্ঞানই প্রকাশিত হবে।

শিবজী স্বরূপতঃ পরম বৈষ্ণব হয়েও তমোগুণাবিষ্ট হয়ে মায়াসম্বন্ধযুক্ত ও মায়াশক্তির সঙ্গী। তিনি বিষ্ণুর ন্যায় ত্রিগুণাতীত স্বতন্ত্র পরমেশ্বর তত্ত্ব নন। তমো-গুণে ভ্রমাদি দোষসমূহ লক্ষিত হয়। শিব ও বিষ্ণুর পার্থক্য নির্ণয়ে শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত যুক্তি :—

শিব—মায়াশক্তিসঙ্গী, তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু—পরমেশ।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩১১)

ব্যবহারতঃ শিব ঈশ্বরকোটি হয়েও সর্ব্বদা গুণমায়া-মিলিত,—

শিবঃ শক্তিযুক্তঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেতাহং ত্রিধা।। (ভাঃ ১০।৮৮।৩)

অর্থাৎ—"বৈকারিক, তৈজস ও তামস—এই তিনপ্রকার অহঙ্কারদ্বারা সংবৃত এবং সর্ব্বদা মায়াশক্তিযুক্ত তত্ত্বই 'শিব'।"

শিব (শঙ্কর) সর্ব্বদা মায়াশক্তির সঙ্গে মিলিত থাকায় মায়িক অহঙ্কারসমূহে আবিষ্ট থাকেন এবং সাত্বত ভাগবতধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়ে যাতে মায়ার ধর্ম্ম বিপুলভাবে প্রচারিত হয়, তজ্জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট থাকেন। সাত্বত-সনাতন ভাগবত ধর্ম্মের পরাজয় ও মায়ার ধর্ম্ম তথা আচার্য্য শঙ্করের প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদের (মায়াবাদের) বিজয় হলেই শিবের বাসনা চরিতার্থ হয়। তমোগুণের রঙ্গীন চশমা আচার্য্যশঙ্করের দৃষ্টিপথে আবরণ সৃষ্টি করায় সেই রঙ্গীন চশমার মাধ্যমে তিনি ত্রিগুণাতীত গুরু ব্যাসদেবের যথার্থ স্বরূপ দেখতে না পেয়ে নিজে তমোগুণাবিষ্ট ভ্রমাদি দোষে দূষিত অবস্থায় গুরু ব্যাসদেবকে ভ্রমাদি-দোষ সংযুক্তরূপে দর্শন করেছেন। আচার্য্য শঙ্কর তমোগুণের প্রভাব হতে মুক্ত থাকলে গুরু ব্যাসদেবের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে অসুবিধা হত না। শিবজী সর্ব্বদা গুণমায়ায় মিলিত থাকায় বহির্ম্মুখ জীবগণকে মায়িকগুণে অভিভূত করে ভগবানকে ভুলিয়ে মায়িক কারাগারে আবদ্ধ রাখতে পারবেন জেনে শ্রীভগবান্ নিজ অনুগত দাস শ্রীশিবজীকে কল্পিতশাস্ত্র মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত প্রচারার্থ আদেশ করেন। ভগবানের নিত্য ভগবৎস্বরূপকে আবৃত করে ও গোপন করে অসুর মোহনার্থ মায়াবাদরূপ অসচ্ছাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচার করা শিবজীর অভিপ্রেত না হলেও তিনি ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারেন নাই। তাই তিনি শঙ্করাচার্য্যরূপে বিবর্ত্ত বা মিথ্যাবাদের আশ্রয়ে কল্পিত মত প্রচার করলেও ভগবৎপাদপদ্মে দোষী বা অপরাধী হন না।

শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদের প্রচারক হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ-চরণে অপরাধী না হলেও তাঁর মত ও পথ অনুসরণকারিগণ তথা মায়াবাদিগণ অবশ্যই অপরাধী হবেন। উদাহরণ-স্বরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-প্রসঙ্গে জানা যায়,—এক মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কাশীবাসী এক-দণ্ডী শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের মুখে কৃষ্ণনাম না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁকে বলেছিলেন,—মায়াবাদী—সেবা-বিবাদী বা অপরাধী হওয়ায় তাঁর মুখে প্রকৃতি-সম্বন্ধি গৌণ নামোচ্চারণেই যোগ্যতা থাকে, তুরীয় বৈকুণ্ঠ-নামোচ্চারণে যোগ্যতা হয় না, সেজন্য তাঁর মুখে কৃষ্ণনাম আসে না। যথা,—

"প্রভু কহে,—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' কহে নিরবধি।।
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।

'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুই ত' সমান।।
'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন এক রূপ।
তিনে ভেদ নাহি,—তিন 'চিদানন্দ-রূপ'।।
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম—নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ'।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১২৯-১৩২)

উক্ত পয়ারের 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে' শ্রীশ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় লিখেছেন,—"প্রভু বললেন,—মায়াবাদী জীবতত্ত্বকে 'অপ্রাকৃত' না মেনে মায়াচ্ছন্ন ব্রহ্মখণ্ডকে 'জীব' বলে স্থির করে এবং ব্রহ্মকে 'নির্ব্বিশেষ' জেনে (সচ্চিদানন্দ) ভগবদ্বিগ্রহকেও 'মায়াময়-বিগ্রহ' বলে। ইহাতেই মায়াবাদী কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকে 'অনিত্য' জেনে মহা-অপরাধী হয়েছে। কৃষ্ণের 'মুখ্যনাম' পরিত্যাগ করে 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' ইত্যাদি 'গৌরনাম'সকল উচ্চারণ করে থাকে ; যদিও বা কখনও 'গোবিন্দ', 'মাধব', 'কৃষ্ণ' এই মুখ্য নামসকল তার মুখে বাহির হয়, তথাপি তার জ্ঞানদোষে (কৃষ্ণনামকে অবিশ্বাসবশতঃ অন্যান্য প্রাকৃত বা জাগতিক শব্দবিশেষ বলে জ্ঞানহেতু তার মুখে) চিদ্বিগ্রহ কৃষ্ণের 'নাম' কখনই (বাহির) হয় না। বস্তুতঃ কৃষ্ণের নাম ও কৃষ্ণের স্বরূপ—দুইই চিদ্বস্তু অর্থাৎ নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ—তিনই চিদানন্দময়। বদ্ধজীবের দেহটী—জীবরূপ 'দেহী' হতে পৃথক্ এবং তার পিতৃদত্ত 'নাম' ও তার 'আত্মা' বা 'স্বরূপ' হতে 'পৃথক্ ও জড়াশ্রিত' ; কিন্তু কৃষ্ণে সেরূপ নয়, অর্থাৎ কৃষ্ণের যিনি 'দেহ' তিনিই 'দেহী', তিনি 'নাম', তিনিই 'নামী'। কৃষ্ণে মায়া বা মায়াপ্রসূত জড় সম্বন্ধ না থাকায় 'দেহ-দেহী' বা 'নাম-নামী'র মধ্যে ভেদ অসম্ভব ; বদ্ধজীবের পক্ষেই দেহ-দেহী বা নাম-নামীর (মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান) অর্থাৎ জীবেই 'নাম', 'দেহ' ও 'স্বরূপে'র পরস্পর পৃথক্ ধর্ম্ম বিদ্যমান।'

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বজীব-জীবন পরমাত্মা। কৃষ্ণের পরমাত্মত্ব জ্ঞানের অভাব হেতু মায়াবাদিগণের কৃষ্ণপ্রীতি-রাহিত্য দেখা যায়। কৃষ্ণই যে সর্ব্বজীব-হৃদয়ে অন্তর্যামী বা পরমাত্মারূপে অধিষ্ঠিত, তাহা তিনি স্বয়ংই অর্জ্জুনকে বলেছেন,—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।। (গীতা ১০।২০)

অর্থাৎ—"হে গুড়াকেশ (বিজিতনিদ্র অর্জ্জুন)! আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী বা পরমাত্মা, আমিই সকল জীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণ।"

জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে কৃষ্ণের অংশ পরমাত্মা বিরাজিত ;—

"অতএব পরমাত্মা—সবার জীবন।
সেই পরমাত্মা—এই শ্রীনন্দনন্দন।।" (চৈঃ ভাঃ আঃ ৭।৫৫)

"আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়।।
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ২।১৮-১৯)

গীতার ১৬শ অধ্যায়ে জগন্মিথ্যাত্ববাদিগণকে 'অসুর' বলা হয়েছে। মায়াবাদিগণ জগৎকে মিথ্যা বলেন, সেইহেতু তারা অসুর-শ্রেণীভুক্ত। অসুর-স্বভাবে জীবের অনাদি অপ্রারব্ধ অপরাধই পরমাত্ম-কৃষ্ণ-বিদ্বেষের কারণ ; যথা,—

'কংসাদিহ আত্মা কৃষ্ণে তবে হিংসে কেনে?'
পূর্ব্ব অপরাধ আছে তাহার কারণে।। (চৈঃ ভাঃ আঃ ৭।৫৮)

জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবর 'মায়াবাদের জীবনী" গ্রন্থটীতে 'কংস' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই—কংস ও প্রলম্বাসুর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও মায়াবাদী নাস্তিক। কৃষ্ণ ও বলদেব তাদের বিনাশ করে তদ্যুগীয় জীবসমূহকে নাস্তিক্য মায়াবাদের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

❋❋❋❋

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

স্থান—গৌহাটী, তাং—১৩/৪/১৯৯০

শ্রীভগবানের বাণীরূপ বিগ্রহ শাস্ত্র এবং এই শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদ বিভাগ করেছেন, বেদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ উপনিষদাদি প্রণয়ন করেছেন, বেদান্ত দর্শন বা উত্তর মীমাংসা প্রকাশ করছেন, মহাভারত রচনা করেছেন, অষ্টাদশ পুরাণাদিও তিনি রচনা করেছেন। এসব করেও তিনি মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না। মানসিক অশান্তি নিয়ে বসেছিলেন তিনি। সেইসময় শম্যাপ্রাস বদরিকাশ্রমে তাঁর গুরু নারদঋষি উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে তাঁকে চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁর গুরু নারদঋষির নিকট থেকে সেই চতুঃশ্লোকী ভাগবত শ্রবণ করে সমাধিযোগে বসলেন। তারপর তিনি সেই পূর্ণপুরুষ, লীলাপুরুষোত্তম ভগবানকে দর্শন পান—সর্ব্বশক্তিসমন্বিত-তত্ত্ব, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি যে ভগবান্ তাঁর দর্শন পেলেন। একাধারে তিনি ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব সবই অনুভব করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের স্বপ্নসমাধিতে যে তত্ত্বদর্শন লাভ হয়েছে, সেইটাই

তিনি প্রকাশ করছেন এই ভাগবতে। তারই প্রথম কথা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন—তত্ত্বদর্শন সম্বন্ধে ভগবান্‌কে কিভাবে ভালবাসা যায়? সেই প্রেমময় ভগবান্ কে? আমরা যে জীবাত্মা পরমাত্মা সেই ভগবানের কি করে সান্নিধ্য লাভ করতে পারি?—সেই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব-বিচারে তিনি শাস্ত্রে আলোচনা করেছেন।

এখানে যে প্রসঙ্গ আজ আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, সে প্রসঙ্গ হচ্ছে, নারদঋষি দ্বারকায় বসুদেব মহারাজের গৃহে উপস্থিত। সেখানে বসুদেব মহারাজ নারদঋষিকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানিয়েছেন এবং তাঁর কল্যাণ-বিষয়ক প্রশ্ন তিনি রেখেছেন নারদঋষির কাছে। সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি আজ।—

শুকদেব গোস্বামী এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করছেন পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকটে,—

শ্রীশুক উবাচ,—

গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারাবত্যাং কুরূদ্বহ।
অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ।।

গোবিন্দভুজের দ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকাপুরীতে নারদঋষি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-লালসায় প্রায়ই গিয়ে হাজির হতেন। বর্ণনা করছেন শুকদেব পরীক্ষিত রাজার কাছে। বহু স্থান ত' পৃথিবীতে আছে যেখানে সাধুসজ্জনগণ, মুনি-ঋষিগণ যাতায়াত করেন।

মহদ্বিচলনং নৃনাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যতে ক্বচিৎ।।
"মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাই তবু যান পর ঘর।।"

এখানেও সেই প্রসঙ্গ দেখাচ্ছেন। নারদঋষি পৃথিবীর সর্ব্বত্র পর্য্যটন করছেন ভগবানের নাম গুণগান করে। তাঁর হাতে যে বীণা আছে, সে বীণায় মূর্চ্ছনা দিতে হয় না। সে বীণা আপনি রাধাগোবিন্দের নাম করে।

নারদ মুনি, বাজায় বীণা, রাধিকারমণ-নামে।
নাম অমনি, উদিত হয়, ভকত-গীত-সামে।।

তাঁর হাতের যে বীণা সে বীণা সাম গান করে, ভগবানের নাম, রূপ, গুণ গান করে। তিনি ভগবানের নাম গুণগান করতে করতে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করেন।

একদিন দক্ষ প্রজাপতি নারদঋষিকে অনুরোধ করলেন,—আমার কিছু বিশেষ উপকার করতে হবে আপনাকে। কি উপকার? আমার ছেলেগুলোর লেখাপড়া হচ্ছে না, আপনি যদি এদের একটু লেখাপড়ার দায়িত্ব নেন। নারদঋষি বললেন,—আপনার ত' সব জানা আছে। তথাপি আপনি যখন একটা দায়িত্ব দিতে চাচ্ছেন, তা হবে। নারদঋষি দক্ষ প্রজাপতির ছেলেদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নিলেন, তিনি তাদের Private tutor নিযুক্ত হলেন ; কিন্তু অবৈতনিক।

নারদঋষি যে শিক্ষায় শিক্ষিত, যে দীক্ষায় দীক্ষিত, ঠিক সেই অবস্থাটাই তাঁর আচরণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। তিনি দক্ষ প্রজাপতির ছেলেদের সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ উপদেশ করলেন। তাঁর উপদেশ শুনে দক্ষের হাজার হাজার ছেলে সব সংসার ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। এই অবস্থা দেখে প্রজাপতি দক্ষ নারদঋষিকে অভিসম্পাৎ করলেন,—আপনি একজায়গায় বসে বহুলোককে ধর্ম্মকথা, শাস্ত্রকথা উপদেশ করতে পারবেন না। প্রজাপতি দক্ষের যা যোগ্যতা, ক্ষমতা, অধিকার তার থেকে অনেক বেশী যোগ্যতা, ক্ষমতা, অধিকার নারদঋষির। তথাপি যেহেতু তিনি ভক্ত, বৈষ্ণব, সেইজন্য তিনি পাল্টা অভিশাপ দেননি। দক্ষ প্রজাপতির অভিশাপ তিনি মেনে নিয়েছেন ভগবানের সেবার দিকে তাকিয়ে। তিনি বললেন,—ঠিক হয়েছে, আমি ত' তোমারই ছেলেপিলেদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নিয়ে এখানে আটকে গিয়েছিলাম। পুনরায় আমি আমার পূর্ব্বের যে কর্ত্তব্য সে কর্ত্তব্যে আবার উদ্বুদ্ধ হব।

নারদঋষি পৃথিবীর সর্ব্বত্র পর্য্যটন করতেন। শুধু এই পৃথিবী নয়, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ যখন যেখানে খুশী সেই লোকে নারদঋষি চলে যেতেন। এখানে প্রজাপতি দক্ষ বলেছেন, আপনি একজায়গায় বসে থেকে ধর্ম্মকথা, শাস্ত্রকথা উপদেশ করতে পারবেন না। সেইজন্য তিনি একটা ব্যবস্থা নিলেন, প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপ যেখানে প্রবেশ করে না এমন একটা জায়গায় তিনি যেতে চাচ্ছেন। কেন না, মাঝে, মাঝে তাঁর ইচ্ছা হত একটু নিরালায়, নিভৃতে ভগবানের নাম স্মরণ করেন, নাম গুণগান করেন। স্থানটা নির্ব্বাচন করেছেন তিনি দ্বারকা। কেন? এখানে দক্ষ প্রজাপতির অভিসম্পাৎ প্রবেশ করবে না। সেই কথাই এখানে বর্ণনার মধ্যে রয়েছে। 'গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারাবত্যাং কুরূদ্বহ'—গোবিন্দের ভুজের দ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকাপুরী। দক্ষ প্রজাপতির অভিসম্পাৎ তার ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না, ক্ষমতা নেই। নারদঋষি জেনে শুনে মাঝে মাঝে এই দ্বারকায় যেতেন নিরালায়, নিভৃতে ভগবানের নাম স্মরণ করবেন বলে।

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ।।

শুকদেব বলছেন পরীক্ষিৎ মহারাজকে,—হে রাজন্! সর্ব্বতোভাবে মৃত্যুর অধীনতাগ্রস্ত কোন্ মানব ব্রহ্মাদি দেবেন্দ্রগণেরও সেবনীয় শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-কমলের আরাধনা না করেন। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকেরই ভগবানের আরাধনা, ভগবানের ভজন করা বিশেষ কর্ত্তব্য, একান্ত কর্ত্তব্য, First and foremost duty। সেই কর্ত্তব্য জানিয়ে দিচ্ছেন এখানে। দেবেন্দ্র, মুনীন্দ্রবাঞ্ছিত ধন যে ভগবান্, তাঁর আরাধনা, তাঁর উপাসনা করা, তাঁর নাম গুণকীর্ত্তন করা আমাদের সবথেকে বড় প্রয়োজন এ সংসারে।

কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছে মায়াবদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষসম হৈনু।।

শাস্ত্রের এই উপদেশ অনুসারে আমাদের সংসারে যতরকম কর্ত্তব্য আছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হচ্ছে—হরিভজন, ভগবদ্ভজন, ঈশ্বরারাধনা। খাওয়া, পরা, থাকা সবকিছু নিয়ে আমরা চলব, কিন্তু ভগবানের নাম ভুললে হবে না। সেই প্রেমময় ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা আমাদের অনুশীলন করতে হবে, জীবনে অভ্যাস করতে হবে,—এটাই সবথেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু। এইজন্যই আমরা সংসারে বেঁচে থাকব, খাব, পরব।

শ্রীবসুদেব উবাচ—

ভগবন্ ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্ব্বদেহিনাম্।
কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাম্।।

বসুদেবের ঘরে হাজির হয়েছেন নারদঋষি। নারদঋষিকে লক্ষ্য করে বলছেন বসুদেব,—হে ঋষিপ্রবর! আপনার যে আগমন আজ আমার গৃহে তা 'স্বস্তয়ে' অর্থাৎ আমাদের মঙ্গলের জন্য। শুধু আমার বা আমাদের নয়, সমস্ত দেহধারী জীবগণের পক্ষে মঙ্গলজনক আপনাদের ন্যায় সাধুগণের আগমন। উদাহরণ দিচ্ছেন কিরকম? 'কৃপণানাং যথা পিত্রো'—পিতা বহুদূর দেশে আছেন, ছেলে বাড়ীতে আছে। বহুদিন পরে পিতা বাড়ীতে ফিরে এলে বাচ্চা শিশুর যেরূপ আনন্দ হয়, বাবা! বাবা! করে ছুটে যায়, আজ আপনাকে দর্শন করে নারদঋষি আমার ঐরূপ আনন্দ হচ্ছে। 'কৃপণানাং যথা পিত্রো'। এখানে 'কৃপণ'-শব্দ একটা ব্যবহৃত হয়েছে। কৃপণ ব্যক্তির পক্ষে একথা কেন বললেন? বসুদেব মহারাজ নিজকে কৃপণ বলছেন! তাঁর ত' অতুল বৈভব, ঐশ্বর্য্য। তথাপিও তিনি 'কৃপণ'-শব্দ নিজকে বলছেন কেন? এখানে 'কৃপণ'-শব্দে আমরা যে অর্থ করি, জানা আছে আমাদের যে অর্থ—দাতা এবং কৃপণ সম্বন্ধে সে ধারণা নয়। অথচ কৃপণ-শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। শাস্ত্রীয় সমস্ত শব্দের অর্থ, ঠিক যা, যেটা, যাকে বলে অভিধাবৃত্তিতে ব্যাখ্যা, সেটা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। সাধারণ অর্থ জানা আছে আমাদের। সেই অর্থ শিক্ষা আমাদের লেখাপড়ার মধ্যে হয়েছে। শাস্ত্রীয় অর্থ যদি আমাদের শিখতে হয়, তাহলে আবার সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে সেই অর্থ শিখতে হবে। এখানে 'কৃপণ'-শব্দের কি অর্থ? উপনিষদের মধ্যে শব্দগুলো এসেছে। কাকে কৃপণ বলছেন?—

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স এব কৃপণঃ।"

অক্ষর পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে না জেনে যারা এজগৎ থেকে চলে যাচ্ছেন, অর্থাৎ সাধন-ভজন করছেন না, তারাই হলেন কৃপণ। কৃপণ-শব্দের উল্টোশব্দ হল দাতা। আর এখানে কৃপণ-শব্দের উল্টোশব্দে বলছেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ-শব্দের অর্থ তাহলে ঠিক এর উল্টোটা হবে।

"য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স এব ব্রাহ্মণঃ।"

হে গার্গি! অক্ষর পরব্রহ্ম ভগবানকে যাঁরা জেনে এ জগৎ থেকে চলে যেতে পারছেন, যাঁরা আত্মকল্যাণ চিন্তা করবার অবসর পেয়েছেন, তাঁরাই হলেন ব্রাহ্মণ। নারদঋষির কাছে বসুদেব মহারাজ (ভগবানের পিতা, যে সে ব্যক্তি নন) বলছেন,—আমার কোন তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় নি, ভালমন্দের বিচার আমি শিখিনি, কিভাবে ভগবানের ভজন-সাধন করতে হয়, সে শিক্ষা আমার লাভ হয় নি। ভগবানের পিতার যদি সে শিক্ষা লাভ না হয়েছে, তাহলে কার শিক্ষা হয়েছে? বসুদেব মহারাজ এখানে দৈন্যোক্তি করছেন, দৈন্য করে বলছেন। সর্ব্বসদ্‌গুণবিভূষিত বসুদেব মহারাজ। তাঁদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান্ তাঁদের ঘরে আসছেন পুত্ররূপে। সেই ব্যক্তি বলছেন, আমার কোন সাধন-ভজন হচ্ছে না, আমি সাধন-ভজন কিছু জানি না, বুঝি না!

এরপর আরও বলছেন শুকদেব গোস্বামী,—সাধু বড়, না দেবতা বড়? তুলনামূলক একটা আলোচনা করছেন এখানে তিনি,—

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্।।

দেবতাগণের চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়, তাঁদের চরিত্র কখনও জীবগণের পক্ষে, মনুষ্যগণের পক্ষে সুখের কারণ, আবার কখনও দুঃখের কারণ। এটা কি ঠিক কথা? হ্যাঁ, এটা ঠিক কথা। আমরা এ সংসারে যত দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছি, সবরকম দুঃখ-কষ্টকে শাস্ত্রে ভাগ করা হয়েছে তিনভাগে। মহামায়া দুর্গাদেবীর কারাগারে আমরা বাস করছি। এটা হল ভূলোক, এর উপরে আছে ভুবলোক—পিতৃলোক, স্বর্লোক—স্বর্গ। তার উপরে আরও চারটে আছে। মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোক। এই সত্যলোকে ব্রহ্মার অধিষ্ঠান, অবস্থিতি। এইরকম ধরণের সপ্ত ঊর্দ্ধলোক এবং সপ্ত নিম্নলোক। তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল ও রসাতল—এই সপ্ত অবর লোক। এই চৌদ্দলোক মহামায়া দুর্গাদেবীর নিয়ন্ত্রণে। আমরা এখানে দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছি। এই চৌদ্দভুবনকে বলা হচ্ছে জেলখানা। মহামায়া দুর্গাদেবী আমাদের অবস্থানুসারে আমাদের শাসন করছেন। তাঁর হাতে বহু আয়ুধ—অস্ত্র। এছাড়া আরও তিনটে অস্ত্র তাঁর হাতে আছে—আধ্যাত্মিক তাপ, আধিদৈবিক তাপ ও আধিভৌতিক তাপ। আধ্যাত্মিক তাপ অর্থাৎ জরা, ব্যাধি প্রভৃতি মানসিক অশান্তি যতপ্রকার আছে আমাদের। আধিদৈবিক তাপ—দেবতাগণের থেকে যে-সকল কষ্ট আমাদের আসে—বন্যা, প্লাবন, বজ্রাঘাত, অগ্ন্যুৎপাদন, ভূমিকম্প, খরা প্রভৃতি। আধিভৌতিক তাপ—কুকুড়ে কামড়ানো, বাঘে ধরা, সাপে কামড়ানো প্রভৃতি প্রাণীজগৎ থেকে যতপ্রকার কষ্ট আমরা পাই। যতপ্রকার কষ্ট আমরা এ সংসারে পাচ্ছি, সে-সকলকে এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে।

এইখানে বলছেন,—দেবতাগণের চরিত্রের মধ্যেও কখনও ভাল, কখনও খারাপ আমার দেখতে পাই। তজ্জন্য কখনও তাৎকালিক সুখ, আর কখনও দুঃখ আমরা

পাই। সুখ-দুঃখ ব্যাখ্যা করছেন শাস্ত্রে সুন্দরভাবে। এ জগতে অবিমিশ্র আনন্দ, সুখ-শান্তি নাই। তাহলে কি আছে? দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তিকে আমরা সুখ বলে মনে করছি। সবসময় দুঃখ চলছে। যদি কিছুক্ষণ সেই দুঃখটা স্তব্ধীভূত হয় সেই সময়টাকে আমরা সুখ বলে মনে করছি। বাস্তব সুখ-শান্তি এ জগতে, এ সংসারে হয় না, নেই। কেন নেই? এ সংসারটা ত' সাজা পাওয়ার জায়গা। জেলখানা ত' এটা। দুঃখ দিয়ে গড়া এটা, দুঃখ দেওয়ার জন্যই এগুলো তৈরী হয়েছে। সে কথা শাস্ত্রে সুন্দরভাবে বুঝানো হয়েছে।

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপম্
স্বপ্নাভমস্তধীষণং পুরু দুঃখদুঃখম্।

দুঃখ দিয়ে গড়া এ সংসার। সেই দুঃখই আমরা ভোগ করি সব সময়। কখনও যদি একটু সুখ-শান্তি হল বলে আমরা মনে করি, বাস্তবে তা কিন্তু সুখ নয়, সেটা দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি। তাকেই আমরা সুখ বলে ধরে নিচ্ছি। কেমন, আগেকার দিনে যদি লোকে চুরি করত, তখন রাজার শাসন ছিল পাইক পেয়াদা দিয়ে তাকে নদীতে চুবিয়ে ধরত। তাকে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলা উদ্দেশ্য নয়। যখনই সে ছটফট করছে, তখন একটু তুলে ধরে। তখন সে বলে, আঃ, বাঁচলাম। যেই 'আঃ বাঁচলাম' বলা অমনি আবার জলে চুবিয়ে ধরে। এ সংসারের সুখ-শান্তি হচ্ছে এইরকম। এই দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তিকে সুখ-শান্তি বলছি আমরা। বাস্তব সুখ-শান্তি নাই এ সংসারে।

দেবতাগণের চরিত্রে সুখ-দুঃখ দুটোই রয়েছে। সবসময় সুখ-শান্তি, তা নেই। "সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্।।" হে নারদঋষি! আপনার ন্যায় অচ্যুতাত্ম অর্থাৎ ভগবান্‌কে যাঁরা সার করেছেন, ভগবান্ ছাড়া যাঁদের এ জগতে আর কোন রক্ষাকর্ত্তা নেই, কোন আত্মীয়-স্বজন নেই—এমন যাঁরা ভগবদ্ভক্ত, তাঁদের যে চরিত্র, সেটা পৃথিবীবাসী সমস্ত জীবগণের কল্যাণের জন্য—একথাই বসুদেব মহারাজ বলছেন।

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ।।

দেবদেবীরা কারা? তাঁদের কি পরিচয়? ভগবান্ কিছু বিশেষ বিশেষ অধিকার দিয়ে এঁদের এক একটা দপ্তর বণ্টন করেছেন। কিন্তু তাঁরা পেয়েছেন সেই ভগবানের কাছ থেকে। আমরা সেই দেবদেবীর কাছে যখন শরণাপন্ন হচ্ছি, তখন আমরা বিধিবিধান-অনুসারে কিছু কিছু ফল পাচ্ছি। আমরা যতটুকু সেখানে শ্রদ্ধা অর্পণ করব, ততটুকুই আমরা পেতে পারি ; তার বেশী কিছু পেতে পারি না। কিন্তু সকলেরই আমাদের একটা দুশ্চিন্তা বলুন, দুর্ভাবনা বলুন বা অধিক ভাবনা বলুন, আমরা মনে করি যে, দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করতে গেলে অল্প-স্বল্প কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চাই ; কিন্তু পেতে চাই অনেক কিছু। (ক্রমশঃ)

পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২০০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীল মহারাজ আলাচুয়া প্রচার সমাপনান্তে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি. সি.তে ২৮।৫।২০০১ হইতে ৪।৬।২০০১ তারিখ পর্য্যন্ত প্রচার করেন। এখানকার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল,—জীবের অজ্ঞতা দূরীকরণের উপায়, গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব ও মহিমা, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এবং তাঁহার শিক্ষা, শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, গঙ্গমাতা গোস্বামিনীর জীবনচরিত, লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অবতারের কারণ ইত্যাদি।

অতঃপর ৫।৬।২০০১ হইতে ২৯।৬।২০০১ পর্য্যন্ত ইউরোপ মহাদেশের হল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, ইটালি ও ইংল্যাণ্ডে বিপুল সাফল্যের সহিত প্রচার করিয়াছেন। হল্যাণ্ড এবং জার্ম্মানীতে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত ও শিক্ষা, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর জীবন-চরিত, শ্রীগুরুতত্ত্ব, পারমার্থিক জীবনের সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত, ভক্তিলতার ছয়টী পাতা, শ্রীগৌরবাণী, বাবাজীগণের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন।

ভক্তিলতার ছয়টী পাতা—সাধনভক্তিতে দুইটী—ক্লেশঘ্নী ও শুভদা। ভাবভক্তিকে হৃদয়ে আবির্ভূত করাইবার জন্য যত্নপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধন করাকে সাধনভক্তি বলে। এই সাধন যথার্থ আরম্ভ হইলে পর সকল প্রকার ক্লেশ দূর হইয়া যাইবে এবং সকলপ্রকার শুভ অর্থাৎ কল্যাণ আসিবে। ভাবভক্তিতে পুনঃ দুইটী পাতার উদ্‌গম হইবে—মোক্ষলঘুতাকৃৎ ও সুদুর্ল্লভা। মোক্ষলঘুতাকৃৎ অর্থাৎ ভাবভক্তি উদিত হইলে মোক্ষকেও অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া দেয়। মোক্ষ সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার মতামত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন,—'আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরেব হি মুক্তি।' আত্যন্তিক দুঃখ অর্থাৎ ত্রিতাপ। সম্পূর্ণরূপে ত্রিতাপ দূর হওয়াকে মুক্তি বলে। ত্রিতাপ সম্বন্ধে একটু স্বচ্ছ জ্ঞান প্রয়োজন। ত্রিতাপ অথাৎ তিনপ্রকার তাপ অথবা দুঃখ—(১) আধ্যাত্মিক, (২) আদিদৈবিক ও (৩) আধিভৌতিক। অবশীভূত মনের দ্বারা বশীভূত হওয়ার জন্য যে দুঃখ, তাহা আধ্যাত্মিক তাপ। দেবতাগণের দ্বারা প্রদত্ত দুঃখ, যেমন—বন্যা, খরা, ভূকম্প ইত্যাদি আধিদৈবিক তাপ এবং আধভৌতিক তাপ হইল অন্যান্য প্রাণী হইতে প্রাপ্ত কষ্ট, যেমন—সর্প দংশন, কুকুরে কামড়ানো প্রভৃতি। ভাবভক্তি অত্যন্ত দুর্ল্লভ হওয়ার জন্য সুদুর্ল্লভা বলা হইয়াছে। 'বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভ মুক্তি'—বলিয়াও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভগবানের পাদপদ্মের সেবালাভ করাকে মুক্তি বলে। আবার কোন শাস্ত্রে 'মুক্তিহি তু অন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি।'—জীবস্বরূপে বিশেষরূপে অবস্থান করাকে মুক্তি

বলা হয়। জীবের স্বরূপ নিত্য কৃষ্ণের দাসত্ব করা বা সেবা করা। এই দাস্য আবার শান্তাদি ভেদে পাঁচ প্রকার। এই পাঁচটী ভাবের কোন একটীতে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণের সেবালাভ করাই মুক্তি। মুক্তি পাঁচপ্রকার,—সামীপ্য, সারূপ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য। এই মুক্তি ভগবান্ ভক্তগণকে দিতে চাহিলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করিতে চাহেন না। এজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন,—'দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।' এই মুক্তি আবার (১) সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা ও (২) প্রেমসেবোত্তরা। ভক্তগণ কখনও কখনও বিশেষ পরিস্থিতিতে 'প্রেমসেবোত্তরা' মুক্তি গ্রহণ করিলেও সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা গ্রহণ করেন না। সারূপ্যাদি মুক্তি সম্বন্ধে একটী বিশেষ রহস্য জানা দরকার। সাধারণভাবে বলা হইয়াছে, ভগবানের সমান রূপ। কিন্তু ভগবানের সমানরূপ ত' কাহারও হইতে পারে না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে,—'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।" তাহলে এর সামঞ্জস্য কিরূপে হইবে? এখানে ভগবানের সমান রূপ, ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য না হইয়া ভগবদ্ভক্তের সমান রূপ এবং ভগবদ্ভক্ত বা পরিকরের সমান ঐশ্বর্য্য হইবে।

প্রেমাবস্থাতে ভক্তিলতাতে আরও দুইটী পাতার উদ্ভম হইবে—(১) সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা, (২) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী। সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা অর্থাৎ ঘনীভূত আনন্দ। জড়-জগতের যত আনন্দ, মোক্ষের যত আনন্দ, এই দুইটী আনন্দকে কোটিগুণ করিলেও ভক্তির আনন্দের সমান হইবে না। শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী অর্থাৎ ভক্তিদেবী আবির্ভূত হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিজ পরিকরের সহিত উক্ত সাধকের প্রেমদ্বারা বশীভূত হইয়া যান। এখানে বিশেষ রহস্য এই যে,—কৃষ্ণাকর্ষণীর দুইটী অর্থ হয়। (১) কৃষ্ণ + আকর্ষণী এবং কৃষ্ণা + আকর্ষণী। উদাহরণ দিলে বিষয়টী আরও পরিষ্কার হইবে। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য প্রেমভক্তির অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ থাকিতে না পারিয়া গোপবালকরূপে আসিয়া দুগ্ধ প্রদান করেন। শ্রীগোপীনাথ তাঁহার জন্য 'অমৃতকেলি' ক্ষীর চুরি করিয়া 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' নাম ধারণ করেন। অন্যত্র দেখা যায়, বিল্বমঙ্গলের প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল আসিয়া দর্শন দান করেন। আমাদের গোস্বামিগণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী নন্দগ্রামস্থ টেরকদম্বে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। হরিকথার আবেশে ক্ষুধাতৃষ্ণা সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন। পাছে ভক্তের কষ্ট হয় এজন্য শ্রীকৃষ্ণা অর্থাৎ গৌড়ীয়গণের আরাধ্যা শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী স্বয়ং আসিয়া পরমান্ন রন্ধন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজন করিতেছেন। প্রখর রৌদ্রে ভক্তের কষ্ট না হয়, তজ্জন্য শ্রীমতী রাধারাণী নিজ বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা ছায়া প্রদান করিতেছেন।

হল্যাণ্ডে প্রচারসেবায় সহায়তা করিয়া শ্রীস্বরূপ দাসাধিকারী, শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী, সপরিবার শ্রীরাঘবচৈতন্য দাসাধিকারী ও সপরিবার শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী

দেবী, সাবিত্রীদেবী শ্রীসমিতির কৃপাভাজন হইয়াছেন এবং জার্ম্মান প্রচারসেবায় সহায়তা করিয়া শ্রীরামশ্রদ্ধা দাসাধিকারী শ্রীসমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ইটালি এবং ইংল্যাণ্ডে শ্রীল মহারাজ শ্রীসনাতন শিক্ষা, বস্তুপরিণামবাদ, শক্তিপরিণামবাদ এবং অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন। ইংল্যাণ্ডে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখামঠ শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বার্মিংহাম, বাথ ও লণ্ডনের বিখ্যাত 'কন্‌ওয়ে হল'-এ বক্তৃতা প্রদান করেন। ইংল্যাণ্ডে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন, শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষা, হেরাপঞ্চমী প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব ও সুভদ্রাদেবী যখন রথারূঢ় হইয়া নগর ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন হাজার হাজার শ্রদ্ধালু জনগণ 'জয় জগন্নাথ' 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া ভারতীয়দের ন্যায় রাস্তায় আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেব ও ভক্তগণের নৃত্য দর্শন করিতে থাকেন। রথযাত্রার পর ধর্ম্মসভাতে Mr. J. S. Sapra,–Consulate general of India, Mr. O. P. Sharma, President,Nation Council of Hindu Temple (U.K.), Chairman–Hindu Council (Birmingham), Member–Inter City Religious Council (England), Vice Co-Chairman–Interfaith Network (U.K.), Mrs. Theresa Stewart–Deputy Mayor (Birmingham) যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বিশেষ করিয়া Indian Consulate General এর ভাষা ও বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত সুন্দর। তাঁহার ভাষা ও সাধুসন্তগণের চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহার বংশে বৈষ্ণবীয় সংস্কার পূর্ণরূপে বিদ্যমান।

শ্রীল মহারাজজীর ভাষণ শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রধান অতিথিগণ বার্মিংহামে শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠকে সকলপ্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন। তাঁহারা জানান যে, শ্রীল মহারাজ যখনই আসিবেন, মঠ-কর্ত্তৃপক্ষ যেন তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব হইতে সূচিত করেন। ধর্ম্মসভার পর মিঃ জন নামক এক সাংবাদিক শ্রীল মহারাজকে প্রশ্ন করেন,—

মিঃ জন—আপনার ভগবান্ কে?

শ্রীল মহারাজ—ভগবান্ এক, অদ্বিতীয়। যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, তিনিই ভগবান্। G=Generator, O=Operator, D=Destroyer. আমার ভগবান্, আপনার ভগবান্, সকলের ভগবান্ এক। যাঁহাকে শাস্ত্রে—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" বলা হইয়াছে।

মিঃ জন—আপনার বার্মিংহাম আসায় জনমানসে কি ধরণের প্রভাব পড়িবে?

শ্রীল মহারাজ—যাঁহারা আমাদের হরিকীর্ত্তন ও হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই ক্রমশঃ ক্রমশঃ জন্মমরণের মালা হইতে অতিক্রান্ত হইয়া সাধুসঙ্গে ভজন

করিয়া ভগবৎসেবা লাভ করিবেন।

মিঃ জন—ভারতীয়রা পরমার্থে পাশ্চাত্ত্য দেশ অপেক্ষা অনেক উন্নত কেন?

শ্রীল মহারাজ—ভারতীয়দের রক্তের মধ্যে এই ভাব বিদ্যমান। পাশ্চাত্ত্যবাসীদের রক্তে 3W and 6D বিদ্যমান রহিয়াছে।

মিঃ জন—স্বামীজী! 3W & 6D এর তাৎপর্য্য কি?

শ্রীল মহারাজ—স্মিতহাস্যে উত্তর দেন, 3W এর তাৎপর্য্য—Wine, Women, Wealth. 6D এর তাৎপর্য্য—Dog, Drink (alcohole), Dance (night club), Divorce, Duplicity, Diplomacy.

ভারতবাসীরা God এর ভজন করে, পাশ্চাত্ত্যবাসীর ঠিক এত বিপরীত Dog এর ভজন করে। ভারতীয়রা দেহত্যাগ করিবার সময় ভক্ত এবং ভগবানের চিন্তা করেন এবং ভক্তরূপেই পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। পাশ্চাত্ত্যবাসীরা মরিবার সময় Dogএর চিন্তা করিয়া পুনরায় Dog যোনি প্রাপ্ত হয়। এজন্যই পাশ্চাত্ত্যে Dog এর সংখ্যা এত বেশী।

এই উত্তর শুনিয়া সভাস্থ সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠে। অবশেষে পঞ্চসহস্রাধিক ব্যক্তিকে সুস্বাদু খেচরান্ন মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ইংল্যাণ্ডে প্রচারসেবায় সহায়তা করিয়া শ্রীভক্তিবেদান্ত আশ্রম মহারাজ ও শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর আনুগত্যে সকল মঠবাসী ব্রহ্মচারী শ্রীসমিতির বিশেষ কৃপালাভ করিয়াছেন। শ্রীসমিতির সমস্ত প্রচারকগণ এখানে আসিয়া মহারাজের সহিত যোগ দেন। শ্রীল মহারাজ ৩০।৬।২০০১ তারিখে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে অবতরণ করিয়াছেন এবং পরসিবস মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। অন্যান্য প্রচারক-গণ—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বন মহারাজ চাতুর্ম্মাস্যের পূর্ব্বেই ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রবন্ধলেখকগণকে জানানো যাইতেছে যে, পত্রিকাতে প্রকাশের জন্য কোনরূপ প্রবন্ধ পাঠাইলে তাহা অবশ্যই কালিতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। কোনরূপ XEROX Copy পাঠাইবেন না। বহু প্রবন্ধলেখক XEROX পাঠানোর জন্য তাঁহাদের প্রবন্ধ প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে না।

E-mail : vedanta_samiti@mantraonline.com

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে

সাদর আহ্বান

✆ ২৩৬৯১

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ৪০০৬৮

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ
পোঃ—তুরা, পিন্ - ৭৯৪০০১
জেলা—ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও উক্ত মঠের সেবকবৃন্দের উদ্যোগে আগামী ১৫ই শ্রাবণ, ১৪০৮ (ইং ৩১।৭।২০০১), মঙ্গলবার হইতে ১৯শে শ্রাবণ (ইং ৪।৮।২০০১), শনিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও ৬ই ভাদ্র (ইং ২৩।৮।২০০০), বুধবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উক্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, ধর্ম্মসভা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ছায়াচিত্র এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীযোগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাদি প্রদর্শন তথা বিশেষ-ভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, ভোগরাগ এবং শ্রীনন্দোৎসব-দিবসে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

১লা শ্রাবণ, ১৪০৮

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সেবকবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে জানিতে হইলে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীজন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান-সূচী

২৬শে শ্রাবণ (ইং ১১।৮।২০০১), শনিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।

অপরাহ্নে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

গোধূলিলগ্নে—সন্ধ্যারতি ও গীতি-কীর্ত্তন।

রাত্রে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও অধিবাস-কীর্ত্তন।

২৭শে শ্রাবণ (ইং ১২।৮।২০০১), রবিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন—মঙ্গলারতি অন্তে প্রাতঃ হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৮টা পর্য্যন্ত নগর-পরিক্রমা।

পূর্ব্বাহ্নে—৮-৩০ টার পর সম্পূর্ণ দিবস শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-প্রসঙ্গ পারায়ণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

রাত্রি—৮টা হইতে ধর্ম্মসভা, রামমঙ্গল ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন।

২৮শে শ্রাবণ (ইং ১৩।৮।২০০১), সোমবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও কীর্ত্তনান্তে ধর্ম্মসভা, পরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন ও রামমঙ্গল।

বিঃ দ্রঃ—*দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য।*

☆ **"শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট"**-এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয় দান (৮০জি ধারা) আয়কর-মুক্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৩শ বর্ষ } ১৫ পদ্মনাভ, সঙ্কর্ষণ, ৫১৫ শ্রীগৌরাব্দ { ৭ম সংখ্যা
৩১ ভাদ্র, সোমবার, ১৪০৮, ইং ১৭/৯/২০০১

সানুবাদং

শ্রীপৃথুমহারাজকৃতা গো-ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মণ্যদেব-স্তুতিঃ (২)

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একবিংশতিতমেঽধ্যায়ে—৩৪-৪৪]

অসাবিহানকগুণোঽগুণোঽধ্বরঃ
পৃথগ্বিধ-দ্রব্য-গুণক্রিয়োক্তিভিঃ।
সম্পদ্যতেঽর্থাশয়লিঙ্গনামভি-
র্বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনঃ স্বরূপতঃ।। ১।।

সেই ভগবান্ স্বরূপতঃ শুদ্ধসত্ত্বময় চিদানন্দস্বরূপ। তিনি প্রাকৃত গুণরহিত হইয়াও বিবিধ দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, মন্ত্র, অর্থ, সঙ্কল্প, দ্রব্যশক্তি ও নাম,—এই সকল বিভিন্ন সংজ্ঞাদ্বারা কর্ম্মমার্গে যজ্ঞরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।। ১।।

প্রধান-কালাশয়-ধর্ম্মসংগ্রহে
শরীর এষ প্রতিপদ্য চেতনাম্।

ক্রিয়াফলত্বেন বিভুর্বিভাব্যতে
যথানলো দারুষু তদ্‌গুণাত্মকঃ ।। ২।।

অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠগত হইয়া কাষ্ঠের গুণ অর্থাৎ দীর্ঘত্ব ও বক্রত্বাদি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বিভু ভগবান্ ও অব্যক্তা প্রকৃতি,—তৎক্ষোভক কাল, বাসনা ও অদৃষ্ট, এই সকলের সহিত উৎপন্ন শরীরসমূহে কর্ম্মার্পণরূপ বুদ্ধি প্রেরণা করিয়া তাঁহাদিগের কর্ম্মফলানুসারে স্বয়ং প্রকাশিত হন।। ২।।

অহো মমামী বিতরন্ত্যনুগ্রহং
হরিং গুরুং যজ্ঞভুজামধীশ্বরম্।
স্বধর্ম্মযোগেন যজন্তি মামকা
নিরন্তরং ক্ষৌণিতলে দৃঢ়ব্রতাঃ।। ৩।।

এই ভূমণ্ডলে আমার যে-সকল প্রজা দৃঢ়ব্রত হইয়া যজ্ঞভুক্ দেবগণের অধীশ্বর জগদ্‌গুরু শ্রীহরিকে আরাধনা করেন, অহো! তাঁহারাই আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন।। ৩।।

মা জাতু তেজঃ প্রভবেন্মহর্দ্ধিভি-
স্তিতিক্ষয়া তপসা বিদ্যয়া চ।
দেদীপ্যমানেঽজিতদেবানাং
কুলে স্বয়ং রাজকুলাদ্দ্বিজানাম্।। ৪।।

মহাসম্পত্তিশালী রাজকুলের তেজ,—তিতিক্ষা, তপস্যা, বিদ্যাদ্বারা স্বয়ং প্রকাশমান আত্মবিৎ ব্রাহ্মণকুলে এবং অজিত শ্রীবিষ্ণুই যাঁহাদের একমাত্র পরমদেবতা, সেই বৈষ্ণবকুলে—যেন কদাপি প্রভাব বিস্তার না করে।। ৪।।

ব্রহ্মণ্যদেবঃ পুরুষঃ পুরাতনো
নিত্যং হরির্যচ্চরণাভিবন্দনাৎ।
অবাপ লক্ষ্মীমনপায়িনীং যশো
জগৎপবিত্রঞ্চ মহত্তমাগ্রণীঃ।। ৫।।
যৎসেবয়াশেষগুহাশয়ঃ স্বরাড্
বিপ্রপ্রিয়স্তুষ্যতি কামমীশ্বরঃ।
তদেব তদ্ধর্ম্মপরৈর্বিনীতৈঃ
সর্ব্বাত্মনা ব্রহ্মকুলং নিষেব্যতাম্।। ৬।।

মহত্তমগণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মণ্যদেব পুরাণপুরুষ শ্রীহরিও সর্ব্বদা যে ব্রাহ্মণকুলের পরিচর্য্যাদ্বারা অচল লক্ষ্মী ও ভুবনপাবন যশঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; যে ব্রাহ্মণকুলের সেবা করিয়া সর্ব্বান্তর্যামী বিপ্র-বৎসল স্বপ্রকাশ ভগবান্‌ও পরিতুষ্ট হন, তোমরা ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে বিনীতভাবে সেই আত্মবিৎ ব্রহ্মকুলেরই সেবা কর।। ৫-৬।।

পুমাঁল্লভেতানতিবেলমাত্মনঃ
প্রসীদতোঽত্যন্তশমং স্বতঃ স্বয়ম্ ।
যন্নিত্যসম্বন্ধনিষেধয়া ততঃ
পরং কিমত্রাস্তি মুখং হবির্ভুজাম্।। ৭।।

আত্মবিৎ ব্রাহ্মণকুলকে নিত্যসেব্য-জ্ঞানে সেবা করিলে চিত্ত আপনা হইতেই অবিলম্বে পরিশুদ্ধ হয় এবং জ্ঞানাদির অভ্যাস ব্যতীতও মুক্তিলাভ হয়। ইহলোকে আত্মবিৎ ব্রহ্মকুলের সেবাপেক্ষা হবির্ভোজী দেবতাদিগের আর কি উৎকৃষ্টতর মুখ আছে ?? ৭।।

অশ্নাত্যনন্তঃ খলু তত্ত্বকোবিদৈঃ
শ্রদ্ধাহুতং যন্মুখ ইজ্যনামভিঃ।
ন বৈ তথা চেতনয়া বহিষ্কৃতে
হুতাশনে পারমহংস্যপর্য্যগুঃ।। ৮।।

ভগবান্ অনন্ত, সর্ব্বান্তর্য্যামী ও চিদঘনবিগ্রহ। যজ্ঞবিদ্‌গণ ইন্দ্রাদির নামোচ্চারণ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মণের মুখে যজনীয় দ্রব্য হোম করিলে তাহা যেমন তিনি (শ্রীভগবান্) তৃপ্তির সহিত ভোজন করেন, অচেতন অগ্নিতে হোম করিলে তেমন ভোজন করেন না ।। ৮।।

যদ্‌ব্রহ্ম নিত্যং বিরজং সনাতনং
শ্রদ্ধা-তপোমঙ্গল-মৌন-সংযমৈঃ।
সমাধিনা বিভ্রতি হার্থদৃষ্টয়ে
যত্রেদমাদর্শ ইবাবভাসতে।। ৯।।
তেষামহং পাদসরোজরেণু-
মার্য্যা বহেয়াধিকিরীটীমায়ুঃ।
যং নিত্যদা বিভ্রত আশু পাপং
নশ্যত্যমুং সর্ব্বগুণা ভজন্তি।। ১০।।

যে বেদে এই বিশ্ব দর্পণগত প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রকাশ পায়, সেই বেদের তাৎপর্য্য জানিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ শ্রদ্ধা (দৃঢ়বিশ্বাস), মঙ্গল (প্রতিকূল বর্জ্জনপূর্ব্বক অনুকূল আচরণ), মৌন (অধ্যয়ন-বিরোধী বার্ত্তা-পরিত্যাগ), ইন্দ্রিয়সংযম এবং সমাধিদ্বারা নিত্যকাল বিচার করিয়া থাকেন। হে আর্য্যগণ, **আমি যেন সেইরূপ আত্মবিৎ ব্রাহ্মণগণের পদরেণু যাবজ্জীবন নিজ মুকুটোপরি বহন করিতে পারি।** যিনি সেই চরণ-ধূলি নিত্যকাল শিরে ধারণ করেন, তাঁহার পাপরাশি শীঘ্রই বিদূরিত হয় এবং সমস্ত সদ্‌গুণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে।। ৯-১০।।

গুণায়নং শীলধনং কৃতজ্ঞং
বৃদ্ধাশ্রয়ং সংবৃণতেঽনু সম্পদঃ।

প্রসীদতাং ব্রহ্মকুলং গবাঞ্চ
জনার্দ্দনঃ সানুচরশ্চ মহ্যম্।। ১১।।

সর্ব্বগুণের আধার, সচ্চরিত্র, কৃতজ্ঞ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুবর্গকে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন, সেই পুরুষকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি সকল সম্পত্তি সম্যক্‌ভাবে ভজনা করিয়া থাকে ; সুতরাং ব্রহ্মকুল, গো-কুল এবং অনুচরবর্গসহ শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।। ১১।।

প্রশ্নোত্তর

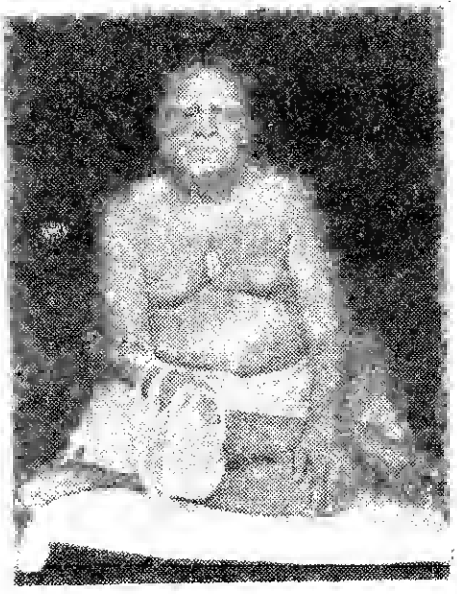

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৫ পৃষ্ঠার পর]

১০। বস্তুসিদ্ধি-লাভে কি প্রপঞ্চে অবস্থান সম্ভব?

"বস্তুসিদ্ধি হইলে প্রাকৃত জগতে আর থাকা যায় না ; ভক্ত তখন অপ্রাকৃত জগতে অবস্থান করেন।"

—'প্রয়োজনবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৭।২৪

১১। সিদ্ধিতে মহাভাগবতের দর্শন কি?

"(কবে) শ্বপচ-গৃহেতে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণকোলাহল।।"

—'সিদ্ধিলালসা'—১, গীঃ মাঃ

১২। শ্রীরাধাগত-প্রাণ প্রেমিক ভক্তের কিরূপ বিপ্রলম্ভ হয়?

"রাধিকাচরণ, ত্যজিয়া আমার,
ক্ষণেকে প্রলয় হয়।
রাধিকার তরে, শতবার মরি,
সে দুঃখ আমার সয়।।"

—'সিদ্ধিলালসা'—১০, গীঃ মাঃ

১৩। আশ্রয়তত্ত্বানুগত সেবকের চিত্তবৃত্তি কি?

"শ্রীকৃষ্ণবিরহে, রাধিকার দশা,
আমি ত' সহিতে নারি।

যুগল-মিলন, সুখের কারণ,
জীবন ছাড়িতে পারি।।"

—'সিদ্ধিলালসা'—১০, গীঃ মাঃ

১৪। আশ্রয়তত্ত্বের পক্ষপাতিত্ব-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদের বিচার কি?

"রাধা-পক্ষ ছাড়ি', যে জন সে জন,
যে ভাবে সে ভাবে থাকে।
আমি ত' রাধিকা- পক্ষপাতী সদা,
কভু নাহি হেরি তা'কে।।"

—'সিদ্ধিলালসা'—৯, গীঃ মাঃ

১৫। স্বারস্বিকী সিদ্ধির স্বরূপ কি?

"স্বারস্বিকী সিদ্ধি, ব্রজগোপী-ধন,
পরমচঞ্চলা সতী।
যোগীর ধেয়ান, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান,
না পায় এখানে স্থিতি।।
সাক্ষাৎ দর্শন, মধ্যাহ্ন-লীলায়,
রাধাপদ-সেবার্থিনী।
যখন যে-সেবা, করহ যতনে,
শ্রীরাধাচরণে ধনি।।"

—'সিদ্ধিলালসা'—৬, গীঃ মাঃ

১৬। শ্রীরূপানুগের সংসিদ্ধি-লালসা কিরূপ?

"কবে বা এ দাসী, সংসিদ্ধি লভিবে,
রাধাকুণ্ডে বাস করি'।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা, সতত করিবে,
পূর্ব্ব স্মৃতি পরিহরি'।।"

—'সিদ্ধিলালসা'—৮, গীঃ মাঃ

১৭। শ্রীরাধানুগার সেবার স্বরূপ কি?

"তুমি রাধিকার দাসী, রাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণসেবা স্বতন্ত্রা হইয়া করিবে না। রাধাকৃষ্ণে সমান স্নেহ রাখিয়াও কৃষ্ণের দাস্য-প্রেম অপেক্ষা রাধিকার দাস্য-প্রেমে অধিকতর আগ্রহ করিবে। ইহারই নাম 'সেবা'। শ্রীরাধার অষ্টকালীন সেবাই তোমার সেবা।"

—জৈঃ ধঃ, ৩৯ অঃ

১৮। ব্রজে গোপগৃহে জন্মটী কি? এ বিষয়ে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিচারের সামঞ্জস্য ও বৈশিষ্ট্য কি?

"কোন কোন ভক্তলেখক স্বরূপসিদ্ধিকে সাধকের সাধন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই গোপগৃহে ব্রজে জন্মগ্রহণ করা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; তাহাও মিথ্যা নয়। ইহাই ভক্তবৈষ্ণবের বস্তুসিদ্ধির পূর্ব্বে দ্বিজত্বলাভ বলিয়া জানিতে হইবে। ভক্তের গোপীদেহ-প্রাপ্তিই সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ দ্বিজত্বপ্রাপ্তি বা আপন-দশা। যখন সেই অবস্থায় গুণময় দেহ বিগত হয়, তখনই সাধকের 'স্বরূপসিদ্ধি' হইতে 'বস্তুসিদ্ধি' হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৫

১৯। শুদ্ধভক্তের শ্রীধামপ্রীতি ও ভক্তসেবা-লালসা কিরূপ?

"(কবে) ধামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ- রেণু গায় মাখি,
ধরি অবধূত বেশ।।"

—'সিদ্ধি-লালসা'—১, গীঃ মাঃ

২০। শুদ্ধভক্ত কি গৌড়বন ও ব্রজবনে ভেদ দেখেন? শ্রীরাধাদাস্য কখন লাভ হয়?

"(কবে) গৌড়-ব্রজবনে, ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী।
(তখন) ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী।।"

—'সিদ্ধিলালসা'—১, গীঃ মাঃ

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১০ পৃষ্ঠার পর]

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।"

শ্রবণাদি নয় প্রকার ভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।।
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
হ্যনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ।।"
"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।।"
"যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"

এই সমস্ত শ্রুতিবচন আমাদের এতৎসহ আলোচ্য। কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ নবধাভক্তি সকল বেদে উদ্দিষ্ট অভিধেয় বস্তু। ঐ সকল সাধন হ'তেই প্রেমের উদ্‌গম হয়। বেদে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তিন তত্ত্বের প্রকৃষ্ট সন্ধান র'য়েছে।

'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।"
"'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।।"
"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।"

পুরুষোত্তম বস্তুতে সর্ব্বরসের আশ্রয় জে'নে তাঁকে ছেড়ে কে অন্যত্র আশ্রয় করে?

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।"

বদ্ধজীবের জ্ঞানে কদাপি তদ্বস্তু লভ্য হয় না। দ্বাদশরসের ভাণ্ডার এক জায়গায় থা'কলে এবং তা' পূর্ণরূপে থা'কলে কে বোকা তা'কে ছেড়ে দেয়? সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তির ক্রমপর্য্যায়সমূহ শ্রদ্ধা, রতি ও রস নামে খ্যাত। দাস্যহ'তেই প্রেম-শব্দের ব্যবহার। মাধুর্য্যরস বাৎসল্য, সখ্য, দাস্যে ক্রমে অল্প। মাধুর্য্যরসে সর্ব্বরসই পূর্ণমাত্রায় থেকেও বৈশিষ্ট্য থা'কল। অন্যান্য রসগুলি ক্রমে অভাব থেকে গেল। কৃষ্ণ দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দেখেই মুগ্ধ হ'য়ে আস্বাদন কর্‌তে স্বয়ং ইচ্ছা কর্‌লেন এবং তা' বিচার ক'রে রাধার স্বরূপ গ্রহণ কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌লেন।

"অপরিকল্পিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপুরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব।।"

গৌরসুন্দর ঔদার্য্যমূর্ত্তিতে স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন কর্‌লেন।

সেবাদ্বারাই কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকার হয়।

"প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস।।"

অধোক্ষজে ভক্তি না হ'লে অনর্থ নষ্ট হয় না।

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।।"
"সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান।।"

বাদরায়ণ সূত্রগুলিতে বেদের মত এই তিন অর্থই প্রতিপাদিত হ'য়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় সম্বন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়ে অভিধেয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে প্রয়োজন বিচার সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত ক'রেছেন। পূর্ব্বমীমাংসার ১২ অধ্যায়ে জৈমিনি ধর্ম্মার্থকামের বিচার দেখিয়েছেন। কিন্তু ব্যাসদেব উত্তর-মীমাংসা কেবল মোক্ষের বিচার ক'রলেন। সমন্বয় ও অবিরোধ—এই দুই অধ্যায়ে সম্বন্ধবিচার, তৃতীয়ে সাধনবিচার ও চতুর্থে ফলবিচার। শ্রীজীবগোস্বামিপাদের ভাগবতসন্দর্ভের চারিটীতে—তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও কৃষ্ণ-সন্দর্ভে সম্বন্ধজ্ঞানের বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন। তত্ত্বসন্দর্ভে প্রমাণ-প্রমেয় বিচার। প্রমেয়গুলির বিচার ভগবৎ (ব্রহ্ম), পরমাত্ম ও কৃষ্ণসন্দর্ভ নামে আখ্যাত কর্‌লেন। মুখ্যবৃত্তিতে ব্রহ্ম-শব্দে ভগবান্ বুঝায়, এজন্য ব্রহ্মসন্দর্ভের নাম ভগবৎসন্দর্ভ দিয়েছেন। অভিধেয় বিচার ভক্তিসন্দর্ভে বিশেষভাবে সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে। প্রয়োজন-বিচার প্রীতিসন্দর্ভ নামে আখ্যাত ক'রেছেন। এইগুলির সুষ্ঠু আলোচনার অভাবে বর্ত্তমানে সহজিয়া সম্প্রদায়ের এত দৌরাত্ম্য জগৎকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। বেদের বস্তুগুলিই বেদান্তে বর্ণিত হ'য়ে জীবের উপকারের জন্য অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ভাগবতী তনুর আবির্ভাব হ'য়েছে। মায়ামুগ্ধ শাঙ্করগণ তাঁর ভোগা দেওয়া কথায় ভুলে গিয়েছে ব'লে বুদ্ধিমান যাঁরা তাঁরা সেই অসার বস্তুর চর্চ্চায় না গিয়ে শ্রুতির মুখ্যার্থের অনুসন্ধানমূলে সর্ব্বক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতের চর্চ্চা রসিকের সহিত করুন, তবেই জীবন সার্থক হ'বে, কৃষ্ণবস্তুকে বশীভূত ক'রতে পার্‌বেন। কৃষ্ণপ্রেমা পঞ্চমপুরুষার্থ এসে কৃষ্ণের প্রীতির সঙ্গে জীবেরও সর্ব্বপ্রকার প্রীতিবৈশিষ্ট্য উদিত হ'য়ে যাবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে কাশীবাসী সন্ন্যাসীরা বেদান্তের এইপ্রকার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনে একেবারে অবাক্ হ'য়ে তাঁকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জেনে স্তব কর্‌তে লাগ্‌ল এবং বল্‌লে, আপনাকে হীন মনে ক'রে যে-সমস্ত অপরাধ করেছি, সেগুলি কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করুন। আমরা আপনার শরণাগত হ'লাম। এই স্তব শুনে কৃষ্ণচৈতন্যদেব তা'দিগকে কৃষ্ণ নামানুগ্রহ দান কর্‌লেন এবং তারা এখন কৃষ্ণনাম সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ ক'রতে লাগল। তা'দের মন একেবারে বদলিয়ে গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়ে মধ্যস্থানে বসিয়ে হরিধ্বনির সহিত মহাপ্রসাদ সম্মান কর্‌লেন।

★★★★

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৮ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০১

ভগবদনুশীলন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অকুণ্ঠভাবে ও যথাযথ-রূপে এই সমগ্র পৃথিবীতে যতপ্রকার নাস্তিকতা আছে, তাহার স্বরূপ নিরপেক্ষ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। 'অস্তি' এমন বস্তুর অস্বীকারকারীই 'নাস্তিক' বলিয়া বর্ত্তমান ধর্ম্ম-প্রগল্‌ভতার যুগে অত্যন্ত আদর লাভ করায় গৌড়ীয়ের চেতনময়ী লেখনী সচলা হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্ত্যদেশে একটী প্রবাদ আছে,—"Pen is mighter than the sword," অর্থাৎ তরবারি অপেক্ষা লেখনী শক্তিশালিনী। পাশ্চাত্ত্যদেশ যাহারা অত্যন্ত জড়বাদী, তাহারা শব্দের এবম্বিধ প্রাধান্য কেমন করিয়া দিতে শিক্ষা করিল জানি না, তবে ভারতবর্ষের উন্নততম চিন্তায় শব্দের মাহাত্ম্য এবং স্বতঃপ্রামাণ্যের বহুল সংবাদ আমরা বেদাদি অপৌরুষেয় সাহিত্য হইতে জানিতে পারি। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের চূড়ান্ত বিচারের জন্য ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে নিকটাগত কলির মূর্ত্ত প্রতীক দুর্য্যোধন কার্ষ্ণ অর্জ্জুনাদির নিকট নিদারুণভাবে পরাজিত হইয়াছিল। সেইখানে আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যহ দশ সহস্র সৈন্য বধ করিতে প্রতিজ্ঞাকারী দ্রোণাচার্য্য "অশ্বত্থামা হতঃ" সামান্য এই শব্দদ্বয় শ্রবণ করিয়া অস্ত্র সঞ্চালনে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, "অশ্বত্থামা হতঃ" শব্দদ্বয়ের উচ্চারণকর্ত্তা কোনও জন-সামান্য ছিলেন না, দ্বাপরের ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির—যিনি ন্যায় নীতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনিই এই শব্দদ্বয়ের বাহক।

সুতরাং "Pen is mighter than the sword,"—এই প্রবাদটীর আলোচনা করিতে বসিয়া আমরা কোনপ্রকার নাস্তিক লোকের লেখনীর প্রশংসা করিব না, বা করিতে পারি না। নাস্তিক লোক প্রতিষ্ঠাকামী। 'অস্তি'-বস্তুর উপর মিথ্যা নঞর্থক ধারণা করা কোন সভ্যলোকের সমীচীন নহে। জড়ের সমীক্ষকই বলেন, জড়বস্তু ধ্বংসশীল। "অস্তি" এমন বস্তু ধ্বংসশীল নহে বলিয়াই জড় হইতে পারে না, উহা নিত্য। হরি ও জীবাত্মাই সেই বস্তু। অতএব ভগবানের অনুশীলন করিতে গিয়া আমরা নাস্তিকের নিকট ঋণ করিবার আশা পোষণ করি না। তবে স্বভাবগত দোষে আস্তিক লোকের নিকটও নাস্তিক ব্যক্তি পসার জমাইতে চায়—ইহাই হাস্যাস্পদ।

নাস্তিক লোক হরি-অন্বেষণের ভাণ করে কেন? ইহার উত্তর অতীব সহজ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৮ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০১

'অস্তি' কি তাহা জানিতে না পারিলে 'নাস্তি' বলা যাইবে না। সুতরাং হরি ও হরি-সম্বন্ধীয় বস্তুর দুয়ারে হানা দেওয়া নাস্তিক লোকের স্বভাব। সে সর্ব্বপ্রকারে হরি-বিরোধী কার্য্য করিতে থাকে। লেখনীকেও সে তাহার সহায়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। এইজন্য নাস্তিক লোকের লেখনী পাঠ করিয়া মানুষ ভগবদ্বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। যাহারা নাস্তিক হইতে চায়, অথচ জগতের নিকট নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে, তাহারা নাস্তিকের লেখায় যেখানে ঈশ্বরের বিষয়ে আলোচনা আছে তাহা পাঠ করে, ভোটের জোরে নাস্তিক লোককে ভক্ত দাঁড় করাইয়া আস্তিককেই নাস্তিক বলিতে চায়। নাস্তিকের শাস্ত্র-আলোচনা কপটতা মাত্র। ভ্রমর ও লুতাকীট উভয়েই ফুলে ফুলে ঘুরিয়া বেড়ায়। ভ্রমর ফুলের মধু অন্বেষণ করে, আর লুতাকীট ফুলকে নষ্ট করিবার জন্য মাৎসর্য্যপূর্ণ হৃদয়ে ফুলের উপর বসে। পাষণ্ডের শাস্ত্রালোচনাও তদ্রূপ। সম্প্রতিকালে কোন এক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদের মৃত্যুর পর সংবাদপত্রে দেখা গেল যে, তাঁহার শয্যার পার্শ্বে গীতা ধর্ম্মগ্রন্থখানি ছিল। অথচ তাঁহার সমস্ত জীবন ধরিয়া বলিয়াছেন, ধর্ম্ম কাপুরুষের জন্য। সুতরাং তিনি কিরূপে গীতা স্পর্শ করিতে পারেন? যদি ঘটনাটি সত্যও হয়, তবে উহা লুতাকীটের পুষ্পের উপর উপবেশন বুঝিতে হইবে।

একদেশে এক বিরাট্ ধনী লোক বাস করিত। লোকটী অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল এবং ধনী হইলেও খুব কৃপণ ছিল। উহার দুইজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিল। তাহারাও অত্যন্ত কৃপণ ছিল। একবার উক্ত ধনী লোকটী একটী উৎসব করিয়া স্বীয় কার্পণ্যদোষ অপনোদন করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু অর্থ ব্যয় না করিয়াই যাহাতে উৎসব হইতে পারে, সেই ইচ্ছা তাহার একেবারে নষ্ট হইল না। তথাপি তাহার কৃপণ কর্ম্মচারী দুইটীকে বাজারে পাঠাইল এবং বলিয়া দিল—খুব ভাল দ্রব্য বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিবে। ব্যয়কুণ্ঠ কর্ম্মচারী দুইটী পয়সা ব্যয় করিতে নারাজ। যাহা হউক, দুইজনে বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুইটী কৈফিয়ৎ দিল। একজন বলিল, বাজারে ভাল দ্রব্য নাই। আর একজন বলিল, বাজারে ভাল দ্রব্য বলিয়া কিছু দেখিলাম না, যাহা যাহা পাওয়া যাইতেছে সবই সমান বলিয়া বোধ হইল, একটী হইতে আর একটীর তফাৎ নাই। বুদ্ধিমান মালিক স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন হইল জানিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। তথাপি মৌখিক জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের উক্তি দুইপ্রকার হইলেও মূলতঃ একই ; কারণ কেহই আমাকে আমার আদিষ্ট দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিলে না।

ভগবদনুশীলনে রত হইয়া জগতের নাস্তিকগণ ঐ কৃপণ কর্ম্মচারিদ্বয়ের ন্যায় মন্তব্য করিয়া থাকে। যাহাতে যাহারা প্রকৃত ভগবদনুশীলন করিতে চাহে না, তাহারা আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং ঐ প্রকার মন্তব্যকেই ভগবৎসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার

করে। আমরা ঐপ্রকার দুইটী মতের সমানতা প্রদর্শন করিব। পূর্ব্ব মত দুইটীর একটীতে সরাসরি দ্রব্য নাই এবং অপরটীতে 'সব দ্রব্যই ভাল, ইহার সহিত অন্যের কোন পার্থক্য নাই' উক্ত হইয়াছে। প্রথমজন বোকা, সেইজন্য ভাল দ্রব্য নাই বলিয়া ধ্বনি তুলিয়াছে। বুদ্ধিমান এবং চাপা দ্বিতীয় কর্ম্মচারী চিন্তাসহকারে পরে উত্তর দিল যে, সমস্ত দ্রব্যই ভাল অর্থাৎ যাহা খুশী তাহাই ক্রয় করিতে পারা যায়। মূল ভাবটী এই যে, অধিক মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিবার আবশ্যকতা নাই। 'সব ধর্ম্মই সমান' উক্তিকারীও ঐরূপ।

কোন কোন নাস্তিক বলিয়া থাকে—ঈশ্বর নাই, পরলোক নাই। লোকায়ত (চার্ব্বাক) দর্শন এই শ্রেণীর। "যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ"—এই তাঁহার নীতি। চার্ব্বাক অত্যন্ত প্রত্যক্ষবাদী। কালক্রমে ঐ মত বিভিন্ন আচার্য্যকর্ত্তৃক ভীষণভাবে নিন্দিত হইলে বর্ত্তমানের নাস্তিকগণ লুতাকীটের পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। উক্ত দ্বিতীয় কর্ম্মচারিটীর ন্যায় তাহারা বলে, প্রত্যেকেই ভগবান্—Everybogy is God. শিক্ষিত সমাজ কি একটু বিচারও করিবেন না। **ভগবান্ নাই** এবং **প্রত্যেকেই ভগবান্**—উক্তিদ্বয় একই—ইহা নহে কি? প্রত্যেক জীবমাত্রই যদি ভগবান্ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভগবানের সেবা আর কে না করে? চেতন বস্তু-মাত্র জীব, প্রত্যেকে নিজ নিজ সুখ উৎপাদনে সচেষ্ট। সুতরাং ঈশ্বরসেবা ত' প্রত্যেকেরই হইল! এইসকল চিন্তা কি কপটতার আকর নহে? পরস্পরের মধ্যে ভেদ-বৈশিষ্ট্য না থাকিলে 'প্রত্যেক'-শব্দটীর সৃষ্টি কি করিয়া সম্ভব? যাহারা নাস্তিক হইতে চাহে, নাস্তিকতার বৃদ্ধিসাধনে যাহারা তৎপর, তাহারা ভিন্ন আর কে বলিবে যে জীবমাত্রই শিব, ভগবান্? বিশেষতঃ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে "জীবই ভগবান্" বলা স্ববিরোধ। যদি তাহাই হইত, সেই বিশ্বাস যদি তাহার প্রকৃতই থাকিত, তবে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন কেন? গৃহের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধুবর্গ সকলেই ত' ভগবান্—তাহাদের সেবা করিলেই ত' ভগবানের সেবা হইয়া যাইত! তবে আবার লাল কাপড় পরিবার কপটতা কেন? ইহা উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ জীবের উক্তি নহে কি? প্রত্যেকেই ভগবান্ আর প্রত্যেকের মধ্যেই ভগবান্ আছেন—এই দুইটী পৃথক্ কথা। প্রত্যেকের মধ্যে ভগবান্ আছেন বলিয়া প্রত্যেকের সেবাবিধান কি-প্রকারে ভগবানের সেবা হইতে পারে?

কুক্কুরগুলি বিষ্ঠা গ্রহণ করে এবং উহাদের জীবনও তাহাতে রক্ষিত হয়। সুতরাং বিষ্ঠাতেও মনুষ্যাদি জঙ্গম প্রাণীর জীবনধারণের উপাদানগুলি আছে বুঝা যায়, কিন্তু তজ্জন্য বিষ্ঠা মানুষ বা মানবেতর কোন উচ্চ প্রাণীর আহার্য্য হইতে পারে না এবং মানুষ যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার সহিত কুক্কুরের ভক্ষ্য বিষ্ঠা সমতুল্য হইতে পারে না। যদি কেহ সব খাদ্যদ্রব্যই সমান বলিয়া থাকে, সে পাগল বা তজ্জাতীয় কোন বিকৃতমস্তিষ্ক হইবে। তাহাকে মানুষ বলা কোনও ক্রমে যাইবে না, যাইতে পারে

না। সেই প্রকার একের বাঞ্ছাপূরক ধর্ম্মকে অন্যের ধর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান করা যায় না। যদি কেহ সেইরূপ উক্তি করিয়া থাকেন, তিনি পূর্ব্বের উদাহরণের শিকার হইবেন না কেন—সুধী পাঠকবর্গ তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিবেন। সুতরাং সব ধর্ম্ম সমান—ইহা কোন শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। প্রত্যেক জীবও ভগবান্ হইতে পারে না। এইরূপ উক্তি মিথ্যাবাদীরাই করিতে পারে। কোন পাত্রের মধ্যে তৈল আছে বলিয়া পাত্রটীই তৈল বা তৈলই পাত্র—এরূপ বলা যেমন মূর্খতা, তদ্রূপ জীবের মধ্যে ভগবান্ আছেন বলিয়া জীবই ভগবান্ বা ভগবান্ই জীব একথা বলা মূর্খতা। আধার ও আধেয় কখনই এক নহে। ইহাতে ভগবানের একত্বে বহুত্বের দোষও আপতিত হয়। সুতরাং ভগবান্ নাই এবং প্রত্যেকেই ভগবান্—ইহা একই কথা, উক্তিদ্বয়ে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই। ইহাই নাস্তিকতার প্রতীক।

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

অদৃষ্ট

সাধারণতঃ 'অদৃষ্ট' বলিতে ভাগ্য, নিয়তি, দৈব প্রভৃতিকে বুঝায়। কেহ কেহ জীবের কর্ম্মফলকেই 'অদৃষ্ট' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন। "পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে" অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের অর্জ্জিত কর্ম্মকেই অদৃষ্ট বা দৈব কহে। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে রহিয়াছে,—

লব্ধা নিমিত্তমব্যক্তং ব্যক্তাব্যক্তং ভবত্যুত।
যথাযোনি যথাবীজং স্বভাবেন বলীয়সা।। (ভাঃ ৬।১।৫৪)

"জীবকৃত পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্মসমূহই ফলোন্মুখ হইলে উহাকে 'অদৃষ্ট' বলা হয়। সেই অদৃষ্টই জীবের জন্মের মূল কারণ। অদৃষ্টকে লইয়া জীব প্রবল কর্ম্মবাসনারূপ পিতৃসদৃশ অথবা মাতৃসদৃশ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ লাভ করে।" ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বা পাপ ও পুণ্যভেদে অদৃষ্ট দ্বিবিধ। কথায় বলে,—"Man is the maker of own fate", বৈষ্ণব ব্যতীত প্রত্যেক জীবের অদৃষ্টলিপি জন্মকালেই লিখিত হইয়া যায়। জাতকের জন্মকালে অদৃষ্টপুরুষ অর্থাৎ ভাগ্য-নিয়ামক দেবতা অলক্ষ্যে তাহার অদৃষ্টে (পাপপুণ্য-কর্ম্মানুসারে) যেরূপ লিখিয়া দেন, তদনুসারে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়,—এইরূপ বিশ্বাস হইতে 'অদৃষ্টলিপি' শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। জগতের অনেকেই অদৃষ্টবাদী হইয়া থাকেন। 'অদৃষ্টবাদী' বলিতে ভাগ্যে যাহা আছে তাহা হইবে, এইরূপ বিশ্বাসী। বৈষ্ণবগণ অদৃষ্টপরায়ণ অর্থাৎ কেবলমাত্র ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল না হইয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকিয়া নিজেদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন। সুবুদ্ধি ব্যক্তিরই জীবন সফল ও সুখদায়ক হয়।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৮ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০১

গর্ভে উৎপত্তিকালীন অদৃষ্টের লিখনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কারণ। কোটী কোটী প্রাণী মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবদ্দশায় যে-সকল জগৎ দর্শন করেন, তন্মধ্যে যে জগতে বা যে দৃশ্যে যাহার আশা বা বাসা (বাসনা অর্থে সংস্কার) বদ্ধমূল হয়, মৃত্যুসময়ে তাহাদের হৃদয়াকাশে সেই দৃশ্যই উদিত অর্থাৎ স্ফুরিত হয় ও মরণানন্তর সে সেই দৃশ্য অর্থাৎ সেই জগৎ প্রাপ্ত হন। মনুষ্য, দেবতা প্রভৃতি পূর্ব্বে যেরূপ আকারসম্পন্ন ছিলেন, বর্ত্তমানে অন্য আকারে (দেহে) পরিদৃষ্ট হইতেছেন এবং পরেও পৃথক্ আকারে জন্মগ্রহণ করিবেন। সংসারে প্রত্যেক জীবই জন্মের পূর্ব্বে একরূপ থাকে, জন্মকালে একরূপ হয় ; আবার কতিপয় দিবস পরে অন্যরূপ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই সংসারে সদা একরূপ ও সুস্থির এইরূপ কিছুই বা কোনও বস্তু নাই। কূপ হইতে জলোত্তোলনকারী ঘট যেমন রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়া নিয়তই ঊর্দ্ধাধঃ গমন করিতে থাকে, সেইরূপ জীবও তৃষ্ণারজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া নিয়তই ঊর্দ্ধাধঃ ভ্রমণ করিতেছে। তৃষ্ণা হৃদয়রূপ পদ্মের ভ্রমরী। তৃষ্ণারূপিণী ভ্রমরী কখনও স্বর্গে, কখনও পাতালে, কখনও নরকে, কখনও নভস্থলে, কখনও বা দিক্‌কুঞ্জে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতেছে। ভ্রমণের হস্ত হইতে জীব পরিমুক্ত হইতে পারিতেছে না। পশু যদ্রূপ রজ্জুবদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছানুযায়ী বিচরণ করিতে অপারক হয়, সেইরূপ জীবসমূহও আশাপাশে বদ্ধ হইয়া স্বাধীনতাবিহীন হইয়া আছে।

মনুষ্য, দেবতাদি জীবসমূহ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। অদৃষ্টাধীন অর্থাৎ দৈববশ হইয়াই জীবগণ সংসার-চক্রে ঘুরপাক খাইয়া অশেষ দুঃখ লাভ করিতেছে। জীব পূর্ব্বজন্মের প্রাক্তন পাপকর্ম্মের ফল বা দণ্ডরূপ রোগাদি দুঃখ, ক্লেশ বা তাপসমূহ মাতৃগর্ভে বাসকালে প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গদ্বারা ভোগ করিয়া পূর্ব্ব-পাপের হিসাব নিকাশ দেয়। যেমন, দুঃখের সময় দুঃখ হয়, হইলে লোকসকল 'আঃ কি কষ্ট!' এইরূপ বলিয়া থাকে, সেইরূপ প্রাক্তন কর্ম্মের অনুসরণ করিয়াই 'হা অদৃষ্ট' এইরূপ বলিয়া থাকে। বদ্ধজীব স্ব-স্ব-বাসনাযোগে কর্ম্মফল ভোগের আবাহন করে বলিয়া সকল জীবেরই দিন বা কাল একইভাবে অতিবাহিত হইতেছে। সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মফলে সুখ-দুঃখাদি লাভ করিয়া প্রপঞ্চে বাস করিতেছে। কালবিশেষে প্রভূতবলশালী ও সমধিক ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন জীব জন্মগ্রহণ করে, আবার অদৃষ্টচক্রে তজ্জাতীয় জীবদিগের বলবীর্য্যাদি হ্রাস হইয়া থাকে। অদৃষ্টক্রমে আজ যিনি পৃথিবী শাসন করিতেছেন, দুইদিন পরে হয়ত দেখা যাইবে তিনি বন্দী অবস্থায় অন্ধকার কারগারের মধ্যে অতি দুঃখে জীবনযাপন করিতেছেন। এই সংসারে বহু বৈভবশালী পুরুষ নিজ কর্ম্মফলের দোষে দরিদ্র হইয়াছেন এবং বহু দরিদ্র ব্যক্তিও নিজ কর্ম্মপ্রভাবে বিত্তশালী হইয়াছেন।

এই সংসারে স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে কেহ রাজেন্দ্র হইয়া দিব্যযানে গমন করে, কেহ

উত্তম গজে গমন করে, কেহ পশুর ন্যায় মনুষ্যদিগের বাহন হইয়া থাকে। কেহ বা পশু-পক্ষী যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, কেহ বা কীট-পতঙ্গাদি হইয়া দুঃখ ভোগ করে, কেহ বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে সাধু-সন্ন্যাসী হয়, কেহ বা অসৎকর্ম্মফলে পাপপরায়ণ নরঘাতক হয়। কেহ বা প্রচুর ধনরত্ন দান করিয়া শেষ করিতে পারে না, কাহারও বা কেবল ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কেহ বা সুরম্য সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে, কাহারও বা ছিন্ন বসন পরিধান করিয়া দিন অতিবাহিত হইয়া থাকে। কেহ বস্ত্রহীন ও অনাহারী, কেহ বা অমৃতভোজী হয়। কেহ অতি কমনীয় শ্রীসম্পন্ন হয়, কেহ বা গলৎকুষ্ঠী হইয়া থাকে। অদৃষ্টের পরিহাসে কেহ কুব্জা, কেহ অঙ্গহীন, কেহ বেঁটে, কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ, কেহ বধির হয়। অদৃষ্টক্রমে কাহাকেও কৃষ্ণবর্ণ, কাহাকেও গৌরবর্ণ, কাহাকেও বা শ্যামবর্ণবিশিষ্ট হইতে দেখা যায়। স্বকর্ম্মদ্বরা কেহ স্বর্গলোক, কেহ শিবলোক, কেহ ব্রহ্মলোক, কেহ যমলোক প্রাপ্ত হয়। কেহ বা ভয়ানক নরকে নিপতিত হইয়া যমদূতগণের তাড়নায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় সর্ব্বদা জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। কেহ কর্ম্মানুসারে বিষ্ঠার কীট হইয়া বিষ্ঠা-শ্লেষ্মা ইত্যাদি ভক্ষণ করে। মঙ্গলহস্তী যে কখনও কখনও ভিক্ষুককে রাজা করে, তাহার কারণ—তাহারই বলবৎ প্রাক্তন কর্ম্মফল। এতৎপ্রসঙ্গে ভক্তকবি প্রেমদাস গাহিয়াছেন,—

যে যেমন কর্ম্ম করে, তেমনি ভুঞ্জায়ে তারে,
ভাবিয়া দেখিলে সব হেথা।।
কেহ ঘোড়ায় দোলায় চড়ে, কেহ স্কন্ধে বহে কারে,
ছত্র ধরি' কেহ চলে পথে।
কেহ কর্ম্ম-অনুসারে, জন্ম ভরি' কারাগারে,
কারো বিষ্ঠা কেহ বহে মাথে।।
শত সহস্রাযুত লক্ষ, কেহ পালে দিয়া ভক্ষ্য,
উদর ভরিতে কেহ নারে।
এখানে দেখিছ যেবা, পরে যা' তা' জানে কেবা,
বিধাতার মনে সে বিচারে।।
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ, প্রেত-পিশাচ-দৈত্য-রক্ষ,
স্বভাবে সকল পরচার।
যাহার যেমন মত, সেই কর্ম্মে অনুরত,
সেইমত ভক্ষ্য সে আচার।।

অদৃষ্টানুসারে অর্থাৎ ভাগ্যানুসারে জীবের সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, ভয়, মৃত্যু, অকালমৃত্যু, দীর্ঘায়ু প্রভৃতি হইয়া থাকে। আয়ু থাকিলে কাহারও সমুদ্রে, অগ্নিরাশিতে, বিষভক্ষণে, অস্ত্রে ও শস্ত্রে প্রাণনাশ হয় না। সময় না হইলে শতশরে বিদ্ধ হইলেও

কাহারও মৃত্যু ঘটে না, কিন্তু কাল উপস্থিত হইলে তৃণের আঘাতে জীবের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কাহারও গর্ভমৃত্যু ঘটে, কেহ বা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র প্রাণত্যাগ করে, কেহ শিশুকালেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে, কেহ বা পূর্ণ যৌবন অবস্থাতেই সংসারাটবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে, কেহ বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুকে বরণ করে।

অতএব দেখা যাইতেছে, কর্ম্মফলানুসারেই কেহ বা চিরজীবী, কেহ রোগগ্রস্ত, কেহ নিরোগ, কেহ ধনী, কেহ বা দরিদ্র হইয়া থাকে।

ভগবান্ যাহার জন্য যে খাদ্য নির্দ্ধারণ করিয়া রাখেন, তাহাই তিনি প্রাপ্ত হন। ভগবান্ যে ফলদাতা তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। জীব—ভবিষ্যদ্দৃষ্টি বঞ্চিত, আর জীবের যাহা 'অদৃষ্ট' তাহা ভগবানের পরিজ্ঞাত বিষয়। "এই কর্ম্ম শুভজনক"—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মানবগণ তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় এবং পরে অশুভ বলিয়া বোধ হইলেও দুর্দ্দৈববশতঃ তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত তাঁহারা সেবাসুখ লাভ করিয়া বহিঃপ্রতীত দুঃখকেও সুখজ্ঞানে অবিমিশ্র সুখে কালযাপন করেন, আর যাহারা ভগবৎ-সেবেতর জড়ভোগে নিরত, তাহারা নশ্বর মিশ্র সুখদুঃখে দিন কাটায়। এই সংসারে দুঃখই অনন্ত, সুখ তৃণকণার ন্যায় অল্প, তাহা অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর এবং তাহাই আবার অশেষ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। সেই কারণে অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ দুঃখানুবিদ্ধ ক্ষণিক সাংসারিক সুখের প্রতি আস্থা স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে।

প্রাকৃত সদসৎকর্ম্মফলে বদ্ধজীব উচ্চাবচ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, উহা কেবল জীবের কর্ম্মফল ভোগের নিদর্শন মাত্র। পরমার্থ-বিচারে—জাতি বা প্রাকৃত বংশমর্য্যাদার কোন মূল্যই নাই। এই প্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"কর্ম্মফলের উত্তমতার বা অধমতার নির্দ্দেশ উত্তম বা অধমবংশে উদ্ভবের দ্বারা নিরূপিত হয়, কিন্তু জীব স্বরূপতঃ বিষ্ণুভক্ত বলিয়া তাৎকালিক বংশ পরিচয়ে ছোট বা বড় থাকিলেও ভগবদ্ভক্তির পরিমাণ অনুসারেই উত্তম বা অধম শব্দ-বাচ্য হইবেন, ইহাই সকল সাত্বত শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে গান করেন। নিম্নকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে জীবের বিষ্ণুভক্তির অধিকার হইবে না, এরূপ নহে। অবরকুলজাত ব্যক্তি বৈষ্ণব হইলে উচ্চকুলোদ্ভূত অভক্তেরও পূজ্য।" সৎকর্ম্মফলে অতি উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভগবদ্ভজনে পরাঙ্মুখ হইলে তাহার নরকলাভ অবশ্যম্ভাবী।

ভোগে, ধর্ম্মে বা পুণ্যে ও অধর্ম্মে বা পাপে অর্থ ব্যয় করিলে জন্মজন্মান্তর স্বর্গ ও নরক লাভ হয়। কিন্তু উহা ভগবদারাধনায় অর্থাৎ ভগবানের ও ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইলে ভক্তিলাভ হয়। ভক্তিলাভই জীবের পরমসিদ্ধিলাভ। শ্রীকৃষ্ণভজনই সকল মঙ্গলের মঙ্গল। ইহা কর্ম্মফলভোগ রোগের মহৌষধ ও ভব-বন্ধন ছেদনকারী।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৮ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০১

পিতা ও মাতা সন্তানের কর্ম্মমূল ছেদন করিতে পারেন না, সদ্‌গুরুই কেবলমাত্র কর্ম্মমূল ছেদনে সক্ষম। অত্যল্প সময়ের জন্যও কোন জীব জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত মহা সৌভাগ্যফলে সাধুসঙ্গ লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিবেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৮ পৃষ্ঠার পর]

তিনদিন পরে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। গোপাল চক্রবর্ত্তীর গলিত কুষ্ঠ হইল। তাহার উচ্চ নাসিকা গলিয়া পড়িল, হাত-পায়ের আঙ্গুল কুঁকড়াইয়া গেল। গলিত কুষ্ঠের অসহ্য যন্ত্রণায় বিপ্র কাতর হইয়া পড়িল। যদিও হরিদাস ঠাকুর তাহার দোষ গ্রহণ করেন নাই, তথাপি কৃষ্ণ তাহার ফলভোগ করাইলেন। কারণ কৃষ্ণ বৈষ্ণব-অপরাধ সহ্য করিতে পারেন না। বিপ্রের দুঃখ শুনিয়া হরিদাস মনে খুবই ব্যথা পাইলেন এবং সেই স্থান ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আসিলেন। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি আচার্য্যকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলে আচার্য্য তাঁহাকে সসম্মানে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি গঙ্গার তীরে হরিদাসকে একটী গোফা করিয়া দিলেন এবং গীতা-ভাগবত প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। ঠাকুর আচার্য্যের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন এবং উভয়ে কৃষ্ণকথায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। হরিদাস ঠাকুর একদিন অদ্বৈতাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—গোসাঞি প্রভু! আমি আপনার নিকট একটী নিবেদন করিতেছি। আপনি কি কারণেই বা আমাকে প্রত্যহ অন্ন দিতেছেন? এখানে কত মহা মহা কুলীন ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন। আপনি আমার মত এমন একজন অকুলীন অপাত্রকে আদর আপ্যায়ন করিতেছেন, অলৌকিক আচার করিতেছেন—ইহাতে আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করিতেছি। প্রভো! আপনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কুলচূড়ামণি, যাহাতে আপনার কোন অপযশ না হয়, তাহাই করিবেন।" এই কথা শুনিয়া আচার্য্য কহিলেন,—"হরিদাস! তুমি বিন্দুমাত্র চিন্তা করিও না। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুসারেই আমি আচরণ করিয়া থাকি।" এক শ্রাদ্ধদিবসে অদ্বৈতপ্রভু হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করাইলেন এবং বলিলেন,—"তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।"

একদিন হরিদাস গোফায় বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নামসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। জ্যোৎস্না-বতী রাত্রিতে চতুর্দ্দিক আলোয় ঝলমল করিতেছে। গঙ্গায় চন্দ্রকিরণ পড়ায় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার হইয়াছে। ঠাকুর তুলসীদেবীর সম্মুখে বসিয়া নাম করিতেছেন। সেইসময়

এক অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গচ্ছটায় চারিদিক আলোকিত হইয়া গেল এবং তাঁহার অঙ্গগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল। তিনি আসিয়া তুলসীকে নমস্কার করিয়া পরিক্রমা করিলেন এবং হাতযোড় করিয়া হরিদাসের চরণ বন্দনা করিয়া মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন,—"তুমি জগদ্বন্ধু। তোমার রূপের তুলনা নাই। তোমার সঙ্গ লাভ করিবার জন্য খুবই উৎসুক হইয়া আমি আসিয়াছি। তুমি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে অঙ্গীকার করিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর।"—এই বলিয়া তিনি নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঐ রমণীকে দর্শন করিলে মুনিগণেরও ধৈর্য্যনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু হরিদাস ঠাকুর নির্ব্বিকার। তিনি তাঁহার প্রতি করুণা পরবশ হইয়া বলিলেন,—"আমি সংখ্যানাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই কীর্ত্তনযজ্ঞ সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার অন্য কোন কৃত্য নাই। তুমি দ্বারে বসিয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ কর। নাম সমাপ্ত হইলেই তোমার প্রতি প্রীতি আচরণ অবশ্যই করিব।" এই বলিয়া তিনি নামে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই রমণী দ্বারে বসিয়া নাম শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রাতঃকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাতঃকাল দেখিয়া রমণীটি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এমনভাবে তিনদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া নামগানে বিভোর। তৃতীয় দিবসের রাত্রিও শেষ হইয়া গেল। রমণী অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন,—"তুমি আমাকে আশ্বাস দিয়া তিনদিনই বঞ্চনা করিলে। তোমার আর নাম সমাপ্ত হইতেছে না।" ঠাকুর কহিলেন,—"কি করিব, আমি নিয়ম করিয়াছি, নিয়মের ব্যতিক্রম কি করিয়া করি?" তখন সেই নারী তাঁহার নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন,—"আমি মায়া। তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। ব্রহ্মাদি সকলকেই আমি অনায়াসে মোহিত করিয়াছি। কিন্তু কেবলমাত্র তোমাকে মোহিত করিতে পারিলাম না। তুমি মহাভাগবত। বহুভাগ্যফলে তোমার শ্রীমুখে শুদ্ধ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত শুদ্ধ হইল। এখন তুমি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে কৃষ্ণ উপদেশ করিয়া আমার মঙ্গল বিধান কর। আমি পূর্ব্বে শিবের নিকট হইতে রামনাম প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন তোমার নিকট হইতে কৃষ্ণনাম লইবার আমার অভিলাষ হইতেছে। তুমি আমাকে কৃষ্ণনাম প্রদান করিয়া আমার জীবন ধন্য কর এবং নাম-প্রেম-বন্যায় আমাকে ভাসাইয়া দাও।" এই বলিয়া মায়াদেবী হরিদাসের শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করিবার উপদেশ প্রদান করিলে মায়া অনায়াসে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নীলাচলে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। প্রভুও তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। এইভাবে নীলাচলে হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে বাস করিতে লাগিলেন এবং নামভজনে নিমগ্ন রহিলেন।

একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া হরিদাসকে দিতে আসিলেন। আসিয়া

দেখেন,—ঠাকুর শুইয়া আছেন এবং মন্দ মন্দ সংখ্যানাম করিতেছেন। গোবিন্দ তাঁহাকে প্রসাদ ভোজনের জন্য ডাকিলে হরিদাস সেদিন লঙ্ঘনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"আজ আমার সংখ্যা কীর্ত্তন পূরণ হয় নাই। কি করিয়া বা আহার করি! আবার মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, তাহাও বা কি করিয়া উপেক্ষা করি!"—এই বলিয়া তিনি মহাপ্রসাদের বন্দনা করিলেন এবং এক কণা লইয়া ভক্ষণ করিলেন।

আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাসের নিকট আগমন করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—'প্রভো! আমার শরীর সুস্থ আছে, কিন্তু বুদ্ধি ও মন অসুস্থ বলিয়া অনুভব করিতেছি।" প্রভু তাঁহাকে তাঁহার ব্যাধির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সম্প্রতি তাঁহার সংখ্যানাম পূরণ হইতেছে না বলায় মহাপ্রভু বলিলেন,—"হরিদাস তুমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, সংখ্যা অল্প কর। তুমি ত' সিদ্ধ মহাপুরুষ। সাধনে এত আগ্রহ প্রকাশ কেন করিতেছ? জগতের লোককে নিস্তার করিবার জন্যই এবং নামের মহিমা জগতে প্রচার করিবার জন্যই তুমি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছ। সুতরাং আমি বলিতেছি,—অল্প সংখ্যা করিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন করিও।"

হরিদাস ঠাকুর অশ্রুসিক্ত নয়নে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রভুকে নিবেদন করিলেন,—"প্রভো! আমার হীনকুলে জন্ম। আমার এই শরীর অতীব নিন্দনীয়। সর্ব্বদাই আমি হীনকর্ম্মে রত। আমি লোকের অদৃশ্য, অস্পৃশ্য। আমার মত এমন অধম পামরকে আপনি কৃপাপূর্ব্বক দাসত্বে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং রৌরব হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। আপনি স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র ঈশ্বর। আমি আপনার অনুগ্রহের কথা আর কি বলিব। ম্লেচ্ছ হইয়াও আমি বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করিয়াছি। যাহা হউক, প্রভো! বহুদিন হইতে আমার একটী বাসনা। আমাকে যেন আপনার লীলাসম্বরণ দেখিতে না হয়। তাহার পূর্ব্বেই আমি যেন চলিয়া যাইতে পারি। আমার শেষ সময়ে আমি আপনার অভয় শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিব। নয়নে আপনার চাঁদমুখ নিরীক্ষণ করিব। ঐ সময় জিহ্বায় আপনার "কৃষ্ণচৈতন্য" নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই প্রাণ আমি ছাড়িয়া দিব। আমার অন্তিম বাসনা আপনি পূরণ করুন প্রভু। আমার এই নীচ দেহ যেন আপনার সম্মুখে ত্যাগ করিতে পারি। হরিদাসের এইকথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু গদ্গদ স্বরে কহিলেন,—"হরিদাস! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। তুমি যাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে কৃপাময় কৃষ্ণ অবশ্যই তাহা পূরণ করিবেন। কিন্তু হরিদাস! আমার তোমাকে লইয়াই সব কিছু সুখ। আমাকে ছাড়িয়া তোমার যাওয়া ঠিক হইবে না।" হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া নিবেদন করিলেন,—"প্রভু! আর মায়া করিও না। এই অধমের শেষ বাসনা দয়া করিয়া পূরণ করুন। তোমার কত শত শ্রেষ্ঠ পার্ষদ শিরোমণিগণ রহিয়াছেন। আমার ন্যায় একটী কীট চলিয়া গেলে কোনই ক্ষতি হইবে না।" শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৮ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০১

পরদিবস প্রাতঃকালে ভক্তগণসহ মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন। হরিদাস তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া সমস্ত ভক্তগণের চরণ বন্দনা করিলেন। প্রভু তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—"তোমার যাহা আজ্ঞা তাহাই হউক।" তখন হরিদাসের ভজন কুটীরের অঙ্গনে মহাপ্রভু ভক্তগণসহ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। স্বরূপ গোসাঞি প্রভৃতি হরিদাসকে পরিক্রমা করিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করিতেছেন। মহাপ্রভু রামানন্দ, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি সকলের নিকট হরিদাসের গুণগান করিতে করিতে পঞ্চমুখ হইয়াছেন। সমস্ত ভক্তবৃন্দ ইহাতে বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং তাঁহারা তাঁহার চরণ বন্দনা করিতে লাগিলেন।

হরিদাস ঠাকুর তাঁহার নিজের সম্মুখে মহাপ্রভুকে বসাইলেন এবং অপলক নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নেত্র হইতে অবিরল অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" শব্দ করিতে করিতে নামের সহিত তিনি প্রাণত্যাগ করিয়া দিলেন। হরিদাসের এইপ্রকার মহা যোগেশ্বরের ন্যায় স্বচ্ছন্দমরণ দর্শন করিয়া সকলের স্মৃতিপটে ভীষ্মের নির্য্যাণের কথা উদিত হইল। হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণকালে সমস্ত ভক্তগণের হরি-কৃষ্ণ-শব্দে সেইস্থান মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রেমানন্দে মহাপ্রভু বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তগণসহ মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিতে করিতে হরিদাসের চিন্ময় কলেবর সমুদ্রে লইয়া গেলেন এবং সমুদ্রজলে স্নান করাইয়া কহিলেন,—আজ হরিদাসের স্পর্শে সমুদ্র মহাতীর্থে পরিণত হইল। ভক্তগণ হরিদাসের পাদোদক পান করিলেন এবং তাঁহার অঙ্গে প্রসাদ চন্দন দিলেন। ডোর, কড়ার, প্রসাদ, বস্ত্র অঙ্গে দিয়া বালি গর্ত্ত করিয়া হরিদাসকে শয়ন করাইলেন। চারিদিকে ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু হরিবোল হরিবোল বলিয়া স্বহস্তে বালু দিয়া ঠাকুরকে সমাধিস্থ করিলেন এবং সেখানে সমাধিপীঠ নির্ম্মাণ করিলেন। হরিদাস ঠাকুরকে সমুদ্রতীরে সমাধি দিয়া মহাপ্রভু ভক্তগণসহ নৃত্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং সকলে সমুদ্রে স্নান করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করিয়া সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হরিদাসের বিরহ-মহোৎসবের জন্য সিংহদ্বারে আসিয়া মহাপ্রভু নিজে আঁচল পাতিয়া সকলের নিকট ভিক্ষা মাগিতে লাগিলেন। সকলেই আনন্দ অন্তঃকরণে প্রভুকে ভিক্ষা দিতে আসিলে স্বরূপ গোসাঞি তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে মহোৎসব-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। চারি বৈষ্ণবসহ পশ্চাদ্‌গামী লোককে সঙ্গে লইয়া স্বরূপ গোসাঞি সমস্ত দোকানে গিয়া দোকানদার-গণের নিকট হইতে প্রচুর প্রসাদ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিলেন। বাণীনাথ পট্টনায়েক এবং কাশীমিশ্রও অনেক প্রসাদ পাঠাইলেন। হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসবে সমস্ত বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রভু স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া সেবা করাইলেন। এক এক বৈষ্ণবকে

পাঁচ সাত জনের আহার্য্য দ্রব্য দিতে লাগিলেন। স্বরূপ দামোদর প্রভুকে পরিবেশনের কার্য্য হইতে বিরত করিয়া তিনি জগদানন্দ, কাশীশ্বর ও শঙ্করকে লইয়া চারিজনে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। পুরী, ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণসহ মহাপ্রভু প্রসাদ সম্মান করিলেন। সমস্ত ভক্তগণ আকণ্ঠ পুরিয়া ভোজন করিয়া আচমন করিলে মহাপ্রভু নিজহস্তে সকলকে চন্দনযুক্ত মালা পরাইলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইয়া বরদান করিলেন। তিনি বলিলেন,—"হরিদাসের বিরহ-উৎসব বা বিজয়োৎসব যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, নৃত্য-গীত করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাকে বালুকা দিয়াছেন এবং মহোৎসবে ভোজন করিয়াছেন, অচিরকালমধ্যেই তাঁহাদের সকলের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে। হরিদাসের দর্শনের এইপ্রকার শক্তি।"

মহাপ্রভু হরিদাসের বিরহে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ ভঙ্গ।।

হরিদাসের যখনই চলিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল, তখনই তিনি চলিয়া গেলেন। আমার তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা হইল না। তিনি পৃথিবীর শিরোমণি ছিলেন। আজ তাঁহাকে হারাইয়া মেদিনী রত্নশূন্য হইয়া গেল।" প্রভু "জয় জয় হরিদাস" বলিয়া গাহিতে লাগিলেন। তাঁহার আনুগত্যে ভক্তগণ "জয় জয় হরিদাস" বলিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ।।" (চৈঃ চঃ অঃ ১১।১)

আমি হরিদাসকে নমস্কার করি এবং তাঁহার প্রভু সেই চৈতন্যদেবকে নমস্কার করি—যিনি হরিদাসের দেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

জয় নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কি জয়।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

—শ্রীহরিদাস রায় (ভক্তিশাস্ত্রী)

সাধুসঙ্গে দক্ষিণ ভারত তীর্থ দর্শন

আগামী ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৪০৮ (ইং ৩রা ডিসেম্বর, ২০০১)

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

✆ ৪০০৬৮

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীবিগ্রহ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২২ পৃষ্ঠার পর]

" 'শূকর শূকর' বলি' প্রভু চলি' যায়।
স্তম্ভিত মুরারিগুপ্ত চতুর্দ্দিকে চায়।।
বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইল বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে দেখেন জলভাজন সুন্দর।।
বরাহ-আকর প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে।।
গর্জ্জে যজ্ঞ-বরাহ প্রকাশে খুর চারি।
প্রভু বলে,—"মোর স্তুতি করহ মুরারি।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।২১-২৪)

একদিবস প্রভু বরাহ-আখ্যান শ্রবণ করিয়া বরাহের আবেশে মুরারিগুপ্তের গৃহে প্রবেশ করিয়া বরাহমূর্ত্তি প্রকট করেন। 'শূকর শূকর' বলিতে বলিতে প্রভু মুরারিগুপ্তের বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। বিষ্ণুগৃহে একটী বৃহৎ জলপাত্রে জল দেখিয়া দন্তদ্বারা জল-পাত্র উত্তোলন করিলেন। তৎকালে মুরারি প্রভুকে যজ্ঞবরাহরূপে দর্শন করিলেন। বরাহদেব বিষ্ণুর অবতার। ভগবান্ গৌরসুন্দরের অবতার বিশেষ হওয়ায় বরাহ-আখ্যান শ্রবণে বরাহের আবেশে শ্রীগৌরসুন্দর বরাহলীলার প্রাকট্য সাধন করিলেন।

"শঙ্করের গুণ শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর-মূর্ত্তি দিব্য-জটাধর।।" (চৈঃ ভাঃ মঃ ৮।৯৮)

শিবের এক গায়ন-এর মুখে শিব-গীত শ্রবণে মহাপ্রভুর শঙ্করাবেশ। জটাধারী শঙ্করমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গায়ন-এর স্কন্ধে আরোহণ করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু ষড়্ভুজ দর্শনের বর্ণনা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দুই প্রকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আমরা দেখিতে পাই,—

'শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল-মুষল।
দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইলা নিতাই বিহ্বল ।।
ষড়্ভুজ দেখি' মূর্চ্ছা পাইলা নিতাই।
পড়িলা পৃথিবীতলে ধাতু-মাত্র নাই।।" (চৈঃ ভাঃ মঃ ৫।৯৩-৯৪)

ষড়্ভুজধারী গৌরসুন্দরের ছয়টী হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, হল ও মুষল। এইরূপ প্রদর্শন করায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রেম-বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শ্রীনারায়ণের অস্ত্র। আবার হল ও মুষল শ্রীবলরামের অস্ত্র। ইহা হইতে

ইহাই সহজে অনুমেয় যে, এক গৌরাঙ্গ বিগ্রহে শ্রীনারায়ণ ও শ্রীবলরামের দুই ভগবৎ-স্বরূপের সমন্বয় ঘটিয়াছে।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা পাই,—

"প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শার্ঙ্গ বেণুধর।।
পাছে চতুর্ভুজ হৈলা, তিন অঙ্গ বক্র।
দুই হস্তে বেণু বাজায়, দুই হস্তে শঙ্খ, চক্র।।
তবে ত' দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।
শ্যাম-অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন।।" (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।১৩-১৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দকে যে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করান, সেই মূর্ত্তির ছয়টী হস্তে ছয়টী বস্তু—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গ (এক প্রকার ধনুকের নাম) ও বেণু। দ্বারকানাথের অস্ত্র—শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, মথুরানাথের অস্ত্র—শার্ঙ্গ এবং ব্রজনাথের অস্ত্র—বেণু। ইহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শচীনন্দন বিগ্রহ দ্বারকানাথ, মথুরানাথ ও ব্রজনাথের মিলিত বিগ্রহ। ষড়্ভুজ প্রকটনের পর শ্রীনিত্যানন্দকে মহাপ্রভু চতুর্ভুজরূপ দেখাইলেন। এই চতুর্ভুজরূপের তিন অঙ্গ বক্র—গ্রীবা, কটি ও জানু। এক হস্তে শঙ্খ, এক হস্তে চক্র এবং অপর দুই হস্তে বেণু বাজাইতেছেন। এই চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উভয়ই প্রকটিত হইয়াছে। শঙ্খ-চক্রদ্বারা ঐশ্বর্য্য আর ত্রিভঙ্গ বেণুবাদনদ্বারা মাধুর্য্যের প্রকাশ ঘটিয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দকে এই মূর্ত্তি প্রদর্শনের মধ্য দিয়া মহাপ্রভু প্রমাণ করিয়াছেন—তিনি একাধারে মাধুর্য্যময় ব্রজনাথ, অপরদিকে ঐশ্বর্য্যময় দ্বারকানাথ উভয়ই। ইহার পর চতুর্ভুজরূপ অপসারণ করিয়া বংশীবাদক দ্বিভুজ ব্রজেন্দ্রনন্দন রূপ প্রকটিত করেন। বর্ণ তাঁহার শ্যাম, পরিধানে পীতবসন।

শ্রীগৌরসুন্দর রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ষড়্ভুজরূপে দর্শন দিয়াছিলেন। এই ষড়্ভুজ কেমন? "ঊর্দ্ধং হস্তদ্বয়মপি ধনুর্বাণযুক্তং চ মধ্যং বংশীবক্ষঃস্থল বিনিহিত-মুত্তমং গৌরচন্দ্রঃ। শেষহস্তদ্বয়ঞ্চ পরমসুমধুরং নৃত্যাবেশং সবিভ্রৎ এবং শ্রীগৌরচন্দ্রং নৃপপতিরখিলং প্রেমপূর্ণ দদর্শঃ।" (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ ৪।১৬।১৫)। এই ষড়্ভুজ মূর্ত্তির ঊর্দ্ধ দুই বাহুতে ধনুর্ব্বাণ, বক্ষঃস্থলে মধ্য দুই বাহু বংশীবাদনে রত এবং শেষ দুই বাহু নৃত্যভঙ্গী প্রকাশে নিযুক্ত।

সার্ব্বভৌমও মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজরূপ দর্শন করেন।

সার্ব্বভৌম-প্রতি আগে করি' পরিহাস।
শেষে সার্ব্বভৌমেরে ষড়্ভুজ প্রকাশ।। (চৈঃ ভাঃ আঃ ১।১৫৯)

বেদান্তের মায়াবাদী ভাষ্য সার্ব্বভৌমের নিকট শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর পরিহাস করিয়াছিলেন। তৎপর মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়াছিলেন।

এই ষড়্ভুজ হইল রামলীলার ভুজদ্বয়, কৃষ্ণলীলার ভুজদ্বয় ও গৌরলীলার ভুজদ্বয় তত্তদুচিত অস্ত্রাদির সহিত প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাবলম্বনে আমরা জানিতে পারি যে, সার্ব্বভৌমকে পূর্ব্বে চতুর্ভুজরূপ ও পরে দ্বিভুজরূপ শ্রীগৌরসুন্দর প্রদর্শন করাইয়াছিলেন।

"দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ।।" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।২০৩)

শ্রীগৌরসুন্দর প্রথমে সার্ব্বভৌমকে ঐশ্বর্য্যাত্মক চতুর্ভুজরূপ, তৎপরে মাধুর্য্যাত্মক দ্বিভুজরূপ দেখাইলেন। ঐশ্বর্য্যাত্মক চতুর্ভুজরূপ—শ্রীনারায়ণরূপ, মাধুর্য্যাত্মক দ্বিভুজরূপ—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপ। এইভাবে প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হইল গৌরসুন্দর সার্ব্বভৌমকে বুঝাইয়া দিলেন যে, দ্বাপরে কংসের কারাগারে যিনি চতুর্ভুজরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন তিনি আমি, আবার দ্বাপরে দ্বিভুজ গোপবেশ বেণুকর-নবকিশোর-নটবররূপে যিনি লীলা করিয়াছেন, তিনিও আমি। সুতরাং এক গৌরবিগ্রহে চতুর্ভুজরূপে নারায়ণ ও দ্বিভুজরূপ শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান।

সমস্ত ভগবৎস্বরূপ শচীনন্দন বিগ্রহে বর্ত্তমান।

"পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে।।
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার, যত আছে আর।।
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১০-১২)

পূর্ণ ভগবান্ যখন জগতে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার সহিত সকল ভগবৎস্বরূপও অবতীর্ণ হন। সকল ভগবৎস্বরূপ স্বয়ং ভগবানের অংশ। গৌরসুন্দর পূর্ণ ভগবান্—স্বয়ং ভগবান্। ব্রজের তনয় কৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্যামসুন্দরই গৌরসুন্দর। "একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ।"—এই তত্ত্বটি গৌরসুন্দরও প্রকটিত করিয়াছেন। পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গে নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদি অংশাবতারসকল, যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার সকলই অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই সৌভাগ্যবান্ ভক্তগণ শচীনন্দন-দেহে লক্ষ্মী-রুক্মিণী-ভাগবতী, বলরাম, বরাহ, নারায়ণ, শিব, কৃষ্ণ, বিশ্বরূপ, রাম-সীতা-লক্ষ্মণ, মৎস্য-কূর্ম্ম-নৃসিংহ-বামন-বুদ্ধ-কল্কি প্রভৃতিরূপে দর্শন করিয়াছেন এবং দর্শনকালে গৌরসুন্দরের দেহ না দেখিয়া তৎস্থলে তত্তৎ ভগবৎস্বরূপের রূপই দেখিয়াছেন।

সকল গৌড়ীয় মঠে শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দরের বিগ্রহ পূজিত হইয়া থাকেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের উন্নতোজ্জ্বল রসের বিলাস ও শ্রীমতী রাধারাণীর মহিমা,

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আদর্শ শিক্ষা ব্যতিরেকে কেহই জানিতে সমর্থ হন না। অতএব মহাপ্রভুর আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণের সেবা করাই গৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য। আর এই কারণেই গৌড়ীয় মঠে শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দরের বিগ্রহ পূজিত হইয়া থাকেন।

—শ্রীভবতারণ দাসাধিকারী

শ্রীরাধাষ্টমী সর্ব্বতিথি-সার কেন?

সর্ব্বাদ্যা সর্ব্বশক্তিস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও অধিক বন্ধ্যা। স্বয়ং রাধাকান্ত শ্রীরাধিকার অনুগামী এবং তাঁর ধ্যেয়। শ্রীকৃষ্ণের সুচিরকাল আরাধনায় যে অভীষ্ট লাভ হয়, শ্রীরাধার স্বল্পকালমাত্র আরাধনায় ততোধিক ফল লাভ হয়। সুতরাং শ্রীরাধার আবির্ভাব-তিথি সর্ব্ব তিথি অপেক্ষা বরীয়সী। সর্ব্বতিথিগণের সারশিরোমণি শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী। শ্রীমাধব হতে যেরূপ শাস্ত্রে মাধবপ্রেষ্ঠজনের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হয়েছে, সেইরূপ শ্রীমাধবতিথি হতে শ্রীমাধবদয়িতার আবির্ভাব-তিথিরও অধিক মহত্ত্ব শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। একাদশী মাধবতিথির মধ্যে সর্ব্বারাধ্যা। সহস্র একাদশী-ব্রত পালন করলে মানুষ যে-সকল ফল লাভ করেন, তা হতেও শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত পালনে শতগুণ অধিক সুকৃতি লাভ হয়। কেননা, 'রা'-শব্দ উচ্চারণ করলেই কৃষ্ণভক্তি হয়, আর 'ধা'-শব্দ উচ্চারণ করা মাত্রই ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণেরও দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। একমাত্র মাধব ব্যতীত সর্ব্বতিথির ভূষণমণিস্বরূপ শ্রীহরিদয়িতার প্রকট-তিথির মহিমার কথা কেহ বর্ণনা করতে পারে না। এ তিথির মহিমা ব্রহ্মাশিবাদিরও অগম্য।

শ্রীরাধা কে? কি তাঁর পরিচয়? কি তাঁর মহিমা?—শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা বা ইন্দ্রিয়তোষণই যাঁর একমাত্র ব্রত, তিনি হলেন রাধা। রাধা তাঁর সমস্ত চিদানন্দময় শরীর দিয়ে কৃষ্ণের আরাধনা করে থাকেন। ইঁনি হরির আরাধনা করেন বলে হরির হরিত্ব, কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব। কৃষ্ণের সম্পত্তি হল রাধা, রাধা ছাড়া কৃষ্ণ অপূর্ণ। রাধাছাড়া কৃষ্ণ ব্রহ্ম হয়ে যেতেন। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলেছেন,—

'কৃষ্ণ বাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে।।"

প্রণতজনের চিন্তামণি, ব্রজ নাগরীগণের চূড়ামণি, বৃষভানুরাজের ফুলমণি, পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমাস্বরূপিণী হচ্ছেন শ্রীরাধা। রাধার অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণতোষণ। কৃষ্ণের যতপ্রকার বাঞ্ছা বা অভিলাষ আছে, সমস্ত একমাত্র রাধাঠাকুরাণীই পূরণ করতে সমর্থ। রাধাই কৃষ্ণের আরাধনা করেছেন। এসকল কারণে তাঁর রাধিকা নাম হয়েছে।

রাধা সাধিকা, কৃষ্ণ আরাধিকা।। মদনাখ্য মহাভাবস্বরূপিণী সর্ব্বগুণে তাঁরই

শ্রেষ্ঠত্ব। গোপালতাপনী, ঋক্ পরিশিষ্ট, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে সর্ব্বত্র শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব, প্রমাণিত হয়েছে। তন্ত্রেও রাধার সর্ব্বশক্তিময়তা, সর্ব্বশক্তির সার স্বরূপতা বলা হয়েছে। পরমাসুন্দরী আনন্দলীলাময়ী প্রেমপ্রতিমা কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধার অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণপ্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই। রাধার তুলনা রাধাই, সর্ব্বাধিকা বলেই তিনি রাধিকা।

তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে,—

'গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা শিরোমণি।।"

গোবিন্দ আনন্দস্বরূপ, ত্রিজগতের চিত্ত আকর্ষক, তিনি সনাতন সর্ব্বানন্দের পরাকাষ্ঠা হলেও সেই গোবিন্দের আনন্দদায়িনী, গোবিন্দমোহিনী হল রাধা ঠাকুরাণী। রাধা পূর্ণতম তত্ত্বকেও পরিপূর্ণ করেন। কৃষ্ণের আনন্দের, তাঁর লীলার পরিপূরক হল রাধা। শ্রীকৃষ্ণ সবকিছু পরিত্যাগ করে যাঁকে হৃদয়ে ধারণ করেন তিনি হলেন রাধা। কেননা, রাধা হল গোবিন্দের প্রাণসর্ব্বস্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বকান্তা শিরোমণি। অগ্নিশিখাকে যেমন আগুনের সঙ্গ থেকে পৃথক্ করা যায় না, ঠিক তেমনই রাধা ও কৃষ্ণ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে অবস্থিত। রাধা হচ্ছেন সমস্ত শোভার খনি। রাধা ভুবনমোহন কৃষ্ণের মনমোহিনী। গোলোক, বৈকুণ্ঠে যত শক্তি ও লক্ষ্মীগণ আছেন, তাঁদের সকলের মূল হচ্ছেন রাধা। রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমের গুরু, কৃষ্ণময়ী, তাঁর অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণতন্ময়তা।

শ্রীরায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট রাধাঠাকুরাণীর কথা বলতে বলতে বলেছেন,—

যাঁহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঁই কথাবিলাস শিখে ব্রজরামা।।
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী।

রাধা মাধবের প্রেমে একান্ত বশীভূতা বলে মাধবী নামেও অভিহিতা। রাধা কৃষ্ণতমাল তরুর লতিকা বা মাধবীলতাস্বরূপা, শ্যামরূপ নবজলধরের অপরূপা বিজলীসদৃশা, কৃষ্ণহৃদয়-আকাশে চন্দ্রকিরণস্বরূপা, কৃষ্ণচাতকের রাধাই একমাত্র জীবনোপায়। রাধা হল মহাভাবস্বরূপিণী, কৃষ্ণমোহিনী, রাধাই হ্লাদিনীশক্তির অমূর্ত্তরূপ।

শ্রীবৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে বলা হয়েছে,—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা।।

শ্রীরাধারাণী হচ্ছেন দেবী অর্থাৎ যাবতীয় সুন্দরীগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। কৃষ্ণময়ী অর্থাৎ কৃষ্ণ যাঁর অন্তরে বাহিরে, যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে। রাধা হল সর্ব্বপূজ্যা, সর্ব্বোপাসিকা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সম্মোহিনী। যে কৃষ্ণ নিজের রূপে, মাধুর্য্যে

সর্ব্ব জগৎকে মুগ্ধ করেন, সেই গোবিন্দকেও তিনি (রাধা) মুগ্ধ করেছেন। সর্ব্বকান্তি অর্থাৎ যিনি সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।।

মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধার অন্তরে স্ব-সুখবাঞ্ছা সর্ব্বতোভাবে তিরোভূতা, তাঁর সমগ্র অন্তরটি ভরে আছে শুধু কৃষ্ণ সুখৈকবাঞ্ছা। কৃষ্ণ সর্ব্বজগতের আনন্দের হেতু হলেও রাধা তার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আনন্দপ্রদাত্রী। কৃষ্ণের রূপে বিশ্বজীবের চক্ষু জুড়ায়, আর রাধার রূপে কৃষ্ণের চক্ষু জুড়ায়। যিনি সর্ব্বসুখহেতু, সর্ব্বআনন্দ হেতু, তাঁহার জীবাতু হল শ্রীরাধা। শ্রীরাধার আনুগত্য ও কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত কোটিকল্পকাল কৃষ্ণসেবা করলেও কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন, কৃষ্ণবশীকরণ কখনও সম্ভব হয় না। রাধারাণীর কৃপা লাভ করতে না পারলে মধুর কৃষ্ণের প্রেমসেবা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কেনন, রাধা হল কৃষ্ণপ্রেমের গুরু।

—শ্রীনিত্যানন্দ দাস

****

ধাম-বৈশিষ্ট্য

[ধাম দ্বিবিধ]

শ্রীহরির লীলাক্ষেত্র—ধাম দু'প্রকার।
দ্বিবিধ ধামে তিনি নিত্য করেন বিহার।। ১।।
নিত্যলীলা আর প্রকটন লীলা তাঁর।
দুই লীলায় নব নব রসের সঞ্চার।। ২।।
প্রাকৃত জগতে তাঁর যেথা ধাম রয়।
সেথা তদিচ্ছামত প্রকটলীলা হয়।। ৩।।
বৈকুণ্ঠেরও 'পরে বৃন্দারণ্য ধাম রয়।
তথায় তাঁর নিত্যলীলা—পূর্ণানন্দময়।। ৪।।

[ব্রজেন্দ্রনন্দন ও তদ্ধামের শ্রেষ্ঠত্ব]

"রসো বৈ সঃ"-বাণী মতে কৃষ্ণই রসময়।
'সঃ'-পদে 'লীলাপুরুষোত্তম' নাম হয়।। ১।।
'সঃ'-পদ সর্ব্বনাম, নহে ক্লীবের পদ।
পূর্ণানন্দময় রস তাঁহাতে সম্ভব।। ৩।।

ঐ শ্লোকে 'সা'-পদ থাকিলে 'স্ত্রী' বুঝাইত।
শক্তিপর ব্যাখ্যা ইথে হয় নিষেধিত।। ৩।।
সেই সচ্চিদানন্দ বস্তু ব্রজেশ তনয়।
আত্মারামগণও তাঁ'তে আকর্ষিত হয়।। ৪।।
'কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ'—হেন বাণী।
জানায় বিষয় কৃষ্ণ—সর্ব্বরসখণি।। ৫।।
অখিলরসামৃতমূর্ত্তি—সর্ব্বরসাধার।
তাঁর সম তাঁর বড় কেহ নাহি আর।। ৬।।
সেই প্রভু—কভু কৃষ্ণ, কভু গৌরহরি।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব দুঁহে,—প্রেমের ভাণ্ডারী।। ৭।।
শ্রীনন্দনন্দন হৈলা শ্রীশচীনন্দন।
বেদ-পুরাণাদিতে তার অসংখ্য বর্ণন।। ৮।।
রাধাকৃষ্ণ-মিলিত তনু গৌরাবতার।
কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি-পন্থা কৈলা আবিষ্কার।। ৯।।
জন্মাদি লীলা তাঁর নিত্যলীলায় নাই।
(সেথা') ভক্তসেবা-সুখানন্দ আস্বাদে সদাই।। ১০।।
জীবে কৃপা করিবারে যবে হয় মন।
ধামাদি সহিত তাঁর হয় প্রকটন।। ১১।।
জন্ম-অন্তর্দ্ধানাদি কৈলা মনুষ্যের সম।
ইথে তাঁর তত্ত্ব নাহি বুঝে মূঢ় জন।। ১২।।
দ্বারকা ও মথুরার ঊর্দ্ধে ব্রজধাম।
রাধাসহ কৃষ্ণের তথা' নিত্য অবস্থান।। ১৩।।
বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যেরে করিয়া ধিক্কৃত।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য ব্রজে নিত্য প্রকাশিত।। ১৪।।
ব্রজধামের ঈশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা।
কৃষ্ণ-সাথে প্রেম-ক্রীড়ায় যিনি সর্ব্বাধিকা।। ১৫।।
বিষ্ণুতত্ত্বেরও আদি প্রভু শ্রীবলরাম।
তাঁরও পূজ্যা শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণ যাঁর প্রাণ।। ১৬।।
রাধার কিঙ্করী-সূত্রে ভজিলে রাধা-পদ।
রাধা-কৃপা পাইলে ব্রজে প্রবেশ সম্ভব।। ১৭।।
কৃষ্ণের বিভূতি, ধামাদি সব চিদানন্দ।
তাঁর স্বরূপ প্রেম-নেত্রে দেখে ভক্তবৃন্দ।। ১৮।।

নদীয়াধাম, ব্রজধাম আর ক্ষেত্রধাম।
এই তিন ধামে নিত্য তাঁহার অবস্থান।। ১৯।।
সাধু-সঙ্গে ধাম-সেবায় টুটে মায়া-ভয়।
মায়া-মুক্ত হ'য়ে নিত্য ব্রজে বাস হয়।। ২০।।

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—১৬)

ভগবদ্ধাম

পৃথিবীতে যে-সকল ভগবদ্ধাম যে-ভাবে বিরাজমান, বৈকুণ্ঠেও সেই সকল ধাম অবিকল তদ্রূপে অবস্থিত। তৎপ্রমাণ—যা যা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাহতাঃ।। (স্কান্দে)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আঃ ৫ম) ধাম সম্বন্ধে উক্তি,—

প্রকৃতির পরে পরব্যোম নামে ধাম।
শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্।।
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাঁহাই বিশ্রাম।।
তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি।
দ্বারকা, মথুরা, গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি।।
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম।
শ্রীগোকুলে শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম।।
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায়।।
চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম।।
প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ-প্রকাশ।
গোপ-গোপীসঙ্গে যথা কৃষ্ণের বিলাস।।

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সপ্তবর্গ-সপ্তপাতালবিশিষ্ট চতুর্দ্দশ ভুবন। তাহার বাহিরে প্রকৃতির আটটী আবরণ। তদূর্দ্ধে বিরজানদীর অপরপারে সিদ্ধলোক। ইহা শ্রীহরিদ্বারা হত দৈত্যগণের সাযুজ্য মুক্তির স্থান ও জ্ঞানমার্গে সিদ্ধ ব্যক্তির প্রাপ্য নির্ব্বিশেষ ধাম। ইহার ঊর্দ্ধে পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ। অবতারগণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করিলে ধাম ও

পরিকরসহ তথায় অবতীর্ণ হন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ এক সময়ে বহুরূপে প্রকাশ পাইতে পারেন, তদ্রূপ ধামেরও সামর্থ্য। কিন্তু ধাম সর্ব্বব্যাপক বলিয়া স্থানান্তর হইতে তাহার আগমন প্রয়োজন হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্ব্বপরম স্বরূপ, তদ্ধামও তদ্রূপ সর্ব্বোপরি বিরাজমান। সেই ধাম অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে পৃথিবীতেও বিদ্যমান। পৃথিবীর বৃন্দাবন এবং পরব্যোমস্থ বৃন্দাবনে ভেদ নাই, একই বৃন্দাবনের উভয়ত্র স্থিতি। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ (স্বায়ম্ভুবাগম ঈশ্বর-দেবী-সংবাদে ৮৫তম পটলে)—

ধ্যায়েত্তত্র বিশুদ্ধাত্মা ইদং সর্ব্বং ক্রমেণ তু।
নানাকল্পলতাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং ব্যাপকং স্মরেৎ।।
অধঃ সাম্যং গুণানাঞ্চ প্রকৃতিং সর্ব্বকারণম্।
প্রকৃতেঃ কারণান্যেব গুণাংশ্চ ক্রমশঃ পৃথক্।।
ততস্তু ব্রহ্মণো লোকং ব্রহ্মচিহ্নং স্মরেৎ সুধীঃ।
ঊর্দ্ধে তু সীম্নি বিরজাং নিঃসীমাং বরবর্ণিনি।।
বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতাং শুভাম্।
ইমাশ্চ দেবতাং ধ্যেয়া বিরজায়াং যথাক্রমম্।।
ততো নির্ব্বাণপদবীং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মরেত্তু পরমব্যোম যত্র দেবাঃ সনাতনাঃ।।
ততোঽনিরুদ্ধলোকং চ প্রদ্যুম্নস্য যথাক্রমম্।
সঙ্কর্ষণস্য চ তথা বাসুদেবস্য চ স্মরেৎ।।
পীযূষলতিকাকীর্ণাং নানাসত্ত্বনিষেবিতাম্।
সর্ব্বর্ত্তুসুখদাং স্বচ্ছাং সর্ব্বজন্তুসুখাবহাম্।।
নীলোৎপলদলশ্যামাং বায়ুনা চালিতাঃ মুহুঃ।
বৃন্দাবনপরাগৈস্তু বাসিতাং কৃষ্ণবল্লভাম্।।
সীম্নি কুঞ্জতটাং যোষিৎক্রীড়া-মণ্ডপ-মধ্যমাম্।
কালিন্দীং সংস্মরেদ্ধীমান্ সুবর্ণতটপঙ্কজাম্।।
কালিন্দীজলসংসর্গিবায়ুনা কম্পিতং মুহুঃ।
বৃন্দাবনং কুসুমিতং নানাবৃক্ষবিহঙ্গমৈঃ।।
সংস্মরেৎ সাধকো ধীমান্ বিলাসেকনিকেতনম্।
একীভাবো দ্বয়োর্যত্র বৃক্ষয়োর্মধ্যদেশতঃ।।
তদধশ্চিন্তয়েদ্দেবি মণিমণ্ডপমুত্তমম্।
ত্রিলোকীসুখসর্ব্বস্বং সুযন্ত্রং কেলিবল্লভম্।।
তত্র সিংহাসনে রম্যে নানারত্নময়ে সুখে।
সুমনোঽধিক-মাধুর্য্যকোমলে সুখসংস্তরে।।

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাখ্য চতুষ্পাদৈর্বিরাজিতে।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশানাং শিরোভূষণ-ভূষিতে।।
তত্র প্রেমভরাক্রান্তং কিশোরং পীতবাসসম্।
কলয়া কুসুমশ্যামং লাবণ্যৈকনিকেতনম্।।
লীলারস সুখাম্ভোধি-সংমগ্নং সুখসাগরম্।
নবীননীরদাভাসং চন্দ্রিকাঞ্চিতকুন্তলম্।।

তাহাতে বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে এই সকল ধ্যান করিবে,—নানাকল্পলতাকীর্ণ সর্ব্বব্যাপী বৈকুণ্ঠ, তন্নিম্নে ত্রিভুনের সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতি, তৎপরে সত্যলোক। প্রকৃতির ঊর্দ্ধে সীমাশূন্যা বিরজানদী, তাহাতে বেদাঙ্গ-স্বেদ-সলিল প্রবাহিত। বিরজার উপরিভাগে ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণের মুক্তিস্থান। তদূর্দ্ধে সনাতন দেবগণের বিহারস্থান পরব্যোম। তদূর্দ্ধে অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের স্থান (যথাক্রমে অবস্থিত) স্মরণ করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যমুনাকে সম্যক্ প্রকারে স্মরণ করিবে। সেই যমুনা অমৃতলতাকীর্ণা, নানাপ্রাণিদ্বারা নিষেবিতা, সর্ব্বঋতুর সুখদায়িনী, স্বচ্ছসলিলা, সর্ব্বজন্তুর সুখাবহা, নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণা, মৃদুতর-তরঙ্গ-শোভিতা। তাহার তটভাগে কুঞ্জ, মধ্যভাগে ব্রজসুন্দরীগণের ক্রীড়ামণ্ডপ, তীরে সুবর্ণভূমি এবং নীচে সুবর্ণকমল।

অতঃপর ধীমান্ সাধক বিলাসের একমাত্র নিকেতন কুসুমিত বৃন্দাবন সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিবে। সেই বৃন্দাবন নিত্যনূতন পুষ্পাদি-রঞ্জিত, সুখসমাকুল, স্বরূপানুভব-জন্য যে আনন্দ, তাহা হইতেও অধিক সুখের অভিব্যক্তিস্বরূপ শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়-পঞ্চকে পরিপূর্ণ, নানাবিধ বিহঙ্গাদির ধ্বনিতে পরিরঞ্জিত, নানারত্ন-লতাশোভিত, মত্তভ্রমর-গুঞ্জনে মণ্ডিত, চিন্তামণি-পরিশোভিত, সকল ঋতুজাত ফলফুলে পরিপূর্ণ, প্রবালসমূহে সর্ব্বদিক পরিশোভিত ; তাহাতে কালিন্দীর জল-সংসর্গি বায়ু মৃদুল হিল্লোলে বারম্বার প্রবাহিত এবং নানা বৃক্ষ ও পক্ষী শোভা পাইতেছে। হে দেবি! বৃন্দাবনের যে-স্থানে কল্পবৃক্ষদ্বয় মধ্যদেশে একীভাবপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের অধোভাগে মণিমণ্ডপ চিন্তা করিবে। তন্মধ্যে ত্রিলোকীর সর্ব্বসুখাস্পদ কেলিবল্লভ উত্তম যন্ত্র, নানারত্নখচিত মনোহর সিংহাসন, তাহাতে পুষ্পাধিক কোমল মাধুর্য্যপূর্ণ সুখময় আস্তরণ। ঐ সিংহাসন ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাখ্য চারিটী কীলক-সংবদ্ধ। তাহা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের শিরোভূষণদ্বারা ভূষিত। ঈদৃশ সিংহাসনে প্রেমভারাক্রান্ত, পীতবসন, কলয়াকুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, লাবণ্যরাশির একমাত্র আশ্রয়স্থল, লীলারস-সুখসাগরে মগ্ন, নবীন-নীরদাভাস, ময়ূরপুচ্ছ-চূড়াশোভিত-কুন্তল কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণলোক নিখিল ভগবল্লোকের উপরিভাগে বিরাজিত।

ব্রহ্মসংহিতায়ও শ্রীকৃষ্ণলোকের বিবরণ এইরূপ,—

সহস্র-পত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকার-তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্।।

কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকম্।
ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদীস্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ।।
প্রেমানন্দ-মহানন্দ-রসেনাবস্থিতং তু যৎ।
জ্যোতীরূপেণ মনুনা কামবীজেন সঙ্গতম্।।
তৎকিঞ্জল্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি।
চতুরস্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমদ্ভুতম্।।
চতুরস্রং চতুর্মূর্ত্তেশ্চতুর্দ্ধাম চতুষ্কৃতম্।
চতুর্ভিঃ পুরুষার্থৈশ্চ চতুর্ভির্হেতুভির্বৃতম্।।
শূলৈর্দ্দশভিরানদ্ধমূর্দ্ধাধো দিগ্বিদিক্ষু চ।
অষ্টভির্নিধিভির্জুষ্টমষ্টভিঃ সিদ্ধিভিস্তথা।
মনুরূপৈশ্চ দশভির্দিক্‌পালৈঃ পরিতো বৃতম্।
শ্যামৈর্গৌরৈশ্চ রক্তৈশ্চ শুক্লৈশ্চ পরিদর্ষভৈঃ।।
শোভিতং শক্তিভিস্তাভিরদ্ভুতাভিঃ সমন্ততঃ।।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোকুলাখ্য ধাম সহস্রদলকমল-সদৃশ। সেই কমলের কর্ণিকার তাঁহার ধাম। অনন্তের অংশে গোকুলের সতত আবির্ভাব। ঐ কর্ণিকার হীরক কীলকশোভিত ষট্‌কোণ মহদ্‌যন্ত্রস্বরূপ। ষট্‌কোণে ষট্‌পদী শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের স্থান—যাহা প্রেমানন্দজনিত মহানন্দরসাত্মক প্রকৃতি পুরুষকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এবং জ্যোতীরূপ কামবীজের অবস্থিতি স্থান। সহস্রদল-কমলের কিঞ্জল্ক—শ্রীকৃষ্ণের স্বজাতি গোপগণের ও পত্র—গোপীগণের ধাম। গোকুলের চতুর্দ্দিকে শ্বেতদ্বীপ, তাহার চতুষ্কোণে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের ধাম। তাহার দশদিকে দশটী শূলদ্বারা বদ্ধ। অষ্টনিধি ও অষ্টসিদ্ধিদ্বারা সেবিত, মন্ত্ররূপী ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালদ্বারা পরিরক্ষিত শ্যাম, গৌর, রক্ত ও শুক্লবর্ণ পার্ষদগণ পরিবৃত এবং সর্ব্বদিকে অত্যাশ্চর্য্য শক্তিসমূহে সুশোভিত।

গোকুল-অর্থে গো-গোপাবাস-স্বরূপ। গোকুলের স্বরূপ—'অনন্তাংশসম্ভবম্' অর্থাৎ শ্রীবলদেবের অংশ গোকুলের নিত্যাবির্ভাব। সর্ব্বমন্ত্রসেবিত শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্ররাজের বহুপীঠ আছে, তন্মধ্যে 'কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং' ইত্যাদি শ্লোকে মুখ্যপীঠ বর্ণন করিতেছেন। সহস্রদল কমলাকৃতি গোকুলের কর্ণিকার মহদ্‌যন্ত্র অর্থাৎ উহার প্রতিকৃতি সর্ব্বত্র ষট্‌কোণ যন্ত্ররূপে লিখিত হয়। উহার ষট্‌কোণ অষ্টাদশ-অক্ষর মন্ত্রের স্থান। প্রকৃতি মন্ত্রের স্বরূপ কারণস্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই ঐ মন্ত্রের প্রকৃতি। সেই মন্ত্রের দেবতা-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই উহার পুরুষ অর্থাৎ যাঁহা হইতে মন্ত্রের আবির্ভাব হয় তাঁহাকে মন্ত্রের প্রকৃতি এবং যিনি মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বা উপাস্য তিনি ঐ মন্ত্রের পুরুষ বলিয়া কথিত হন। প্রকৃতি-পুরুষ উভয়ের বিশেষণ 'প্রেমানন্দ-মহানন্দরসেন'—প্রেমরূপ যে আনন্দসমূহ সেই প্রেমানন্দই আবার মহানন্দ-রসরাশি অর্থাৎ প্রেমানন্দের পরিপাক-

বিশেষ। সেই মহানন্দ-রসস্বরূপেও জ্যোতিরূপ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ মন্ত্ররূপে ও কামবীজে প্রকৃতি-পুরুষস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত। সেই কর্ণিকারের কিঞ্জল্ক অর্থাৎ কর্ণিকার-সংলগ্ন অভ্যন্তর বলয় তদংশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে যাহাদের অংশ—এমন সজাতীয় গোপগণের ধাম।

গোকুলের বাহিরে চতুষ্কোণাত্মক স্থলের নাম শ্বেতদ্বীপ। কারণ সেই অংশে "গোকুল" এই নামবিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু চতুরস্রের অভ্যন্তর 'বৃন্দাবন'-নামে খ্যাত। তাহার অপর নাম গোলোক। গো এবং গোপাবাসরূপ সহস্রদলকমলের নাম শ্রীগোকুল বা বৃন্দাবন, আর সেই গোকুলের বহির্ম্মণ্ডল (চতুষ্কোণ স্থান) এবং অভ্যন্তরস্থ গোকুল উভয়ের সমষ্টির নাম গোলোক। গোলোকের বাহিরে চতুষ্কোণে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারি মূর্ত্তির ধাম। সেই চতুষ্কোণ স্থান ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ এবং তত্তৎ প্রাপ্তির উপায় সাধনসমূহে ব্যাপ্ত। তাহা সর্ব্বদিকে মন্ত্ররূপী অর্থাৎ নিজ নিজ মন্ত্রাত্মক ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণদ্বারা পরিবৃত। শ্যাম, গৌর, রক্ত ও শুক্ল—এই চারি বর্ণাত্মক মূর্ত্তিমান্ ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব—এই চারি বেদদ্বারা সুশোভিত। শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার উল্লেখ আছে—কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ (১০।২৮।১৪) অর্থাৎ সেই গোলোকে মূর্ত্তিমান্ বেদগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া গোপগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা—এই শক্তিসকলদ্বারা গোলোক সুশোভিত।

'মাংসময় দেহ যে স্থানে গমন করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ'—ভাগবত ১০।২৮।১৩ শ্লোকের (সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং) টীকায় শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—'দেহাদি-পিহিতানাং তদ্দর্শনমশক্যম্ দেহাদিব্যতিরিক্তং ব্রহ্মস্বরূপং দর্শয়ামাস" অর্থাৎ দেহাদি-আচ্ছন্ন শ্রীভগবদ্ধাম দর্শনে অসমর্থ, ইহা জানাইবার জন্য দেহাদিব্যতিরিক্ত ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করাইলেন।

অজামিলের বৈকুণ্ঠ-গমন-প্রসঙ্গেও উক্ত হইয়াছে,—ততো গুণেভ্য আত্মানং বিযুজ্যাত্মসমাধিনা। যুযুজে ভগবদ্ধাম্নি ব্রহ্মণ্যনুভবাত্মনি।। (ভাঃ ৬।২।৩৬) অর্থাৎ বিষ্ণুদূতগণের সঙ্গপ্রভাবে অজামিলের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে পূজাদি পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। তথায় এক দেবমন্দিরে আসন কল্পনা করিয়া যোগ ধারণা করেন। তৎপরে আত্মাকে দেহাদির সঙ্গ হইতে বিমুক্ত করিয়া সমাধিদ্বারা অনুভবাত্মক ভগবৎস্বরূপে যোজিত করিলেন। তৎপশ্চাৎ—"হিত্বা কলেবরং তীর্থে গঙ্গায়াং দর্শনাদনু। সদ্যঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তিনাম্।।" বিষ্ণুপার্ষদ মহাপুরুষদের দর্শনের পর গঙ্গায় দেহত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবৎপার্ষদগণের দেহলাভ করিলেন ; পরে "সাকং বিহায়সা বিপ্রো মহাপুরুষকিঙ্করৈঃ। হৈমং বিমানমারুহ্য যযৌ যত্র শ্রিয়ঃপতিঃ।।"

শ্রীহরির কিঙ্কর মহাপুরুষগণের সহিত স্বর্ণরথে আরোহণ করিয়া শ্রীপতি-সমীপে গমন করিলেন। সেইস্থান ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অগোচর। "যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্" শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

কেন ভজন হয় না?

অনেক সময়ে ভাবি, আমার ভজন হইতেছে না। কিন্তু কেন হ'ল না, কেন হইতেছে না, তাহার কারণ কিছুই অনুসন্ধান করি না। জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জপুঞ্জ সুকৃতিফলে ভগবান্ সদ্‌গুরু মিলাইয়াছেন—দেবের দুর্ল্লভ, ভুবনৈকবন্দ্য গুরুদেবের পদতলে আসিয়াছি, কিন্তু তবুও কেন হরিভজন হইতেছে না, ইহার কারণ কি? এটা ঠিক যে, বাস্তব বস্তু সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় বিনা কোনদিন কেহ হরিভজন করিতে পারে নাই বা পারিবে না। গুরুদেব যে সে ভক্ত নহেন—*গৌরশক্তি-স্বরূপ—রূপানুগবর*। তিনি অবতার অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। তিনি শুদ্ধসত্ত্ব। চিদ্রাজ্যে যত জীব আছে, *শ্রীরূপের* আনুগত্য ব্যতীত কাহারও অন্য গতি নাই—রাধাগোবিন্দ পাদপদ্ম পাইবার আর অন্য উপায় নাই। কেন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর এত মর্য্যাদা? কারণ, তিনি অভিধেয় বা ভক্তি রসের আচার্য্য—ভক্তিরসামৃতের মূল মহাজন। তাঁহার ন্যায় শ্রীরাধাগোবিন্দের এত ঘনিষ্ঠ সেবক আর কেহই নাই। এইরূপ সেবাসৌন্দর্য্যে ভূষিত আছেন বলিয়াই—এইরূপ সেবামাধুর্য্যে রাধাগোবিন্দকে মুগ্ধ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার এত রূপের ছটা। সেই হ্লাদ-রূপের ছটা প্রাকৃত নহে, কেননা উহা অপ্রাকৃত নবীনমদনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাই তাঁহার নাম শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দর রাখিয়াছেন "শ্রীরূপ"। আমার গুরুদেবও সম্পূর্ণ তদভিন্ন। তাঁহার সেবার মাধুর্য্যে রাধাগোবিন্দের নয়ন-মন মুগ্ধ—আকৃষ্ট। তিনি এত কৃষ্ণসেবায় অনুক্ষণ রত—সেবা সৌন্দর্য্যে ভূষিত, তাই তিনি সুদর্শন। আর আমি তাঁহার সেবক বলিয়া পরিচয় দিয়া এত কুদর্শন বা কুরূপ কেন? হরিভজন হইতেছে না বলিয়াই ত' আমি এত কুরূপ বা কুদর্শন!

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির সংজ্ঞায় উহার স্বরূপ-লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—"সা কৃষ্ণাকর্ষিণী চ" অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ লক্ষণ এই যে, উহা শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে। তাহা হইলে দেখা গেল, ভক্তি হ্লাদিনীর সারবৃত্তি-বিশেষ। কেননা, হ্লাদিনীশক্তিই "গোবিন্দানন্দিনী", "গোবিন্দমোহিনী", উহা গোবিন্দ বা পুষ্পবাণের আনন্দদায়িনী। ইন্দ্রিয় বা হৃষীকের—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বা প্রাকৃত মদনের বৃত্তি নহে। উহা মদন-

মোহন-মোহিনী, উহা ভুবনমোহিনী নহে—ভুবন-মোহন-মোহিনী। আনন্দ সকল সত্তার মধ্যে নিহিত আছে। ঐ আনন্দ যখন অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণচন্দ্র ভোগ করেন, তখন যে জীবের সেই আনন্দের উদ্দেশ চেষ্টা বা ক্রিয়া, তাহাকে 'ভক্তি' বলে। তাহাতে জীবেরও আনন্দ। একের আনন্দে অন্যের আনন্দের ব্যাঘাত হয় না। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান নাই। উহাতে কৃষ্ণের সম্বিৎ বলিয়া একটী শক্তি কার্য্য করে। সেই শক্তির কার্য্যই—সে কৃষ্ণকে আনন্দ জানায়—সুখভোগ করায়, আর কৃষ্ণের আনন্দ উপভোগ করিবার ক্ষমতাকেও জীবের নিকট প্রকটিত করায় এবং জীবও কৃষ্ণের আনন্দ হইতেছে বলিয়া জানিতে পারে। তাই কৃষ্ণকে আনন্দ দিবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণানুভূতিও যুগপৎ এবং অচ্ছেদ্যভাবে প্রবল। কিন্তু আমি সব জড়ের ক্রিয়ায় বা ক্রিয়া-রাহিত্যে মত্ত বা মগ্ন, তাহাতে আমার সুখ হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের যে সুখ হইতেছে, সেই অনুভূতি কোথায়? উহা জানিতে পারিতেছি না কেন? এই বুদ্ধি বা উপলব্ধির অভাব বা শুদ্ধজ্ঞানের অভাবের মূলে সম্বিৎশক্তির প্রভাবরাহিত্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সাধনরাজ্যে সদ্‌গুরুর পদতলে আসিয়া সদ্‌গুরুর শিষ্য পরিচয়ে পরিচিত দুইপ্রকার ভক্তকে আমরা লক্ষ্য করি। কেহ কেহ আছেন, তাঁহারা সদ্‌গুরুর নিকট বসিয়া হরিকথা শ্রবণে সর্ব্বদা উন্মুখতা দেখান্, কিন্তু হরিসেবাকার্য্যে—গুরুদেবের প্রিয়কার্য্যে—যাহাতে দেহকে বা কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়কে চালনা করিতে হয়, ঐরূপ ব্যাপারে একটু উদাসীন অর্থাৎ একটু আলস্য-প্রধান ধাতু বা একটু ক্রিয়া-চেষ্টাহীন ভাব। ইঁহারা কর্ম্মঠ বা পরিশ্রমী নহেন বা একটু শ্রমজনক-সেবাকার্য্যে কুণ্ঠাপ্রবণ। আবার কেহ কেহ আছেন, তাঁহারা হরিকথা শ্রবণ হউক্ বা না হউক্, হরিকথাশ্রবণে দৃঢ়চেষ্টা, দৃঢ়যত্ন থাকুক্ বা না থাকুক, খুব কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী ও দৈহিক চেষ্টাময় কার্য্যে সদাই উন্মুখ। আমি উভয়দলভুক্ত। আলস্য-প্রধান ধাতু হইয়া ভাবি যে, হরিকথা বসিয়া বসিয়া শ্রবণ করিলেই, তত্ত্বকথায় পারদর্শী হইয়া জগতে একটী 'পণ্ডিত' বলিয়া খ্যাতিলাভ হইবে এবং বিবাদিজগতের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডার দ্বারা জয়ী হইয়া একটী মহা প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে। যথাসময়ে অবশ্য বৈষ্ণবের পরিশ্রমলব্ধ ভিক্ষান্নে প্রিয় উদর পূরণ করিতে কোন ত্রুটী হইবে না। তখন ভুলিয়া যাই যে, "*সেবোন্মুখে* হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ", "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন ** *সেবয়া*"—এই বাক্যদ্বয়ের 'সেবোন্মুখে' এবং 'সেবয়া' কথাটী চিত্তে আদৌ স্থান পায় না। তাও কি কখনও হয়! কৃষ্ণোপলব্ধি বা পরেশানুভবই ত' সম্বন্ধ। জগতে 'টান' বলিয়া একটী কথা আছে, সেই 'টানই' সম্বন্ধের মূল। যদি তত্ত্বকথাশ্রবণেই অত উন্মুখতা—অত ব্যগ্রতা, তাহা হইলে তাঁর কার্য্যকে আমার ইহ ও পরকালের একমাত্র কার্য্য বলিয়া সেই 'টান' কৈ? তত্ত্বকথা শ্রবণের ফলে ত' কৃষ্ণের প্রতি আমার এই 'আপনার' বলিয়া 'টান' বাড়িবে! তাহাই যখন নাই, তখন তত্ত্বকথা শ্রবণ হইতেছে না, বুঝিতে হইবে! চেতনময় গুরুদেবের চেতনময়

বাণী বা কৃষ্ণকীর্ত্তন কৃষ্ণব্যতীত কিছুই নহে। উহা জীব-হৃদয়ের কল্মষ বা অভদ্র অর্থাৎ যাবতীয় ভোগপ্রবৃত্তিকে বলপূর্ব্বক ধ্বংস করিয়া সেই হৃদয়কে নিজের সাম্রাজ্যরূপে পরিণত করিয়া নিজের বিহারক্ষেত্র করেন। চেতনময়ী কীর্ত্তন-বাণীর এতই অদ্ভুত প্রভাব! শেষোক্তদলের মধ্যেও আমি একজন। প্রত্যেক কার্য্য বা প্রত্যেক দ্রব্যকে কৃষ্ণের ন্যায় কৃষ্ণাভিন্ন জ্ঞানে বিভুরূপে—আমার সেব্যরূপে—আমার ভোক্তৃরূপে—পরিচালক বা চেতনময়রূপে জ্ঞান করি কই?

প্রথম প্রথম যখন গুরুদেবের নিকট অসিয়াছিলাম, তখন তাঁহার শ্রীমুখে প্রায়ই শুনিতাম—(আজও তাহার বিরাম নাই, কখনও বিরাম হইতে পারে না, কেননা, তাঁহার নিত্য ধর্ম্মই তাই!) তিনি পার্শ্বস্থিত প্রাচীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন,—সেই জিনিষটী (প্রাচীর) যখন আমাকে দেখা'বে, তখনই আমি তাঁহার রূপ দেখিতে পাইব—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।" কথাটা শুনিয়া অবাক্ হইয়াছিলাম। এও কি হয়? আমিই ত' প্রাচীরের দ্রষ্টা, প্রাচীর ত' কখনই আমার দ্রষ্টা নহে, ইহা ত' সহজ বুদ্ধিতেও বুঝি। কিন্তু তিনি এইরূপ অর্থ কখনও উদ্দেশ করেন নাই। যে-কাল পর্য্যন্ত আমি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বক্ প্রভৃতি দৃক্ সাহায্যে দ্রষ্টা বলিয়া অভিমান করিব, সেইকাল পর্য্যন্তই আমি জড়ের দ্রষ্টা বা ভোক্তা—সেইকাল পর্য্যন্ত আমি জড়ের সঙ্গী 'ভবানী-ভর্ত্তা', আমি শাক্তেয়বাদী ; কেননা, অচিৎ বা কালপ্রসূত দ্রব্যসাহায্যে অচিৎক্রিয়ার কার্য্যরূপে অচিদ্ দৃশ্যবস্তুকেই অচিদ্ বস্তুর দ্রষ্টৃরূপে দর্শন করি। অর্থাৎ অচিৎকেই বস্তুর কারণরূপে স্থাপন করি—ইহাই ত' হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির আসুর ধর্ম্ম।

যুগে যুগে, শুধু যুগে যুগেই বা বলি কেন, প্রতি জীবের হৃদয়েই অনাদিবহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন এইরূপ চেষ্টা নিহিত আছে। দৃশ্য বস্তুকে আমার ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য জ্ঞান করিয়া আমি তৃপ্ত হই, মনে প্রভূত আনন্দ লাভ করি, কিন্তু দৃশ্যবস্তু ত' কিছু আনন্দ পায় না—আমার আনন্দে ত' তাহার আনন্দাভাব! এখানে আমি অহঙ্কারবিমূঢ় কর্ত্তা, অণুচৈতন্যের ধর্ম্ম 'শ্রদ্ধা বা প্রণিপাত' বিসর্জ্জন দিয়া দ্রষ্টা বলিয়া অভিমানী!—গুরুদেব বলিয়াছিলেন,—'দেওয়াল যখন আমাকে দেখা'বে তখন আমি দেখিব, তাহা হইলে দেওয়ালই আমার দর্শনের পরিচালক। পরিচালক বস্তুকে ত' আমার ইন্দ্রিয়-সাহায্যে স্বেচ্ছামত গঠন করিতে পারি না। পরিচালক—বিভু—বিষ্ণু-বস্তুর ধর্ম্ম উহা নহে, তিনি কখনও কাহারও দ্বারা তাহার কোন ইন্দ্রিয়সাহায্যে গঠিত বা পরিচালিত হন না—তাঁহাতে সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিমত্তা বা স্বতঃকর্ত্তৃত্ব বর্ত্তমান। দেওয়াল যদি পরিচালকই হন, তাহা হইলে তিনি কখনই দেওয়াল-শব্দবাচ্য নহেন। কথাটা জড়ের ভাষায় বলিতে গিয়া "প্রাচীররূপী" বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অর্থাৎ হরিবিমুখগণ জগতে ভোগবুদ্ধি-চালিত হইয়া বা ইন্দ্রিয়-ভোগ্যজ্ঞানে যে-সব সংজ্ঞা বস্তুকে দেওয়া হয়,

ব্যাপক বা বিভু বা বিষ্ণুর সেবকগণ বস্তুকে বিভুরই তদভিন্ন বৈভবজ্ঞানে ঐরূপ সংজ্ঞা দিলেও উহাকে হরিবিমুখের ন্যায় ভোগ্যজ্ঞান করেন না। প্রহ্লাদের হরিভজন ছিল, তাই তিনি স্ফটিকস্তম্ভ—যাহা হিরণ্যকশিপুর নিকট ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য পরিমেয় বস্তুরূপে পরিচিত ছিল, তাহাকে তিনি স্ফটিকস্তম্ভরূপী জড়বস্তু জ্ঞান না করিয়া তাঁহাকে বিভু বা বিষ্ণুবস্তুজ্ঞানে 'বাসুদেব' বলিয়া সংজ্ঞিত করিলেন। **(ক্রমশঃ)**

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৪ পৃষ্ঠার পর]

সামান্য কিছু পূজা দিলাম, আর পেতে চাই লাখ লাখ টাকা। 'ধনং দেহি জনং দেহি দিশো জহি'—এমন করে যাচ্ছি সবসময়। এখানে ভাগবত বলছেন,—না, তা হয় না। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" কৃষ্ণ গীতায় বলছেন অর্জ্জুনকে, —হে অর্জ্জুন, যে আমাকে যেভাবে, যেমনভাবে প্রপত্তি স্বীকার করে, ফলটা সে সেইরকম পায়। এর দুরকম অর্থ আছে। যতটুকু পরিমাণে আমাকে শ্রদ্ধা করে, ফলটা সেই অনুসারে হয়। এখানে উল্টোপাল্টা ব্যাখ্যা করলে হবে না, অনেকে এর উল্টো ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব—এটার ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা হওয়া চাই। শ্রদ্ধার যে পরিমাণ, সেই পরিমাণ অনুসারে তার প্রাপ্তি, তার বাইরে নয়। চার আনা পূজা দিয়ে আমি একলাখ টাকা চাইতে পারি না। মিলবে না ওটা। "ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ।" এই যে দেবদেবীরা এঁরা কারা?—কর্ম্মসচিব, কর্ম্মচারী, কর্ম্মচারিণী। ভগবৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত এঁরা। আইন করা আছে, সেই আইন অনুসারে যে যতটুকু আইন পালন করে চলবে, এঁরা তাদের সেই পরিমাণে ফলটুকু দিতে পারেন। তার বাইরে কিছু করার ক্ষমতা নাই। কিন্তু 'সাধবো দীনবৎসলাঃ'। সাধুসন্তগণ কি করতে পারেন? তাঁরা দীনবৎসল। দীনবৎসল মানে,—যারা সাধন-ভজন বোঝেন না, যাদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়নি, আত্মকল্যাণ-চিন্তা করতে যারা শেখেনি, তাদের প্রতি এঁদের স্নেহ মমতা অধিক আছে। তাই এখানে তুলনামূলক আলোচনা করে দেখাচ্ছেন যে, দেবতাগণের থেকে সাধুসন্তগণের মহিমা-মাহাত্ম্য অধিক। শাস্ত্রে কোন জায়গায় বলা হয়েছে, গঙ্গাদেবী বড়, না বৈষ্ণব বড়? সেখানে কি পাওয়া গেছে?—

"গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ।।"

গঙ্গাদেবীর স্পর্শ করলে তবে আমাদের পবিত্রতা আসে, আর সাধুর দর্শনমাত্রেই পবিত্রতা। 'সাধূনাং দর্শনাং পুণ্যম্' একথা বলছেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৮ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০১

ব্রহ্মাংস্তথাপি পৃচ্ছামো ধর্ম্মান্ ভাগবতাংস্তব।
যান্ শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ।।

বসুদেব মহারাজ বলছেন,—হে নারদঋষি! আপনি যদৃচ্ছাক্রমে আমার ঘরে এসেছেন, আমার গৃহ পবিত্র হয়েছে, আমরা সবাই ধন্য হয়েছি, তথাপি আমার কিছু জানবার আগ্রহ আছে। যখন সব হয়েই গেছে, তখন আবার কি দরকার? সেইজন্য বলছেন,—আপনার দর্শনে আমরা পবিত্র হয়েছি, আমাদের গৃহ ধন্য হয়েছে, তথাপি আমি আপনার কাছে জানতে চাই, কিছু প্রশ্ন আছে। কি?—"ধর্ম্মান্ ভাগবতাংস্তব"—আপনার কাছে জানতে চাই, ভাগবত-ধর্ম্ম কাকে বলে? সনাতন ধর্ম্ম কাকে বলে? আত্মধর্ম্ম কাকে বলে? ভগবান্‌কে কেমন করে ভালবাসতে হয়, এটা আমার জানা নাই, শুনা নাই। কিন্তু আমি শুনেছি, যে সনাতন ধর্ম্ম, ভাগবত-ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক যদি কেউ শ্রবণ করেন, যদি কেউ অনুশীলন করেন, যদি কেউ অভ্যাস করেন জীবনে "মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ"—সবথেকে যে বড় ভয় তার থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। তাহলে কি ব্যাপার? সনাতন ধর্ম্ম শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করলে, অনুশীলন করলে, অভ্যাস করলে সমস্ত ভয়ের থেকে যে বড় ভয় সে ভয়ের থেকে উদ্ধার লাভ করা যাবে। সবথেকে বড় ভয় এ সংসারে আমাদের কি?—মৃত্যুভয়। মৃত্যুঞ্জয় হতে পারেন যদি সনাতনধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম তিনি অনুশীলন করেন। সেটা এখানে বুঝাচ্ছেন। এখানে যে কথা, ঠিক এরূপ কথা গীতার মধ্যে আপনারা পেয়েছেন,—

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।।"

এখানে বলছেন,—'সর্ব্বতোভয়াৎ'। একই লাইন। সেখানে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে কি বলছেন?—হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে যে সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব বলতে যাচ্ছি এর কোন ক্রমভঙ্গের সম্ভাবনা নাই। এখান থেকে আরম্ভ করতে হবে, ওখানে শেষ হবে, এমন কোন কথা নাই। যখনই তুমি এর উপযোগিতা, উপকারিতা বুঝতে পারবে, তখনই তুমি সেই সনাতনধর্ম্ম যাজন কর, অভ্যাস করা শুরু কর। 'প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে'—এতে তোমার কোন লোকসানের কথা নাই, সবটাই লাভ। আত্মধর্ম্ম-অনুশীলনকারীর সবটাই লাভ, লোকসানের কোন কথা নাই। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—এই সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব, আত্মধর্ম্মের অনুশীলনকারী সামান্য অল্প পরিমাণেও যদি তিনি জীবনে সাধনা করেন, অভ্যাস করেন 'ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—তিনি মহাভয় থেকে ত্রাণলাভ করেন। মহানভয় বলতে এখানেও এই একই মৃত্যু। ওখানে 'সর্ব্বতো ভয়াৎ', আর এখানে 'মহতো ভয়াৎ'—একই কথাই বলা হয়েছে। তাহলে মানুষের কি মৃত্যু নাই? কথাটা ত' এরকম আসে। হ্যাঁ, তাই। আমাদের জন্ম-মৃত্যু নাই। জন্ম-মৃত্যু যে সব সময় বলছি আমরা মুখে। শাস্ত্র সেখানে বুঝাচ্ছেন যে,

জড় শরীরের উৎপত্তি এবং জড় শরীরের লয়—একেই জন্ম-মৃত্যু বলা হয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রে জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই, অজর, অমর।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।"

আত্মা অজর, অমর, নিত্য, শাশ্বত, সনাতন। তার জন্ম মৃত্যু হয় না। দেহের উৎপত্তি এবং নাশ, এটাকেই লক্ষ্য করে আমরা জন্ম-মৃত্যু বলি। দেহী আত্মা যখন কোন শরীরে প্রবেশ করছে, তখন বলছি জন্ম ; দেহী আত্মা যখন কোন শরীর থেকে বিনিষ্ক্রান্ত হচ্ছে, তখনই আমরা বলি মৃত্যু। তাহলে আত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই। বেদে, উপনিষদে, গীতা, ভাগবতে, রামায়ণে, মহাভারতে সর্ব্বত্রই একই কথা বলা আছে।

এখানে বসুদেব মহারাজ তিনি নারদঋষির কাছে জানতে চাচ্ছেন, সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে। অন্য ধর্ম্মের কথা, প্রশ্ন এখানে হয় নাই। যারা সাধারণ মানুষ, তারা কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে পারবেন না। প্রশ্ন কারা করবেন?—যারা কিছুটা বিষয় অবগত হয়েছে, যাদের সামান্য তত্ত্বদর্শনও হয়েছে, তারাই প্রশ্ন করতে পারেন। নারদঋষি ত' সর্ব্বজ্ঞ। বসুদেব মহারাজ—যিনি কৃষ্ণের পিতা, তিনি কি সর্ব্বজ্ঞ নন? যদি তিনি সর্ব্বজ্ঞ না হন, তাহলে তাঁর ভক্তিতে বশীভূত হয়ে ভগবান্ তাঁর পুত্রত্ব স্বীকার করেছেন কি করে? এ হেন ব্যক্তি, সর্ব্বদর্শী হয়েও, সর্ব্বজ্ঞ হয়েও তাঁর জানবার ইচ্ছা, আগ্রহ কি?—আমাকে দয়া করে বলুন, সনাতনধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, ভাগবত-ধর্ম্ম কাকে বলে। প্রশ্ন, আবার তার সঙ্গে উত্তরটাও রয়েছে। যে প্রশ্নটা তিনি করছেন, উত্তরটাও যেন তিনি নিজে আবার প্রশ্নের মধ্যেই দিয়ে দিচ্ছেন। কিরকম? সনাতনধর্ম্ম যদি শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক শ্রবণ করা যায়, তাহলে 'মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ'—সবথেকে বড় ভয় (মৃত্যু) থেকে উদ্ধার লাভ করা যায়। এরূপ প্রশ্নকে আমরা Sugesstive question বলব। প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরটা মেলানো আছে। আর এ উত্তরটা বসুদেব মহারাজের নিশ্চয়ই ত' জানাও আছে। সর্ব্বতত্ত্বদর্শী না হলে কি কেউ ভগবান্‌কে পান? ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ হয় কি কখনও? হবে না। তত্ত্বদর্শী তাঁকে নিশ্চয়ই হতে হবে। ভগবদ্ভক্ত যা বলবেন, তা অভ্রান্ত সত্য—Universal Truth, Axiomatic Truth—একথা, এ তত্ত্বদর্শন শাস্ত্রে বুঝানো আছে। ভাল-মন্দের বিচার সম্বন্ধে তাঁর Concrete idea—বাস্তব দর্শন আছে। তিনি সৎকে সৎ বলবেন, অসৎকে অসৎ বলবেন। সৎ মানে নিত্যবস্তু, অসৎ মানে অনিত্য বস্তু—এ সম্বন্ধে তাঁর বাস্তব ধারণা আছে। তাঁকেই বলে সাধু, তাঁকেই বলে গুরু।

বহুক্ষেত্রে কেউ কেউ বলছেন,—আমার গুরু এমন তত্ত্বকথা বলেন, যা শাস্ত্রে—

বেদ, বেদান্তে, উপনিষদে কোথাও নাই। কথাটা বাজে কথা, অযৌক্তিক কথা। ওটা হতে পারে না। সাধু তাই বলবেন যেটা শাস্ত্রে আছে ; গুরু সেই তত্ত্বই নির্দ্দেশ করবেন, যা শাস্ত্রে আছে। কেন? শাস্ত্র ত' Universal Truth, তার থেকে ত' নিতে হচ্ছে আমাদের। তাকে বাদ দিয়ে নয়। সাধু-গুরু-বৈষ্ণব যা বলবেন, শাস্ত্রে আছে সে Theory। তাকে অবলম্বন করেই আমাদের কিছু বলতে হবে। তার বাইরে কিছু বলা চলবে না । যদি কেউ কিছু বাইরে বলেন, তাহলে নিজের কথা হয়ে যাবে। নিজের কথা মানে সেটা ভুল, তত্ত্ববিভ্রম। সেজন্য আমরা যা কিছু বলব, যা কিছু জীবনে অভ্যাস করব, অনুশীলন করব, সবটাই Axiomatic Truth হওয়া চাই। তার বাইরে বললে জগতের লোক মানবে না। জগতের লোক মানে সাধারণ মানুষ?— না, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি, বিশ্বের বিদ্বজ্জনবরেণ্যগণ। তাঁরা মানবেন না। চিন্তাশীল মনীষিগণ তাঁরা যে জিনিষটা মেনেছেন, সেটা আমাদের সকলকে মেনে নিতে হবে। সেটা কি? 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।'

মহাজনগণ,　　যে পথে করেছেন গমন,
সেই পথ প্রাতঃস্মরণীয়।
সেই পথ লক্ষ্য করে,　　স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধরে,
আমরাও হব বরণীয়।।

এটা আমার নিজস্ব ব্যাপার নয়, 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'।

গীতার মধ্যে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন,—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।।"

মহাজনগণ যেটা বলেছেন, সেটাকে মেনে নেওয়ার কথা বলেছেন। সেখানে অনুসরণের কথা এসেছে, অনুকরণের কথা আসে নাই। অনুসরণ যদি আমরা করি, তাহলে আমাদের কল্যাণ ; আর যদি অনুকরণ করি (বাঁদরগুলো অনুকরণপ্রিয়) তাহলে আমাদের কল্যাণ নাই। বাঁদরের মত অনুকরণ করলে হবে না, অনুসরণ করতে হবে। তার মধ্যে আমার জন্য যে মঙ্গল, কল্যাণ নিহিত আছে, সে জিনিষটা বুঝে নিয়ে তা আমাকে পালন করতে হবে। তার মধ্যে আমার কল্যাণ আছে।

এখানে বলছেন, সেই সনাতনধর্ম্ম যদি অনুশীলন করা যায়, অভ্যাস করা যায়, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যদি শ্রবণ করা যায়, তাহলে কল্যাণ। 'শ্রদ্ধাপূর্ব্বক' একটা কথা এসেছে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তন মানে কি? শ্রদ্ধা-শব্দের দার্শনিক বিচার খুব সুসূক্ষ্ম বিচার। ব্যাখ্যাটা শুনলে মনে হবে বোধ হয় এটা একদেশিক বিচার। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। এই 'শ্রদ্ধা'-শব্দের ব্যাখ্যা করছেন দার্শনিক বিচারে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে,—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।।

অদ্ভুত ব্যাপার। সুদৃঢ় বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাস নয়। যে বস্তু যা নয়, তার প্রতি বিশ্বাস? তা ত' নয়। তত্ত্ববস্তুর প্রতি, বাস্তব বস্তুর প্রতি বিশ্বাস। আবার তার ব্যাখ্যা কি? 'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়'—যদি আমি ভগবানের সেবা করি, তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হই, তাহলে আমার সবটা করা হয়ে যাবে। একথা কেন? আমাদের সময় ত' খুব কম, তাই না? "অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রম্ স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।" শব্দশাস্ত্র অনন্ত, তার জানার শেষ নাই। আর আমাদের পরমায়ু অত্যন্ত কম, বাধাবিপত্তি অনেক জীবনে। এমতাবস্থায় কি করব আমরা? সারসঙ্কলন করব আমরা। সারসঙ্কলন করবার কথা বলছেন ,তাহলে ভাল-মন্দের বিচার করে আমাদের অগ্রসর হতে হয়। সারসঙ্কলন করতে গিয়ে বলছেন কি, এমন অনুষ্ঠান করব আমরা যাতে আমাদের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সবটা হয়ে যাবে। সেই Theoryর মধ্যেই রয়েছে,—"কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।।" আমি যদি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ করি, তাহলে সকলের প্রতি—যার প্রতি যে দায়িত্ব, কর্ত্তব্য সবগুলো হয়ে যাবে। প্রমাণ করা যায় এটা?—হ্যাঁ যায়, ভাগবতের মধ্যেই রয়েছে, গীতার মধ্যেও আছে।

"যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।।"

গ্রীষ্মের দারুণ নিদাঘ, ভীষণ গরম। সব জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। বাগিচায় কিছু ফুলের গাছ আছে। গাছের গোড়ায় জল দেওয়া হবে, না গাছের পাতায় পাতায় একটু জল ছিটিয়ে দিলে গাছগুলো বাঁচবে?—গাছের গোড়ায় জল ঢালতে হবে। গাছের গোড়ায় যদি জল দেওয়া যায়, তাহলে বৃক্ষ সঞ্জীবিত হবে, ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে। গাছের পাতায় পাতায় একটু জল ছিটিয়ে দিলে কি গাছকে বাঁচানো যাবে?—যাবে না। এই উদাহরণ দিচ্ছেন। তাহলে মুখে আহার দিতে হবে। মুখে আহার না দিয়ে যদি কিছু খাবার নামে গুঁজে দেওয়া যায়, চোখে গুঁজে দেওয়া যায়, কানের মধ্যে গুঁজে দেওয়া যায়, তাহলে মানুষটা বাঁচবে ত'? 'প্রণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং"—সমস্ত ইন্দ্রিয় সঞ্জীবিত হবে যদি মুখে আহার দেওয়া যায়। 'তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা'—সেইরকম ধরণের ভগবান্ অচ্যুতের পূজা, উপাসনা, আরাধনা।

মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা-পল্লবের বল,
শিরে বারি নহে কার্য্যকর।

গাছের গোড়ায় জল ঢালতে হবে, তবে বৃক্ষ বাঁচবে। গাছের পাতায় পাতায় একটু জল ছিটিয়ে দিলে তাকে বাঁচানো যাবে না। আরও প্রমাণ রয়েছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৩শ বর্ষ } ১৬ পদ্মনাভ, অনিরুদ্ধ, ৫১৫ শ্রীগৌরাব্দ { ৮ম সংখ্যা
৩০ আশ্বিন, বুধবার, ১৪০৮, ইং ১৭/১০/২০০১

সানুবাদং

শ্রীউদ্ধব-কৃতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণমহিমা-দশকম্

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে— ৭-১৬]

শ্রীউদ্ধব উবাচ,—

কৃষ্ণদ্যুমণি নিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ।
কিং নু নঃ কুশলং ব্রূয়াৎ গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্।। ১।।

(প্রেম-পুলকিতাঙ্গ উদ্ধব নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু মার্জ্জন করিয়া যদুকুল সংহারাদি ভগবচ্চাতুর্য্য স্মরণপূর্ব্বক বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—)

শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে বিদুর! কৃষ্ণসূর্য্য অস্তমিত হওয়াতে আমাদিগের গৃহসকল কালরূপ মহাসর্পদ্বারা গ্রস্ত হইয়াছে, এমতাবস্থায় তোমার জিজ্ঞাসিত বন্ধুবর্গের কুশল আর কি বলিব?? ২।।

দুর্ভগো বত লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি।
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোড়ুপম্।। ২।।

হায়! এই মনুষ্যলোক অতিশয় ভাগ্যহীন, বিশেষতঃ যাদবগণ সর্ব্বাপেক্ষা কৃষ্ণজ্ঞানহীন ; কারণ, ক্ষীরসমুদ্রস্থ চন্দ্রের সহিত তত্রস্থ মৎস্যগণ একত্র বাস করিয়াও যেমন উহারা চন্দ্রকে কমনীয় কোন জলচরমাত্র বোধ করিয়া সুধাকর-চন্দ্রের স্বরূপ জানে না, তদ্রূপ এই যাদবগণ কৃষ্ণের সহিত একত্রে বাস করিয়াও তাঁহার ভগবৎস্বরূপ জানিতে পারেন নাই।। ২।।

ইঙ্গিতজ্ঞাঃ পুরুপ্রৌঢ়া একারামাশ্চ সাত্বতাঃ।
সাত্বতামৃষভং সর্ব্বে ভূতাবাসমমংসত।। ৩।।

হে বিদুর! যাদবগণ নিতান্ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবশতঃই শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন নাই, নচেৎ তাঁহাদের জ্ঞানসামগ্রীর অভাব ছিল না ; তাঁহারা লোকের চিত্তস্থ ভাব জানিতে পারিতেন এবং অতিশয় নিপুণ ছিলেন ; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্রে ক্রীড়া করিলেও নিখিলভূতাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে যদুশ্রেষ্ঠমাত্র জ্ঞান করিতেন।। ৩।।

দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টা যে চান্যদসদাশ্রিতাঃ।
ভ্রাম্যতে ধীর্ন তদ্বাক্যৈরাত্মন্যুপ্তাত্মনো হরৌ।। ৪।।

যাদবগণ ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে 'ইনি যাদব, আমাদের বন্ধু' এইরূপ বলিতেন ; কিন্তু শিশুপালাদি যে-সকল অন্যপক্ষ বৈরভাব আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিত, তাহাদের সেই সেই বাক্যে আমাদের বুদ্ধি মোহপ্রাপ্ত হয় না; কারণ, আমাদের চিত্ত পরমাত্মা শ্রীহরিতে নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অন্য মূঢ়লোকের বুদ্ধি ইহাদ্বারা অনায়াসেই বিভ্রান্ত হইতে পারে।। ৪।।

প্রদর্শ্যাতপ্ত-তপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্।
আদায়ান্তরধাদ্‌যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্।। ৫।।

সেই ভগবান্ তপস্যাহীন-বশতঃ অপরিতৃপ্তলোচন মনুষ্যগণকে স্বীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া, পুনরায় লোকলোচনস্বরূপ সেই মূর্ত্তি তাঁহাদের চক্ষুর নিকট হইতে গ্রহণপূর্ব্বক আচ্ছাদন করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন।। ৫।।

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্।। ৬।।

ভগবান্ প্রপঞ্চ জগতে স্বীয় যোগমায়াবলে স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী ; তাহা এত মনোরম যে, তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়—তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম অলৌকিক।। ৬।।

যদ্ধর্ম্মোসূনোর্ব্বত রাজসূয়ে
নিরীক্ষ্য দৃক্‌স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ।

কার্ৎস্ন্যেন চাদ্যেহ গতঃ বিধাতু-
রর্ব্বাক্‌সৃতৌ কৌশলমিত্যমন্যত।। ৭।।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দকর সেই রূপ নিরীক্ষণ করিয়া ত্রিভুবনস্থ প্রাণিসমূহ এই অনুমান করিয়াছিলেন যে, বিধাতার মনুষ্যনির্ম্মাণ বিষয়ে যে নৈপুণ্য ছিল, তৎসমুদায়ই এই শ্রীমূর্ত্তি-প্রকাশে নিঃশেষিত হইয়াছ।। ৭।

যস্যানুরাগপ্লুত-হাস-রাস-
লীলাবলোক-প্রতিলব্ধমানাঃ।
ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্‌ভিরনুপ্রবৃত্ত-
ধিয়োঽবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ।। ৮।।

সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সানুরাগ হাস্য, পরিহাস, আমোদ, প্রমোদ, লীলাবলোকন-দ্বারা অভিমান-যুক্ত ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিলে শ্রীকৃষ্ণ যখন গমন করিয়াছিলেন, তখন ব্রজস্ত্রীগণের দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত তাঁহাদের চিত্তও শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী হইয়াছিল এবং তাঁহাদেরস্ব-স্ব কার্য্য সমাপ্ত না হইলেও তাঁহারা তদ্‌গতচিত্তে নিশ্চেষ্টের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন।। ৮।।

স্বাশন্তরূপেষ্বিতরৈঃ স্বরূপৈ-
রভ্যর্দ্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো
হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ।। ৯।।

ভগবদাশ্রিতগণের দ্বিবিধ রূপ, শান্ত-স্বরূপ ভগবদ্ভক্ত ও তদিতর অশান্ত-স্বভাব (ভগবদ্বহির্ম্মুখ অসুরগণ)। অসুরগণ যখন সেই ভক্তগণকে পীড়ন করিতে থাকে, তখন চিদচিদীশ্বর পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তের প্রতি দয়ার্দ্রান্তঃকরণে প্রাকৃতজন্মরহিত হইয়াও, কাষ্ঠে যেরূপ অগ্নি আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ নিজকলা মহৎস্রষ্টা কারণাব্ধিশায়ী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবতাররূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন।। ৯।।

মাং খেদয়ত্যেতদজস্য জন্ম-
বিড়ম্বনং যদ্বসুদেব-গেহে।
ব্রজে চ বাসোঽরিভয়াদিব স্বয়ং
পুরাদ্ব্যবাৎসীদ্‌যদনন্তবীর্য্যঃ।। ১০।।

উদ্ধব কহিলেন,—বসুদেব-গৃহে অজ-পুরুষের জন্মাভিনয়, ব্রজে অরি-ভয়ে বাস্ এবং অনন্তবীর্য্যের স্বয়ং মথুরা-পরিত্যাগরূপ লীলা-বৈচিত্র্যসকল আমার মনে খেদ উৎপন্ন করিতেছে।। ১০।।

****

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ আশ্বিন, ১৪০৮ ; ১৭ অক্টোবর, ২০০১

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৬ পৃষ্ঠার পর]

বিশ্বমঙ্গল

১। জগতের প্রকৃত মঙ্গল কিরূপে হইবে? শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আন্তরিক বিশ্বমঙ্গল কামনা কি ধারণাতীত নহে?

"সংসারের স্থূল উন্নতি বা অবনতির বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন, কিন্তু সংসারগত জীবাত্মনিচয়ের পরমার্থতত্ত্বে উন্নতি-সম্বন্ধে আমরা স্বভাবতঃ ব্যস্ত ; এমত কি, সমস্ত জীবনসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতৃগণের আত্মোন্নতি-সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত থাকি। পতিত ভ্রাতাদিগকে সংসারকূপ হইতে উদ্ধার করা বৈষ্ণবদিগের প্রধান কর্ম্ম। বৈষ্ণব-সংসার যত প্রবল হইবে, ক্ষুদ্রাশয়গ্রস্ত পাষণ্ড-সংসার ততই হ্রাস পাইবে,—ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের নৈসর্গিকী গতি। সেই অনন্তরূপি-পরমেশ্বরের প্রতি **সর্ব্বজীবের প্রীতিস্রোতঃ প্রবাহিত হউক, পরমানন্দস্বরূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হউক, ঈশ্বরাভিমুখ লোকদিগের চিত্ত পরমতত্ত্বে দ্রবীভূত হউক, কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়েরা ভগবৎকৃপাবলে সাধুসঙ্গাশ্রয়ে ও ভক্তিতত্ত্ব-প্রভাবে উত্তমাধিকারী হইয়া বিশুদ্ধ প্রীতিকে আশ্রয় করুন, মধ্যমাধিকারী মহাত্মগণ সংশয় পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানালোচনা সমাপ্ত করিয়া প্রীতিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হউন, সমস্ত জগৎ হরিসঙ্কীর্ত্তনে প্রতিধ্বনিত হউক।"**

—'উপক্রমণিকা' কৃঃ সং

২। বিশ্বের সর্ব্বত্র হরিসঙ্কীর্ত্তন-প্রচার ও শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-পূরণে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল না কি?

"আহা! যেদিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান-ডঙ্কা-খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ নিজ-নিজ-নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নাম উল্লেখপূর্ব্বক হরিনামকীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সেদিন কবে হইবে! আহা! যেদিন একদিক হইতে বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল 'জয় শ্রীশচীনন্দন কী জয়' এইরূপ ধ্বনি করত প্রসারিত-বাহু হইয়া অপরদিকে অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সেদিন কবে হইবে! যেদিন তাঁহারা বলিবেন, হে আর্য্যভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেমসমুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সেদিন কবে হইবে! যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণবপ্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে এবং সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সে দিন কবে হইবে!"

—'নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়', সঃ তোঃ ৪।৩

৩। শ্রীল ভক্তিবিনোদ কি সমগ্র বৈষ্ণবজগৎ ও সজ্জনবৃন্দকে বিশ্বের সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম-প্রচারে আহ্বান করেন নাই?

"হে শুদ্ধভক্তবৃন্দ! শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম জগজ্জীবের পরম ধন। যে-সকল ধর্ম্ম আজকাল ধূমধামের সহিত দেশে দেশে প্রচারিত হইতেছে, সে সমস্তই সদোষ ও অসম্পূর্ণ। যখন সেই সমস্ত ধর্ম্ম কুণ্ঠিত হইয়া নিজ-নিজ-দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত হইবে এবং পরমধর্ম্ম অগ্রসর হইয়া সকল দেশে ব্যাপ্ত হইবে, সেই সুখজনক সময় আমাদের আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন **সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া শ্রীনামহট্টের পুষ্টি করুন।** ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গভক্ত-ব্রাজকবিপণী মহোদয়গণ শুদ্ধনামের পসরা মস্তকে করিয়া আমাদের হৃদয়নাথ শ্রীগৌরাঙ্গকে ও তাঁহার জগৎপাবন হরিনামকে প্রচার করুন।"

—'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ

৪। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনামহট্টের কার্য্য কিভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং উহার কিরূপ ভবিষ্যৎসাফল্য কামনা করিয়াছিলেন?

"শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমন্নবদ্বীপ-ধামান্তর্গত গোদ্রুমক্ষেত্রই ঐ হাটের মূল স্থান। তথায় কতিপয় শুদ্ধ হরিনামপরায়ণ বৈষ্ণব নামহট্টের কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। ★★★ যাঁহারা কোন গণ্ডগ্রামে বা নগরে এক একটী প্রপন্নাশ্রম স্থাপন করত নাম প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই নামের 'দোকানদার' বা 'বিপণিপতি'। যাঁহারা নামের পসরা লইয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের নামই 'পসারী' বা 'ব্রাজকপিণী'। গোদ্রুমকল্পাটবীতে কতকগুলি কর্ম্মচারীর নাম প্রকাশিত হইয়াছে। ★★★ জগজ্জনতারণ **শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গপ্রভু** বোধ হয়, **পুনরায় স্বীয় প্রচারিত শুদ্ধনাম জগৎকে দিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছেন। আমাদের এরূপ আশা হইতেছে যে, অতি অল্পকালের মধ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম আম্লেচ্ছ পৃথিবীকে পবিত্র করিবে।"**

—"শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৫। বিশ্বের সর্ব্বত্র যে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই জয়যুক্ত হইবেন, তৎসম্বন্ধে মহাজনের ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ?

"নিঃস্বার্থভাবে যাঁহারা নাম প্রচার করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজনীয় হইবেন এবং বিশুদ্ধনামের চিৎফলই কুতর্করূপ অন্ধকারকে অতি শীঘ্র নাশ করিবে, সন্দেহ নাই। ★★★ আমরা আশা করিতেছি যে, নামের হাটের পর্ব্বটি অতি অল্পদিনের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার হইবে। শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উপাধি প্রবেশ করিতেছে, তাহা ক্রমশঃ দূর হইবে এবং অবশেষে **শুদ্ধনামের জয়পতাকা দেশ-বিদেশে উড্ডীয়মান হইতে থাকিবে।"**

—'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৬। অদূরভবিষ্যতে শ্রীচৈতন্যধর্ম্মই যে জগদ্ব্যাপী হইবে, তাহার লক্ষণ কি?

"বৈষ্ণব মহোদয়গণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে, নোয়াখালি জেলার একজন মুসলমান বিচারপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্মকে সর্ব্বোত্তম জানিয়া ঐ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা-ব্যক্তি অনেক সুকৃতির বলে এরূপ সদ্‌গতি লাভ করিলেন। আশা করি, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় সমস্ত যবন ও ম্লেচ্ছমণ্ডলী ক্রমশঃ এই পবিত্র ধর্ম্ম শীঘ্রই অঙ্গীকার করিবেন। খোল করতাল ও কীর্ত্তনের সুর যেরূপ প্রবলতা-সহকারে অন্যান্যধর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে অতিশীঘ্র চৈতন্যধর্ম্ম জগদ্ব্যাপী হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

—সঃ তোঃ ২।৯ বাং ১২৯৩ 'বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার'

৭। অচিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার সুলক্ষণ সূচিত হইতেছে কি?

'অদ্বিতীয় শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরমধর্ম্ম অবিলম্বেই জগতে যে প্রচারিত হইবে, তাহার লক্ষণ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টিয়ান্‌গণ খোলকরতাল লইয়া নামরস আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ান্ পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যদেবের খোল-করতাল অতি সত্বরেই ইংলণ্ডাদি দেশে লইয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমত্ব, নামের অপার মহিমা, বৈষ্ণবকৃপায়ই যে-সকল চিৎসমৃদ্ধি হইয়া থাকে, এরূপ সিদ্ধান্তের সহিত বক্তৃতার পর "যা'দের দেখ্‌লে নয়ন ঝুরে তারা দু-ভাই এসেছে"—এই সঙ্গীতে খোল-করতাল সহকারে নৃত্য করিতেছেন। আবার মুক্তিফৌজীয় খৃষ্টানগণ প্রকারান্তরে সঙ্কীর্ত্তন স্থাপন করিতেছেন। এইসকল দেখিয়া আমাদের মনে আশা হয় যে, প্রাগুক্ত শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইবার সময় আসিয়াছে। যদিও কীর্ত্তনাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইয়া বৈষ্ণবেতর সম্প্রদায়ে প্রকাশ পায় নাই, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাক্য কিছুদিনের মধ্যেই সত্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না, কেন না, কোন ঘটনাই একেবারে বিশুদ্ধ হয় না। প্রথমে সমলরূপে প্রকাশ হইতে হইতে নির্ম্মল হইয়া পড়ে।"

—'নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়', সঃ তোঃ ৪।৩

৮। কোন্ ধর্ম্মে পরস্পর বিশুদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সম্ভবপর?

"পরমেশ্বরের বিশুদ্ধগুণগণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্ম্মসকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়বিশেষের ভজনভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকল বর্ণ, সকল জাতি, সর্ব্বদেশের মনুষ্য একত্র হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নাম সঙ্কীর্ত্তন সহজেই করিয়া থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকেও চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীবসমূহে সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর

ভুলিতে পারিবেন না। তখন হরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া 'হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ!' বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন।"

—'নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়', সঃ তোঃ ৪।৩

৯। শ্রীভক্তিবিনোদ বিশ্বমঙ্গলের জন্য পরমেশ্বরের নিকট কি আবেদন জানাইয়াছেন?

"Oh God! Reveal Thy most valuable truths to all so that your own may not be numbered with the fanatics and the crazed and that the whole of mankind may be admitted as 'your own'."

—*"To Love God", (Journal of Tajpur 25th Aug. 1871)*

১০। পরমেশ্বর প্রাপ্তপ্রেমজীবন ভক্তকে কিভাবে আহ্বান করেন?

'এই রস-ভাণ্ডার আমি যত্ন করিয়া তোমার জন্যই রাখিয়াছি ; তুমিই ইহার একমাত্র অধিকারী। ★★★ তোমার ভয় নাই, শোক নাই, তুমি অমৃত লাভ করিয়াছ। তুমি আমার জন্য সমস্ত শৃঙ্খল ছেদন করিলে। আমি তোমার প্রীতি-ঋণ শোধ করিতে পারিব না।"

—চৈঃ শিঃ, উপসংহার

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্।।"

গুরূন্—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুগণকে, ঈশভক্তান্—ঈশভক্তগণকে—শ্রীবাসাদিকে ; ঈশম্—ঈশকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে, ঈশাবতারকান্—শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভু প্রভৃতিকে ; তচ্ছক্তীঃ—শ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি শ্রীগৌরশক্তিগণকে, তৎপ্রকাশান্—তাঁহার প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতিকে আমি বন্দনা করিতেছি। গুরু, ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ ও ঈশশক্তি—মহাপ্রভুর মধ্যে এঁরা সকলেই আছেন।

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।।

শ্রীগৌরসুন্দর যদিও অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন, যদিও কৃষ্ণই গৌর এবং গৌরই কৃষ্ণ, তথাপি তাঁহাদের বিলাসগত নিত্য বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। কৃষ্ণস্বরূপে শ্রীগৌরসুন্দরই রসরাজ মূর্ত্তি। আবার কৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দররূপে বিপ্রলম্ভ মহাভাবময় মূর্ত্তি। শ্রীগৌর-সুন্দরকে কৃষ্ণ বলিতে গিয়া যেন আমাদের তদুপাসনায় রসবিপর্য্যয় না ঘটে। শ্রীগৌরাঙ্গই যখন কৃষ্ণ তখন শ্রীগৌরসুন্দরকেই মধুররতির বিষয়বিগ্রহরূপে গ্রহণ করিব, এইরূপ বিচারই গৌরনাগরীবাদ।

ঈশভক্তবিচারে ঈশা-দাস্য ও ঈশ-দাস্য অবস্থিত। ঈশা-দাস্য লাভ হইলে ঈশ-দাস্য লাভ ঘটে ; অর্থাৎ ঈশা-দাসীরই ঈশদাস্যে অধিকার। গোপীগণ আশ্রয়জাতীয় সেবিকা। গোপীর বিচারে কৃষ্ণ নাগররাজ কিন্তু বিপ্রলম্ভ রসময় বিচারে অন্যপ্রকার বিচার করা উচিত।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে,—

যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাঁহানে।
তথাপি স্বভাব সে গায় বুধ জনে।।
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বলে।।

গৌরসুন্দরকে নাগর বলিলে রসাভাস দোষ হয়। যাঁহারা ভজন করেন না, তাঁহারা এই রূপানুগ বিচার লঙ্ঘন করিতেছেন।

অদ্য আমাদের অন্তরঙ্গ ভক্তের কথা আলোচ্য বিষয়। সেবকগণ দুইপ্রকার—বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। গোলোক ব্যতীত নিখিল জগতের কথা—বহিরঙ্গের কথা। বহিঃ অঙ্গ বহিরঙ্গ জগতে মর্য্যাদাপথে অন্তঃ অঙ্গ সেবা বর্ত্তমান। বিশ্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই আড়াই প্রকার রসের বিচারে অন্তরঙ্গতা আবদ্ধ। তৃতীয় মানের জগতে পূর্ণতার অভাব। এ জগতে ভগবানের একপাদ বিভূতি বর্ত্তমান। ত্রিপাদ বিভূতি বৈকুণ্ঠে আছে।

জগৎ মায়ারাণী বা মাপারাণীর রাজ্য। তাই জগতের বিচারে আবদ্ধ আমরা রাধারাণীর বিচার গ্রহণ করি না। ঐশ্বর্য্যবিচারে বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ গোলোকের বহিঃপ্রকোষ্ঠ। বহিঃ-শব্দে অধঃ এবং অন্তঃ-শব্দে উপরি বুঝায়। বৈকুণ্ঠবিচারে অন্তঃ ও বহিঃ শব্দ জড়খণ্ডাত্মক নহে। গৌরব-সখ্য, গৌরব-দাস্য ও গৌরব-শান্ত নারায়ণভক্তে আছে। ঊর্দ্ধবিচারে অর্জ্জুনের সখা প্রভৃতি অবস্থিত। মর্য্যাদাপথে লক্ষ্মীনারায়ণের কথা। মর্য্যাদাশিথিল-পথে সুগভীর অন্তরঙ্গতা। যেমন এদেশের বিচারে প্রভুভৃত্য প্রভৃতির কথা। পিতামাতা, পতিপত্নীর মধ্যে অন্তরঙ্গতা অবস্থিত। মর্য্যাদাপথে Dignity and Reverence আছে ; আর ভাবপথে Closer affinity আছে। দশরথ-কৌশল্যার শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বাৎসল্য রসনৈতিক বিচারে অবস্থিত। নন্দ-যশোদার

বাৎসল্য অন্তরঙ্গ বিচারে অবস্থিত। সীতারামের উপাসনা বা রাধাকৃষ্ণভজনের উপাসনার পার্থক্য আলোচ্য। বজ্জ্রাজী ও রামচন্দ্র, ভীম ও কৃষ্ণ, মধ্বাচার্য্য ও ব্যাসদেব ইঁহাদের সম্বন্ধ মর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা এ প্রকার নয়। অন্তরঙ্গ সেবা-প্রণালীতে Sonhood of Godhead, Consorthood of Godhead and Friendship of Godhead রয়েছে। বৈকুণ্ঠবর ভূমিকা উহা চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত চিন্তার মধ্যে নয়। ইহ জগৎ অতিক্রম ক'রে বিরজা, তৎপরে ব্রহ্মধাম, ব্রহ্মধাম অতিক্রম ক'রে বৈকুণ্ঠের নিম্নার্দ্ধ। (ক্রমশঃ)

~ঃ ঃ~

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—১৭)

ভগবদ্ধাম

শম-দমাদিযুক্ত সুকৃত কর্ম্মিগণ স্বর্গলোকে গমন করেন, ব্রাহ্ম্য-তপস্যাযুক্তগণ ব্রহ্মলোকে পরাগতি লাভ করেন, কিন্তু গোলোকে গতি দুরারোহা। প্রেমি-ভক্তগণ শ্রীহরিতে অভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে প্রকৃতির অতীতা গতি লাভ করেন। গোগণের ও গোপ-গোপীগণের বসতিস্থান বলিয়া ঐ স্থানের নাম গোলোক। কেবল রাগানুগমার্গেই ব্রজগতি সম্ভব।

সর্ব্বোপরি বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণলোক ভিন্ন পৃথিবীতে স্থিত গোকুল-মথুরা-দ্বারকা প্রভৃতি ধামও স্বরূপতঃ প্রপঞ্চাতীত ধামের সদৃশ। সে-সকলও প্রপঞ্চাতীত নিত্য অলৌকিক রূপ এবং শ্রীভগবানের নিত্য-বিহারভূমি।

বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

ভূর্ভুবঃ-স্বস্তলেনাপি ন পাতালতলেঽমলম্।
নোর্দ্ধলোকে ময়া দৃষ্টং তাদৃক্ ক্ষেত্রং বসুন্ধরে।।

শ্রীবরাহদেব বলিতেছেন,—হে বসুন্ধরে! ভূর্ভুবঃ স্বঃ—তিনলোকমধ্যে এবং পাতালে ও উর্দ্ধলোকে কোথাও মথুরার মত নির্ম্মল ক্ষেত্র আর দেখি নাই। "অহোতিধন্যা মথুরা যত্র সন্নিহিতো হরিঃ।" এই মথুরা অতি ধন্যা—যেখানে শ্রীহরি সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন। এই মথুরা যে কেবল উপাসনা-স্থান মাত্র অর্থাৎ ভক্তগণ এখানে ভগবানের উপাসনা করিয়া সিদ্ধির পর অন্যত্র গিয়া ভগবান্‌কে লাভ করিবেন, তাহা নহে। এইস্থানেই (পৃথিবীস্থ মথুরায়ই) শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজ করিতেছেন। পদ্মপুরাণেও তাদৃশী উক্তি আছে,—"অহো মধুপুরী ধন্যা যত্র তিষ্ঠতি কংসহা।" গোপালতাপনী-শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে,—"স হোবাচ তং হি নারায়ণো দেবঃ সকাম্যা

মেরোঃ শৃঙ্গে যথা সপ্তপুর্য্যো ভবতি তথা সকাম্যা নিষ্কাম্যাশ্চ ভূগোলচক্রে সপ্তপুর্য্যো ভবন্তি তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ ব্রহ্মগোপাল-পুরী ইতি।"

শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে বিধাতঃ! যেমন সুমেরু শৃঙ্গে কাম-ফলদা সপ্তপুরী বিদ্যমান্, তদ্রূপ ভূমণ্ডলে ভোগদা ও মোক্ষদা অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারকা—এই সপ্তপুরী আছে। তন্মধ্যে গোপালপুরী মথুরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপা। এই মথুরা সুদর্শন চক্রদ্বারা রক্ষিত হইয়া প্রাপঞ্চিক দোষে দূষিত হয় না। মথুরা, বৃহদ্বন, মধুবন, তালবন, কাম্যবন, বহুলাবন, কুমুদবন, খদিরবন, ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, শ্রীবন, লৌহবন ও বৃন্দাবন—এই দ্বাদশবনে আবৃতা।

শ্রীবৃন্দাবনের তত্ত্ব শ্রীমথুরামণ্ডলের তত্ত্বাদি দ্বারাই সিদ্ধ। দেবর্ষি নারদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

কিমিদং দ্বাদশাত্মকং বৃন্দারণ্যং বিশাম্পতে।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ যদি যোগ্যোস্মি মে বদ।।

হে গোপপতে! এই দ্বাদশকাত্ম্যেক বৃন্দাবনের তত্ত্ব কি? যদি আমি শ্রবণের যোগ্য হই, তবে কৃপা করিয়া বর্ণন করুন। শ্রীকৃষ্ণের উত্তর,—

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈককেবলম্।
অত্র যে পশবঃ পক্ষি-বৃক্ষা কীটা নরামরাঃ।।
যে বসন্তি মমাধিষ্ণ্যে মৃতা যান্তি মমালয়ম্।
অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে।।
যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ।।
পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্।
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী।
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ।।
সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ।
আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে।
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা।।

এই রমণীয় বৃন্দাবন কেবল আমারই নাম। পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, কীট, নর, অমর প্রভৃতি যাহারা আমার ধামে বাস করে, তাহারা মৃত্যুর পর আমার নিত্য ধামে প্রবেশ করে। আমার নিবাস ভূমি বৃন্দাবনে যে-সকল গোপকন্যাগণ বাস করে, তাহারা সকলেই যোগিনী (আমাতে সংযোগপ্রাপ্তা) এবং নিত্য আমার সেবাপরায়ণা। এই পঞ্চযোজন পরিমিত স্থান আমার দেহ-স্বরূপ। পরমামৃতবাহিনী কালিন্দী সুষুম্না নামে অভিহিতা। এখানে দেবগণ ও ভূতগণ সূক্ষ্মরূপে বাস করেন। সর্ব্বদেবময় আমি কখনও এস্থান ত্যাগ করি না। এই স্থানে যুগে যুগে আমার আবির্ভাব-তিরোভাব হইয়া থাকে। এই রম্য বৃন্দাবন তেজোময়, চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য।

বিশেষতঃ তাদৃশ অলৌকিকরূপত্ব ও ভগবন্নিত্যধামত্বের বিষয়ে দিব্য কদম্ব-অশোকাদি বৃক্ষ অদ্যাপি মহাভাগবতগণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

বরাহপুরাণে কালীয়হ্রদ-মাহাত্ম্যে,—

অত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্যন্তে পণ্ডিতা নরাঃ।
কালীয়হ্রদপূর্ব্বেণ কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ।।
শতশাখং বিশালাক্ষি পুণ্যং সুরভি-গন্ধি চ।
স চ দ্বাদশমাসানি মনোজ্ঞঃ শুভশীতলঃ।।
পুষ্পায়তি বিশালাক্ষি প্রভাসন্তে দিশো দশ।।

শ্রীবরাহদেব ধরণীকে বলিতেছেন,—হে বিশালাক্ষি! পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই স্থানে কালীয়হ্রদের পূর্ব্বভাগে সর্ব্বলোক-পূজিত, পবিত্র সদ্‌গন্ধযুক্ত শতশাখ কদম্ববৃক্ষ মহাশ্চর্য্যের সহিত দেখিয়া থাকেন। হে বিশালাক্ষি! সেই কদম্ববৃক্ষ বারমাসই শুভ শীতল পুষ্পযুক্ত। উহার জ্যোতিতে দশদিক্ উদ্ভাসিত হয়।

বরাহপুরাণে ব্রহ্মকুণ্ড-মাহাত্ম্যে শ্রীভগবদুক্তি,—

তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ত্বং বসুন্ধরে।
লভন্তে মনুজাঃ সিদ্ধিং মম কর্ম্মপরায়ণাঃ।।
তস্য তত্রোত্তরে পার্শ্বেঽশোকবৃক্ষঃ সিতপ্রভঃ।
বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী।।
স পুষ্পতি চ মধ্যাহ্নে মম ভক্তসুখাবহঃ।
ন কশ্চিদপি জানাতি বিনা ভাগবতং শুচিম্।।

হে বসুন্ধরে! ব্রহ্মকুণ্ড-বিষয়ে এক আশ্চর্য্য সংবাদ বলিতেছি, শ্রবণ কর। এস্থান আশ্রয় করিয়া যে-সকল মনুষ্য সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়, অর্থাৎ ভক্তির অনুষ্ঠান করে, তাহারা স্থানপ্রভাবে সত্বর সিদ্ধিলাভ করে। সেই ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তরপার্শ্বে একটী শ্বেতবর্ণ অশোকবৃক্ষ আছে। বৈশাখমাসের শুক্লা-দ্বাদশীতে মধ্যাহ্নকালে সেই বৃক্ষ সুখপ্রদ পুষ্প দান করে। শুচি ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত একথা কেহই জানে না। 'শুচি' অর্থে শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয়ে অনুসন্ধানরহিত ব্যক্তি। তিনিই সেই বৃক্ষ দেখিতে পান। এতদ্দ্বারা দেখা যায় যে, পৃথিবীও এ তত্ত্ব অবগত নহেন।

বৃন্দাবনীয় অন্য তীর্থকে উদ্দেশ করিয়া বরাহপুরাণের উক্তি,—

কৃষ্ণক্রীড়া-সেতুবন্ধং মহাপাতক-নাশনম্।
বলভীং তত্র ক্রীড়ার্থং কৃত্বা দেবো গদাধরঃ।।
গোপকৈঃ সহিতস্তত্র ক্ষণমেকং দিনে দিনে।
তত্রৈব রমণার্থং হি নিত্যকালং স গচ্ছতি।।

শ্রীকৃষ্ণক্রীড়া সেতুবন্ধ মহাপাপ-নাশকারী। তথায় বলভী অর্থাৎ তৃণদ্বারা গৃহ

নির্ম্মাণ করিয়া সকল সময়ে বিহার করিবার জন্য তিনি গোপীগণসহ গমন করেন। এখানে 'নিত্যকালং' এবং 'গচ্ছতি' শব্দদ্বয়ে বর্ত্তমানকাল প্রয়োগ থাকায় তথায় নিত্যস্থিতি প্রমাণিত হয়।

স্কান্দেও উক্ত হইয়াছে,—

ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবী-সমাশ্রিতম্।
হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্ম-রুদ্রাদি সেবিতম্।।

অতএব পুণ্য বৃন্দাবন বৃন্দাদেবীকর্ত্তৃক সমাশ্রিত, শ্রীহরি-অধিষ্ঠিত এবং তাহা ব্রহ্ম-শিবাদি-পরিসেবিত।

শ্রুতিতেও দেখা যায়,—

"গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহং বৃন্দাবন-সুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং তোষয়ামি ইতি।" শ্রীগোপালতাপনীতে ব্রহ্মার উক্তি,—বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষমূলে অবস্থিত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দকে আমি মরুদ্গণের সহিত পরিচর্য্যাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া থাকি।

পাদ্মে পাতালখণ্ডে উক্তি,—

"যমুনাজল-কল্লোলে সদা ক্রীড়তি মাধবঃ।"

যমুনা-জলকল্লোলে মাধব সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন। যমুনার জল-কল্লোল যাহাতে এরূপ যে বৃন্দাবন, তাহাতে মাধব নিত্য ক্রীড়া করেন। তদ্গুণ সংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাসে অজহল্লক্ষণা স্বীকার করিয়া যমুনাতীর ও নীর—উভয়ত্রই ভগবানের ক্রীড়াস্থান জানিতে হইবে।

এ সকল প্রমাণদ্বারা ভৌমবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি সিদ্ধান্তিত হইল।

ছান্দোগ্যে ৭।২৪।১ মন্ত্রে—স ভগবান্ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? স্বে মহিম্নি ইতি।

সেই ভূমাখ্য শ্রীহরি কোথায় অবস্থিত? নিজ বিভূতিতে প্রতিষ্ঠিত।

গোপালতাপনীতে—'সাক্ষাদ্ ব্রহ্মগোপালপুরী হীতি।' গোপালপুরী সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম।

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে—'তেজোময়মিদং রম্য দৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা।' এই শ্রীকৃষ্ণধাম তেজোময়, রমণীয় এবং চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য।

ভগবদ্ধামসমূহ নিত্য চিন্ময়, তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে,—

ছত্রাকারন্তু কিং জ্যোতির্জলাদূর্দ্ধং প্রকাশতে।
নিমগ্নায়াং ধরায়ান্তু ন বৈ মজ্জতি তৎকথম্।।
কিমেতচ্ছাশ্বতং ব্রহ্ম বেদান্তশত-রূপিতম্।
তাপ-ভয়ার্ত্তি-দগ্ধানাং জীবনং ছত্রতাং গতম্।।
দর্শনাদেব বাস্যাথ কৃতার্থাঃ স্মো জগদ্গুরো।
বারং বারং তবাপ্যত্র দৃষ্টির্লগ্না জনার্দ্দন।
পরমাশ্চর্য্য-রূপোঽপি সাশ্চর্য্য ইব পশ্যসি।।

শ্রীভগবদুত্তর,—

ছত্রাকারং পরং জ্যোতির্দৃশ্যতে গগনে বরম্।
তৎপরং পরমং জ্যোতিঃ কাশীতি প্রথিতং ক্ষিতৌ।।
রত্নং সুবর্ণখচিতং যথা ভবেত্তথা পৃথিব্যাং খচিতা হি কাশিকা।
না কাশিকা ভূমিময়ী কদাচিত্তু ততো ন মজ্জেন্মম সদ্‌গতির্যতঃ।
জড়েষু সর্ব্বেষ্বপি মজ্জমানেষ্বিয়ং চিদানন্দময়ী ন মজ্জেৎ।।

মুনিগণের শ্রীবিষ্ণুর প্রতি প্রশ্ন,—

হে ভগবন্! জলের উপর ছত্রাকারে জ্যোতিঃস্বরূপ ইহা কি প্রকাশ পাইতেছে? সমস্ত পৃথিবী জলমগ্ন হইলেও উহা কেন জলমগ্ন হয় নাই? ইহা কি বেদান্তশত-নিরূপিত শাশ্বত ব্রহ্ম? অথবা তাপত্রয়দগ্ধ জীবগণের জীবন ছত্ররূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে? হে জগদ্‌গুরো! আমরা জ্যোতিঃস্বরূপ ঐ বস্তুটী দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। হে জনার্দ্দন! আপনার দৃষ্টি বারম্বার ঐ জ্যোতিরূপ ছত্রে সংলগ্ন কেন? আপনি স্বয়ং পরমাশ্চর্য্যস্বরূপ হইয়াও বিস্মিতের ন্যায় উহা দর্শন করিতেছেন কেন?

শ্রীবিষ্ণুর উত্তর—ছত্রাকার গগনবিহারী যে পরম জ্যোতি তোমরা দেখিতেছ, উহা পৃথিবীতে কাশী-নামে প্রসিদ্ধ। যেমন সুবর্ণমধ্যে রত্ন খচিত থাকে, তদ্রূপ পৃথিবীতে ঐ কাশী খচিত। তাহা কখনও ভূমিময়ী নহে অর্থাৎ জড় নহে; এজন্য ইহা জলমগ্ন হয় না। উহা আমার সদ্‌গতি অর্থাৎ আমি তথায়ও নিত্য বিরাজ করি। নিখিল জড়বস্তু নিমজ্জিত হইলেও চিদানন্দময়ী কাশী নিমজ্জিত হইবে না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উক্ত হইয়াছে,—

চেতনা-জড়য়োরৈক্যং যদ্বন্নৈকস্থয়োরপি।
তথা কাশী ব্রহ্মরূপা জড়া পৃথ্বী চ সঙ্গতা।।
নির্ম্মাণস্তু জড়স্যাত্র ক্রিয়তে ন পরাত্মনঃ।
উদ্ধরিষ্যামি চ মহীং বারাহং রূপমাস্থিতঃ।
তদা পুনঃ পৃথিব্যাং হি কাশী স্থাস্যতি মৎপ্রিয়া।।

এক দেহমধ্যে জড়-চেতনের অবস্থিতি হইলেও যেমন চেতন জড়ধর্ম্মে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মরূপা কাশী এবং জড়রূপা পৃথিবী মিলিতা থাকিলে কাশী পার্থিব জড়ধর্ম্মে অলিপ্তা। যেমন জড়ের উৎপত্তি আছে, জড়ে অধিষ্ঠিত পরমাত্মার উৎপত্তি নাই, তদ্রূপ পৃথিবীর উৎপত্তি থাকিলেও কাশীর উৎপত্তি নাই। আমি বরাহ-রূপ প্রকট করিয়া যখন পৃথিবীকে উদ্ধার করিব, তখন পুনরায় আমার প্রিয় এই কাশী পৃথিবীমধ্যে স্থিতিলাভ করিবে। পরমাত্মা দেহে অবস্থিত হইলেও যেরূপ দেহ-পীড়াদিদ্বারা ব্যথিত হয় না, তদ্রূপ কাশী প্রভৃতি ভগবদ্ধামসকল পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াও প্রাপঞ্চিক ধর্ম্মে লিপ্ত হয় না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ আশ্বিন, ১৪০৮; ১৭ অক্টোবর, ২০০১

তর্কপন্থা ও শ্রৌতপন্থা

যে পন্থায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে অতীন্দ্রিয় বাস্তবসত্য তথা বাস্তববস্তুকে মাপিয়া লইবার চেষ্টা বিদ্যমান, তাহাই 'তর্কপন্থা'। ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা ও ঐশ্বর্য্য সকলই তর্কাতীত। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কখনও তর্কের দ্বারা জ্ঞেয় নহেন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি তাঁহার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির মাধ্যমে যে ভাল-মন্দের বিচার করেন, তাহার কোনটাই ঠিক নহে, সবটাই তর্কপন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত ও ভ্রমপ্রমাদাদি পূর্ণ। দৃশ্যবস্তু ও বুদ্ধ্যাদি জড় হইবার ফলে বুদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা কেবলমাত্র বাহ্য জাগতিক বস্তুসকল উপলব্ধ হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত বাস্তববস্তুর উপলব্ধি অসম্ভব। জড় সহজিয়া বা সাহিত্যিকগণ মনের বা মেধার সাহায্যে অপ্রাকৃত বস্তুর বিচার করিতে গিয়া যে-সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন, সকলই—লৌকিক ; সুতরাং তাঁহাদের তাদৃশ প্রয়াস নিরর্থক। বিশ্বের যাবতীয় ভাব প্রাকৃত, ত্রিগুণজাত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অসৎ। তাই জাগতিক ভাব বা ব্যাপারসমূহে ভালমন্দের পার্থক্য বিদ্যমান। জড়াভিনিবেশবশতঃ ঐ সকলের নিন্দা ও প্রশংসায় পরমার্থ হানি হয়।

স্বরূপবৃত্তি বা আত্মবৃত্তির আনুগত্য সম্বন্ধবিহীন মনের যাবতীয় চেষ্টা ভক্তি-প্রতিকূল। এতাদৃশ মন ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—এই দোষচতুষ্টয়ে সর্ব্বদাই দুষ্ট। মনোধর্ম্মী মাত্রেই তর্কপন্থী। তর্কপন্থীর কথা কখনও প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। তর্কপন্থাদ্বারা অবিদ্যাগ্রস্ত জীব অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সন্ধান পাইতে পারেন না।

অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্যশক্তি তার ।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র তাহার।। (চৈঃ চঃ অঃ ১৯।১০৩)

তর্কপন্থা কখনই অদ্বয়জ্ঞানের সাধনস্বরূপ অঙ্গ হইতে পারে না। ভগবৎস্বরূপ, ভক্তস্বরূপ পরস্পরের চিদুদ্দীপনময় নিত্য অনুভবনীয় ভাব তর্কপথের প্রাপ্য বস্তু নহে। ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েরই প্রভাব অচিন্ত্য।

ভগবান্, তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না যায় কথন।। (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৯৬)

অচিন্ত্যভাবসম্পন্ন বস্তুকে কখনও তর্কের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর নহে। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্ব ৫।২২ শ্লোকে উক্ত রহিয়াছে,—

অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।।

"যে ভাব অচিন্ত্য তাহাতে তর্কের যোজনা করা উচিত হয় না। অচিন্ত্যের লক্ষণ এই যে,—উহা প্রকৃতির অতীত।" জড় তর্ক অবলম্বনে জড়ভোগপ্রবৃত্তি-প্রাচুর্য্যে

ভগবানের চিন্ময়লীলা দূরে পড়ে। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।" আত্মা আছে, কি না আছে সন্দেহ যাঁহাদের আছে, তাঁহারা তর্কপন্থী। যিনি প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই সুখপ্রাপ্ত হন ; সংশয়াত্মা ব্যক্তিই কেবল ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন। "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" "নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।" যম মহারাজ তর্কের কুফল সম্বন্ধে নচিকেতাকে বলিয়াছেন,— "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।" অর্থাৎ "হে নচিকেতা, তুমি যে আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে মতিলাভ করিয়াছ, তর্কের দ্বারা তাহা নষ্ট করা উচিত নয়।"

অপ্রাকৃত হরিভক্তির কথা কিছু বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত বিচার বা বুদ্ধির সাহায্যে যাহারা কুতর্কের আবাহন করিয়া থাকেন, তাহারা মায়ার কবলে কবলিত হতভাগ্য জীব। এই প্রসঙ্গে গোপীনাথাচার্য্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছেন,—

তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক, নানাবাদ।
ইহার কি দোষ—এই মায়ার প্রসাদ।। (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১০৭)

বৈষ্ণব ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

মায়াবাদ-দোষ যার হৃদয়ে পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তার বজ্রসম ভেল।।

তর্কপথে বা অশুদ্ধপথে যে সত্য আমরা জ্ঞাত হই, তাহা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। যাহা পরিবর্ত্তনীয়, সেই সত্যকে কখনও প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। তর্কের কোন প্রতিষ্ঠা নাই—"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১১)। এতৎপ্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগ ১।৪৫ শ্লোকে রহিয়াছে,—

স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাৎ ভক্তি-তত্ত্বাববোধিকা।
যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যদস্যা অপ্রতিষ্ঠতা।।

"ভক্তিতত্ত্ব-প্রতিপাদক শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে অত্যন্ত অল্পমাত্র রুচি জন্মিয়া থাকিলে ভক্তিতত্ত্ব বোধগম্য হয়, কিন্তু কেবলমাত্র শুষ্ক-যুক্তি-তর্কদ্বারা তাহা কোনমতেই জানা যায় না, কারণ তর্কের কোন প্রতিষ্ঠা বা শেষ নাই।"

যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে।। (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১।৪৬)

"তর্কনিষ্ঠ কোন ব্যক্তি তর্কদ্বারা অতি যত্নে একটী মত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অধিক অন্য একজন তার্কিক অনায়াসে তাহা খণ্ডন করিতে পারেন।"

ভগবানের ভক্তগণ শ্রৌতপন্থার অনুসরণকারী বা শ্রৌতপন্থী। তাঁহারা শ্রুতি বা গুরুপারম্পর্য্যে শ্রুত শ্রৌতকথা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ। আম্নায়পথে যে সত্য আগত হয়, তাহা অপরিবর্ত্তনশীল, তাহাকেই শ্রৌতপন্থা বা বিশুদ্ধপন্থা বলে। অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের প্রদাতাই শ্রীল গুরুপাদপদ্ম। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের বাণীর বাহিরে অন্য কোন

বাস্তব সত্য থাকিতে পারে না। সকল সন্দেহ ও বাদ নিরসন করিতে একমাত্র গুরুপাদপদ্মই সমর্থ। তর্কপন্থীর তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে যে বিচারপ্রণালী, তাহাতে গুর্ব্ববজ্ঞা ও শাস্ত্রাবজ্ঞা উভয়ই হইয়া থাকে। মানব যতদিন পর্য্যন্ত তর্কপথ পরিত্যাগ না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার বাস্তব সত্যের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইবে। তর্কপন্থীমাত্রেই গুরুপারম্পর্য্য-লব্ধ শ্রৌতপথ স্বীকার না করায় অশ্রৌতপন্থী, বেদবিরোধী, ভক্তিবিরোধী, নাস্তিক বা জীবাত্মা স্বরূপের নিত্যধর্ম্মবিরোধী। তাঁহাদের কথা অজ্ঞ সাধারণের শ্রুতিমধুর হইলেও তত্ত্বজ্ঞগণের অশ্রাব্য। ভগবদ্ভজনানভিজ্ঞ জনগণ মনোধর্ম্মেরই শ্রেয়ত্ব প্রদান করিয়া থাকেন, তাই তাহাদের মনের কথায় আদর, শ্রৌতকথায় আদর নাই। শ্রুতিপারম্পর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বহু শ্রবণদ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় না।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।।

(কঠ ১।২।২৩)

"পরমাত্ম-বস্তুকে বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্যদ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা প্রার্থনা করেন, তখন তাহার নিকটে সেই পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশতনু প্রকটিত করেন।"

অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে।। (চৈঃ চঃ মঃ ৬।৮২)

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'—এই বিচারের অনুকূলপন্থাই শ্রৌতপন্থা এবং বিরুদ্ধপন্থাই তর্কপন্থা। অন্বয়ভাবে যাহা গৃহীত হয়, তাহা শ্রৌতপথ ; আর ব্যতিরেকভাবে যাহা গ্রহণ করা হয়, তাহা তর্কপথ। শ্রৌতপন্থী—অহিংসক, আর কপট শ্রৌতপন্থীর বেশে কুতার্কিক—হিংসাপরায়ণ। ষড়্দর্শনের পাঁচটী দর্শনই তর্কপথে প্রতিষ্ঠিত, কেবলমাত্র শ্রীল বেদব্যাসের বেদান্তদর্শনে শ্রৌতপথের কথা পাওয়া যায়। আচার্য্য শঙ্কর অসুরমোহনের জন্য শ্রৌতপথের নাম করিয়া বেদান্তদর্শনে তর্কপন্থার আবাহন করিয়াছেন। তর্কপন্থাদ্বারা ভগবজ্জ্ঞান অসুরমোহনের জন্য আবৃত হইয়াছে, শ্রৌতপন্থাই সেই আবরণ-উদ্ঘাটনের একমাত্র সম্বল। কীর্ত্তনমুখেই শ্রৌতপথ সংরক্ষিত। গুরুপারম্পর্য্যরহিত গুর্ব্ববজ্ঞাময় তর্কপথ অবিদ্যাগ্রস্ত জীবকে তমোরাজ্যে প্রবেশ করায়, সেখানে ভজনীয় বস্তুর সেবাবৃত্তি নাই। ভাগ্যহীন ব্যক্তিই শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না।

শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে।। (চৈঃ চঃ)

শাস্ত্রকারগণ আমাদের মত বিষয়-ভোগাসক্ত ছিলেন না, তাঁহাদের বিচারে কোনপ্রকার দোষ নাই, নিঃসংশয়ে তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ আশ্বিন, ১৪০৮ ; ১৭ অক্টোবর, ২০০১

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোন প্রকারে কাহারও অনর্থসাগর হইতে উদ্ধারলাভ ঘটে না। শ্রৌতপথ অবলম্বন করিয়া শ্রৌতবিধি মতে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত জীবের তর্কপন্থার কোন শুভ গতি নাই। যাহারা সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প তাঁহাদের অশ্রৌত তর্কপথই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, তাঁহারা শ্রৌতপথের বা সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে অসমর্থ। যথার্থ কৃষ্ণৈকশরণ কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত লঘুতা ও অভাব পরিপূরণ করিবার জন্য যাঁহারা আধ্যক্ষিক তর্কপথ অবলম্বন করেন, তাহাদের ভব-নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার কোনদিন সম্ভাবনা নাই।

গৌরসুন্দর তর্কপথের আবাহন করেন নাই, পরন্তু তিনি শ্রৌতপথের পুনঃপ্রবর্ত্তক। তিনি কর্ম্মিগণের ন্যায় জড়েন্দ্রিয়তর্পণপর চঞ্চল মনোধর্ম্ম প্রদর্শন বা প্রচার করেন নাই। ভগবান্ অবিদ্যাগ্রস্ত জীবকে তর্কপন্থাশ্রয়ে স্বীয় অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ লাভ করিতে পারা যায় না, তাহা জানাইবার জন্য শ্রৌতপন্থাই একমাত্র গ্রহণীয় বলিয়াছেন। শ্রৌতপথ বা গুরুবাক্যে দৃঢ় নিশ্চয়তাই ভবরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এতদ্ব্যতীত ভজনের প্রধান প্রতিবন্ধক বা কণ্টকস্বরূপ তর্কপন্থার আক্রমণের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই, নাই, নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

একাদশী-মাহাত্ম্য

গালব-নামে এক মহাতপস্বী মুনি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল ভদ্রশীল। ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি যেমন বাল্যকাল হইতেই হরিভজনে রত ছিলেন, সেইপ্রকার ভদ্রশীলও সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শিশুকাল হইতেই ভগবৎপাদপদ্মসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বেদপাঠ, তপ-জপ, শাস্ত্র অধ্যয়ন অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া ভদ্রশীল হরিমন্দির মার্জ্জন করিতেন এবং কৃষ্ণা ও শুক্লা এই দুইটী একাদশী-ব্রত শুদ্ধচিত্তে পালন করিতেন।

পুত্রের এতাদৃশী ভক্তি ও হরিভজন দর্শন করিয়া তাঁহার পিতা গালবমুনি আশ্চর্য্য হইলেন এবং এই ধর্ম্ম আচরণের ফল কি ভদ্রশীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রশীল বলিলেন,—"হে পিতঃ! এই একাদশী-ব্রতের ফল বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। আকাশের তারাও গণিবার ক্ষমতা হয়ত' কাহারও হইতে পারে, সমুদ্রের জলও হয়ত' কলসীতে ভরা যাইতে পারে, পৃথিবীর ধূলিকণাও হয়ত' গণনা করা সম্ভব হইতে পারে ; কিন্তু এই একাদশী-ব্রতের ফল বর্ণন করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আপনি যখন এতই আগ্রহান্বিত হইয়াছেন, তখন বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ আশ্বিন, ১৪০৮ ; ১৭ অক্টোবর, ২০০১

পূর্ব্ব জন্মে আমি সোমবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার নাম ছিল ধর্ম্ম-কীর্ত্তি। আমি জম্বুদ্বীপে একচ্ছত্র নরপতি ছিলাম। আমি খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিলাম। সর্ব্বদা অধর্ম্মে রত থাকিয়া সাধুগণকে এবং প্রজাদিগকে পীড়ন করিতাম। এইভাবে পাপকার্য্যে জীবন কাটাইতেছিলাম। দৈবযোগে একদিন সৈন্যসামন্ত লইয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক মৃগয়া করিতে গেলাম। বনমধ্যে একটী হরিণকে দেখিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য ঘিরিলাম এবং সৈন্যদের বলিলাম,—এই হরিণটী যদি তোমরা মারিতে না পার, তবে নিস্তার নাই। যাহার দিক্ দিয়া হরিণটী পলায়ন করিবে, তাহাকে সবংশে নিধন করিব। এইকথায় সৈন্যগণ খুব ভীত হইল এবং সজাগভাবে হরিণটীকে ধরিবার জন্য উৎসুক হইল। হরিণটীও শঙ্কাকুল হইয়া ভাবিল,—"যদি আমি সৈন্যের দিক্ দিয়া পলায়ন করি, তবে রাজা সবংশে সৈন্যগণকে মারিয়া ফেলিবে। আমার ন্যায় একটী নগণ্য প্রাণীকে রক্ষা করিবার জন্য অনেকেই মৃত্যু বরণ করিবে। আজ শুভ একাদশী-তিথি। যদি ইতিমধ্যে আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে খুব ভাল হইবে। একাদশী তিথিতে মৃত্যুর জন্য আমার পশুযোনি হইতে মুক্তিলাভ হইবে। যাহা হয় হইবে, আমি রাজার দিক্ দিয়া পলায়ন করিব। রাজার হাতে নিধন হইলে এই পাপযোনিপ্রাপ্ত পশুত্ব খণ্ডন হইবে এবং মোক্ষলাভ হইবে। আর যদি কোনরকমে পলাইয়া গিয়া আমার প্রাণরক্ষা হয়, তাহা হইলে রাজা লজ্জা পাইবে এবং সৈন্যগুলিও রক্ষা পাইবে।"—এইরূপ ভাবিয়া হরিণটী আমার দিক্ দিয়া পলাইয়া গেল। আমি উহাকে লক্ষ্য করিয়া বাণ ছুঁড়িলাম। কিন্তু এমন নিয়তির পরিহাস আমার বাণ ব্যর্থ হইল। আমার খুব লজ্জা হইল। ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলাম। অশ্বপৃষ্ঠে পড়িয়া ঘোর বনে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু বহু অন্বেষণ করিয়াও হরিণটীকে দেখিতে পাইলাম না। অত্যন্ত পরিশ্রমে আমার অশ্বটীর মৃত্যু হইল। আমিও খুব পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিলাম। আমার সৈন্যগণ বহু অন্বেষণ করিয়াও আমাকে না পাইয়া স্ব-স্ব-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এদিকে শেষরাত্রিতে সেই বৃক্ষতলে আমার মৃত্যু হইল। মহাভয়ঙ্কর দুইজন যমদূত আসিয়া মহাপাশদ্বারা আমাকে বন্ধন করিয়া ফেলিল এবং যমালয়ে লইয়া গেল। মহাজন যমরাজ দূতগণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"অকারণে কেন ইহাকে এখানে আনিয়াছ? এই রাজা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। কারণ, একাদশীর উপবাসে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমি তোমাদিগকে সাবধান করিয়া বলিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর,—যিনি একাদশী-ব্রত পালন করিবেন, হরিমন্দির মার্জ্জন করিবেন এবং গোবিন্দের নাম-কীর্ত্তন করিয়া হরিভজনে রত থাকিবেন, তাঁহাকে কোনও দিন এখানে আনিবে না। বরং তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিবে।"

যমরাজের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া দূতগণ বিস্মিত হইল। করযোড়ে ধর্ম্মরাজের

স্তব করিল। মহাজন যমরাজের মুখে এইকথা শ্রবণ করিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। যমরাজ বিধিমতে আমার সেবা করিলেন। তখন আকাশ হইতে দিব্যরথ আসিল এবং আমার দিব্যগতি লাভ হইল। অজ্ঞানে একাদশী-ব্রত আচরণ করিয়া আমার ব্রহ্মলোকে বাস হইল। সেই আমিই আপনার পুত্ররূপে সম্প্রতি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার দিব্যজ্ঞান অপহৃত হয় নাই। তজ্জন্যই আমি হরিভজনই সার বুঝিয়াছি এবং একাদশী-ব্রত পালনের ন্যায় সাধন আর নাই জানিয়া আমি একাদশী-ব্রত পালন করিতেছি।"

পুত্রের কথায় গালবমুনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং এহেন ভক্তপুত্র লাভের জন্য গৌরবান্বিত ও ভাগ্যবান্ বোধ করিয়া মুহুর্মুহু পুত্রকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। একাদশী-ব্রতপরায়ণ হরিভক্ত পুত্রের সঙ্গক্রমে গালবমুনি হরিপরায়ণ হইলেন এবং একাদশী-ব্রত পালন করিতে লাগিলেন।

"মাধব-তিথি, ভক্তি-জননী, যতনে পালন করি।
কৃষ্ণ বসতি, বসতি বলি', পরম আদরে বরি।।"

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

বিপদাপদই মানুষের প্রকৃত বন্ধু

বিপদাপদই মানুষের প্রকৃত বন্ধু। কেন? 'বিপদে মধুসূদন'—বিপদকালেই বিপদহারী মধুসূদনের স্মৃতি জাগরিত হয়। দুঃখ-কষ্ট, আপদ-বিপদে পতিত হলেই মানুষ পরিত্রাণ পাবার জন্য দুঃখহারি বিপদভঞ্জন শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করেন।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণ দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কঠোর সাধন-ভজন করেন। ভক্তরা কিন্তু দুঃখ-কষ্ট, আপদ-বিপদকে সরিয়ে না রেখে বরং বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদ হিসাবে গ্রহণ করেন। কেন করেন? ভক্তরা মনে করেন, ভগবান্ আপদ-বিপদ দিয়ে আর্ত্তি বাড়িয়ে দেন, তাঁর প্রতি প্রীতির গাঢ়তা আনয়ন করেন। স্বর্ণকার যেমন কাঁচা সোনাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তাকে পাকা সোনায় পরিণত করেন, ভগবান্ও ঠিক তদ্রূপ তাঁর আশ্রিতজনকে বিপদাপদ, দুঃখ, কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করে তাকে বিশুদ্ধ করে নেন। তাই পাণ্ডবজননী কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রার্থনা করিয়াছেন,—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্।। (ভাঃ ১।৮।২৫)

হে গোবিন্দ! তুমি আমাকে নিরন্তর দুঃখ-কষ্টের মধ্যে রেখ। আমি কামনা করি যে, বিপর্য্যয় বার বার আমাদের জীবনে ঘটুক। যাতে আমরা বার বার তোমার দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করি।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ আশ্বিন, ১৪০৮ ; ১৭ অক্টোবর, ২০০১

কুন্তীদেবীর এই প্রার্থনা সমগ্র শুদ্ধভক্তের ভক্তিপথের আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ। যার সত্যি সত্যি কৃষ্ণভজন আরম্ভ হয়েছে, তার নিকট নানাপ্রকার বিঘ্ন, বিপদরাশি কৃষ্ণেচ্ছায় উপস্থিত হয়ে তার হৃদয়ের অকপটতা পরীক্ষা করে থাকেন। যারা এই বিপদসমূহকে কৃষ্ণের অনুকম্পা জেনে কায়মনোবাক্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণবে আনুগত্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন, তারাই কৃষ্ণকৃপা লাভ করতে পারেন।

এইজন্য কুন্তীদেবী বললেন,—"বিপদঃ সন্তু" অর্থাৎ বিপদ আসুক। বিপর্য্যয়কে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন কেন? কারণ, তিনি জানেন কিভাবে বিপদকালে কৃষ্ণ স্মরণীয়। কুন্তীদেবী বলেন,—হে ভগবান্, বিপর্য্যয়গুলিকে আমি স্বাগত জানাই, কারণ বিপদকালে আমি তোমাকে নিবিড়ভাবে স্মরণ করতে পারি। অতএব আমরা বিপজ্জনক অবস্থায় নিপতিত হলে, সেই বিপদই কৃষ্ণস্মরণে আমাদের অনুপ্রেরণাদায়ক। বিপদকে স্বাগত জানাবার কারণ কি? বিপদ বিপর্য্যয়কে স্বাগত জানাবার উদ্দেশ্য হল—কৃষ্ণদর্শন। বিপদ আমাদের পরমার্থ-জীবনের উন্নতির সহায়ক। এইজন্য বিপদ কাম্য। অবিরামভাবে ভগবৎপাদপদ্ম স্মরণের অর্থ বিপদসঙ্কুল জন্ম-মৃত্যুময় ভবসাগর থেকে ভগবদ্ধামে সেবা প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুতি। গোষ্পদের ন্যায় ক্ষুদ্র জলাশয় অতিক্রম করা যেমন সহজ, ঠিক তেমনই দুস্তর ভগসাগর ভগবচ্চরণে শরণাগত ভক্ত অতি অনায়াসেই অতিক্রম করে ভগবানের চিন্ময়ধামে যেতে পারেন।

কৃষ্ণভক্ত কখনও বিপদ-বিপর্য্যয়ে বিচলিত হয় না। বরং বিপদকে স্বাগত জানায়। কেননা, কৃষ্ণভক্ত সবসময়ই ভগবানের চরণে একান্ত শরণাগত—নিবেদিতাত্মা। তাই কৃষ্ণভক্ত সম্পদ্ ও বিপদ—উভয়কেই সমদৃষ্টিতে দেখেন, উভয়কেই কৃষ্ণকৃপা উপলব্ধি করে থাকেন। বিভিন্ন ভক্ত এইভাবে চিন্তা করেন যে, কৃষ্ণ বিপদরূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। এই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গী। যেমন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধজয়ের পূর্ব্বে পাণ্ডবদেব বহু বিপদে পড়তে হয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণ বার বার তাঁদের বিপন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। পাণ্ডবেরা কোন বিপদেই বিচলিত হননি। কারণ তাঁরা জানেন, তাঁদের সঙ্গে সর্ব্বদাই কৃষ্ণ আছেন। সেইজন্য ভগবদ্ভক্ত বিপদে বিপন্নবোধ করেন না। ভক্তগণ ভাবেন এই বিপর্য্যয় হচ্ছে কৃষ্ণেরই কৃপা। কৃষ্ণ বিপদ দিয়েছেন, কৃষ্ণই আবার রক্ষা করবেন।

শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ কখনও বিপদ বা বিপর্য্যয়ের নিবৃত্তি কামনা করেন না। কারণ, বিঘ্ন ও বিপদ হরিভজনের তীব্রতা কোটিগুণ বৃদ্ধি করে থাকে। বিপদের অগ্নিপরীক্ষায় ভক্তের সম্ভোগপিপাসা ও অনর্থরাশিকে অনায়াসে ও অজ্ঞাতসারে রক্ষা করে দেয়। বিপদের মধ্যেই রয়েছে বিজয়ের জয়মাল্য, বিপদরাশির মধ্যে রয়েছে সেবানিষ্ঠার পরীক্ষা। বিপদই আমাদের অধিকতর সেবারাজ্যে আকৃষ্ট করে, অনায়াসে দুঃসঙ্গ বর্জ্জনে দৃঢ়ব্রত করে দেয়। বিপদই কৃষ্ণসেবানন্দের উদ্দীপক।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ আশ্বিন, ১৪০৮ ; ১৭ অক্টোবর, ২০০১

ভগবান্ অহৈতুক বিঘ্ন-বিপদ প্রদান করে ভক্তের ভক্তত্ব পরীক্ষা করে থাকেন। বিঘ্ন-বিপদ না থাকলে সেবকের সেবোৎসাহ বৃদ্ধি হয় না। তজ্জন্য ভক্ত সহস্র সহস্র বিপদরাশি, বিঘ্নরাশি প্রার্থনা করেন। আমাদের এমনভাবে ভজন করা উচিত যাতে দুঃসহ দুঃখ-দুর্দ্দশায়ও তা বিঘ্নিত না হয়। এটী হচ্ছে কুন্তীদেবীর উপদেশ।

অনেকে বলেন,—আপনারা শ্রীকৃষ্ণভক্ত, আপনাদের আবার বিপদ-আপদ কেন? এই জড়জগৎ হচ্ছে বিপদসঙ্কুল, বিপদাপদে পরিপূর্ণ—'পদং পদং যদ্ বিপদম্।' জগৎটাই বিপদময়। এখানে কোন স্থান নিরাপদ নয়, একমাত্র গোলোক-বৃন্দাবন ছাড়া। এ সংসারে সকলে বিপদ এড়াতে চায়, কিন্তু তা পারেন না। ভক্ত কিন্তু কখনও বিপদ থেকে মুক্ত হতে চান না। কারণ, বিপদের মধ্যেই কপট-অকপটের বাছাই হয়। মৌখিক ভক্তি ও আন্তরিক ভক্তির পরীক্ষা হয়। কপট সাধু ও বাস্তব সাধুর যাচাই হয়। কাজেই ভক্তিরাজ্যে বিপদের মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান আর কিছুই নেই। এজন্যই কুন্তীদেবী কৃষ্ণের নিকট চিরকাল বিপদের প্রার্থনা করেছেন। শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে বিপদের মধ্যে চিত্তে আতঙ্ক উপস্থিত হয় না। কারণ, তারা শরণাগত। এই যে অসুরগণের আসুরিক চেষ্টা, পাষণ্ডগণের পাষণ্ডতা, দুর্ম্মুখগণের কুৎসিত নিন্দা, কুচক্রিগণের নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র, কপটগণের কুনাট্য—এগুলি আপাতদৃষ্টিতে খারাপ হলেও এগুলি ভক্ত-সাধকের ভক্তির পুষ্টিসাধন করে থাকে।

কৌরব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধের মধ্যে আমরা কি শিক্ষা পাই? সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই সত্যের বিজয়পতাকা উড্ডীন। দুর্য্যোধনের দাম্ভিকতার পরিণাম ও অর্জ্জুনের শরণাগতি। বিপদ-বিঘ্নের মধ্যেই শুদ্ধভক্তের সেবোৎসাহ কোটিগুণ পরিবর্দ্ধিত হয়, আনুগত্য ধর্ম্মে কোটিগুণ আত্মপ্রকাশিত হয়, দৈন্য কোটিগুণে প্রকটিত হয়, ভব-মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হয়, শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরিত হয়, পরবিদ্যার জীবন লাভ হয়, প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন লাভ হয় এবং সমস্ত আত্মা সেবারসে অভিষিক্ত হয়।

বিপদের মধ্যেই হরি-গুরু-বৈষ্ণবে শরণাগতিতে উৎসাহ ও বল পাওয়া যায়। বিপদের মধ্যে দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য ভক্তের হৃদয়ে উদিত হয়ে থাকে। বিপদেই যে-প্রকার আর্ত্তি সহজেই উদিত হয়, শরণাগতি চিত্তে অধিষ্ঠিত হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। বিপদের মধ্যে আমরা যেমন ভক্তির পোষক আচারে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারি, তেমন কিন্তু সম্পদের মধ্যে হতে পারি না। কারণ, সম্পদ্ আমাদের সম্ভোগের মায়াবী-মূর্ত্তিতে মনকে অন্যমনস্ক, বিক্ষিপ্ত করে দেয়। শরণাগতের আপাত বিপদ বা বিঘ্ন সমস্তই পরমমঙ্গলের অগ্রদূত। সেই বিপদেই কৃষ্ণ আমাদের অনুপ্রেরণাদায়ক। এইজন্য বিপদকে স্বাগত জানানো উচিত।

যারা বিষয়ী, দুর্জ্জন, যারা জাগতিক প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির বল ভরসাকে বহুমানন

করে বা প্রাকৃত বলের দ্বারা সাধুগণকে নির্য্যাতিত করে, তাদের ভজনপথ বিঘ্নসঙ্কুল করতে চায়, তাদের জাগতিক বল ভরসা কিছুতেই তাদের রক্ষা করতে পারে না। কারণ তারা শরণাগত নয়। ভক্তের বহুশত্রু থাকতে পারে, তারা পরাক্রান্ত যোদ্ধা হলেও শ্রীকৃষ্ণের কৃপেচ্ছায় ভক্তের কেউ ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?" এই কথার উপর ভক্তের দৃঢ় বিশ্বাস। কেননা, কৃষ্ণভক্ত বিনা শর্ত্তে কৃষ্ণের শরণাপন্ন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আমরা কি দেখতে পাই? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ মহান যোদ্ধার সামনে অর্জ্জুন ছিলেন তাদের তুলনায় অতিতুচ্ছ। কিন্তু কৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত অর্জ্জুন কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য এবং অন্যান্যদের বধ করে বিজয়ী হতে সমর্থ হয়েছিলেন। আবার রাবণ ছিল প্রবল পরাক্রান্ত শিবের মহাভক্ত। কিন্তু রামচন্দ্ররূপে ভগবান্ যখন তাঁর মৃত্যু কামনা করলেন, তখন কেউই তাকে রক্ষা করতে পারলেন না। ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত ভক্তগণ বিপদকে ভগবানের পরম অনুকম্পা বলেই বরণ করে এবং বিপদের মধ্যে ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত প্রত্যক্ষ করে সর্ব্বোৎসাহাদি ছয়গুণে বিভূষিত হয়ে থাকেন। আর অসৎ বা বিষয়ী ব্যক্তিগণ ষড়্‌রিপুর তাণ্ডবের ক্রীড়ানক হয়ে পড়ে। জাগতিক দলীয় বল সাধুগণের কেশ স্পর্শও করতে পারে না। এইজন্য আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাখা উচিত, আমরা কৃষ্ণভক্ত, আমাদের কোন বিপদ হবে না। আমি কোন দুঃখপাত ভোগ করব না। আমাদের জানা উচিত—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে আছেন, তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন। কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কারো শরণাগত হব না। তাই আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩৩) দেখতে পাই,—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো।।

হে মাধব! আপনার ভক্তগণ আপনাতেই বদ্ধসৌহৃদ। তারা কখনই স্থানভ্রষ্ট হন না। অর্থাৎ মুক্তাভিমানিদিগের ন্যায় অধঃপতিত হন না। তারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে বিঘ্নকারিদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করে নির্ভয়ে বিচরণ করে থাকেন।

আবার শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" অর্থাৎ "প্রিয় অর্জ্জুন, তুমি জগতে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না।" এখন কেউ হয়ত' প্রশ্ন করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কেন অর্জ্জুনকে একথা ঘোষণা করতে পরামর্শ দিলেন? নিজে কেন ঘোষণা করলেন না? কারণ, কৃষ্ণ ভক্তের জন্য কখনও নিজ-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন ; কিন্তু ভক্তের প্রতিশ্রুতি কখনও ভঙ্গ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ হলে আমাদের কোন বিপর্য্যয় ঘটবে না।

সুতরাং অহৈতুক সেবকের কখন বিনাশ নেই। শ্রীচৈতন্যবাণী-সেবক-সম্প্রদায়ের

কেশ স্পর্শ করতে পারে, ত্রিলোকে এরূপ কোন দেবতা বা কোন অসুর নেই। তবে যে স্বয়ং নিত্যানন্দপ্রভু জগাই-মাধাইয়ের দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়ার লীলা প্রকাশ করেছিলেন, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস বাইশ বাজারে প্রহৃত হবার লীলা প্রকট করেছিলেন, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ নানাভাবে উপদ্রুত হবার আদর্শ প্রকাশ করেছিলেন, তা কেবল লোকশিক্ষার জন্য। তাঁরা সেই সকল আদর্শ স্থাপন করে আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, সেবায় বা ভজনে বিঘ্ন ও বিপদে ভজনের অকৃত্রিমতাই পরীক্ষিত হয়, তদ্দ্বারা সেবার দৃঢ়তা ও ভগবানের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আমাদের প্রভুগণ যখন ঐরূপ বিঘ্ন ও বিপদের মধ্যে জয়যাত্রায় অভিমানের আদর্শ প্রকাশ করেছেন, তখন আমরাও তাঁদের পদসংলগ্ন রেণু হয়ে তাঁদের পদত্রাণের একটী ধূলিকণারূপে তাঁদের শ্রীচরণতলে নিত্য সংযুক্ত থেকে কোটি কণ্টকরুদ্ধ ভক্তিমার্গে বিচরণকালে তাঁদের নিত্য জয়যাত্রার সঙ্গী হতে পারব, এতে কোন সন্দেহ নেই, যদি আমরা অনন্তকোটি বিঘ্ন ও বিপদের মধ্যে বিচ্যুত না হই। কোটি কোটি বিপদ, কোটি কোটি বিঘ্নকে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করব। বিপদগুলি বারম্বার আমাদের জীবনে আসুক—এই হচ্ছে একান্ত অনুগত ভক্তের প্রার্থনা।

—শ্রীনিত্যানন্দ দাস

ধাম-বৈশিষ্ট্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৬ পৃষ্ঠার পর]

[ধামের স্বরূপ ও ধাম দর্শন]

মায়াবদ্ধ জীবগণ জড় চক্ষু-দ্বারে।
মায়াতীত ধামেরে কভু চিনিতে না পারে।। ১।।
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'গৌতমীয়তন্ত্র-ভাষা'।—
"তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্ম-চক্ষুষা।।" ২।।
রামভক্ত বিপ্রে কহিলা শ্রীগৌরসুন্দর।—
"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।।" ৩।।
রঙিন চশমাতে সব রঙিন দেখায়।
প্রকৃত বস্তুর রঙ্ বুঝা নাহি যায়।। ৪।।
মায়ার প্রলেপে যা'র চক্ষু ঢাকা রয়।
চিন্ময় ধামেরে সেও দেখে মায়াময়।। ৫।।
বদ্ধজীবে দেখে ধামে মায়াজাত দ্রব্য।
চিদ্বৈভব দেখা কি বদ্ধজীবের সাধ্য?? ৬।।

ধাম আর গ্রাম কভু এক নাহি হয়।
স্বরূপ শক্তির বিক্রম ধাম—রসময়।। ৭।।
"গোলোক, গোকুল-ধাম—বিভু কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাঁহার সংক্রম।।" ৮।।
মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে ধাম অপ্রাকৃত স্থান।
তথা' বিরাজিত সদা স্বয়ং ভগবান্।। ৯।।
অপ্রাকৃত বলি' ধাম অধোক্ষজ তত্ত্ব।
বদ্ধজীব নাহি বুঝে ধামের মাহাত্ম্য।। ১০।।
চিন্ময় ধাম হরির নিত্যলীলাভূমি।
দেবেও কৃতার্থ হয় সেই ধামে প্রণমি'।। ১১।।
"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা"-শ্লোকে কৃষ্ণ কয়।—
'তাঁহার স্ব-স্বরূপ কভু মায়াবৃত নয়।।' ১২।।
চিন্ময় ব্রজধাম কৃষ্ণের ইচ্ছাবশে।
এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত একই স্বরূপে।। ১৩।।
গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা যা'র চিত্তে ভায়।
ধামের রসময় রূপ সে দেখিতে পায়।। ১৪।।

[কৃষ্ণ-ধাম ও গৌর-ধামের কৃপা-বৈশিষ্ট্য]

শ্রীগৌর, শ্রীকৃষ্ণ হ'লেও কৃষ্ণরূপ নয়।
তিনি কৃষ্ণরূপ রসোৎকর্ষ প্রকাশয়।। ১।।
আস্বাদক বিষয়-বিগ্রহ শ্রীগৌরহরি।
তিনি ভক্তরূপ-ভক্তভাব অঙ্গীকারি'।। ২।।
কৃষ্ণ-লীলায় ভজন-বিষয় প্রতিভাত।
গৌর-লীলায় ভজন-প্রণালী আবিষ্কৃত।। ৩।।
শ্রীকৃষ্ণলীলা সর্ব্বদাই সম্ভোগময়ী।
আর শ্রীগৌরলীলা সদা বিপ্রলম্ভময়ী।। ৪।।
চিদ্বিষয়িণী বুদ্ধি হৈলে গৌরের কৃপায়।
ব্রজে কৃষ্ণ-ভজনের যোগ্যতা উপজয়।। ৫।।
পুরুষাভিমান হ'তে ভোগবুদ্ধি জাগে।
ভোগবুদ্ধি রহিলে কি ধাম-বাস সম্ভবে?? ৬।।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বাণী শুনিতে শুনিতে।
ভোগবুদ্ধি ছাড়ে ক্রমে তাঁদের কৃপাতে।। ৭।।

শ্রীগৌরের শিক্ষাসার শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
শ্রীহরির সুখোদ্দেশ্যে গৌড়ীয়ের কীর্ত্তন।। ৮।।
বৈদেশিক বাদ্যযন্ত্রে করিলে কীর্ত্তন।
তাহা ভক্তির ক্রম-ভঙ্গ দোষের লক্ষণ।। ৯।।
আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকর বাদ্যযন্ত্র যত।
সঙ্কীর্ত্তনে ব্যবহারে হয় অপরাধ।। ১০।।
কীর্ত্তনে জড়ীয় রস করিলে মিশ্রণ।
শ্রীহরির সুখ তাহে হয় কি কখন?? ১১।।
আত্মার স্বাভাবিক রাগ হইলে উদিত।
রাগমার্গে ভজে ভক্ত রাধাকৃষ্ণ-পদ।। ১২।।
রাধার দাসী অভিমান জাগিলে অন্তরে।
ধামের স্বরূপ ত্বরা নয়নেতে স্ফুরে।। ১৩।।
গৌর-প্রিয়জনের কৃপা অল্পভাগ্যে নয়।
গৌর-ধামের কৃপা কিন্তু অল্পভাগ্যে হয়।। ১৪।।
মুক্তকুলের আশ্রয়স্থল ব্রজধাম।
পাপী অপরাধীরা সেথা নাহি পায় স্থান।। ১৫।।
গৌরের মত গৌর-ধাম জীবে কৃপা করে।
পাপী-অপরাধীরেও স্থান দেয় ক্রোড়ে।। ১৬।।
কৃষ্ণধাম করে অপরাধের বিচার।
গৌরধাম সব অপরাধ করে দূর।। ১৭।।
কৃষ্ণধামাপেক্ষা তাই গৌরধাম উদার।
গৌরজন গৌরধামের করে সমাদর।। ১৮।।
কৃষ্ণলীলাপরাধ-ভয়ে ইন্দ্র ভীত হ'য়ে।
গৌর-ভজন করিলা গৌরধামাশ্রয়ে।। ১৯।।
গৌর-কৃপা পাইল ইন্দ্র যে বৃক্ষের তলে।
'গোদ্রুম ধাম'-নামে তাহা বিখ্যাত ভূতলে।। ২০।।
মার্কণ্ড ঋষিও সেই বৃক্ষ-তলে বসি'।
গৌর-কৃপা লভিল তথা গৌর-পদ ভজি'।। ২১।।
শ্রীনামপেক্ষা গৌরধাম অধিক করুণ।
শ্রীধামাশ্রয়ে মিলে মহাজন-কৃপাকণ।। ২২।।
নবধা ভক্তির পীঠ নবদ্বীপ ধাম।
সেই ধাম চিন্তামণি—ব্রজের সমান।। ২৩।।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর পৃথক্ তত্ত্ব নয়।
উভয় তত্ত্বই মধুর রসের আশ্রয়।। ২৪।।
মধুরে মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য প্রকাশয়।
মূল ব্রজে কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ রয়।। ২৫।।
উভয় লীলাই যুগপৎ বর্ত্তমান।
বিপ্রলম্ভভাবে ভজন—গৌর-অবদান।। ২৬।।
কৃষ্ণের ঔদার্য্যলীলা-পীঠ নবদ্বীপ।
সর্ব্বরসাশ্রিত ভক্তই ভজে গৌর-পদ।। ২৭।।
কৃষ্ণধাম ও গৌরধামে ভেদবুদ্ধি যা'র।
ধামাপরাধে নরকের শাস্তি প্রাপ্য তা'র।। ২৮।।
গৌরজন ও ব্রজজনে ভেদ নাহি হেরি'।
গুরু-বৈষ্ণব পদ-রেণু শিরোপরি ধরি।। ২৯।।
সতত প্রার্থনা করি তাঁ'দের চরণে।
অহর্নিশি সেবি যেন ধামবাসিগণে।। ৩০।।
জয় জয় গৌরধাম ও জয় কৃষ্ণধাম।
কৃপা করি' এ পাষণ্ডে দেহ ক্রোড়ে স্থান।। ৩১।।

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

হরিভজন হ'ল না!!

আমার হরিভজন হ'ল না। হৃদয়ের কপটতা গেল না, আমার দেহ, ইন্দ্রিয়সকলই হরিভজনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল। আমার ইন্দ্রিয়গ্রাম সেবোন্মুখ হইল না, তাই আমি সদ্‌গুরু ও শুদ্ধ বৈষ্ণবের অযাচিত সঙ্গলাভ করিয়াও তাঁহাদের সঙ্গ করিতে পারিলাম না। ভোগোন্মুখ কর্ণে তাঁহাদের শুদ্ধকীর্ত্তন প্রবেশ করিল না ও তাঁহাদের কীর্ত্তিত নাম আমার রসনাগ্রে উদিত হইল না। আমার হরিভজনে উৎসাহ নাই, হরিভজনই যে আমার নিত্যধর্ম্ম তাহাতে নিশ্চয়তা নাই, সেবাকার্য্যে ধৈর্য্য নাই। গুরু-বৈষ্ণবের মহান আদর্শ দেখিয়াও তাঁহাদের আচরণ অনুবর্ত্তন করিবার রুচি নাই, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগে যত্ন ও দৃঢ়সঙ্কল্প নাই, সাধুগণের বৃত্তি অনুসরণ করিবার আগ্রহ নাই, তাই আমার দুর্দ্দৈব কাটিল না।

আমার ন্যায় দুর্ভাগা জগতে আর কেহ নাই, আমি কুক্কুর হইতেও ঘৃণ্য—কুকুর অমেধ্যভোজী, আর আমি মানুষ নামে পরিচয় দিয়া, ভক্তির পোষাক পরিয়া গুরু-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে সেবাবুদ্ধি না করিয়া কৃষ্ণবস্তুতে ভোগবুদ্ধিপরায়ণ। আমার লালসার

পরিতৃপ্তিকর বস্তুগুলি পাইলে আমি গুরুবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে অনুরাগ দেখাইয়া থাকি, কিন্তু আমার প্রভুর আচরণের আদর্শ আমি একবারও হৃদয়ে স্থান দিই না। মহাপ্রসাদ কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট হইলেও তাহা ভক্ষণ করিবার শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া আমি মহাপ্রসাদে ভোগবুদ্ধি করিতেছি। মহাপ্রসাদে "যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ" এই বুদ্ধি আমার উদিত হইতেছে না। আমার প্রাকৃত বুদ্ধি গেল না, আমি কনিষ্ঠাধিকার হইতে আর উন্নত অধিকার লাভ করিতে পারিলাম না। বৈষ্ণবে আমার নিয়তই প্রাকৃতবুদ্ধি রহিয়াছে। শ্রীগুরুদেবে আমি সততই মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিতেছি। আমি ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করি, আমার 'কাঠের ঠাকুর', 'মাটীর ঠাকুর' বুদ্ধি লইয়া আমি বৈষ্ণব সাজিয়া বিষ্ণুপূজা করিতে গিয়া শক্তি-পূজা করিয়া ফেলি এবং প্রাকৃত শাক্ত হইয়া পড়ি। আমার ঘণ্টাবাদনই সার হয়, অধোক্ষজ বিষ্ণু আমার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন—আমার ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃত চেষ্টা তাঁহার নিকটে পৌঁছিতে পারে না।

আমি তুলসীকে পত্র মাত্র, গঙ্গাকে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের অর্থাৎ আমার পাপস্খালনের বা পুণ্যার্জ্জনের বস্তুমাত্র জ্ঞান করি। আমি ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করি, লোকে আমাকে 'ভক্ত' বলিবে—এইজন্য। আমি কপটতাপূর্ব্বক ভাবের ঘরে চুরি করিয়া নির্জ্জনতাশ্রয় করিয়া থাকি, লোককে জানাই আমি নির্জ্জন-ভজনানন্দী কিন্তু আমি মনোধর্ম্মের অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি। তাই বলিতেছিলাম—'আমার হরিভজন হইল না।'

যদি আমার হরিভজন হইত, তাহা হইলে আমার হৃদয়ে—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া" ও সৎসিদ্ধান্তগুলি নিশ্চয়ই প্রস্ফুটিত হইয়া আমার জীবনটীকে সৌগন্ধযুক্ত করিয়া তুলিত। আমার কুরূপ ঘুচাইয়া আমাকে সুরূপ করিত, আমার হৃদয়ে পূতিগন্ধময় অভদ্ররাশি বিদূরিত করিয়া সেই স্থানে ভক্তিলতাবীজের অঙ্কুরোদ্গম হইত, রূপানুগ বৈষ্ণবগণ আমাকে কুরূপ বা কুদর্শন দেখিয়া আমার প্রতি আর উদাসীন থাকিতেন না, আমার সেবাসৌন্দর্য্য দেখিয়া আমাকে রাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে অর্পণ করিবার জন্য আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপূর্ব্বক আমাকে তাঁহাদের অনুগত পাল্যও আশ্রিতবর্গের মধ্যে স্থান প্রদান করিতেন।

কিন্তু আমার বড়ই দুর্দ্দৈব, আমার হরিভজন হইল না। আমি কোনসময় কর্ম্মবুদ্ধি লইয়া শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকি, কখনও বা মানসিক ইন্দ্রিয়ের চালনা করিয়া—আমি বড়ই সেবা করিতেছি দেখাইয়া থাকি। কখনও ভাবি আমার যখন বৈষ্ণবগণের আনীত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে হয় তখন তদনুপাতে কিছু পরিশ্রম না করিলে বোধ হয় বৈষ্ণবগণ আমার অন্ন বন্ধ করিবেন। কখনও ভাবি, বেশী শ্রমশীলতা দেখাইলে তাঁহারা আমাকে আদর করিয়া অধিক পরিমাণে চর্ব্ব্যচুষ্যাদি প্রদান করিবেন—এইরূপভাবে বৈষ্ণবগণের ভিক্ষান্নে পরিপুষ্ট হইয়া আমার জীবনটী কাটিয়া যাইবে। কিন্তু কি করিতেছি, কোথায় আসিয়াছি, ইঁহাদের সঙ্গে আমার কতদূর কি লাভ হইতেছে, পর-উপদেশে

পাণ্ডিত্য না দেখাইয়া নিজের জীবনে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আদর্শ কতটুকু প্রতিফলিত হইয়াছে, আমার হৃদয়ে ভজনের সঙ্গে সঙ্গে ভজনীয় বস্তু সম্বন্ধে সৎসিদ্ধান্তগুলি কতটুকু পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান একবারও করি না। দিন যায় রাত্র আসে, আবার রাত্র চলিয়া যায় পুনরায় দিন আগমন করে, কিন্তু আমার হরিভজনে একচুলও উন্নতি দেখা যায় না। হায়! আমি এখন হরিভজনের দুর্ল্লভ জন্ম, হরিভজনের উপযোগী দেহ, গুরু-কর্ণধার, নিত্যপ্রবাহিত ভগবৎকৃপারূপ অনুকূল-বায়ু প্রাপ্ত হইয়াও উহাদিগকে আমার হরিভজনের প্রতিকূল করিয়া ফেলিলাম! দেহ আমার হরিভজন না করিয়া মায়ার ভজন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত। আমি গুরুপাদপদ্ম পরিহারপূর্ব্বক কামক্রোধাদি-রিপুবর্গকে আমার 'প্রভু' বলিয়া বরণ করিলাম। কিন্তু বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তাহাদের দুর্ন্নিদেশ পালন করিলেও তাহারা আমার প্রতি একবারও কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল না। আমি এতই নির্ল্লজ্জ, নির্ঘৃণ্য যে তথাপি আমি উহা-দিগেরই দাস্য করিবার জন্যই লালায়িত! আমার লোক দেখান 'গোরা ভজা' দু'নৌকায় পা দেওয়ার প্রবৃত্তি গেল না। দুঃসঙ্গে আমার আত্মীয়-পরিজনবুদ্ধি, তৎসঙ্গে পরবুদ্ধি! যেদিন আমার দুঃসঙ্গে অনাদর, গৌরবিরোধী নিজজনে পর্য্যন্ত পরবুদ্ধি, সদ্‌গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি ও তাঁহাদের প্রতি স্বাভাবিক 'টান' হইবে, সেইদিন আমার হরিভজন আরম্ভ হইবে।

"যা প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু।।" (বিষ্ণুপুরাণ ১০।২০।২০)

"জ্ঞান-কর্ম্মাদি অন্যভিলাষশূন্যা কেবলা ভক্তিই আমাদের প্রাণ। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বিশ্রম্ভ-সেবাদ্বারাই ভক্তিলাভ করা যায়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই গুরুসেবা। কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্ত্যঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কীর্ত্তনের দ্বারাই ভক্তির অন্যান্য অঙ্গ সাধিত হয়। দুর্জ্জন-সঙ্গত্যাগই নির্জ্জন ভজন অর্থাৎ সাধুসঙ্গই নির্জ্জনতা। সর্ব্বদা হরিকথা-প্রচারই হরিকীর্ত্তন। সর্ব্বদা হরিকথা বলা বা শ্রীহরির সেবাময় কথায় নিমগ্ন থাকাই মৌনাবস্থা। নিরপরাধে নাম-ভজনই বা শ্রীনাম সংখ্যাত-অসংখ্যাত শুদ্ধ উচ্চ-কীর্ত্তনই লীলাস্মরণ। শ্রীরূপানুগত্যে গৌর-ভজনই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ ভজন, ইহাই শ্রেষ্ঠ।"

"রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই ঋষিনীতি অবলম্বিত হইলেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে। ঋষিনীতি অবলম্বন করিতে হইলে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থরাজি আলোচনা ও অধ্যয়ন করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে শিক্ষা-বিভাগের ঔদাসীন্য পরিহার করা কর্ত্তব্য।"

—শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ আশ্বিন, ১৪০৮ ; ১৭ অক্টোবর, ২০০১

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৮০ পৃষ্ঠার পর]

যেমন ধরুন, একজন ভক্ত তিনি ভগবানের আরাধনা করছেন, ভগবানের উপাসনা করছেন, তাঁর পূজা করছেন। এতে কি অন্যান্য দেবদেবীরা সন্তুষ্ট হন না, হবেন না?—হবে। সেইটা উদাহরণ দিয়ে আবার বুঝানো আছে।—

যৎপূজনেন বিবুধাঃ পিতরোঽর্চ্চিতাশ্চ
তুষ্টা ভবন্তি ঋষিভূতসলোকপালাঃ।
সর্ব্বে গ্রহাস্তরণিসোমকুজাদিমুখ্যা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

'যৎপূজনেন বিবুধাঃ পিতরোঽর্চ্চিতাশ্চ'—যে গোবিন্দদেবের পূজা করলে সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন, পিতৃপুরুষগণ সন্তুষ্ট হন, 'তুষ্টা ভবন্তি ঋষিভূতসলোকপালাঃ'—যে গোবিন্দের অর্চ্চনা করলে, পূজা করলে ঋষিগণ, প্রাণীজগৎ, লোকপালগণ সন্তুষ্ট হন, 'সর্ব্বে গ্রহাস্তরণিসোমকুজাদিমুখ্যা'—যে গোবিন্দের পূজা করলে সমস্ত গ্রহ শান্তি হয়ে যায়, পৃথক্ পৃথক্ করে আর নবগ্রহ শান্তির প্রয়োজন হয় না, 'গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি'—আমি সেই আদিদেব গোবিন্দকে ভজন করি।

এ স্তব কে করছেন? স্বয়ং ব্রহ্মা। এরদ্বারা কি প্রমাণিত হয়? আমাদের সময় নষ্ট করবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা যেটা, যারদ্বারা সবটাই হয়ে যাচ্ছে, আমরা সেই ব্যবস্থাই নেব। এই শিক্ষা ত' দেওয়া আছে। দেবদেবীর পূজা-উপাসনা করতে যাচ্ছি আমরা অনেকে। কেন? কামনা-বাসনাদ্বারা প্রপীড়িত হয়ে আমরা দেবদেবীর শরণাপন্ন হচ্ছি। দাও, দাও, কিছু দাও। আচ্ছা, সেই দেওয়াটা কি ভগবান্ দিতে পারেন না? যিনি সর্ব্বোপরি মালিক, তিনি ত' সবই দিতে পারেন। তাহলে আধিকারিক দেবদেবীর কাছে শরণাপন্ন হওয়ায় কি প্রয়োজন হচ্ছে আমার? আমি যদি মূলকে ধরতে পারি, তাহলে ত' সবই আছে আমার জন্য। যার ভগবানে ভক্তি আছে, তার সব আছে—গীতা-ভাগবতের বিচার এটা। আর যার ভগবদ্ভক্তি নাই, তার কিছুই নাই। উদাহরণ দিচ্ছে,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।

যার ভগবদ্ভক্তি আছে, তার সব আছে। "হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা"—ভগবান্ শ্রীহরিতে যার ভক্তি নাই, শ্রদ্ধা নাই, তার কিছু নাই। তার জাগতিক যত কিছু গুণ থাক না কেন, সেগুলি সব বৃথা, বিফল। যুক্তি দিয়ে ত' এইসব কথাগুলো বুঝান

আছে। ভগবানে যার ভক্তি আছে, তার সব আছে। আর ভগবদ্ভক্তিবিহীন যে ব্যক্তি, জাগতিক বিচারে তার অনেক কিছু থাকলেও পরমার্থ-বিচারে তার কিছুই নাই, শূন্য।

এসব কথাগুলো বলে বসুদেব মহারাজ আবার দৈন্য করে বলছেন,—

অহং কিল পুরানন্তং প্রজার্থো ভুবি মুক্তিদম্।
অপূজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া।।

নারদঋষিকে বলছেন তিনি, হে মুনিবর! আমি পূর্ব্বজন্মে ভগবান্ বিষ্ণুর মায়ায় বিমোহিত হয়ে ভূতলে সন্তান-কামনায় মুক্তিদাতা শ্রীহরির আরাধনা করেছিলাম। কিন্তু মুক্তি-কামনায় আরাধনা করি নাই। এ আবার কি কথা? ভগবানের আরাধনা যিনি করেছেন, আর তাঁর স্নেহের বশ, ভক্তির বশ হয়ে যে ভগবান্ তাঁর পুত্রত্ব স্বীকার করেছেন, সন্তান হয়ে আসছেন, (বসুদেবের পুত্র বাসুদেব, দেবকীর পুত্র দেবকীনন্দন) যে ভগবান্ ভক্তিতে বশীভূত হয়ে ভক্তের ঘরে আসছেন, তাঁদের আবার তত্ত্বদর্শন ভুল হয়েছিল, এটা কি মনে করা উচিত আমাদের? ভগবান্ ভক্তিতে বশীভূত হয়ে যাঁদের গৃহে পুত্রত্ব স্বীকার করে এসেছেন, তাঁদের আবার তত্ত্বদর্শন ভুল হয়েছে, তত্ত্বজ্ঞান জানা নাই, এটা ত' মেনে নেওয়া যাবে না। কিন্তু বসুদেব মহারাজ এখানে দৈন্য করেই নারদঋষির কাছে বলছেন,—জগতে বদ্ধজীব আমরা, আমরা যেভাবে চলছি, সেই কথাটাই তুলে ধরছেন। বদ্ধজীবের যে কথাগুলো সেগুলো নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েই বলছেন। আমরা এ জগতে পার্থিব বস্তুই প্রার্থনা করি। অপার্থিব বস্তু ভগবদ্ভক্তি প্রার্থনা করতে জানি না। কিন্তু ওটা প্রার্থনা করলে সবটাই আসে, পাওয়া যায়, কোনটা বাকী থাকে না, আইনের কথা এটা।

'যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং জ্ঞাতং ভবতি, যস্মিন্ প্রাপ্তে সর্ব্বমিদং প্রাপ্তং ভবতি'— যাঁকে জানলে সব জানা হয়, যাঁকে পেলে সব পাওয়া হয়, সেই তত্ত্ববস্তু হচ্ছেন ভগবান্। এই সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। যাঁকে জানলে সব জানা হয়, আর কিছু বাকী থাকে না ; যাঁকে পেলে সব পাওয়া হয়, সেই তত্ত্ববস্তু হলে সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম ভগবান্।

বসুদেব মহারাজ বলছেন,—আমি মুক্তিদাতা শ্রীহরির আরাধনা করেছিলাম সন্তান-কামনায়। ভগবানকে যিনি পুত্ররূপে প্রার্থনা করতে পারেন, আর যে ভগবান্ ভক্তির বশ হয়ে তাঁর প্রার্থনা পূরণ করতে পারেন, তিনি কেমন ভক্ত বলুন! সুতরাং এখানে কোন প্রাকৃত কামনা-বাসনার কথা নাই।

যথা বিচিত্রব্যসনাদ্ ভবদ্ভির্বিশ্বতোভয়াৎ।
মুচ্যেমহ্যঞ্জসৈবাদ্ধা তথা নঃ সাধি সুব্রত।।

এখন নারদঋষির কাছে তিনি বলছেন যে,—অমি এই সংসারে বদ্ধাবস্থায় এসে পড়ে আছি, কি করে এই মায়ার সংসার থেকে উদ্ধারলাভ করব, আমাকে দয়া করে

উপদেশ করুন। সম্প্রতি বিচিত্র ব্যসনরাশি পরিপূর্ণ এবং বিবিধ ভয়সঙ্কুল এই সংসার হতে কি করে অনায়াসে মুক্তি লাভ করতে পারি, আমাকে সেই বিষয়ে আপনি উপদেশ করুন। এই হল নারদ ঋষির কাছে প্রার্থনা বসুদেব মহারাজের।

শ্রীশুক উবাচ,—

রাজন্নেবং কৃতপ্রশ্নো বসুদেবেন ধীমতা।
প্রীতস্তমাহ দেবর্ষির্হরেঃ সংস্মারিতো গুণৈঃ।।

শুকদেব বলছেন,—হে রাজন্! বসুদেবের এইরূপ প্রশ্নে ভগবান্ শ্রীহরির বর্ণনীয় সমুদয় গুণ স্মরণ হওয়ায় দেবর্ষি নারদ খুব সন্তুষ্ট হলেন। নারদঋষি সন্তুষ্ট হচ্ছেন কেন? তাঁর কাছে বসুদেব মহারাজ এমনই প্রশ্ন করেছেন, যে প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভগবানের কথা চিন্তা-ভাবনা করতে হবে এবং ভগবানের কথা স্মরণ না করলে, তিনি কিছু বলতে পারবেন না। সুতরাং যেহেতু ভগবানের কথা স্মৃতিপথে আসবে—এই চিন্তা করে নারদঋষি খুব খুশী হয়েছেন এবং বসুদেবের প্রশ্নের খুব তারিফ করছেন,—বা! বা!! বা!!! বেশ সুন্দর প্রশ্ন হয়েছে। এমন প্রশ্ন ত' কেউ করে না আমাকে। হে বসুদেব, আপনি এমন প্রশ্ন করেছেন আমাকে, যে প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাকে কিছুক্ষণ ভগবানের সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত হতে হবে। তাই নারদঋষি মনে মনে খুব আনন্দিত হয়েছেন।

শ্রীনারদ উবাচ,—

সম্যগেতদ্ব্যবসিতং ভবতা সাত্বতর্ষভ।
যৎ পৃচ্ছসে ভাগবতান্ ধর্ম্মাংস্ত্বং বিশ্বভাবনান্।।

নারদঋষি বলছেন,—হে যাদববর! যেহেতু আপনি বিশ্ববিশোধন ভাগবতধর্ম্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন, সেইজন্য আপনার এই প্রশ্ন এবং সঙ্কল্প আমি খুব উত্তম বলে মনে করি। এমন প্রশ্ন কেউ করে না আমার কাছে। জগতের, দুনিয়ার খাওয়া, থাকা, পরার বিষয়ে সব প্রশ্ন করে আমার কাছে। কিন্তু যে প্রশ্ন আজ আপনি আমার কাছে করছেন, এ প্রশ্নের জন্য আজ আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। কেননা, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ভগবানের চিন্তা-ভাবনা আমাকে কিছু করবার অবসর আসছে, সুযোগ পাচ্ছি আমি। প্রশ্ন কি হয়েছে, তা নিশ্চয়ই আপনারা ভুলে যান নাই। প্রশ্ন হয়েছে,—ভাগবতধর্ম্ম কাকে বলে, সনাতনধর্ম্ম কাকে বলে, আত্মধর্ম্ম কাকে বলে, আমি জানতে চাই, শুনতে চাই। যে ধর্ম্মের কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করলে, বিশেষতঃ মৃত্যুভয় থেকেও মানুষ নিষ্কৃতি পায়, সেটা এখন সংক্ষেপে উত্তর দিচ্ছেন।

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব-বিশ্বদ্রুহোঽপি হি।।

এই সনাতন ধর্ম্মের কথা—যা তুমি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছ, এটা যদি

কেউ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, যদি কেউ অনুপঠন করেন পিছনে পিছনে (গুরু আগে বলছেন, শিষ্য পিছনে পিছনে বলে যাচ্ছেন মন্ত্রপাঠের মত), 'ধ্যাতঃ'—যদি কেউ ধ্যান করেন, 'আদৃতঃ'—যদি কেউ মনে মনে আদর করেন, 'অনুমোদিতঃ'—যদি কেউ অনুমোদন করেন—হ্যাঁ, এটা ভাল জিনিস, আমি ঠিক ঠিক করতে পারছি না বটে, তবে ভাল জিনিস, 'সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মঃ'—তাহলে এই যে সনাতনধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম তাকে সদ্য সদ্য পবিত্র করেন। যাঁরা শ্রবণ করবেন, যাঁরা অনুপঠন করবেন, যাঁরা ধ্যান করবেন, যাঁরা আদর করবেন—কেবলমাত্র এই কয়জন লোক পবিত্র হবেন? বলছেন না, সর্ব্বব্যাপক ক্ষমতা এই সনাতন ধর্ম্মের, ভাগবত ধর্ম্মের, আত্মধর্ম্মের। কি? 'দেব-বিশ্বদ্রুহোঽপি হি'—যদি কেউ দেবদ্রোহী থাকেন, যদি কেউ বিশ্বদ্রোহী থাকেন, তাকেও সনাতনধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম পবিত্র করবেন, সে ক্ষমতা রাখে। বিশেষ ক্ষমতা ত'। যে ক্ষমতা ভগবানের—তাঁরই নিজস্ব সম্পদ্, নিশ্চয়ই সকলকে রক্ষা করবে। ভগবানের নিজস্ব যে ক্ষমতা, তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলা সবটারই একই ক্ষমতা। একটুও তফাৎ নাই এবং এটার Identity কষা হয়েছে। Equal in all respect বলা হয়েছে। নাম-নামী অভিন্ন। ভগবান্ স্বয়ং সাক্ষাৎ এবং তাঁর শ্রীনাম একই বস্তু ; ভগবান্ এবং তাঁর রূপ একই বস্তু ; ভগবান্ এবং তাঁর গুণ একই বস্তু ; ভগবান্ এবং তাঁর লীলা একই বস্তু। এর যে কোন একটা অনুশীলন করলে সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন প্রাপ্তি এবং তাঁর সাক্ষাৎ কৃপালাভ—একথা বুঝানো হয়েছে।

'নাম-নামী ভিন্ন নয় রে' বলা হচ্ছে। নাম-নামী অভিন্ন। অন্য ক্ষেত্রে তা হবে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে Identical বলছেন এবং Identity কষছেন। হিসাবটা তাই।

নামঃ চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।

নাম-নামী অভিন্ন প্রমাণ করছেন এখানে।

ত্বয়া পরমকল্যাণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
স্মারিতো ভগবানদ্য দেবো নারায়ণো মম।।

সম্প্রতি আপনার প্রশ্নহেতু আমার হৃদয়ে পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনশালী পরমমঙ্গলময় ভগবান্ নারায়ণের স্মৃতি সমুদিত হওয়ায় এটা আমি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ মনে করছি। নারদঋষিপ্রশ্নের প্রশংসা করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলছেন ঠাকুর, তুমি যে ওঁর হৃদয়ে এইরূপ প্রেরণা দিয়েছ, আর আমাকেও এইরকম প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, এইজন্য আমি আপনার অনুগ্রহ বলে মনে করছি। তার মানে দুটো জিনিস এখানে, সাধুর—ভক্তের কৃপা এবং ভগবানের কৃপা। এই যুগপৎ একটা স্মৃতিপথে আসছে। শুধু একরকম কৃপার দ্বারা কি সিদ্ধ হয় জিনিস? হয় না। ভগবৎ-কৃপায় সিদ্ধ হয় ভক্ত-কৃপার মাধ্যমে। এই জিনিসটা এর ভিতরে আছে। ভগবৎ-কৃপা সিদ্ধ হয় সাধু-গুরুর কৃপার মাধ্যমে,

সেই জিনিসটা এখানে বুঝাচ্ছেন দুটো জিনিসকে একসঙ্গে নিয়ে। আমি যদি ভক্তের কৃপা না পাই, আমি যদি গুরু-কৃপা না পাই, তাহলে ভগবান্ আমাকে কৃপা করতে এগিয়ে আসবেন না। কেন? এটা আইনের ব্যাপার। ভক্ত যদি কাকেও কৃপা না করেন, তাহলে ভগবান্ সেখানে এগোতে পারছেন না, আইনে বাধা পড়ছে। Recommendation—সুপারিস। 'বৈষ্ণবের আবদনে কৃষ্ণ দয়াময়' কথাটা। সুতরাং Recommendation-এর প্রয়োজন আছে। তা না হলে ভগবান্ কিছু করেন না প্রত্যক্ষভাবে—Direct। Recommendation পেলে চট করে মঞ্জুর হয়ে যায়। ঠিক সেই কথাটা এখানে বলছেন। এটা সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন আছে।

নারদঋষির কাছে তত্ত্বদর্শনটা জানতে চাচ্ছেন। এখন নারদঋষি বলছেন কি? আমি ত' কিছু জানি না, আমি ত' কিছু বুঝি না, যে প্রশ্ন করছেন আপনি (বসুদেব) এর ঠিক উত্তর ত' আমি দিতে পারব না। সে কি! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি! সমস্ত সম্প্রদায় আপনাকে গুরু বলে মেনে নিয়েছেন। এ হেন ব্যক্তি যিনি, তিনি বলছেন আমি কিছু জানি না! আমার কাছে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন, আমি এর উত্তর দিতে পারব না, জানা নাই আমার। সাধু-গুরু-বৈষ্ণব যাঁরা, তাঁদের এটাই স্বভাব। তাঁরা নিজেরা জানেন না—এই কথাই বলেন। বলেন সবটাই, কিন্তু বলবার সময় বলেন আমি জানি না। তাহলে আপনি যে কথাগুলো বলছেন, এগুলো কোথা থেকে বলছেন? ভগবান্ যেমন বলাচ্ছেন, বা আমি গুরু-বৈষ্ণবগণের কাছ থেকে যেটুকু শ্রবণ করেছি, সেইটুকু বলছি। তার থেকে বলছি। সেখানে আনুগত্য ধর্ম্ম আছে। আমি বলছি, আমার কথা শুনুন, তা চলবে না বাজারে। ভগবান্ বলছেন, শাস্ত্র এই বলছেন, উপরওয়ালা এই বলছেন—একথা বললে আমরা সেটা গ্রহণ করতে রাজী আছি, বাধ্য আছি। এ সম্বন্ধে আমাকে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, আমি একটা প্রাচীন ইতিহাস বলছি, তার ভিতরে আপনার এই প্রশ্নের উত্তর হবে। এই বলে তিনি একটা প্রাচীন আখ্যান-উপাখ্যান আরম্ভ করেছেন।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
আর্য্যভাণাঞ্চ সংবাদং বিদেহস্য মহাত্মনঃ।।

ভাগবতধর্ম্ম নির্ণয়-সম্বন্ধে বিদেহরাজ মহাত্মা জনক এবং ঋষভনন্দনগণের সংবাদরূপ যে পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, আপনি সেটা শ্রবণ করুন, আমি বর্ণনা করে যাচ্ছি।

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৫৩শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার ২০৯ পৃষ্ঠার প্রথম ৪টী পঙ্‌ক্তি দুইবার মুদ্রিত হইয়াছে এবং ৭ম সংখ্যার ৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে "শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও অধিক বন্ধ্যা" স্থলে "শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও অধিক বন্দ্যা" হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ আশ্বিন, ১৪০৮ ; ১৭ অক্টোবর, ২০০১

রাশিয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার

বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অনুগৃহীত শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ একাদশ দিবস রাশিয়ার রাজধানী মস্কো এবং নিকটস্থ Kurilovoতে বিশেষ সাফল্যের সহিত প্রচার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। রাশিয়া যাওয়ার প্রাক্কালে ৭।৭।২০০১ তারিখে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের জন্মশতবর্ষ-পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় শ্রীল মহারাজ সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভায় বৃন্দাবনস্থ শোধ সংস্থানের অধিকাংশ পি. এইচ. ডি. উপাধিধারী অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীল বন মহারাজের পাণ্ডিত্য ও বিদ্যার প্রতি অনুরাগ সম্পর্কে আলোচনা করেন। শ্রীল মহারাজ সভাপতির ভাষণে "সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বৃত্তি রয়।।" "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।" এবং "বিদ্যা ভাগবতাবধি" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা বিদ্যার মূল তাৎপর্য্য যে ভগবদ্ভজন তাহা বুঝাইয়া দেন। ইহাকেই শাস্ত্রে পরাবিদ্যা বলা হইয়াছে। এই পরাবিদ্যা দান করিবার জন্যই শ্রীল বন মহারাজ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে যাহা 'বন মহারাজের কলেজ' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সভান্তে সকল গৌড়ীয় মঠের সদস্যগণ শ্রীল মহারাজের জয়ধ্বনিপূর্ব্বক বলেন যে, মথুরা-বৃন্দাবনের বিদ্বৎসভায় এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের সভায় সভাপতিত্ব করিবার যোগ্যতা একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিরই আছে।

১৫।৭।২০০১—২৫।৭।২০০১ তারিখ পর্য্যন্ত রাশিয়ার রাজধানী মস্কো ও Kurilovoতে শ্রীল মহারাজ "ভক্তিদেবীর স্বরূপ, পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথি-উদ্‌যাপন, শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, ধ্রুব মহারাজ শুদ্ধভক্ত নন কেন, অনর্থের প্রকারভেদ এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতির উপায়, ভাবভক্তির লক্ষণ" ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

ভক্তিদেবীর স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীল মহারাজ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া বলেন,—ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি, জড়েন্দ্রিয়দ্বারা ভজন সম্ভব নহে। তাহলে আমরা জড়েন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সাধন-ভজন করিব কিভাবে? ইহা শুনিলে সাধারণভাবেই হতাশ হইতে হয়। তিনি উত্তরপক্ষে বলেন,—ইহাতে হতাশ বা নিরাশ হইতে হইবে না। গৌড়ীয় গুরুবর্গ ইহার সামঞ্জস্য করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পরমকরুণ, অহৈতুকী কৃপাময়। স্বয়ং ভগবান্ এবং তদীয় অর্থাৎ গুরু, বৈষ্ণব, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন, যমুনা, গঙ্গা, তুলসীর কৃপায় ভক্তিদেবী আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহিত তাদাত্ম্য হইয়া যায়। তাদাত্ম্য অর্থাৎ তৎস্বরূপতা। যেমন—লোহাতে আগুন। লোহা আগুনে পুড়িয়া লাল হইয়া যায়। এমতাবস্থায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় লোহা পুড়াইতেছে, কিন্তু লোহার

ধর্ম্ম পোড়ানো নয়, আগুনের ধর্ম্ম পোড়ানো। তদ্রূপ ভক্তিবৃত্তির সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ।।
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে।।

অর্থাৎ প্রেমকল্পবৃক্ষের প্রথমাবস্থা ভাবরূপ-অঙ্কুর যাঁহাদের হৃদয়ে উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের নিম্নলিখিত অনুভাবসমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে।—

ক্ষান্তি—ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও ক্ষোভিত না হওয়া। যেমন, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় ভীম, অর্জ্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেও যুধিষ্ঠির মহারাজ অক্ষোভিত-চিত্তে ভীম, অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া বলেন, ধৈর্য্য ধারণ কর, সময়ের প্রতীক্ষা কর।

অব্যর্থকালত্ব—নিরন্তর বাক্যে স্তব, স্মরণ, প্রণামাদি করা। যেমন, ষড়্‌গোস্বামিগণের জীবনচরিত অলোচনা করিলে দেখা যায়,—

সংখ্যাপূর্ব্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণ-গুণ-স্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ।।

আমি সেই রূপ-সনাতনাদি ষড়্‌গোস্বামিগণকে বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা সংখ্যাপূর্ব্বক নাম-জপ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং প্রণামাদিদ্বারা কাল যাপন করিতেন। নিদ্রা-আহার-বিহারাদিতে বিজিত হইয়াছিলেন এবং অত্যন্ত দৈন্যবিশিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের গুণস্মরণের মাধুর্য্যজনিত পরমানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন।

বিরক্তি—চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহের রূপ-রস-শব্দাদি বিষয়গ্রহণে যে স্বাভাবিক রুচির অভাব, তাহাকে বিরক্তি বলে। যেমন, ভরত মহারাজ। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মন্তব্য,—

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ।।

রাজর্ষি ভরত মহারাজ উত্তমঃশ্লোক ভগবানের প্রতি অনুরাগী হইয়া যৌবন অবস্থাতেই প্রাণপ্রিয় স্ত্রী, পুত্র, কলত্র, বন্ধু-বান্ধব ও রাজ্য মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

মানশূন্যতা— নিজের উৎকর্ষ থাকিতেও যে অভিমানহীনতা, তাহাকেই মানুশূন্যতা বলে। যেমন, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর জ্ঞাতি-খুড়া কালিদাস। তিনি সমস্ত বৈষ্ণবের

অধরামৃত ছলে, বলে, কৌশলে গ্রহণ করিতেন। এমনকি, ভুইমালি-জাতি ঝড়ু ঠাকুরেরও অধরামৃত আস্বাদন করিয়াছিলেন এবং এই মানশূন্যতার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বচরণামৃত পান করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন।

আশাবন্ধ—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির দৃঢ়সম্ভাবনাকেই আশাবন্ধ কহে। যেমন, শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—হে গোপীজনবল্লভ! আমার প্রেম নাই, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিসাধনও নাই, বৈষ্ণবযোগও নাই। ভগবন্নিষ্ঠ জ্ঞান, শুভকর্ম্ম অথবা পরিচর্য্যোপযুক্ত সজ্জাতিও নাই। তথাপি দীনহীন জনের প্রয়োজন সম্বন্ধে তুমি সমধিক দয়ালু জানিয়া তোমার প্রাপ্তিবিষয়ে অচ্ছেদ্যমূলা আশাই আমাকে যৎপরোনাস্তি ব্যথা দিতেছে। হায়! হায়! আমি এখন কি করিব?

সমুৎকণ্ঠা— স্বাভীষ্টপ্রাপ্তি-বিষয়ে যে গুরুতর লোভ তাহাকে সমুৎকণ্ঠা বলে। যেমন, শবরীদেবী। গুরু মাতঙ্গঋষির নিকট আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র আসিবেন জানিয়া প্রতিদিন অত্যন্ত উৎকণ্ঠাবশতঃ রাস্তা ফুলের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেন ভগবান্ রামচন্দ্রের চরণে কোনপ্রকার আঘাত না লাগে এইরূপ চিন্তা করিয়া। আজ শ্রীরামচন্দ্র আসিলেন না, আগামীকাল অবশ্যই আসিবেন। হতাশ্ না হইয়া প্রতিদিন উৎকণ্ঠসহকারে রাস্তা ফুলদ্বারা আচ্ছাদিত করিতেন।

নামগানে সদা রুচি—বৃথা কালযাপন না করিয়া সর্ব্বদা নামগানে রুচিসম্পন্ন। যেমন, আমাদের ষড়্গোস্বামিগণ সংখ্যাপূর্ব্বক নামগান সদা সর্ব্বদা করিতেন।

আসক্তি তদ্গুণাখ্যানে—ভগবদ্গুণ-বর্ণনে অত্যধিক আসক্তিকে বুঝায়। যেমন,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকর নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে মুসলমান কাজী বাইশ বাজারে প্রহারের আদেশ দেন। জল্লাদগণ যৎপরনাস্তি বেত্রাঘাত করা সত্ত্বেও তিনি ভগবন্নামে আসক্তিবশতঃ নিরন্তর নামোচ্চারণ করিতেছিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও নাম বিস্মরণ ঘটে নাই।

প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে—ভগবদ্ধামে অর্থাৎ শ্রীধাম নবদ্বীপ, পুরী, শ্রীবৃন্দাবনাদি, বিশেষতঃ ব্রজধামে বাস করিবার জন্য অত্যধিক প্রীতি। যেমন, আমাদের গোস্বামিগণ এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন করিতেন। আবার দেখা যায়,—

রাধাকুণ্ড-তটে কলিন্দ-তনয়া-তীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষ-দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা।
গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ।।

আমি শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্বামিগণের চরণ বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা প্রেমোন্মাদবশতঃ বিরহোত্থ অশেষ দশাদিগ্রস্ত হইয়া প্রমত্তের ন্যায় কখনও রাধাকুণ্ডতটে, কখনও যমুনার তটে, কখনও বা বংশীবটে সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিতেন এবং শ্রীহরির উন্নত গুণগাথা হর্ষভরে গান করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। ❑❑❑

❑ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ আশ্বিন, ১৪০৮ ; ১৭ অক্টোবর, ২০০১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধুসঙ্গে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনযোগে

দক্ষিণ ভারত তীর্থাদি দর্শন

শুভযাত্রা ঃ—১৭ই অগ্রহায়ণ (ইং ৩।১২।২০০১), সোমবার

"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে।।"

তীর্থ দর্শন ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম, এবং সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে, ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভ্রমণচ্ছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল নহে, সাধুসঙ্গই তীর্থদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাজন-বাক্যে দেখিতে পাই,—"যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ!"

শ্রদ্ধেয় সজ্জনসুধীবৃন্দ!

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে ও শ্রীমঠের সাধু-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দের পরিচালনায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, তীর্থ-মাহাত্ম্য-বর্ণন ও কীর্ত্তনাদিমুখে লাক্সারী সুপার ডিলুক্স বাসযোগে সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে ভোর ৫ ঘটিকায় শুভযাত্রা করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন ব্যক্তিগণকে এই পরিক্রমায় উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী যোগদান করিতে আহ্বান জানানো হইতেছে। পরিক্রমা-পঞ্জী ও নিয়মাবলী পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

যোগাযোগের ঠিকানা

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ ✆ ৪০০৬৮
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ✆ ৫৫৫-৮৯৭৩
শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
১৮, হলদার বাগান লেন, কলকাতা—৪

নিয়মাবলী

১। যাত্রিগণের দুইবেলা মহাপ্রসাদ, যাতায়াত ও বাসস্থানের জন্য প্রত্যেককে ৫,৫০১ টাকা আনুকূল্য জমা দিতে হইবে।

২। বাসের সামনের ২৬টী আসনের জন্য অতিরিক্ত ৩০০ টাকা এবং জানালার জন্য পৃথক্ ১০০ টাকা দিতে হইবে।

৩। কোনরূপ আপত্তিকর কিছু হইলে তাহা পরিচালক কমিটিকে জানাইতে হইবে। তীর্থ-পাণ্ডা বিদায় ও ঠাকুর-প্রণামী প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যয়।

৪। নিজস্ব বিছানাপত্র নিজেকে বহন করিতে হইবে।

দর্শনীয়-স্থান

১। রেমুণা—শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথজী, ২। ভুবনেশ্বর—শ্রীলিঙ্গরাজ-মন্দির, ৩। গৌরীকুণ্ড, ৪। পুরীধাম, ৫। সিংহাচলম্—জিয়ড়-নৃসিংহ, ৬। কভুর—রায়রামানন্দ-মিলনস্থান, ৭। পানানৃসিংহ, ৮। মাদ্রাজ, ৯। মহাবলীপুরম্, ১০। পক্ষীতীর্থম্, ১১। শিবকাঞ্চী, ১২। বিষ্ণুকাঞ্চী, ১৩। পণ্ডিচেরী, ১৪। চিদাম্বরম্, ১৫। রামেশ্বরম্, ১৬। কন্যাকুমারী, ১৭। মাদুরাই—শ্রীমীনাক্ষিদেবী, ১৮। শ্রীরঙ্গম্, ১৯। বাঙ্গালোর, ২০। মহীশূর, ২১। বৃন্দাবন গার্ডেন, ২২। তিরুপতি প্রভৃতি।

বিশেষ নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো যাইতেছে যে, যাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত শ্রীপত্রিকার বিগত ৫২শ বর্ষের গ্রাহক-মূল্য প্রেরণ করেন নাই, তাঁহারা অনতিবিলম্বে উক্ত গ্রাহক-মূল্য এবং বর্ত্তমান ৫৩শ বর্ষের গ্রাহক-মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে সেবায় সহযোগিতা ও উৎসাহিত করিবেন।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

৩৩শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

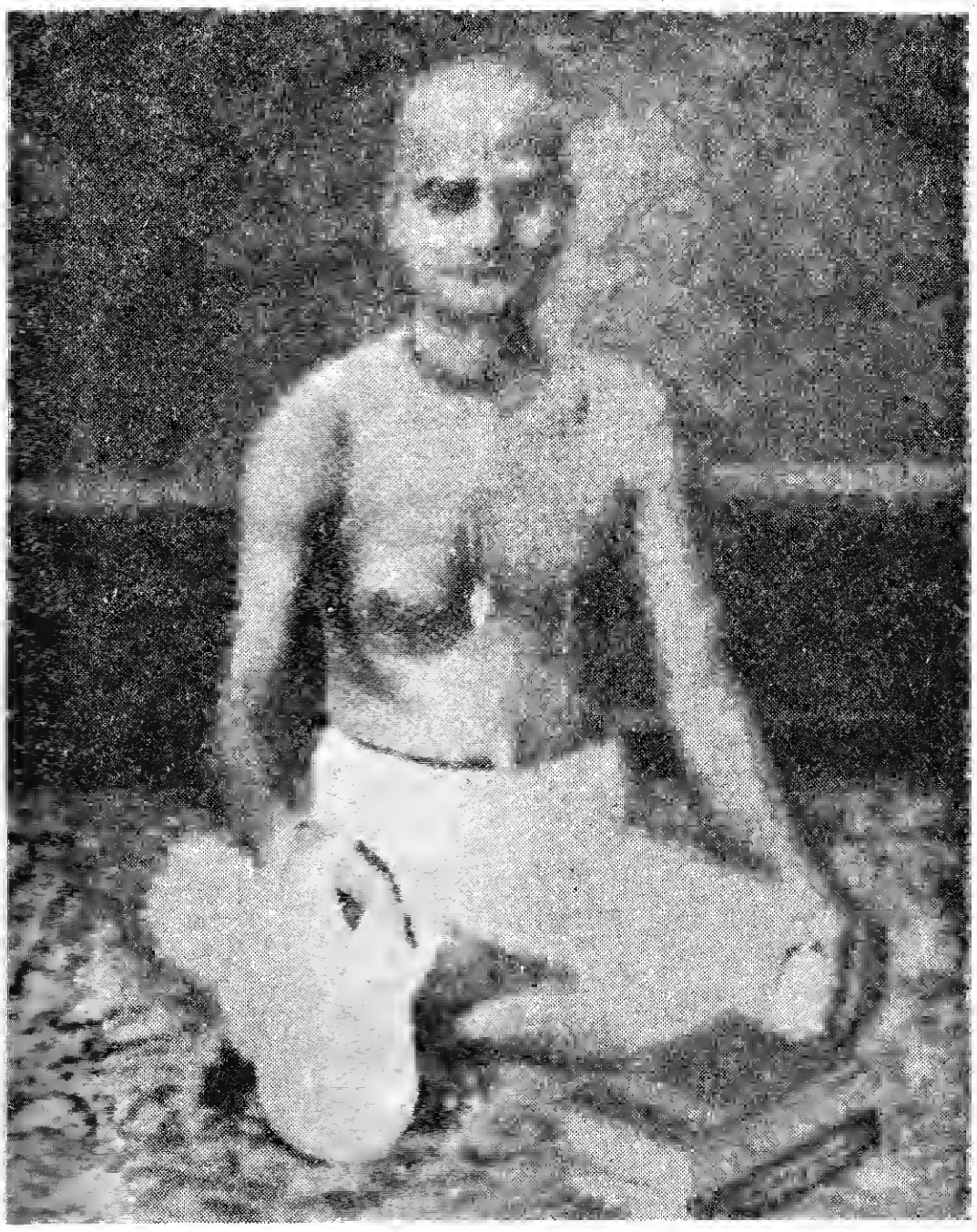

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিনে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব ইতি নামিনে।।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।
১৬ পদ্মনাভ, ৫১৫ শ্রীগৌরাব্দ

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ৩১শে পদ্মনাভ, ১৫ই কার্ত্তিক, ১৪০৮ (ইং ১/১১/২০০১) বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ***১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের*** তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ৩৩শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধবে যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—

৩০শে ভাদ্র, ১৪০৮

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

সেবা-সূচী

১৫ই কার্ত্তিক (ইং ১/১১/২০০১), বৃহস্পতিবার—
প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।
মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।
অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে "সাধারণ-সম্পাদক"-এঁর নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া (পঃ বঃ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৩শ বর্ষ } ১৫ দামোদর, গর্ভোদশায়ী, ৫১৫ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৪০৮, ইং ১৬/১১/২০০১ {৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীউদ্ধব-কৃতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণমহিমা-দশকম্

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে—১৭-২৩, ২৫]

দুনোতি চেতঃ স্মরতো মমৈতদ্-
যদাহ পাদাবভিবন্দ্য পিত্রোঃ।
তাতাম্ব কংসাদুরুশঙ্কিতানাং
প্রসীদতং নোঽকৃতনিষ্কৃতীনাম্।। ১।।

(শ্রীউদ্ধব কহিলেন,—) শ্রীকৃষ্ণ মাতা-পিতার পাদ-বন্দনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, হে তাত, হে মাতঃ, কংসভয়ে নিরতিশয় ভীত হইয়া আপনাদিগের সেবা করিতে পারি নাই, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন্—হরির এই চরিত্র স্মরণ করিতে করিতে আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হয়।। ১।।

কো বা অমুষ্যাঙ্ঘ্রিসরোজ-রেণুং
বিস্মর্ত্তুমীশীত পুমান্ বিজিঘ্রন্।

যো বিস্ফুরদ্ভ্রূবিটপেন ভূমে-
র্ভারং কৃতান্তে ন তিরশ্চকার।। ২।।

যিনি ভ্রূভঙ্গিরূপ কৃতান্তদ্বারা পৃথিবীর ভার দূরীভূত করিয়াছিলেন, তাঁহার চরণকমলের রেণু আস্বাদন করিয়া সেই পুরুষকে কেই বা বিস্মৃতি প্রাপ্ত হয়?? ২।।

দৃষ্ট্বা ভবদ্ভির্ননু রাজসূয়ে চৈদ্যস্য
কৃষ্ণং দ্বিষতোঽপি সিদ্ধিঃ।
যাং যোগিনঃ সংস্পৃহয়ন্তি সম্যগ্-
যোগেন কস্তদ্বিরহং সহেত।। ৩।।

যোগিগণ সম্যক্ যোগপ্রভাবে যে সিদ্ধি বাঞ্ছা করেন, রাজসূয়যজ্ঞে কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালও সেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ; সুতরাং সেই পরম কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণের বিরহ কে সহিতে পারে?? ৩।।

তথৈব চান্যে নরলোকবীরা
আহবে কৃষ্ণমুখারবিন্দম্।
নেত্রৈঃ পিবন্তো নয়নাভিরামং
পার্থাস্ত্রপূতাঃ পদমাপুরস্য।। ৪।।

অপরাপর যে-সকল নরবীর যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের লোচনানন্দকর মুখকমলের শোভা নয়নের দ্বারা পান করিতে করিতে অর্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।। ৪।।

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্ত-সমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চির-লোকপালৈঃ
কিরীট-কোটীড়িত-পাদপীঠঃ।। ৫।।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্ ; তিনি ত্রিশক্তির অধীশ্বর—তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই ; তিনি স্বীয় পরমানন্দস্বরূপে পরিপূর্ণ-কাম। ইন্দ্রাদি অসংখ্য লোকপাল করপ্রভৃতি পূজোপহার সমর্পণপূর্ব্বক কোটী কোটী কিরীটসংঘট্ট-ধ্বনিদ্বারা তাঁহার পাদপীঠের স্তব করিতেন।। ৫।।

তৎ তস্য কৈঙ্কর্য্যমলং ভৃতান্
নো বিগ্লাপয়ত্যঙ্গ যদুগ্রসেনম্।
তিষ্ঠন্ নিষণ্ণং পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যে
ন্যবোধয়দ্দেব নিধারয়েতি।। ৬।।

হে বিদুর, ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দের বাঞ্ছিত রাজাসনে অধ্যাসীন উগ্রসেনের অগ্রে

দণ্ডায়মান হইয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ, 'মহারাজ, অবধারণ করুন্'—এই বলিয়া উগ্রসেনকে নিবেদন করিতেন, তখন ভগবানের সেই ভৃত্যভাব স্মরণ করিয়া মাদৃশ ভৃত্যজনেরও অন্তঃকরণ নিরতিশয় ব্যথিত হইতেছে।। ৬।।

অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্রুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।। ৭।।

অহো কি আশ্চর্য্য! বকাসুরভগিনী দুষ্টা পূতনা কৃষ্ণবিনাশেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কালকূট মিশ্রিত স্তন পান করাইয়াও ধাত্রীপ্রাপ্য গতি লাভ করিয়াছিল ; অতএব, কৃষ্ণ বিনা এমন আর কে দয়ালু আছে যে, তাঁহার শরণাপন্ন হইব?? ৭।।

বসুদেবস্য দেবক্যাং জাতো ভোজেন্দ্রবন্ধনে।
চিকীর্ষুর্ভগবানস্যাঃ শমজেনাভিযাচিতঃ।। ৮।।

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর মঙ্গলবিধানেচ্ছু হইয়া ব্রহ্মার প্রার্থনায় কংসের কারাগৃহে বসুদেবপত্নী দেবকীর গর্ভে প্রাদুর্ভূত হন।। ৮।।

~ ~~~~

দশমূল-তত্ত্ব

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় জগতের স্থানে স্থানে বিদ্যার অনুশীলন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বহুতর পণ্ডিত লোক নিযুক্ত হইয়াছেন। ঐ সকল পণ্ডিতমণ্ডলীর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ চিন্তা-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া সর্ব্বদেশে বিদ্যার্থীদিগের চিত্তের অন্ধকার দূর করিতেছে। অস্মদ্দেশীয় যুবকগণ ঐ সমস্ত পার্থিবজ্ঞান বিদালয়ে সংগ্রহ করিয়া সহজেই চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়া থাকেন। বহুতর আলোচনাক্রমে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বদেশ-বিদেশবাসী ধর্ম্মপ্রচারকদিগের গ্রন্থাদি অনুশীলনপূর্ব্বক ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীশচীনন্দনের ন্যায় উপদেষ্টা আর কেহ হন নাই এবং শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মও কুত্রাপি নাই। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া কোটি কোটি মানব নানা উপায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা কি ও শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মই বা কি—এইরূপ প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইবার বাসনা করিতেছেন। বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে এই একটী বিশ্বাস হইয়াছে যে, মানবগণের ধর্ম্ম কখনও বহুবিধ

ধর্ম্ম হইতে পারে না। যে ধর্ম্ম মানবের পক্ষে নিত্য, তাহা উত্তর কেন্দ্র বা দক্ষিণ কেন্দ্রভেদে পৃথক্ পৃথক্ কখনই হইবে না। মূলে নিত্যধর্ম্ম এক বই দুই নয়। তবে ধর্ম্ম কেন বহুবিধ হইল? ইহার সদুত্তর এই যে, শুদ্ধ অবস্থায় জীবের ধর্ম্ম একই প্রকার। জড়বদ্ধ হইয়া জীবের ধর্ম্ম আদৌ দুইপ্রকার হইয়াছে অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরুপাধিক। নিরুপাধিক ধর্ম্ম কখনই দেশভেদে পৃথক্ হয় না। জড়োপাধি-প্রাপ্ত জীবের দেশ-কাল-পাত্রভেদে প্রকৃতি-পার্থক্যক্রমে সোপাধিক ধর্ম্ম দেশ-বিদেশে ও কালভেদে সহজেই পৃথক্ হইয়া পড়ে। উক্ত সোপাধিক ধর্ম্মই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও নাম প্রাপ্ত হয়। জীব যত উপাধি হইতে পরিষ্কৃত হন, ততই তাঁহার ধর্ম্ম নিরুপাধিক হয়। নিরুপাধিক অবস্থায় সকল জীবেরই এক নিত্য ধর্ম্ম।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর উক্ত নিত্যধর্ম্ম জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং সেই ধর্ম্মের নামই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ৭।১৬৪-১৬৬) এরূপ কথিত আছে,—

মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ।।
নিত্যানন্দ গোঁসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ-বিশেষে।।
আপনি দক্ষিণ দেশে করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণ-নাম-প্রচারণ।।

মহাপ্রভু স্বয়ং ও প্রেরিত সেনাপতিগণদ্বারা জগৎকে কি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা শুনুন্। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ৯।৩৬, ৪১),—

অতএব মালী আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে।।
ভারতভূমেতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার।।

হে পাঠকবৃন্দ! কৃতবিদ্য পুরুষেরা যে অন্যধর্ম্ম-প্রচারক-সকলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদের জীবিতেশ্বর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষা করিতে বাসনা করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এই সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাসমুদয়কে যথাযথরূপে জগৎকে প্রদান করাই আমাদের কর্ত্তব্য। কতকগুলি ক্ষুদ্রবুদ্ধিব্যক্তি এই সুযোগ পাইয়া নানাবিধ স্বকপোল-কল্পিত মত প্রচারপূর্ব্বক কৃতবিদ্য পুরুষগণকে ভ্রান্তিপথে লইবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ কেহ সরলপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন একটী দুরূহপথ অবলম্বন করত জগৎকে ও আপনাদিগকে বঞ্চনা করিতেছে। এ সময়ে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ কৃতবিদ্য যুবকদিগের উপকারার্থে আমরা যথাসাধ্য সরলরূপে

যত্ন করিব। সমস্ত শুভকার্য্যে স্বার্থের ন্যায় আর প্রতিবন্ধক নাই। অনেকেই স্বার্থপরবশ হইয়া জানিয়া শুনিয়াও অবিশুদ্ধ মত প্রচার করিতে পারেন। হে পাঠকবৃন্দ! আমাদের কোনপ্রকার স্বার্থ নাই। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি, আচার্য্যাভিমান প্রভৃতি কোনপ্রকার অনর্থ আমাদের আশাপথে নাই। আমাদের কেবল এই ইচ্ছা যে, আমরা সাধুদিগের কৃপায় শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশামৃত যেরূপ পান করিয়াছি, সেইরূপ সকলেই পান করুন্।

কয়েকদিবস হইল, "শ্রীচৈতনমতবোধিনী' বলিয়া একটী নবীন পত্রিকা আমাদের নয়নগোচর হইয়াছে। সেই পত্রিকার লেখকগণ জগৎকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ মত শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সঙ্কল্পটি মন্দ নয়, কিন্তু যে-প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক প্রভু-শিক্ষা সংগ্রহ করিবার প্রস্তাবনা করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত ভয়াবহ। লেখকগণ গোস্বামিদিগের সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে মহাপ্রভুর শিক্ষিত মত বাহির করিবেন মনে করিয়াছেন। তাঁহারা বিস্মৃত হইতেছেন যে, গোস্বামিদিগের গ্রন্থাবলীর সারাংশ সংগৃহীত হইয়া বঙ্গভাষায় 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ দেদীপ্যমান আছেন। উক্ত গ্রন্থ অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সকল জগৎকে দিতে পারিলে যথেষ্ট হয়। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিত আজকাল কেহই নন। যদি কেহ এমন অভিমান করেন যে, আমি স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা গোস্বামি-কৃত সংস্কৃত পয়ার গ্রন্থ হইতে এমত সার বাহির করিব যে, কবিরাজ গোস্বামীও তাহা পারেন নাই, তিনি নিতান্ত অসার ও হেয়। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ইহাই স্থির হয় যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শিক্ষাগুলি বিশদ্‌রূপে জগৎকে দিতে পারিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। তবে কবিরাজ গোস্বামীর পয়ারে অনেক কথা গূঢ়রূপে বর্ণিত আছে। সেইসব স্থলে গোস্বামি-কৃত সন্দর্ভ, রসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে মূলবাক্য অবতারণ করিয়া ভালরূপে তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া দিতে পারিলে অতিশয় উপাদেয় হয়। 'চৈতন্যমতবোধিনী'র উদ্দেশ্যটি কেবল ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়া মাত্র। আমরা এই প্রবন্ধে যথাযথ মহাপ্রভুর উপদেশামৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে বিশদ্‌রূপে প্রকাশ করিব।

হে পাঠকবৃন্দ! আপনাদের চরণে আমাদের একটী নিবেদন আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাগুলি গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। একটু মনোযোগ করিয়া না পড়িলে বোধগম্য হয় না। আজকাল অনেকেই আহারাদির পর শয়ন করিয়া উপন্যাস গ্রন্থ পাঠ করেন। এই সকল প্রবন্ধ সেইরূপ পাঠ করিলে হইবে না। শিক্ষা সমস্তই বেদ-বেদান্ত-শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব। শ্রদ্ধাসহকারে বিশেষ মনঃসংযোগপূর্ব্বক অন্যান্য সাধুগণের সহিত সমালোচনা-পূর্ব্বক ধীরে ধীরে পাঠ করিলে এই সকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। অতএব পূর্ব্ব কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশেষ যত্নসহকারে এই সিদ্ধান্ত-দশমূলক প্রবন্ধটী আলোচনাপূর্ব্বক আমাদিগকে কৃতার্থ করুন্।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে যতপ্রকার শিক্ষা দিয়াছেন, সর্ব্বত্রই শাস্ত্রের সম্বন্ধ, অভিধেয়

ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিভাগক্রমে সমস্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীসনাতনকে শিক্ষা দিবার সময় বলিয়াছেন, যথা,—

বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন।।
গৌণ-মুখ্য-বৃত্তি কিবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয় কৃষ্ণকে।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৪৩, ১৪৬)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদশাস্ত্রই শাস্ত্র। বেদ যাহা বলেন, তাহাই সত্য। বেদশাস্ত্রের অনুগত হইয়া চলা সাধুগণের কর্ত্তব্য। সেই বেদশাস্ত্র কোনস্থলে গৌণবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, কোনস্থলে মুখ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, কোনস্থলে অন্বয়ভাবে, কোনস্থলে ব্যতিরেকভাবে একমাত্র কৃষ্ণকে প্রকাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব বেদশাস্ত্রের সম্বন্ধ বিচার করিলে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ উক্ত হন না। বেদশাস্ত্রের অভিধেয় বিচার করিলে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। আমরা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব বিশদরূপে বিচার করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট দশটী সিদ্ধান্ত প্রথমে একটী শ্লোক-আকারে দেখাইয়া ক্রমশঃ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে আলোচনা করিব। শ্লোকটী এই,—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎ প্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ।।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্র এই দশটী তত্ত্ব জীবগণকে উপদেশ করিতেছেন।

১। আম্নায়-বাক্যই প্রধান প্রমাণ। তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত নয়টী সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে।

২। কৃষ্ণস্বরূপ হরি জগন্মধ্যে পরমতত্ত্ব।

৩। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।

৪। তিনি অখিল-রসামৃত-সমুদ্র।

৫। জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ তত্ত্ব।

৬। তটস্থ গঠনবশতঃ জীবসকল বদ্ধদশায় প্রকৃতিকর্ত্তৃক কবলিত।

৭। তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ জীবসকল মুক্তদশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত।

৮। জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ।

৯। শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন।

১০। শুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।

প্রথম সিদ্ধান্তে প্রমাণতত্ত্বের বিচার। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত বেদশাস্ত্র-শিক্ষিত সম্বন্ধ-তত্ত্ব বিচার। দশম সিদ্ধান্তে প্রয়োজন-তত্ত্বের বিচার। বিষয়গুলিকে প্রমাণ ও প্রমেয়—এই দুইভাগে বিভক্ত করিলে প্রথম সিদ্ধান্তে প্রমাণ-বিচার এবং দ্বিতীয় হইতে দশম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত প্রমেয়-বিচার। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত যে সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের পরিস্ফূর্তি। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সিদ্ধান্তে জীব-তত্ত্বের পরিস্ফূর্তি। অষ্টম সিদ্ধান্তে তদুভয়ের সম্বন্ধ-বিচার। ভেদাভেদ-শব্দে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বুঝিতে হইবে। পাঠকবর্গ পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ের বিচারে মনোনিবেশ করুন্।

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

****

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৯ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতনচরিতামৃতে,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।।
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন।।
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়।।
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।।
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে 'প্রেমফল'।
ইহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল।।

শ্রীরূপশিক্ষার এইসকল কথা পূর্ব্বে এখানে ভাগবত-প্রদর্শনী ক'রে দেখান হ'য়েছিল। মর্য্যাদাপথে কৃষ্ণ-লোকের নিম্নার্দ্ধে অবস্থিত শান্ত, দাস্য ও সখ্যরস ঢাকা পড়ে। এ সকল তত্ত্ববিচার সদ্গুরুর চরণাশ্রয় না করিলে জানা ও বুঝা যায় না। যদি স্বচ্ছ (Transparent) গুরুর দর্শন হয়, তাঁহার মধ্য দিয়া ভগবৎ-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়। অসদ্গুরু অস্বচ্ছ (Opaque)। আমার গুরু অন্তরঙ্গ ভজন-প্রদর্শক।

অধঃপ্রদেশে অর্থাৎ গোলোকের নিম্নে বৈকুণ্ঠে মর্য্যাদাযুক্ত সেবাতে গোলোকের রস ঢাকা পড়ে। গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতির সেবা মর্য্যাদার দ্বারা ঢাকা পড়ে।

ভগবান্‌কে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত ভক্তিতে সেবা করিলে লক্ষ্মী-নারায়ণকে যেভাবে সেবা করেন আমরা সেইভাবে আবদ্ধ হই। এ সকল distant relation. Closer termএ শ্রীদাম সুদামের সেবা-সৌন্দর্য্য, সখাগণের তাল-পাড়া ও কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট দেওয়া। গৌরব-বিচারে আমরা উপাস্য বস্তুকে আমাদের উচ্ছিষ্ট দিতে পারি না। ঘ্রাত, গৃহীত বা ওষ্ঠস্পৃষ্ট বস্তু নিবেদন করিতে পারি না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সখা শ্রীদাম, সুদাম তাহা দেন। কৃষ্ণ যাহা একা করিয়া উঠিতে পারেন না, সখাগণ তাহার সহায়তা করেন। তাঁহার সহিত কৌতুকরহস্য করেন। মধুমঙ্গল গোপবালক না হইয়াও কৃষ্ণের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা কর্‌ছেন।

সাধারণ লোক এসকল কথা—রাধাগোবিন্দের কথা আলোচনা করেন না ব'লে কেহ কেহ সীতারাম ও লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক হন। ইহাতে চরম মঙ্গল লাভ হয় না। বৈধবর্ণাশ্রমধর্ম্মে পাঞ্চরাত্রিকমতে অবস্থিত থাকিলে মানব ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুগণের লভ্য সত্য, জন, মহঃ, তপঃ প্রভৃতি লোকে গমন করেন। শ্রীরামচন্দ্র একপত্নীব্রতধর। বাহিরের কোন ব্যক্তি তাঁহার সেবা পান না। দশরথ Ethical Principle (নীতিধর্ম্ম) রক্ষা করিতে গিয়া রামচন্দ্রের সেবা ত্যাগ করিলেন। আমরা স্মার্ত্তধর্ম্মের অনুসরণ করিব না। তাই শুদ্ধভক্তগণ নন্দ মহারাজের বন্দনা করেন।

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম।।

নন্দ মহারাজ এরূপ তপস্যা ক'রেছিলেন, প্রেমের দ্বারা ভগবান্‌কে এরূপ বশীভূত ক'রেছিলেন যে, সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি শ্লথ হ'য়ে তিনি (কৃষ্ণ) নন্দের বাড়ীতে তাঁহার প্রাঙ্গণে হামাগুড়ি খাচ্ছেন। নন্দ শ্রুতি-স্মৃতি-বেদান্ত-দর্শন কিছু পড়েন নাই, কিন্তু গোপাল ভিন্ন কিছু জানেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতেই তাঁহার সেবা করেন। যাঁহারা সংসার-ভয়ে ভীত তাঁহারা মহাভারত, স্মৃতি-বেদ আলোচনা ক'রে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করেন। ভবভীতগণ স্মৃতি আলোচনা করেন, মনু, হারীত প্রভৃতির শাস্ত্র পড়েন। ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদির অধিকাংশগুলিতে কর্ম্মকাণ্ডের কথাই প্রবল। বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে দুইখানিতে নারায়ণের উপাসনার কথা পাওয়া যায়। অন্যান্য শাস্ত্রে Ethical Principle (নীতিধর্ম্ম) বা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের কথা পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বেদপাঠ ও শ্রবণের অধিকার। অযোগ্য শূদ্রাদির মহাভারত ও পুরাণ শ্রবণে অধিকার নাই। এইজন্য কথিত হইয়াছে,—"শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্ ব্রাহ্মণঃ অগ্রতঃ কৃত্বা।" বেদবিধি-মতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী ইত্যাদির নিকট সকল কথা বলিবে না। বর্ণের ভিতর Intellectual Cultureএ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ইঁহারা নৈতিক ও পারমার্থিক-শিক্ষায় শিক্ষিত। স্ত্রীগণের মধ্যে অত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি না হইলে, শূদ্রের মধ্যে গুহক না হইলে, তির্য্যগ্ জাতির মধ্যে গরুড় না হইলে, অন্যান্যের শিক্ষার অভাবে বেদবাণী শুনান হইবে না। কিন্তু ভক্তের উক্তি,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা ।
কিন্তু প্রদ্যোন্নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ।।

আমরা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিচারে আবদ্ধ থাকিব না। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী থাকিব না। কিন্তু গোপীভর্ত্তার পাদপদ্মের দাসানুদাস হইব। আমরা কার্ষ্ণ-ভক্তানুভক্তের সেবক হইব। নিজকে পূজ্য বৈষ্ণব বুদ্ধি কর্‌ব না।

আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী।।
নিজ শ্রেষ্ঠ জানি, উচ্ছিষ্টাদি দানে,
হ'বে অভিমান-ভার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা,
না লইব পূজা কার।।

সত্য সত্য অমানী মানদ হইতে হইবে। নিষ্কপটে উপাসনা-প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে। কপটতা করিতে হইবে না। আমি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, অমুকে ম্লেচ্ছ বৈষ্ণব, অমুকে শূদ্র বৈষ্ণব—এরূপ বিচার করিতে হইবে না।

অনুসরণ ও অনুকরণ এক নহে। অনুসরণের ভিতর কপটতা নাই। অনুকরণের ভিতর কপটতা রহিয়াছে। আমরা ইহার দৃষ্টান্ত মহাপ্রভুর সময়ের ঠাকুর হরিদাস ও ঢঙ্গ বিপ্রের মধ্যে দেখ্‌তে পাই। হরিদাস ঠাকুর সত্যসত্যই হরিভজন ক'রেছিলেন বলিয়া নিখিল-জনগণের, এমনকি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণেরও নমস্য হইয়াছিলেন। আর ঢঙ্গ বিপ্র শুধু জাত্যাভিমান ও বাহিরে কৃষ্ণপ্রেমের ভাণ দেখাইয়া ঠাকুর হরিদাসের প্রতিষ্ঠা পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল মাত্র। হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল ছিলেন। তিনি মহাভাগবত ছিলেন। তাই তাঁহার বিচার ছিল,—

বন দেখি' ভ্রম হয়—এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি' মনে হয়—এই গোবর্দ্ধন।।
যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
তাঁহা প্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি।।

আধ্যক্ষিকের চিন্তাস্রোত হইতে তফাৎ হইতে হইবে। আমাদের জড়বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা বৈষ্ণবের চরিত্র দেখিতে হইবে না। জগৎ বহিরঙ্গাশক্তির পরিণতি। বহিরঙ্গের কথায় ইহা ভরপূর রহিয়াছে। কৃষ্ণভজনের অন্তরঙ্গ কথার আলোচনা কম

হইলে জড়জগতের কথা বে'ড়ে যায়। কপট ব্যক্তিগণ ভক্তের চরিত্র বুঝিতে না পারিয়া তুচ্ছ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশায় ঢঙ্গ বিপ্রের আচরণ অবলম্বন ক'রে অপরাধী হ'য়ে পড়েন। ঢঙ্গ বিপ্র মনে করিয়াছিল—'আমি উচ্চবর্ণে জাত। আমি বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া ভাব দেখাইলে নিশ্চয়ই অধিক সম্মান পাইব। আমি ব্রাহ্মণ, হরিদাসের মত প্রেম দেখাইলে খুব প্রতিষ্ঠা পাইব।' কিন্তু দর্শকগণ ঢঙ্গ বিপ্রের কপটতা দেখিয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছিল।

বড় হ'লে কৃষ্ণ বেশী প্রীত হ'বেন না। কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য চান না। কৃষ্ণ ভিক্ষুক সুদামা বিপ্রের সামান্য খুদকুঁড়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। বদ্ধজীব মনে করিতে পারেন,—আমি ধনী, অতএব ভগবানের মন্দিরাদি করিয়া অনেক সেবা করিতে পারিব ; আমি জ্ঞানী, অতএব পাণ্ডিত্যদ্বারা তত্ত্বসকল জানিয়া লইব। আমি ব্রাহ্মণ, অতএব স্মার্ত্তবিধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অর্চ্চন করিতে পারিব। ঐশ্বর্য্যদ্বারা খানিকটা নারায়ণের সেবা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু 'অহংমম-ভাব' নামাপরাধের দ্বারা কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় না। ইহজগতে ম্লেচ্ছ হইতে শূদ্র, শূদ্র হইতে বৈশ্য, বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।

অনুকরণ ও অনুসরণ, কপটতা ও সরলতা, মেকী ও আসল কখনই এক হইতে পারে না। এখানে (মহাপ্রভুর বাড়ীতে) ঠাকুর হরিদাস ও ঢঙ্গ বিপ্রের অনুরূপ একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। গোপালদাস-নামে একটী বাবাজী এখানে অবস্থান করিতেন। আমি তখন এই ঠাকুরবাড়ীর পূর্ব্বদিকের একতলা দালানের মাঝের কোঠায় থাকিয়াভজন করিতাম। লোকজন আসিলে দরদালানে বসিয়া হরিকথা আলোচনা করিতাম। সেই বাবাজীর বয়স ছিল ৮০ বৎসর। তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম (?) করিতেন। মহাপ্রভুর বাড়ীতে তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। তিনি আমার পার্শ্বের ঘরে থাকিতেন। তিনি একদিন আমাদের নিকট আসিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"আপনারা গৌরকিশোর বাবাজীকে সম্মান করেন কেন? আমি তাহা অপেক্ষা কোন্ অংশে কম?" আরও বলিলেন,—"তিনি ত' /৸০ পোয়া চালের ভাত খান। আমি /।০ পোয়া চালের ভাত খাই। আমি চটের কৌপীন পরিধান করি, আর গৌরকিশোর মড়ার নেকড়া পরেন। তবে আমাকে সেরূপ সম্মান করেন না কেন? (ক্রমশঃ)

"যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন না করিয়া, কেবলমাত্র 'উর্জ্জাদর' করিয়া থাকেন, তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যের ভক্তিফল সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারেন না। ইহার দ্বারা চাতুর্ম্মাস্যের প্রতি অনাদরই প্রকাশ পায়।"

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—১৮)

শ্রীভগবানের ধামসমূহ তদীয় স্বরূপ-বিভূতি। এজন্য উপরিভাগে ও অধোভাগে প্রকাশিত বলিয়া উভয়বিধরূপে প্রসিদ্ধ, কিন্তু শ্রীভগবানের নিত্য অধিষ্ঠানহেতু উভয়ত্র প্রকাশমান ধামের একত্ব জানিতে হইবে। অর্থাৎ একই ধাম ঊর্দ্ধে পরব্যোমে ও অধোভাগে পৃথিবীতে বিরাজিত। শ্রীভগবান্ যেরূপ একসময়ে বহুস্থানে প্রকাশ পাইতে পারেন, তাঁহার ধাম সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

শ্রীভগবানের একই সময়ে বহুস্থানে প্রকাশের কথা,—

"চিত্র বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাহবৎ।।"

শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে এক শ্রীবিগ্রহে ষোল হাজার মহিষীকে বিবাহ করেন—ইহা দেবর্ষি নারদ জানিতে পারিয়া শ্রীভগবানের যোগমায়া বৈভব দেখিবার জন্য দ্বারকায় গমন করেন। তাঁহার বিস্ময়ের হেতু যদি সৌভরি-মুনির মত কায়ব্যূহ রচনাদ্বারা বিবাহ হইত, তবে তিনি বিস্মিত হইতেন না। তিনি বহু মুনির কায়ব্যূহ রচনা দর্শন করিয়াছেন, নিজেও তাহাতে সমর্থ ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কায়ব্যূহ বিস্তার করেন নাই, নিজ প্রকাশমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উভয়ে ভেদ এই যে, কায়ব্যূহে দেহ বহু হইলেও সকল দেহের ক্রিয়া এক থাকে অর্থাৎ সৌভরি-মুনি যে কায়ব্যূহদ্বারা পঞ্চাশমূর্ত্তি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার এক মূর্ত্তি হাত নাড়িলে অন্য ঊনপঞ্চাশ মূর্ত্তিও হাত নাড়িত ; কিন্তু প্রকাশ-মূর্ত্তিতে সেরূপ হয় না। প্রকাশে দেহ এক, কিন্তু ক্রিয়া বহু থাকে। তাহা দেখিয়াই নারদ বিস্মিত হন। শ্রীগোলোক পরব্যোমে অবস্থিত, তাহারই প্রমাণ গোকুল ভৌমবৃন্দাবনে বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহী শ্রীমদ্ উদ্ধব তাহা সমাধিতে অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীবিদুরকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-চরিত জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীউদ্ধব বিরহ-ব্যাকুল অবস্থায় দুই দণ্ড মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎপরে পরমানন্দে পূর্ণ হইয়া দৃশ্যমান জগতে ধীরে ধীরে পুনরাগমন করেন।

শনকৈর্ভগবল্লোকান্নৃলোকং পুনরাগতঃ।
বিমৃজ্য নেত্রে বিদুরং প্রত্যাহোদ্ধব উৎস্ময়ন্।। (ভাঃ ৩।২)

ভাগবতীয় বচনানুসারে শ্রীউদ্ধব মৌনাবলম্বনকালে শ্রীকৃষ্ণলোকে তদীয় লীলা দর্শন করিয়াছিলেন। নচেৎ বিচ্ছেদ-ব্যাকুল উদ্ধবের চিত্ত প্রফুল্ল হইতে পারিত না। তখন ভৌম মথুরাদিতে শ্রীকৃষ্ণলীলা অপ্রকট হইয়াছিল। সুতরাং উদ্ধব উক্ত ধামসমূহের প্রকাশবিশেষেই শ্রীকৃষ্ণলীলা দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৮ ; ১৬ নভেম্বর, ২০০১

বিষ্ণোর্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যাসৌ দিবং গতঃ।
তদাবিশৎ কলিযুগ পাপে যদ্রমতে জনঃ।।
যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ।
তাবৎ কলির্ব্বৈ পৃথিবীং পরাক্রান্তং ন চাশকৎ।।

যখন ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রীকৃষ্ণাখ্য ভানু দ্যুলোকে গমন করেন, তখন এই কলি জগতে প্রবেশ করিয়াছে। সেই কলিহেতু লোকসকল পাপে রত হইয়াছে। যে-পর্য্যন্ত রমাপতি-চরণকমলযুগল পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত কলি পৃথিবীস্থ জীবের প্রতি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে পাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বাবতারী বলিয়া সূর্য্যস্থানীয়। আর গুণাবতার শ্রীবিষ্ণু তাঁহার রশ্মিস্থানীয় ; সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্যুলোক অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক লোকের অগোচরে স্থিত মথুরাদির প্রকাশবিশেষরূপ বৈকুণ্ঠে গমন করেন, তখন পৃথিবীতে কলির প্রবেশ হইয়াছিল। এস্থলে মথুরা, দ্বারকা ও বৃন্দাবন ধামের ত্রিবিধ প্রকাশের কথা পাওয়া যায়—অপ্রকট প্রকাশ, আমাদের দৃশ্যমান বর্ত্তমান প্রকাশ ও প্রকট প্রকাশ।

শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকাশে গমন করিয়া বিহার করেন তাহা অপ্রকট প্রকাশ। সেই প্রকাশ পৃথিবীস্থ হইলেও অন্তর্দ্ধান শক্তিদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া বিরাজ করেন। অতএব পাঞ্চভৌতিক দেহধারী আমরা বৃন্দাবনস্থিত মহাকদম্বাদিও যেরূপ দেখি না, শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকাশকেও তদ্রূপ পৃথিবী স্পর্শ করিয়া বিদ্যমান দেখি না।

প্রাপঞ্চিক আমরা যে প্রকাশ দর্শন করি, তাহা দৃশ্যমান প্রকাশ। তাহা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া বিরাজিত। পাঞ্চভৌতিক দেহধারী আমরা যেমন কদম্বাদি বৃক্ষসকল দেখিতে পাই, তেমনই শ্রীকৃষ্ণলীলাও পৃথিবী স্পর্শ করিয়া বিরাজমান। অনেকের বিশ্বাস,—আমরা যে মথুরাধাম দেখিতেছি, তাহা বাস্তবিক নহে, কোনকালে এস্থানে ধাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ মায়াতীত বস্তু, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হইয়াও যেমন জগতে প্রকট বিহার করেন, নরলীলাহেতু অনেক মানব-ধর্ম্ম অঙ্গীকার করেন, সেইরূপ ধামও মায়াতীত এবং চিন্ময়। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা অঙ্গীকারের ন্যায় শ্রীধামসমূহও লীলাবশতঃ পার্থিব ধর্ম্ম অঙ্গীকার করেন। প্রকট প্রকাশে যখন শ্রীকৃষ্ণ প্রকট বিহার করেন, তখন তিনি এই ধাম স্পর্শ করেন, এই ধাম স্পর্শদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করা হয় বলিয়া তিনি 'পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলেন' বলা হয়। সম্প্রতি তিনি পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া বিহার করিতেছেন বলিয়াই "যাবৎ স পাপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ" শ্লোকে উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে।

কেনোপনিষদে,—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি।।

কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া মন নিজ বিষয়ে ধাবিত হয়, কাহার দ্বারা যুক্ত হইয়া প্রাণ গমনাগমন করে, কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া লোকসকল কথা উচ্চারণ করে এবং কোন্ দেবতা চক্ষু-কর্ণাদিকে স্ব-স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত হইয়াছে,—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুজ ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।।

যিনি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, প্রাণের প্রাণ এবং চক্ষুর চক্ষু অর্থাৎ দেহ-ইন্দ্রিয়াদির যিনি প্রবর্ত্তক, তাঁহাকে জানিতে পারিলে ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করিয়া অমৃত হইতে পারেন। সর্ব্বান্তে বলিয়াছেন,— "যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মান-মনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি" অর্থাৎ যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যা জানেন, তিনি পাপসকল বিধূত করিয়া অনন্ত অতিসূক্ষ্মাত্মক স্বর্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এখানে 'স্বর্গ' বলিতে বৈকুণ্ঠলোক। কেননা চতুর্দ্দশ ভুবনস্থ স্বর্গলোক অনন্ত বা নিত্য নহে ; প্রলয়ে তাহার ধ্বংস হয়।

পূতনার সদ্গতি প্রাপ্তির সম্বন্ধেও ভাগবতের উক্তি,—

"যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিম্।" (ভাঃ ১০।৬।২৭)

রাক্ষসী জননীদের গম্য স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিল। অন্যত্র "লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতং"—ধাত্রীযোগ্যা গতি লাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণের ধাত্রী অম্বিকা বা কিলিম্বা যে-স্থানে (গোলোকে) অবস্থান করেন, তথায় গমন করিয়াছিল। উপনিষদে অন্যত্র দেখা যায়,—স্বর্গ কি এবং ব্রহ্ম কি, এই প্রশ্নের উত্তরে—সেই ব্রহ্ম নারায়ণ, ইহা ব্যক্ত করিয়া বৈকুণ্ঠ বন-লোককে স্বর্গ বলা হইয়াছে।

দ্বারকার নিত্যত্ব এই শ্লোকে দেখা যায়,—

দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্।।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্।। (ভাঃ ১১।৩১।২৩)

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে মহারাজ! সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণ-পরিত্যক্ত দ্বারকাধামকে ক্ষণকালমধ্যে জলপ্লাবিত করিয়াছিল, কিন্তু শ্রীভগবদালয় অব্যাহত ছিলেন। সেই আলয়ে ভগবান্ মধুসূদন নিত্যসন্নিহিত আছেন, তাহা স্মরণ করিলে সমুদয় অশুভ নাশ হয় এবং তাহা সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ। 'হরিণা ত্যক্তা'—ইহার দুইপ্রকার অর্থ হয়। হরিণা+ত্যাক্তা, আর হরিণা+অত্যক্তা। পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইতেছে, হরি নিত্যসন্নিহিত আছেন। সুতরাং ভগবদালয়ের চতুর্দ্দিকে পরিখার ন্যায় সমুদ্র প্লাবন বুঝিতে হইবে।

মথুরা সম্বন্ধেও ঐরূপ শ্লোক দেখা যায়,—

"রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্ব্বযাবদবভূভূজাম্।
মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ।।"

যে স্থানে হরি নিত্য সন্নিহিত আছেন, সেই মথুরা সকল যাদব-ভূপতির রাজধানী হইয়াছিল।

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচিঃ।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ।। (ভাঃ ৪।২।৮)

দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে বলিয়াছিলেন,—হে বৎস! যমুনার তটে পরম পবিত্র মধুবন অবস্থিত, তথায় শ্রীহরির নিত্য সান্নিধ্য আছে; তুমি সেই মথুরায় গমন কর। (মধুবন মথুরার অতি সন্নিকটে অবস্থিত)।

শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যত্ব,—

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ-
গূঢ় পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়শ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিন্দ্র-রমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ।।

রঙ্গস্থলগত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মথুরা-রমণীগণ বলিলেন,—অহো! ব্রজভূমি পরম পুণ্যবতী। যেহেতু মনুষ্য চিত্তে গূঢ় পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র বনমালা-বিভূষিত হইয়া বলরামের সহিত গো-পালন করত বিবিধ ক্রীড়াদ্বারা তথায় বিহার করেন। গিরীশ, রমা তাঁহার চরণকমল অর্চ্চনা করেন।

'অঞ্চতি'-পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে নিত্যস্থিতি বুঝাইতেছে। "সাক্ষাদুপদেশস্তু শ্রুতিঃ" অর্থাৎ সাক্ষাৎ উপদেশকে শ্রুতি বলে। তাহা অন্য বাক্য অপেক্ষা বলবান। এখানে 'অঞ্চতি' ক্রিয়াদ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-বিহার উক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবৎ-কৃপাতে মাথুর-পুরস্ত্রীগণের মুখ হইতে যথার্থ বাণী নিঃসৃতা হইয়াছে। তখন তিনি ব্রজেও বিহার করিতেছেন—এইরূপ বর্ত্তমানকালের প্রয়োগে অপ্রকটলীলায়ও ব্রজে স্থিতি-বিহারাদি ব্যক্ত হইতেছে।

বৃন্দাবনীয় লীলার দুইটী স্থিতিস্থান—বৃন্দাবন ও গোলোক। বৃন্দাবনে প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলারই স্থিতি, আর গোলোকে কেবল অপ্রকট লীলার স্থিতি। সুতরাং যে লীলা প্রাপঞ্চিক জগতে অভিব্যক্ত হয় না, তাহার অভিব্যক্তিস্থান গোলোক। বৃন্দাবনের প্রকাশবিশেষ গোলোক। তজ্জন্য শ্রীবৃন্দাবনেই গোলোকাখ্য প্রকাশবিশেষ গোপগণকর্ত্তৃক দৃশ্য হইয়াছিলেন।

লোকপাল বরুণের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও বরুণ-লোকবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণে প্রণতি দর্শন করিয়া গোপরাজ নন্দ বিস্মিতচিত্তে তাহা জ্ঞানিগণের নিকট বর্ণন করেন। সেই গোপসকল শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মনে করিয়া উৎসুকচিত্তে চিন্তা করিয়াছিলেন, ভগবান্

নিশ্চয়ই আমাদিগকে নিজ সূক্ষ্মগতি প্রাপ্ত করাইবেন। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ গোপগণের তাদৃশ সঙ্কল্প অবগত হইয়া তাহা সিদ্ধির জন্য কৃপাপূর্ব্বক প্রকৃতির পারস্থিত গোপগণের লোক (গোলোক) দর্শন করাইয়াছিলেন। অক্রূর পূর্ব্বে যেখানে ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মহ্রদে নন্দাদি-গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নীত, মগ্ন ও উদ্ধৃত হইয়া ব্রহ্মের রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে মূর্ত্তিমান্ বেদসমূহদ্বারা স্তুত হইতে দেখিয়া বিস্মিত ও পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের কোন্ স্থানে গোলোক দর্শন করাইলেন?—ব্রহ্মহ্রদ অর্থাৎ অক্রূরতীর্থ, যেখানে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের সর্ব্বত্রই গোলোক দর্শন করান সম্ভব হইলেও অক্রূরতীর্থের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে জানাইবার জন্য গোপগণকে সেই হ্রদে মগ্ন করাইয়াছিলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

বৈষ্ণবসেবা

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনের সেবা হয় না। বিষ্ণু অঙ্গী আর বৈষ্ণবগণ তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গ। বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া বা বৈষ্ণবকে উপেক্ষা করিয়া ভগবৎসেবা লাভের প্রচেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। ভক্তকে লইয়াই ভগবানের ভগবত্তা। বৈষ্ণবসেবা ভগবৎসেবারই অন্তর্ভুক্ত। বিষ্ণুপূজা হইতেও বৈষ্ণবের পূজা শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৯।২১) স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন, —"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" অর্থাৎ "আমার ভক্তের পূজা আমা হইতেও শ্রেষ্ঠ।' শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে উল্লেখ রহিয়াছে,—

আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়।।

পদ্মপুরাণে পরম বৈষ্ণব শিবঠাকুর পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন,—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।।

"জগতে যতপ্রকার পূজা আছে, সকল পূজাপেক্ষা ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা সর্ব্বোত্তম। আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্য বিষ্ণুর যিনি সেবাপূজা করেন, সেই ভগবদ্ভক্তের পূজা আরও অধিক বড় বা শ্রেষ্ঠ।" ভগবদ্ভক্তকে ভগবান্ও স্বয়ং পূজা করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যতদিন না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের কোন মঙ্গলই হইবে না। বৈষ্ণবসেবার মাধ্যমে ভগবানের সেবা আরম্ভ হয়। ভগবানের কৃপা সরাসরিভাবে কেহই লাভ করিতে পারেন না। বৈষ্ণবের

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৮ ; ১৬ নভেম্বর, ২০০১

সম্পত্তি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। একমাত্র বৈষ্ণবই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। বৈষ্ণবের কাছেই কৃষ্ণকে দেওয়ার একমাত্র শক্তি আছে।

"কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।"

যেখানে বৈষ্ণবসেবা বা বৈষ্ণবের আনুগত্য নাই, সেখানে কৃষ্ণও নাই। বৈষ্ণবসেবায় যাহার যত নিষ্ঠা, তিনি ততই অধিক পরিমাণে বৈষ্ণবতা লাভ করিতে সক্ষম হন। বৈষ্ণবের সেবার জন্য সত্যসত্যই তীব্র ব্যাকুলতা হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ না থাকিলে ভগবানের কৃপাশীর্ব্বাদ পাওয়া কোনকালেই সম্ভব নহে। বৈষ্ণবের সেবা ভগবানের সেবাপেক্ষাও অধিক মঙ্গলপ্রদ, কেননা, কেবলমাত্র ভগবানের সেবা করিলে ভগবান্ তাহা গ্রহণ নাও করিতে পারেন ; কিন্তু ভগবানের কৃপামূর্ত্তি বৈষ্ণবের আবেদন ভগবান্ সর্ব্বদাই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয়।। (শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

দয়ার সাগর বৈষ্ণবকে শাস্ত্র 'বাঞ্ছাকল্পতরু' আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-ভাগবতাদি শাস্ত্রসমূহ সর্ব্বত্রই বৈষ্ণবসেবার মাহাত্ম্য বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত বদ্ধজীবের অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা প্রাপ্তির অন্য কোন পন্থা নাই। বৈষ্ণবসেবাই পরম ধর্ম্ম ও পরম তপস্যা হওয়া উচিত।

প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ।। (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭০)
প্রভু কহে,—কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।। (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৪)
এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়।। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৮৭)
কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৫৫)
কৃষ্ণসেবা হইতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।
ভাগবত-আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ়।। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৮৫)
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৪১)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—তুমি কৃষ্ণভক্ত প্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্।।
তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার।। (চৈঃ চঃ মঃ ১১।২৬-২৭)

বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্।।

"ভগবৎসেবকগণের সিদ্ধিলাভ হয়, কি না হয়—এইরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু যাহারা তদীয় ভক্তগণের পরিচর্য্যায় আসক্ত, তাঁহাদের সিদ্ধিবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে পাওয়া যায়,—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।। (আদিপুরাণ)

"হে পার্থ, যাহারা কেবল আমারই ভক্ত, তাহারা বস্তুতঃ আমার ভক্ত নয়। কিন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁহদিগকে আমার উত্তম ভক্ত বলিয়া জানিবে।"

সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
দেবতানাং মনুষ্যানাং তথৈব যক্ষরক্ষসাম্।।
যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপ লক্ষ শতানি চ।
দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মানাম্।। (পদ্মপুরাণ)

"বৈষ্ণবগণ স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও রসাতলে সর্ব্বত্র দেবগণের মনুষ্যগণের এবং যক্ষ-রক্ষগণের পূজ্য। বৈষ্ণবগণের স্মরণমাত্রেই নিঃসন্দেহে শতলক্ষ পাপ ভস্মীভূত হয়।" ইতিহাস সমুচ্চয়ে লোমশ মুনির বাক্য হইতে পাওয়া যায়,—

তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদয় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ।
প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ।।

"বিষ্ণুর প্রসাদহেতু বৈষ্ণবগণকে প্রসন্ন করিবে, তাহাদ্বারাই বিষ্ণুর প্রসাদ পাইবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

বৈষ্ণবসেবাই হইল অপ্রাকৃতরাজ্যে প্রবেশের একমাত্র দ্বারস্বরূপ। বৈষ্ণবের সেবাপূজা ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের আর দ্বিতীয় কোন রাস্তা নাই। "ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা?" যাহারা বৈকুণ্ঠবার্ত্তা-বহনকারী বৈষ্ণবগণের সেবায় উদাসীন থাকেন, তাঁহারা গৃহমেধী। স্বয়ং ভগবান্ও বৈষ্ণবের সেবা করেন। বৈষ্ণবসেবাই সকল কল্যাণের খনি। শ্রীহরির অনুগ্রহ লাভার্থে বৈষ্ণবগণের সেবাশিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

তোমা' সবা' সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এত বলি' কা'রো পা'য়ে ধরে সেই ঠাঁই।।
নিঙাড়য়ে বস্ত্র কা'রো করিয়া যতনে।
ধূতিবস্ত্র তুলি' কা'রো দেন ত' আপনে।।
কুশ, গঙ্গামৃত্তিকা কাহারো দেন করে।
সাজি বহি' কোন দিন চলে কা'রো ঘরে।।

সকল বৈষ্ণবগণ 'হায় হায়' করে।
"কি কর, কি কর?" তবু করে বিশ্বম্ভরে।।
এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপন-দাসের হয় আপনে কিঙ্কর।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৪৩-৪৭)

যেখানে ভক্ত নাই, সেখানে ভগবান্‌ও নাই। সেবককে বাদ দিয়া সেব্যের অর্থাৎ বৈষ্ণবকে বাদ দিয়া বিষ্ণুর সেবা কিরূপে হইতে পারে? ভক্ত যেমন ভগবানের সেবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত, তদ্রূপ ভগবান্‌ও ভক্তের সুখবিধানের জন্য সততই উদ্‌গ্রীব। ভক্ত এবং ভগবানের পরস্পরের প্রতি এতই ঘনিষ্ঠতা ও প্রীতি যে, একজন আর একজনকে ছাড়া একমুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্দর্শন করেন, কৃষ্ণের প্রতীতি ব্যতীত অন্য ইতর প্রতীতি তাহাদের নাই। ভক্তগণ ভগবানের সেবক, আর ভগবান্ ভক্তেরই সেবক। "ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্" ভাগবতের (১০।৮৬।৫১) শ্লোকে নিজভক্ত শ্রীশুকদেবের বাক্যের সত্যতা দেখাইয়াছেন। 'মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া" শ্লোকে (ভাঃ ১১।১১।৪৭) স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—"যাহারা কায়মনোবাক্যে নিরন্তর সাধুসেবা করেন, আমি তাহাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ করি।"

বৈষ্ণবকে উপদেশক ও নিত্যবন্ধু-জ্ঞানে মমতাবুদ্ধিতে সম্মান ও আদেশ-পালনের দ্বারা সেবা করিতে হইবে। বৈষ্ণবের শুদ্ধসত্ত্বময় হৃদয়মন্দিরে গোবিন্দের বিলাসক্ষেত্র তথা বিশ্রামস্থল।

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।। (চৈঃ চঃ আঃ ১।৬১)
তোমারে হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ।। (শ্রীল নরোত্তম)
স্বয়ং ভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছেন,—
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।। (ভাঃ ৯।৪।৬৮)

"সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। সাধুগণ যেমন আমাকে ছাড়া কিছুই জানে না, তেমনই আমিও সাধুগণ ছাড়া কিছুই জানি না।" বৈষ্ণব ভগবানের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। ভগবানের পরমপ্রিয় বড় আদরের বৈষ্ণবসেবায় ভগবান্ অধিক সন্তুষ্টি লাভ করেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

কর্ম্ম

আজকাল প্রায় সকলকেই বলিতে শুনা যায়,—কর্ম্মই ধর্ম্ম। সংসারে যাবতীয় কর্ম্ম করিয়া যাও, তাহা হইলেই সব হইল। আবার অনেক তথাকথিত ধর্ম্মপ্রচারকগণও কর্ম্মেরই বহুমানন করিয়া থাকেন। ভজন-সাধনের দিকটা যেন গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। কর্ম্ম অবশ্যই অপরিহার্য্য। কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কর্ম্মে ব্যস্ত। কিন্তু সকল কর্ম্মই সমান—ইহা কি করিয়া স্বীকার করা যায়? একটী ছুরির দ্বারা একজনকে আঘাত করিয়া প্রাণনাশরূপ কর্ম্মের দ্বারা প্রাণদণ্ড ফল পাওয়া গেল। আবার ছুরির দ্বারা ফল কাটিয়া খাওয়াইয়া রোগীর রক্ত বর্দ্ধনরূপ কর্ম্মের দ্বারা প্রশংসা লাভ হইল। সুতরাং দুইটীর ফল একরূপ, কি করিয়া বলা যাইতে পারে? "হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া"—ভগবদুদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম করা যায়, তদ্দ্বারা বন্ধন-মুক্তি হইবে এবং নিজেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম কৃত হইবে, তাহা বন্ধনের কারণ হইবে।

বাগানে ফুল ফুটিয়াছে। ফুল তোলা একটী কর্ম্ম। একটী মেয়ে যদি ফুলটী তুলিয়া নিজের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য তাহার খোঁপাতে পরে, তদ্দ্বারা তাহার মঙ্গলের কোন সম্ভবনা নাই। কিন্তু সে যদি ঐ ফুলটী তুলিয়া ভগবানের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, তখন ঐ কর্ম্মটী ভক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া মঙ্গলের কারণস্বরূপ হইয়া যায়। তজ্জন্য শাস্ত্র আমাদিগকে কর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক সাবধান বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

বিদেহরাজ মহাত্মা নিমি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। বাসুদেবের অংশে অবতীর্ণ ঋষভদেবের শতপুত্রের মধ্যে নয়জন পুত্র নবযোগেন্দ্র সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ নিমি তাঁহাদের নিকট বহু প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতে গিয়া নবযোগেন্দ্রের অন্যতম আবির্হোত্র বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ।।" (ভাঃ ১১।৩।৪৩)

অর্থাৎ—কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম—এই তিনটীর স্বরূপই একমাত্র বেদশাস্ত্রগম্য। পরন্তু লোকমুখে জ্ঞাতব্য নহে। উক্ত বেদশাস্ত্র ঈশ্বরজাত অর্থাৎ অপৌরুষেয় বলিয়া পণ্ডিতগণও তদ্বিষয়ে মোহিত হইয়া থাকেন।

কর্ম্ম—শাস্ত্রবিহিত আচরণের নামই কর্ম্ম। অকর্ম্ম—শাস্ত্রবিহিত সদাচারের পালন না করাই অকর্ম্ম। বিকর্ম্ম—শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণই বিকর্ম্ম অর্থাৎ পাপাচরণ। কর্ম্ম লৌকিক বিচারের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না। বেদ বা শাস্ত্র জীবগণের কর্ম্ম করিবার যে পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুরূপ কর্ম্মদ্বারাই সুখ-শান্তিলাভের আশা পূরণ হইতে পারে। বেদ বা শাস্ত্রসমূহ কর্ম্মী-সম্প্রদায়ের দ্বারা বা মনুষ্যের দ্বারা প্রণীত

নহে। "সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্"। উহাতে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা নাই। বেদানুগ অথবা শাস্ত্রানুগ কর্ম্মানুশীলনের দ্বারা জীবের দুঃখ-দুর্দ্দশা বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং প্রকৃত সুখানুভূতি লাভ হইয়া থাকে।

"পরোক্ষাবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা।।" (ভাঃ ১১।৩।৪৪)

পরোক্ষবাদ (অর্থাৎ একপ্রকারে স্থিত বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব গোপন করিবার জন্য অন্যপ্রকারে তাহার বর্ণন) বেদের একটী স্বভাব। সুতরাং পিতা যেরূপ অজ্ঞ সন্তানকে লাড্ডুর প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, তদ্রূপ বেদও অজ্ঞ জীবের নিকট স্বর্গাদির লোভ দেখাইয়া কর্ম্মনিবৃত্তির জন্যই বিহিত কর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

মহারাজ নিমিকে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীপ্রবুদ্ধ কর্ম্ম সম্বন্ধে একটী সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন,—

"কর্ম্মণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিনাং নৃণাম্।।" (ভাঃ ১১।৩।১৮)

শ্রীপ্রবুদ্ধ বলিলেন,—হে রাজন্! জগতে মানবগণ দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির জন্য একত্র হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও ফলবিষয়ে সর্ব্বদাই বিপরীতভাব ঘটিয়া থাকে—ইহা নিপুণভাবে বিচার করিবে।

আমরা কর্ম্মফলবাধ্য স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন জীবগণ কর্ম্মকাণ্ডপ্রবণ হইয়া নানাপ্রকার কর্ম্মে লিপ্ত হই বটে, তাহাতে কোনও লাভই হয় না। সারাদিন নিয়তই প্রচুর পরিশ্রম করিয়া যে-সমস্ত কর্ম্মের আবাহন করি, তাহা ফলতঃ দুঃখকরই হইয়া থাকে। মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা সকলে আর্ত্তি বা দুঃখপ্রদ গৃহ, পুত্র, স্বজন, পশু প্রভৃতি অনিত্যবস্তু লাভের জন্য প্রাণপাত করিয়া যে কর্ম্ম সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি পরিণামে কিন্তু কোনটাই সুখপ্রদ হয় না। আমরা ইন্দ্রিয়সুখ অন্বেষণরূপ কর্ম্মে ব্যস্ত হইয়া ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে ধাবমান হইতেছি। এইভাবে কর্ম্মপথে বিচরণ করিতে করিতে যখন আমাদের কর্ম্মকাণ্ডের নশ্বরতা উপলব্ধির বিষয় হইবে তখন আমরা সদ্গুরু পদাশ্রয় লাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম যে হরিভজন তাহা উপলব্ধি করিব এবং ভজনময় জীবন যাপন করিয়া অমৃতত্ব লাভে সমর্থবান্ হইব।

বেদব্যাসনন্দন জন্মযোগী শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন,—

"কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো নহ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্।।" (ভাঃ ৬।১।১১)

পাপাচরণসমূহ কর্ম্ম। আবার চান্দ্রায়নাদি প্রায়শ্চিত্তসমূহও কর্ম্ম। অতএব কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের সমূলে উচ্ছেদ আশা করা যায় না।

গীতায় বলিয়াছেন,—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।" (গীতা ২।৪৮)

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিযোগযুক্ত হইয়া স্বধর্ম্ম বিহিত কর্ম্ম কর। কর্ম্মফলের সিদ্ধিও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানই যোগ বলিয়া কথিত হয়।

ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে যে,—যদি ফলপ্রাপ্তির আশায় কর্ম্ম করণীয় না হয়, তাহা হইলে বহু ক্লেশসাধ্য কর্ম্ম-সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা কি? অর্জ্জুনের এবম্বিধ আশঙ্কা অনুমান করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"হে ধনঞ্জয়! কর্ম্মানুষ্ঠান আয়াসাসাধ্য হইলেও কেবল পরমেশ্বরকে লক্ষ্য রাখিয়া ও তাঁহারই উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম অবশ্য করণীয় এবং অনুষ্ঠেয়মান কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধিজনিত জ্ঞানপ্রাপ্তি রূপ সিদ্ধিলাভ বা জ্ঞান অপ্রাপ্তিজনিত অসিদ্ধিলাভ—যাহাই সংঘটিত হউক, উভয়ই তুল্যজ্ঞান করিয়া আসক্তি পরিশূন্য হৃদয়ে কর্ম্ম সম্পাদন কর—এইরূপ সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানই যোগ। অর্থাৎ যাবতীয় কর্ম্ম দৃষ্ট অদৃষ্ট সর্ব্বপ্রকার ফলকামনা বিবর্জ্জিতভাবে অবশ্য সম্পাদনীয়।

আবার ভগবান্ বলিলেন,—

"দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়ঃ।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।।" (গীতা ২।৪৯)

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ হইতে অতি নিকৃষ্ট যে কাম্যকর্ম্ম তাহা দূর করিয়া আত্ম যাথাত্ম্য সাধক কর্ম্মযোগলক্ষণা বুদ্ধিকে আশ্রয় কর। যেহেতু ফলকামনায় যাঁহারা কাম্যকর্ম্ম করেন, তাঁহারা কৃপণ অর্থাৎ জন্মকর্ম্মপ্রবাহ পরবশ ও দীন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যে-সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহা ভিন্ন যাবতীয় ফলকামনা পরিপূর্ণ কর্ম্ম যৎপরোনাস্তি নিকৃষ্ট। কারণ তৎসমস্ত জন্ম-মরণরূপ সংসার বন্ধনের হেতুভূত। অতএব তুমি তাদৃশ হীন পথের পথিক না হইয়া ভগবৎ বিষয়ক জ্ঞানমার্গে বিচরণ কর এবং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। যাহারা ফলকাম—তাহারা নিকৃষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। এই পৃথিবীতে তাহারা নিতান্ত দীন।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—হে গার্গী! এই অক্ষর পরব্রহ্মকে না জানিয়া যে ব্যক্তি এইলোক হইতে প্রস্থান করে, সেই কৃপণ। তুমি কর্ম্মদোষে তাহাদের অনুগামী হইয়া তাদৃশ নিন্দনীয় পদটী গ্রহণ করিও না। সকল অনর্থের নিবর্ত্তক, সর্ব্বশান্তিপ্রদ আত্মজ্ঞানের উৎপাদক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তুমি নিরত হও।

কৃপণ জনগণ অতি অকিঞ্চিৎকর সুখের লোভে দানাদি সৎকর্ম্ম সাধনজনিত

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৮ ; ১৬ নভেম্বর, ২০০১

পরমানন্দ উপভোগার্থ ধন ব্যয় না করিয়া প্রতিনিয়ত আত্মবঞ্চনা করে, তদ্রূপ জ্ঞানহীন মানবগণ নিরতিশয় ক্লেশসহকারে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সহিত অতি তুচ্ছ ফলকামনা বিমিশ্রিত করিয়া পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির উপায় রুদ্ধ করিয়া দেয়। এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়েই এইস্থলে কৃপণ-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে।। (চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৬৩)

যে কার্য্য ভগবৎ তোষণের উদ্দেশ্যে সাধিত হয়, তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম। "তৎ কর্ম্ম হরিতোষণং যৎ।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও দেখা যায়,—

তাহারে সে বলি' ধর্ম্ম, কর্ম্ম সদাচার।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার।। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৪)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সকলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমণ করে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়।।"

অতএব,—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি' মজে।।"

সুতরাং ভক্তগণ ভগবানের উদ্দেশ্যেই যাবতীয় কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের আচরিত কর্ম্মসকল কর্ম্ম মীমাংসকের ন্যায় নশ্বর অপূর্ব্বতা লাভ করে না। (অপূর্ব্ব অর্থাৎ কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট)।

এই বিশ্বের ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, সাধু অসাধু, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেরই যোগক্ষেম সেই বিশ্বেশ্বর ভগবান্ বহন করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপা না হইলে কাহারও জীবন রক্ষিত হয় না এবং কেহই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয় না। সকলেরই শরীর ধারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয় সেই সর্ব্বেশ্বরের অধীন। তবে ভগবান্ কেন গীতায় বলিলেন,—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।" (গীতা ৯।২২)

অর্থাৎ তিনি কেবল একান্ত ভগবন্নিষ্ঠগণেরই যোগ ক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ) বহন করিয়া থাকেন। ইহার উত্তর খুবই সহজ। অন্যান্য সকলে প্রযত্ন সমুৎপাদন করাইয়া তদ্দ্বারা তাহাদের প্রয়োজন নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

নিত্য অভিযুক্তগণের প্রযত্ন মাত্রা না থাকিলেও তাহার সর্ব্ব অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে—ইহাই বিশেষ। গৃহস্থ যেমন অকাতরে কুটুম্ব পোষণের ভার গ্রহণ করে, পুরুষ যেমন প্রীতমনে তাহার প্রণয়িনীর পরিপালন করিয়া থাকে, ভগবান্ বলিলেন,—আমিও তদ্রূপ আমার ভক্তগণের অন্নাদি আহরণ ও পরিপালন নির্ব্বাহিত করি। যদি বলা যায়—নিজ অভীষ্টদেবের উপর নিজের প্রতিপালনাদির ভার অর্পণ করায় সেই ভক্তগণের প্রেমশূন্যতা প্রকাশিত হইতেছে, তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, ভক্তগণ তাঁহার উপর কোন ভার অর্পণ করেন না। তিনি স্বেচ্ছায় তাহা গ্রহণ করেন। ভক্তগণ তাঁহাদের সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যু সর্ব্ববিষয়েই উদাসীন। ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার বাৎসল্যগুণহেতু ভক্তের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে ভক্তগণের কোনই অপরাধ নাই। যাঁহার ইচ্ছামাত্র সকল বস্তুর উদ্ভব হয়, যাঁহার বাসনায় জীবের জীবন রক্ষিত হয়, যাঁহারা কৃপায় সৃষ্টিকার্য্য সংসাধিত হয়, নিজভক্তগণের প্রতিপালনের ভার তাঁহার পক্ষে কখনই ভার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। তাঁহার পক্ষে এই কার্য্য অত্যন্ত প্রীতিপ্রদরূপে গৃহীত ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যে যে জন চিন্তে' মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভিক্ষা দেঙ মুঞি মাথায় বহিয়া।।
যেই মোরে চিন্তে', নাহি যায় কা'রো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তা'রে।।"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৫৭-৫৮)

সুতরাং শাস্ত্রবিহিত ভগবদুপাসনারূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই সমস্ত অশুভের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিলে সংসাররূপ দুষ্পার সাগর হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া জীবন সুখময়, শান্তিময় হইয়া উঠিবে,—ইহাই শাস্ত্রসম্মত ও মহাজনানুমোদিত।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা গাহিয়া উপসংহার করিলাম,—

'অন্য অভিলাষ ছাড়ি', জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি',
কায়-মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ।।
যোগী-ন্যাসী-কর্ম্মী-জ্ঞানী, অন্যদেব পূজক ধ্যানী,
ইহলোক দূরে পরিহরি।
কর্ম্ম ধর্ম্ম দুঃখ শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী।।"

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৮ ; ১৬ নভেম্বর, ২০০১

গৌড়ীয়

'গৌড়ীয়'-শব্দটী বহুল প্রচলিত। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়, গৌড়ীয় মঠ, গৌড়ীয়-পত্রিকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এবং ভক্তি-শাস্ত্রে বিভিন্ন স্থানে 'গৌড়ীয়'-শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে।

গৌড়ীয়-সম্প্রদায় কাহারা, গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের উপাস্য কি, শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে কেমনভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জানিবার কৌতূহলবশতঃ এই প্রবন্ধের অবতারণা।

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়—

"এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়ারে করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এ তিনের চরণ বন্দোঁ তিনে মোর নাথ।।" (চৈঃ চঃ আঃ ১।১৯)

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তত্ত্বত্রয় শ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট। এই তত্ত্বত্রয়ের অধিদেব যথাক্রমে শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ। এই তিন অধিদেবের সেবাপ্রকাশ করেন যথাক্রমে শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল মধু পণ্ডিত। গোস্বামিত্রয় যেহেতু গৌড়দেশবাসী সেইহেতু তাঁহারা গৌড়ীয়া বলিয়া অভিহিত।

উক্ত পয়ারের অনুভাষ্যে উল্লেখ আছে, "** 'গৌড়ীয়'-শব্দে গৌড়দেশীয়। ** উৎকলদেশীয় ভক্তগণকে যেমন উড়িয়াভক্ত এবং দ্রাবিড়দেশীয় ভক্তগণকে যেমন দ্রাবিড়ীয় ভক্ত বলা হয়, তদ্রূপ বঙ্গদেশীয়গণও গৌড়ীয়-ভক্ত বলিয়া সংজ্ঞিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যদিও শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি মাধ্বমতস্থ তত্ত্ববাদশাখাবলম্বী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দ্রাবিড়ীয়। তজ্জন্য শ্রীগৌরপদাশ্রিত সম্প্রদায়ে গৌড়ীয় আখ্যা বিশেষতঃ শ্রীআনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যের অপর নাম শ্রীগৌড়-পূর্ণানন্দ। মাধ্ব-গৌড়ীয়-শব্দে তজ্জন্য শ্রীগৌরভক্তগণ সংজ্ঞিত হইতেও পারেন।"

এখানে উল্লেখ থাকে যে, গৌড়দেশ বলিতে বঙ্গদেশকেই বুঝান হইয়া থাকে। সুতরাং বঙ্গদেশের যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের পদাশ্রিত তাঁহারাই গৌড়ীয়।

পুরাকালে বঙ্গদেশবাসীসহ আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণই গৌড়ীয়-পদবাচ্য। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পরে তদীয় ভক্তগণই গৌড়ীয়। কিন্তু গৌড়+ঈয় (নিবাসার্থে)=গৌড়ীয় অর্থাৎ গৌড়নিবাসী। শ্রীচৈতন্যের গৌড়নিবাসী অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসী ভক্তগণই বর্ত্তমানে গৌড়ীয় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

"মাধবেন্দ্র-কৃপাতে গৌড়িয়া বিপ্রদ্বয়।
বৈরাগ্যে প্রবল প্রেমভক্তি রসময়।।" (ব্রজপরিক্রমা)

এক্ষেত্রে 'গৌড়িয়া'-শব্দে গৌড়বাসীকে বুঝান হইয়াছে। গৌড়+ইয়া (নিবাসার্থে)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৮ ; ১৬ নভেম্বর, ২০০১

=গৌড়িয়া অর্থাৎ গৌড়বাসী। শব্দটীর বানান দুইপ্রকার হইয়া থাকে—(১) গৌড়ীয়া ও (২) গৌড়িয়া। উভয়প্রকার একই অর্থবহ অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসী।

তবে সেই পাঠান চারিজনেরে বাঁধিল।
কাটিতে চাহে, গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিল।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১৬৬)

পাঠান কহে,—তুমি পশ্চিমা মাথুর দুইজন।
'গৌড়িয়া' ঠক্ এই কাঁপে দুইজন।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১৭২)

চারিজন ছিলেন—(১) কৃষ্ণদাস রাজপুত, (২) মাধবেন্দ্রপুরীরর শিষ্য 'সানৌড়িয়া' ব্রাহ্মণ, (৩) বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও (৪) বলভদ্রের সঙ্গী ব্রাহ্মণ। পাঠান ইঁহাদের মধ্যে বলভদ্র ও তাঁহার সঙ্গী ব্রাহ্মণকে গৌড়িয়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। কারণ ইঁহারা গৌড়দেশবাসী।

গৌড়ীয়, উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ ।
সবার হইল রূপ স্নেহের ভাজন।। (চৈঃ চঃ অঃ ১।৫৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর যত গৌড়ীয় ও উড়িয়াভক্ত নীলাচলে ছিলেন,তাঁহাদের সকলেরই স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন শ্রীরূপ। এক্ষেত্রে গৌড়ীয়া ও উড়িয়া ভক্তগণকে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত পঞ্চগৌড়দেশ যথা,—সারস্বত, কান্যকুব্জ, মধ্যগৌড় (লক্ষ্মণাবতী), মৈথিল ও উৎকল প্রদেশ। কিন্তু একমাত্র মধ্যগৌড়ের (বঙ্গদেশের প্রাচীন নাম) ভক্তগণই গৌড়ীয় পদবাচ্য।

গৌড়ীয়ের সাধ্যবস্তু কি?—

গৌড়ীয়ের সাধ্যবস্তু কি তাহা নির্ণয়ে শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের নিম্নলিখিত শ্লোকাংশ বিশেষভাবে স্মরণীয়।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।"

ব্রজের তনয় শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্যবস্তু। শ্রীবৃন্দাবন তাঁহার ধাম। ব্রজবধূগণ রাগমার্গে তাঁহার উপাসনা করেন। এই উপাসনাই পরম রমণীয়া।

এই উপাসনাই গৌড়ীয়ের উপাসনা। ব্রজবধূগণ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, সেই আদর্শ গৌড়ীয়ের আদর্শ। কিন্তু ব্রজের তনয় শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একমাত্র সেব্যবস্তু হইলেও শ্রীরাধার সেবা ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণের সেবা হয় না। কারণ, ব্রজললনাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধা। শ্রীরাধার আরাধনাই সর্ব্বোত্তম। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিবিধাননিমিত্ত তাঁহার সকল কার্য্যই আরাধনা।

কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূরণরূপ কৃষ্ণারাধনহেতু শ্রীমতী রাধারাণী 'রাধা' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিতা। পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রেমসুখ অনুভব করেন একমাত্র শ্রীরাধা। কারণ তিনি মাদনাখ্য মহাভাবময়ী।

"তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সৌন্দর্য্য, বদনের হাস্য, দেহের যাবতীয় অলঙ্কার এবং প্রেমকৌটিল্যাদি সকলই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়ক। শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত করিবার জন্যই তিনি দেহের প্রতি যত্ন গ্রহণ করেন, বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্য ও মনোরম সজ্জায় সজ্জিত হন।"

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র পরমাণ।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৯৬)

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, কিন্তু শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের অস্তিত্ব আদৌ সম্ভব নয়। মূলশক্তি শ্রীরাধা। পূর্ণশক্তি শ্রীরাধা। সুতরাং শ্রীরাধা ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশক্তি-মানত্ব প্রমাণ করা যাইবে না। আর এই কারণেই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন।

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৯৮)

স্বরূপতঃ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একবস্তু, কেবলমাত্র লীলারস আস্বাদনের জন্য দুইরূপ।

কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়কায়।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৭১)

শ্রীরাধার চিত্ত, শ্রীরাধার ইন্দ্রিয়, শ্রীরাধার শরীর কৃষ্ণপ্রেমদ্বারা পরিভাবিত। শ্রীকৃষ্ণের নিজশক্তি—শ্রীরাধা। পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তি শ্রীরাধা ব্যতিরেকে কোন ক্রীড়া করিতে পারেন না, অর্থাৎ শ্রীরাধা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের কোন লীলা সম্ভব নয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে।
সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্য রতনে।।

কৃষ্ণপদ অমূল্য রতন। এই অমূল্য রতন লাভ করিতে হইলে পরম যত্নে শ্রীরাধার পদাশ্রয় করিতে হইবে।

আবার,—

রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেলা।।
আতপ রহিত সূরয নাহি জানি।।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি।।
কেবল মাধব পূজয়ে সো অজ্ঞানী।
রাধা অনাদর করই অভিমানী।।

কবঁহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরসরঙ্গ।।
রাধিকা-দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান।।

এই কারণেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র আরাধ্যবস্তু হইলেও শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রীতি অধিক। "** গৌড়ীয় বৈষ্ণব আমরা অনুকূলার কৃষ্ণ অর্থাৎ রাধার কৃষ্ণের উপাসক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধারই অধিক পক্ষপাতী।" (শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত)।

শ্রীরাধার আরাধনা ব্যতিরেকে যখন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা আদৌ সম্ভব নয়, তখন শ্রীরাধাও গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আরাধ্য বস্তু। তজ্জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের অর্থাৎ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের উপাসক।

ব্রজসখীগণ সর্ব্বদাই রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দর্শনের অভিলাষ করিতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

পঞ্চপ্রদীপে ধরি' কর্পূরবাতি।
ললিতা-সুন্দরী করে যুগল আরতি।।

আবার,—

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন।
আরতি করয়ে ললিতাদি সখীগণ।।

ফলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণও সেই ভাবে ভাবিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির নিত্য পূজা করিয়া থাকেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

হরিনাম মহামন্ত্রে রাধাকৃষ্ণের যুগল ভজন। সেই কারণেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নির্ব্বন্ধসহকারে হরিনাম মহামন্ত্র নিত্য জপপূর্ব্বক রাধাকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীভবতারণ দাসাধিকারী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীপত্রিকার আজীবন সদস্য গ্রহণ করা হইতেছে। যাঁহারা আজীবন সদস্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ১০০১ (এক হাজার এক) টাকা এককালীন অথবা এক বৎসরে চারিটী সমান কিস্তিতে দিয়া সদস্য হইতে পারেন। এ ব্যাপারে কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত যোগাযোগ করুন।

ধাম-বৈশিষ্ট্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০৬ পৃষ্ঠার পর]

[শ্রীগৌড়ীয় মঠে বাসই—শ্রীধাম বাস]

শ্রীগৌড়ীয় মঠে বাসই—ধাম-বাস-সম।
অনিত্য জগতে মঠ বৈকুণ্ঠ-নিকেতন।। ১।।
কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগিগণের মঠ আছে যত।
শুদ্ধভক্তি-পথ হইতে তাহারা বিচ্যুত।। ২।।
"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ'-শ্লোকে উল্লিখিত।
একমাত্র ভক্তিতেই শ্রীহরি বশীভূত।। ৩।।
"একয়া ভক্ত্যা'-শব্দেই প্রমাণিত হয়।—
জ্ঞান-যোগাদির অপেক্ষা ভক্তি না করয়।। ৪।।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ শুদ্ধভক্তির প্রতিষ্ঠান।
অন্যাভিলাষীর সেথা' নাহি কভু স্থান।। ৫।।
হরিসেবাময় মঠ—সাক্ষাৎ ব্রজবন।
গুরু-নিষ্ঠ ভক্ত সেথা' রহে অনুক্ষণ।। ৬।।
মঠবাসিদের নাহি পুরুষাভিমান।
গুরু-বৈষ্ণব-দাস হেন করে অভিমান।। ৭।।
গৌর-বাণীতে মুখরিত মঠ অনুক্ষণ।
বৈকুণ্ঠ-সম্পদ্ সেথা হয় দরশন।। ৮।।
গুণময় বিশ্বে যেথা গুণাতীত স্থান।
সেই স্থানে শ্রীমঠের হয় অবস্থান।। ৯।।
"যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।"
তাই মঠে নাহি মায়ার প্রবেশাধিকার।। ১০।।
"মন্নিকেতন্তু নির্গুণং'—কহেন ভগবান্।
অতএব মঠে হরির নিত্য বাসস্থান।। ১১।।
ধাম সদা গুণাতীত, গুণময় জগতে।
"ব্রজ ছাড়া কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে।। ১২।।
"কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা"-শাস্ত্র-আজ্ঞা হয়।
ব্রজবাসীদের কৃষ্ণে সহজ প্রীতি রয়।। ১৩।।
কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিগণ কৃষ্ণে নাহি পায়।
কৃষ্ণ-সাথে তাহাদের সম্বন্ধ নাহি ভায়।। ১৪।।

ভক্তগণ চতুর্ব্বর্গ ত্যজে তৃণ-সম।
পঞ্চবিধ মুক্তি তা'রা করে না গ্রহণ।। ১৫।।
কৃষ্ণসেবা জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম।
হেন শিক্ষা প্রদানিলা প্রভু শ্রীচৈতন্য।। ১৬।।
কৃষ্ণ-সেবায় নাহি নিজেন্দ্রিয় তর্পণ।
তাহাতে কেবল সেব্যের সুখ-চিন্তন।। ১৭।।
পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম হয়।
সেই প্রেমের বশ কৃষ্ণ—'ভাগবতে' কয়।। ১৮।।
নিষ্কিঞ্চন ভক্তের নিরুপাধি প্রেম-রস।
আকর্ষিয়া কৃষ্ণচন্দ্রে করে প্রেমে বশ।। ১৯।।
'শ্রীবেদান্ত সমিতি'র মঠবাসিগণ।
গৌরের আচার-বিচার মানে অনুক্ষণ।। ২০।।
প্রতি মঠে 'শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী'।
ভক্ত-প্রাণ-ধনরূপে রহে বিগ্রহ ধরি'।। ২১।।
শ্রীমঠ অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার।
'অনুকূল কৃষ্ণ' অর্থে কৃষ্ণ শ্রীরাধার।। ২২।।
অনুকূল কৃষ্ণেরে কভু মাপা নাহি যায়।
আশ্রয়-বিগ্রহ-সেবায় তাঁ'রে জানা যায়।। ২৩।।
আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্যে কৃষ্ণানুশীলন।
গৌড়ীয়গণের হেন ভজন-কীর্ত্তন।। ২৪।।
ভক্তিরস নিত্যামৃত,—পূর্ণজ্ঞানময়।
রসিকশেখরের ইথে পূর্ণ সেবা হয়।। ২৫।।
জড়রস অনিত্য ও বিনাশী সর্ব্বথা।
সাবিত্রী-সত্যবানাদি জড় রস যথা।। ২৬।।
জড় রস ছায়া মাত্র, কভু বস্তু নয়।
সেব্যবস্তুর রস জ্ঞান রসিকের হয়।। ২৭।।
অগৌড়ীয়দের গৌড়ীয়গণে আনিবারে।
মঠ-মন্দির নির্ম্মাণের প্রয়োজন করে।। ২৮।।
মঠ-মন্দিরাদি যদি না হইত স্থাপন।
বিশ্ববাসী ভুলিত বাচ্য-বাচক-সেবন।। ২৯।।
শ্রীগুরু-দয়িত বিষয়-বিগ্রহ-সেবন।
গৌড়ীয় ভজনস্থলীতে হয় সর্ব্বক্ষণ।। ৩০।।

'শ্রীবেদান্ত সমিতি'তে গোষ্ঠানন্দিগণ।
গুরু-বৈষ্ণব-সেবারত রহে অনুক্ষণ।। ৩১।।
ভোগোন্মুখ স্বতন্ত্রতা যা'দের হৃদে রয়।
মঠ-বাস তা'দের কাছে হয় অভিনয়।। ৩২।।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সদা আজ্ঞানুসরণ।
নিষ্কপট হইবার মহারসায়ন।। ৩৩।।
মঠের উদ্দেশ্য শ্রীগোবর্দ্ধন-সেবন।
ব্রজেও গোবর্দ্ধন-সেবা করে ব্রজজন।। ৩৪।।
ব্রজে যিনি শ্রীগোবর্দ্ধনার্চ্চনে ব্রতী রয়।
শ্রীমঠের স্বরূপ তা'র অনুভূত হয়।। ৩৫।।
রূপানুগ গুর্ব্বানুগত্যে মঠবাসিগণ।
ব্রজ-পথে চলার শিক্ষা করিছে গ্রহণ।। ৩৬।।
গৌড়ীয় মঠ ব্রজধাম—অপ্রাকৃত স্থান।
মঠবাসই ধাম বাস—ইহাতে প্রমাণ।। ৩৭।।

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

গৌড়ীয় মঠ কি করেন?

গৌড়ীয়েশ্বরের কৃপায় গৌড়ীয় মঠের কথা আজ সমগ্র গৌড়দেশে কাহারও অবিদিত নাই—গৌড়দেশ কেন, নৈমিষারণ্য হইতে আরম্ভ করিয়া অযোধ্যা, প্রয়াগ, কাশী, অপরদিকে শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা আবার দাক্ষিণাত্য ও উড়িষ্যা অঞ্চলের সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটভূমি শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপধামে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের কথা সুপ্রচারিত। গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা বিস্তারিত।

'সত্য' দুইপ্রকারে প্রচারিত হয়—অন্বয়ভাবে ও ব্যতিরেকভাবে। কেবল অন্বয়ভাবে 'সত্য' প্রচারিত হইতে পারে না। ব্যতিরেকভাবে প্রচার অন্বয়মুখে প্রচার অপেক্ষা জগতে অধিকতর উজ্জ্বলভাবে সত্যের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। সত্যযুগে প্রহ্লাদ অপেক্ষা হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবকে ব্যতিরেকভাবে প্রচার করিয়া নৃসিংহের মাহাত্ম্য জগতে অধিকতরভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন ; ত্রেতাযুগে হনুমান অপেক্ষা রাবণ শ্রীরামচন্দ্রকে জগতের নিকট অধিকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন ; দ্বাপরে পাণ্ডব ও যাদবাদি ভক্ত অপেক্ষা কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ব্যতিরেকভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে অধিক প্রচার

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৮ ; ১৬ নভেম্বর, ২০০১

করিয়াছিলেন। কলিযুগে জগাই-মাধাই, চাঁদকাজী, মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী, বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী রামচন্দ্র খান, রামচন্দ্রপুরী এবং পরবর্ত্তিকালে আনুকরণিক ভিন্ন ভিন্ন অপসম্প্রদায় গৌর-নিত্যানন্দকে গৌরভক্তগণ অপেক্ষাও ব্যতিরেকভাবে জগতের নিকট অধিকরূপে প্রচার করিয়াছেন। চিরকালই 'সত্য' এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে প্রচারিত। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সত্যকথাও জগতে এইরূপভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

এখন জিজ্ঞাস্য, 'গৌড়ীয় মঠ' কি করেন? গৌড়ীয় মঠ কি জগতের সহস্র সহস্র সম্প্রদায়ের মতই আর একটী মণ্ডলী বিশেষ? অথবা 'গৌড়ীয় মঠ' কি জগতের অন্যান্য হিতকারী মণ্ডলীর অন্যতম? কিম্বা 'গৌড়ীয় মঠ' কি জগতের অন্যান্য অহিতকারী সঙ্ঘের অন্যতম? 'গৌড়ীয় মঠ' জগতের কোন্ হিতকর কার্য্য করেন? 'গৌড়ীয় মঠ' কি মাতার ন্যায় স্নেহশীল, পিতার ন্যায় পরিপালক, ভ্রাতার ন্যায় সাহায্যকারী? 'গৌড়ীয় মঠ' জগতের কি কল্যাণসাধন করেন, সমাজের কি হিতকামনা করেন, মানবজাতির কতটুকু উপকার করেন যে, জগৎ, সভ্যসমাজ বা মানবকুল তাঁহার কথা শুনিবেন?—এরূপ নানা প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হইতে পারে।

'গৌড়ীয় মঠ' সহস্র সম্প্রদায়ের মত আর একটী মণ্ডলী নহেন। গৌড়ীয় মঠ জগতের অন্যান্য হিতকামী বা অহিতকামী মণ্ডলীর ন্যায় হিতকামী বা অহিতকামী নহেন। 'গৌড়ীয় মঠ' জগতের ভোগযুক্ত ধারণার হিতকর বা অহিতকর কার্য্য করেন না। 'গৌড়ীয় মঠ' জগতের মাতার ন্যায় স্নেহশীল বা নৃশংস, জগতের পিতার ন্যায় পরিপালক বা বিনাশক, জগতের ভ্রাতার ন্যায় সাহায্যকারী বা অনিষ্টকারী নহেন। তবে গৌড়ীয় মঠ কি যে জগৎ তাঁহারই কথা শুনিবে?

গৌড়ীয় মঠের সহিত সমগ্রজগতের কোনও অমিল নাই—অমিল মাত্র একটী কথায়। গৌড়ীয় মঠ বলেন,—গৌড়ীয় মঠের সহিত সমগ্র জগতের মিলও একটী কথায়—**অধোক্ষজের সেবা সমগ্র জীবের ধর্ম্ম**। জগতের অধিকাংশ লোক বলেন অক্ষজের সেবাই জীবমাত্রের ধর্ম্ম। অন্ততঃ মুখে না বলিলে কার্য্যকালে সর্ব্বক্ষণ তাহাই করিয়া বলেন। গৌড়ীয় মঠ বলেন, যাহা সাধ্য, তাহাই একমাত্র সাধন হওয়া উচিত। জগতের অধিকাংশ লোকের মতেই সাধ্য ও সাধন পরস্পর ভিন্ন। গৌড়ীয় মঠ বলেন,—'একতা', 'বিশ্বপ্রেমিকতা' প্রভৃতি কথা দেহ ও মনোধর্ম্মে আসক্ত থাকাকালে কেবল 'আকাশকুসুম' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইলেই ঐক্যতান (Harmony) সম্ভব।

এই পার্থক্যটি খুলিয়া বলি—অধোক্ষজের সেবা বলিতে অতীন্দ্রিয় ভগবানের সেবা। দেহ বা মনের তর্পণ বা তর্পণ-বিরোধ যাহাতে হয়, তাহা অধোক্ষজের সেবা নহে, তাহা অক্ষজের সেবা। মুক্তবায়ু সেবনদ্বারা দেহের তর্পণ হয়, মুক্ত আকাশের

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৮ ; ১৬ নভেম্বর, ২০০১

দিকে তাকাইয়া প্রমাথি মনকে মুক্তপ্রগ্রহ অশ্বের ন্যায় যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দিলে—প্রকৃতির সুষমায় মনকে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে দিলে—কাব্যকাননের বিচিত্র কুসুমরাজির মকরন্দ যথেচ্ছ লুটিতে দিলে মনের তর্পণ হয়। তদ্বিপরীত নির্ব্বিশেষভাব তর্পণদ্বেষ। উহা অধোক্ষজের সেবা নহে—অক্ষজের সেবা।

জগতের অধিকাংশ লোকই প্রত্যক্ষবাদী হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রত্যক্ষটা দেখিয়াও দেখিতে পায় না। জানিয়াও কাজের বেলা ভুলিয়া যায়। চার্ব্বাকের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রত্যক্ষবাদীও সেই বড় 'প্রত্যক্ষ'টাকে প্রত্যক্ষ করিয়াও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। সেই বড় প্রত্যক্ষটার নাম—'মৃত্যু'।

এই বড় প্রত্যক্ষটার কথা যদি আমাদের মনে থাকে, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই অমৃতের জন্য লালায়িত হই। শ্রুতি বলেন,—আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র—অমৃতের অধিকারী,—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ (শ্বেতাশ্বতর ২।৫)।

জগতে এই অমৃত পাইবার দুইপ্রকার চেষ্টা দেখা যায়। ঐতিহাসিকযুগের রাজকুমারগণের ন্যায় অমৃতের পুত্রাভিমানী কেহ কেহ পিতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পিতৃ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবার চেষ্টা করে, আবার সৎপুত্রগণ স্নেহশীল বৎসল পিতার উত্তরাধিকারী হইবার জন্য পিতার নিত্যসেবাই তাঁহাদের 'সাধ্য' ও 'সাধন' জ্ঞান করেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ শেষোক্ত প্রণালীকেই সুষ্ঠু সনাতন প্রণালী বলিয়া জানেন। সুষ্ঠু কেন? যেহেতু—

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্।।" (ভাঃ ১।২।২৭)

—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্রাকৃত কথা-শ্রবণকারী মানবের হৃদয়স্থ হইয়া হৃদয়ের পাপবাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন। এই পাপবীজ বা পাপবাসনা বা অবিদ্যাই জীবের সংসারের কারণ।

এই পন্থা 'সনাতন' কেন? যেহেতু—

"ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্।" (ভাঃ ১।২।২৫)

—'অগ্রে' বলিতে প্রাগ্‌বন্ধ যুগেরও পূর্ব্বে মুনিগণ (মহাজনগণ) এই অধোক্ষজ-ভগবানকে এইরূপভাবে ভজনা করিয়াছিলেন।

যাহাতে 'আনন্দ' অর্থাৎ অমঙ্গল উদয় না করায়, সেইরূপ দয়ার নাম "অমন্দোদয়া দয়া।" উদাহরণ—রোগীকে তেঁতুল খাইতে দিলে বা মাতালকে শৌণ্ডিকালয়ে যাইতে দিলে দয়া করা হয় বটে, কিন্তু উহাতে ভবিষ্যৎ দয়াপ্রাপ্ত ব্যক্তির 'অমন্দ' বা 'অমঙ্গল' উদয় করাইয়া থাকে। রোগীকে তাহার ইচ্ছার বা রুচির প্রতিকূলে চিকিৎসা করিলে, মাতালকে অসৎকার্য্য হইতে রক্ষা করিলে 'অমন্দোদয়া দয়া' করা হয়। বন্যা দূর করা,

দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা, রোগী শুশ্রূষা করা বা কাহারও মনস্তুষ্টি করা বা কাহাকেও উদ্বেগ দেওয়া কিম্বা কাহারও চেতনার বৃত্তি স্তব্ধ করিয়া দেওয়া—ইহারা সকলেই 'মন্দোদয়া দয়া'র উদাহরণ। মানুষ স্বস্থানে না আসা পর্য্যন্ত ইহা বুঝিতে পারেন না। ঐ সকল কার্য্যদ্বারা প্রকৃতপক্ষে জীবের মঙ্গল হয় না। ক্লেশের মূলচ্ছেদনের নামই—পরোপকার। ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ পচা ঘা (Gangrene) রাখিয়া চিকিৎসা করিলে রোগীর উপকার করা হয় না অথবা ইন্দ্রিয়তর্পণ বিরোধকল্পে রোগীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া চিরতরে রোগ দূর করিবার চেষ্টা-রূপ মুক্তিবাদের লোভ দেখাইলেও তাহাতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না।

"স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণেঽপথ্যং বাঞ্ছতো হি ভিষক্তমঃ।।"

সুচিকিৎসক যেরূপ রোগী অপথ্য বাঞ্ছা করিলেও তাহা প্রদান করেন না, তদ্রূপ যিনি স্বয়ং নিঃশ্রেয়ঃ অর্থাৎ চরম মঙ্গলের বিষয় অবগত আছেন, তিনি কখনও অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম্মের উপদেশ করেন না। শ্রুতি বলেন,—

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে।।

(মুণ্ডক ১।২।৯)

—অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহুবিধ অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়াই 'আমরা কৃতার্থ হইয়াছি'—এইরূপ মনে করে। যেহেতু তাহারা কর্ম্মী, কর্ম্মে অনুরাগবশতঃ প্রকৃততত্ত্বে অনভিজ্ঞ। অত্যন্ত আতুর হইয়া কর্ম্মফলে যে কিছু লাভ করে, কিছুকাল পরে সেই স্থান হইতে ভ্রষ্ট হয়। শ্রুতি আরও বলেন,—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।।

(মুণ্ডক ১।২।৮)

—যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনাদিগকে 'বিবেকী' ও 'পণ্ডিত' বলিয়া মনে করে, সেই সকল বিপথগামী অজ্ঞব্যক্তি অজ্ঞব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত অপর অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে।

জগতের অধিকাংশ লোকই নিজগৃহ ভুলিয়া মায়াবিনীর কুহকে গৃহের বিপরীত দিকে ছুটিয়াছে—তাহাতেই তাহাদের এত প্রমত্ততা—ব্যস্ততা—একাগ্রতা—স্থিরসঙ্কল্প যে, বাড়ীর কথা ভাবিবার সুযোগ তাহাদের খুবই কম। কিন্তু গৌড়ীয় মঠের বার্ত্তা—গৌড়ীয় মঠের উড্ডীয়মান অঙ্কিতরক্ত পতাকা সর্ব্বজনের শ্রুতি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ঘোষণা করিতেছেন,—

"কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল, এইমাত্র ভিক্ষা চাই।"

{ Back to God and back to home is the message of Goudiya Math.

"To arrest the pervertedly current tide is the seemingly unpleasant duty of Goudiya Math).

গৌড়ীয় মঠ বলেন,—"জগতের সকল মানুষই আমাদের আত্মীয়—বিশ্বের সকল পশুপক্ষী, তৃণগুল্মই আমাদের স্বজন, যেখানে যত চেতন সকলেই আমাদের প্রভুর, আমরা আমাদের আত্মীয়গণকে মায়াবিনীর কুহক হইতে ঘরের দিকে লইয়া যাইব, কুহকে পতিতকে আরও অধিকতরভাবে কুহকিনীর মায়ায় পাতিত করিবার সাহায্য করিয়া তাহাদের প্রতি আপাতমধুর সহানুভূতি দেখাইব না, তাহারা মায়াবিনীর কুহকে পড়িয়া আমাদের চেষ্টার বিরুদ্ধে উচ্চ চীৎকারে আকাশ-পাতাল পরিপূর্ণ করিলেও আমরা তাঁহাদের নিকট অমৃতের বার্ত্তা ঘোষণা করিব।

পৃথিবীর ধারণার 'ধর্ম্ম' ও ধার্ম্মিকগণের চিন্তাস্রোতে প্রতিকূল বা তাহাদের নিকট আশ্চর্য্যজনক হইলেও আমরা ধর্ম্মকর্ম্ম ভগবৎপ্রণীত সনাতনধর্ম্ম—যে ধর্ম্মের কথা ঋষিগণ, দেবতাগণ, সিদ্ধগণ, মনুষ্যগণ কেহই জানেন না—যে ধর্ম্ম গুহ্য, বিশুদ্ধ, দুর্ব্বোধ হইলেও একমাত্র অমৃতপ্রাপক—যে ধর্ম্ম জীবের পরম ধর্ম্ম—যে ধর্ম্মে জীব মাত্রেরই অধিকার আছে—যে ধর্ম্মের উত্তরাধিকারী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলেই হইতে পারেন, সেই ধর্ম্মের নিত্য আচার ও প্রচার করিব—সেই ধর্ম্মই আমাদের সাধন ও সাধ্য।

জগৎ যে স্রোতে চলিয়াছে,—যে বন্যায় ভাসিয়াছে—যে দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতেছে,—যে অভাবে, ভয়ে, শোকে, মোহে অভিভূত, ক্লিষ্ট—জর্জ্জরিত হইতেছে, তাহা নিবারণ করিবার—তাহার মূল উৎপাটন করিবার উপায় 'গৃহের দিকে চলা' অশোক, অভয়, অমৃতের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করা। বিদেশে যতদিন থাকিব, গৃহাভিমুখ হইতে বিদেশের দিকে যতদূর অধিকতর দ্রুতবেগে ছুটিতে থাকিব, ততদিন শোক, ভয়, মোহ যাইবে না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া মায়ামৃগের ন্যায় ছলনা করিবে। শ্রুতি বলেন,—

"দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি।" (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

—দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয়। মর্ত্ত্যধাম হইতে মৃত্যু উঠিয়া যাইতে পারে না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমবেত জীবের সহস্র চেষ্টায়ও ত্রিতাপকে অণ্ডায়মান দ্বীপে নির্ব্বাসিত করা যাইতে পারে না, রাবণের চিতার আগুণ কেহ নিভাইতে পারে না, উহা নির্ব্বাপিত করিতে পারে কেবল শ্রীরামচন্দ্রের সুশীতল পাদোদক। শুদ্ধ নামবন্যায় জগৎ ভাসিলেই জগতের ক্ষুদ্রবন্যা অতি সহজেই সরিয়া যায় ; হরিকথাকীর্ত্তনের সুভিক্ষ হইলেই আনুষঙ্গিক ভাবে ক্ষুদ্র দুর্ভিক্ষ চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৮ ; ১৬ নভেম্বর, ২০০১

'শোকমোহভয়াপহা' (ভাঃ ১।৭।৮) ভক্তির উদয়ে জীবের সর্ব্ববিধ ক্লেশের মূল অবিদ্যা বিনষ্ট হয় এবং আত্মা সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে।

'ভক্তি'—অগ্নিতুল্য। অগ্নি যেরূপ স্বর্ণকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, অন্য কিছুই সেইরূপ পারে না। ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্যান্যচেষ্টা তেঁতুল, মৃত্তিকা বা ভস্মদ্বারা স্বর্ণ পরিষ্কারের চেষ্টার ন্যায় নিরর্থক। **(ক্রমশঃ)**

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

স্থান—আসানসোল

আজ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ৮৮তম অধ্যায় আলোচনা করছি। প্রসঙ্গ আপনাদের প্রায় সকলেরই জানা। তথাপি সেই প্রসঙ্গই আলোচনা করছি। শাস্ত্রে রয়েছে, আবৃত্তি, আলোচনা এবং অনুশীলন করার প্রয়োজন হয়। কেন?—ওটাকে মনে রাখবার জন্য। ঠিক তারই প্রতিধ্বনি বেদান্ত-দর্শনে আমরা দেখতে পাই। সেখানেও "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" এই সূত্রেতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বুঝাতে চেয়েছেন যে, সবসময়ে আলোচ্য বিষয় বার বার করে পাঠ করুন। তবে ওটা মনে থাকবে। একবার পড়লে যেটা মনে থাকে না, বার বার যদি অভ্যাস করা যায়, অনুশীলন করা যায়, তাহলে ওটা মনে থাকে। তাই বার বার শাস্ত্র আলোচনা করবার কথা আছে। বিশেষ করে শ্রীভগবানের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা পুনঃ পুনঃ অনুশীলন, অভ্যাস করতে হবে—শাস্ত্রে লেখা আছে। শ্রেষ্ঠ নাম ভগবানের, সেই নাম সবসময় অনুশীলন করতে হবে। কখনও বাদ যাবে না। মানুষ ত' সবসময় নাম করতে পারেন না। তার জীবনে ত' ঘুম আছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে নিদ্রা বলে একটা জিনিষ তার আছে। তার ভিতরে কি করে নাম হবে? হ্যাঁ, হবে। অভ্যাস যদি থাকে তার ভিতরেও নাম হবে। অভ্যাসেই তিনি ঘুমের ঘোরেও নাম করবেন। স্বপ্নেও তিনি নাম করে যাচ্ছেন দেখছেন। যেমন বাচ্চা শিশু সারাদিন খেলাধূলা করে, দৌড়ঝাঁপ করে, ঘুমের ঘোরে সে যেমন সব বলতে থাকে, ঠিক সেইরকম। সাধন-ভজনের ক্ষেত্র, অভ্যাসযোগের ক্ষেত্রটাও তাই।

কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে।।

ভগবানের নাম সবসময় করবার জন্য শাস্ত্রে উপদেশ রয়েছে।

পরীক্ষিৎ মহারাজ এই অধ্যায়ের আগে পর্য্যন্ত ভগবানের বহু লীলাকথা শ্রবণ করে এসেছেন। এই অধ্যায়ের প্রথমে 'শ্রীরাজোবাচ,—অর্থাৎ পরীক্ষিৎ মহারাজ বলতে

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৮ ; ১৬ নভেম্বর, ২০০১

আরম্ভ করেছেন তাঁর গুরুদেব শুকদেব গোস্বামীর কাছে—যাঁকে তিনি মনে-প্রাণে গুরু বলে মেনে নিয়েছেন, তাঁর কাছে প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। এতাবৎকাল যাঁর কাছে ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা শ্রবণ করবার অবসর সুযোগ হয়েছে, তাঁর কাছেই এই প্রশ্ন রাখছেন।

দেবাসুরমনুষ্যেষু যে ভজন্ত্যশিবং শিবম্।
প্রায়স্তে ধনিনো ভোজা ন তু লক্ষ্ম্যাঃ পতিং হরিম্।।

এ প্রশ্ন সকলেরই আমাদের। বদ্ধজীব আমরা যারা সংসারে বাস করছি, তাদের সকলের মধ্যে এই একই প্রশ্ন। দেবতা এবং অসুরগণের মধ্যে যারা পরমমঙ্গলস্বরূপ শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতির সাধন-ভজন করছেন, তারা দেখা যায় প্রায়ই ধনী-মানী। 'ন তু লক্ষ্ম্যাঃ পতিং হরিম্'—কিন্তু লক্ষ্মীপতি নারায়ণের যাঁরা উপাসনা করেন, দেখা যায়, তাঁদের যেন অনেক অভাব-অভিযোগ, অভাব-অনটনের মধ্যে কাল কাটাতে হয়। এ জাতীয় প্রশ্ন অনেকেরই আজও হয়। মশায়! ভগবানকে ডাকলে পরে মানুষের কষ্ট হয় নাকি বেশী? এখনও প্রশ্ন শুনতে পাওয়া যায়। ভগবানকে যাঁরা উপাসনা করেন, ভগবানকে যাঁরা ভালবাসতে চান, তাঁদের কষ্ট কোনদিনই হয় না। তবে ঐ যে কষ্ট দেখা যায়, ওটা কি? সেইটা ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছেন এখানে। প্রশ্নটা ঠিক সেইভাবে উত্থাপন করেছেন পরীক্ষিৎ রাজা শুকদেব গোস্বামীর কাছে।

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সন্দেহোঽত্র মহান্ হি নঃ।
বিরুদ্ধশীলয়োঃ প্রভোর্বিরুদ্ধা ভজতাং গতিঃ।।

আমার মহান সন্দেহ, সংশয় উপস্থিত হয়েছে এই যে, দুইরকম প্রভুর সেবায় ফল দুইরকম লাভ হয়। কারও সেবা করলে প্রচুর ধনৈশ্বর্য্য লাভ হয়, সম্মান-প্রতিপত্তি লাভ হয় ; আবার কারও সেবা করলে খুব দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম হয়ে যেতে হয়। যেন খাওয়া থাকা-পরার অভাব লক্ষ্য করা যায়। কেন এ ব্যাপারটা হয়? এ প্রশ্ন আজ আমাদের সবাইয়েরই। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছেন শুকদেব গোস্বামী। প্রশ্নটা যত সহজ, উত্তরটা তত সহজ নয়। তাই শুকদেব গোস্বামী বেশ আটঘাট বেঁধে প্রথম থেকেই তিনি জিনিষটা বুঝাতে চেয়েছেন।

শ্রীশুক উবাচ,—

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা।।

রাজা পরীক্ষিৎ, তোমার প্রশ্ন হচ্ছে শিব-ব্রহ্মাদির উপাসনা যাঁরা করেন, তাঁরা অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হতে পারেন। মান-সম্মান-প্রতিপত্তি যথেষ্ট তাদের লাভ হয়। কিন্তু যাঁরা ভগবানের উপাসনা করতে যান, তাঁদের ক্ষেত্রে যেন দারিদ্র্যতা দেখা দেয়। তাহলে শোন, শিব কে, শিবানী কে, ব্রহ্মা কে, ব্রহ্মাণী কে? সেই কথা এখানে বুঝাতে চাচ্ছেন। সত্ত্ব, রজঃ, তম—এই তিন গুণ মায়ার সৃষ্টি। মায়া কে?—

ত্রিভির্গুণময়ীর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্।।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন গীতায়,—এই ত্রিগুণের দ্বারা মোহিত হয়ে আছে জগজ্জীব। এই ত্রিগুণের ভিতরে সাত্ত্বিক গুণ নিয়ে বসে আছেন স্বয়ং বিষ্ণু। রাজসিক ভাব নিয়ে বসে আছেন ব্রহ্মা, রজোগুণে সৃষ্টি। তামসিক ভাব নিয়ে বসে আছেন শিব—রুদ্র। তাহলে এই যে গুণ, এটা মায়িক গুণ। তাহলে ভগবানের কি গুণ? ভগবানকে বলা হল নির্গুণ। নির্গুণ মানে কোন গুণ নাই তাঁর এমন অর্থ হবে কি? নির্গুণ মানে প্রাকৃত গুণাতীত, লোকাতীত, মায়াতীত। এই বিশেষণ ভগবানের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে। পরবর্ত্তী আলোচনার ক্ষেত্রে আসবে। শিব-ব্রহ্মাদি দেবতা রজঃ-তম গুণ নিয়ে বসে আছেন। সাধরণভাবে গীতার মধ্যে বলা হচ্ছে,—

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।।

তামসিক ব্যক্তিগণ তারা ভূত-প্রেত-পিশাচের পূজা করে, যক্ষ-রাক্ষসের পূজা করে রাজসিক ব্যক্তিরা, আর সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা সাত্ত্বিক দেবতার উপাসনা করে। দেবতাগণকে সাত্ত্বিক বলা হয়েছে। সাত্ত্বিক হলেও সেটা প্রকৃতির অন্তর্গত ব্যাপার। সেইজন্য ভগবানের বিশেষণে এসেছে বিশুদ্ধসত্ত্ব বলে একটা গুণ। বিশুদ্ধসত্ত্ব-শব্দটা ব্যবহার হয়েছে। ভগবান্ দেবতাগণকে নিয়ে বসে আছেন, সেখানে শিবঠাকুর ভগবান্‌কে প্রণাম করেছেন একটা শ্লোক উচ্চারণ করে। সেই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় এর মধ্যে আছে। "হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে"—হে ভগবান্ তুমি অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত, ইন্দ্রিয়াতীত, মায়াতীত, গুণাতীত। সেই যে ভগবান্ তুমি তোমাকে প্রণাম জানাই। মায়িক গুণে আবদ্ধ নন ভগবান্। তিনিই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তিনিই নিখিল জীবাত্মা সৃষ্টি করেছেন, বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা, পাখী, পশু, মনুষ্যগোষ্ঠী সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। মায়া তিনি সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি মায়াদ্বারা আবদ্ধ নন, সেইকথা বলছেন।

শিব-শিবানী যাঁকে বলছ, ব্রহ্মা-ব্রহ্মাণী যাঁকে বলছ, ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী যাঁকে বলছ, এঁরা সব প্রাকৃত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণে বশীভূত। এঁদের ভগবান্ বিশেষ বিশেষ অধিকার দিয়ে বসিয়েছেন। এঁদের কাছে কিছু জিনিষ চাইলে পাওয়া যাবে। প্রাকৃত জগতের যা কিছু আকাঙ্ক্ষা মেটানো যেতে পারে এঁদের সাধন-ভজন করলে। 'ধনং দেহি জনং দেহি দিশো জহি'—এসব স্তব-স্তুতি তাঁদের কাছে করা হচ্ছে। পাওয়াও যায়। কিন্তু যদি হরিভক্তি লাভ করতে হয়, যদি মুক্তি লাভ করতে হয়, যদি ভগবদ্ভক্তি, ভগবৎপ্রেম লাভ করতে হয়, তাহলে এঁদের দিয়ে হবে না। সেইকথা হল বক্তব্য এখানে। যদি তোমাকে ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে হয়, ভগবৎপ্রেম লাভ করতে হয়, মুক্তি লাভ করতে

হয়, তাহলে তোমাকে ভগবানের শরণাপন্ন হতে হবে। কেন? 'মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ, কৃষ্ণ এব ন সংশয়ঃ।' মুক্তির Portfolio নিয়ে বসে আছেন স্বয়ং ভগবান্। মুক্তি দিবার ক্ষমতা কারও নাই।

রাজা মুচুকুন্দ দেবতাগণের পক্ষ হয়ে বহুকাল ধরে যুদ্ধ করেছিলেন। জীবনের সায়াহ্নকাল উপস্থিত, তাই তিনি অবসর নিতে চাচ্ছেন। কার্ত্তিকের জন্ম হয় নাই তখন, তখনকার ইতিহাস। কার্ত্তিকের জন্ম হয়েছে, কার্ত্তিককে যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গত করেছেন, তারপরে দেবতাগণকে বললেন, এই নেন আপনাদের একজন সেনাপতি দিলাম। এবার আমি ইস্তফা দিচ্ছি। দেবতাগণ বললেন,—আপনি ত' আমাদের জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করেছেন, আপনার জন্য আমরা কি করতে পারি? রাজা মুচুকুন্দ বললেন, আমি কিছুর প্রার্থী হয়ে আপনাদের সাহায্য করি নাই। আপনারা বলেছেন, আমি সাহায্য করেছি। আপনাদের কাছে আমি কিছু প্রার্থী নই। তথাপি দেবতারা বললেন,—না, আমরা আপনার জন্য কিছু করতে চাই। তাহলে আমার মুক্তির ব্যবস্থা করুন। আপনারা আমাকে মুক্তি দিয়ে দেন। তখন দেবতারা হাসতে লাগলেন। মুক্তির Portfolio আমাদের হাতে নাই, ওটা আমাদের দ্বারা হবে না। 'মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।' হে রাজন্! মুক্তি চান আপনি? মুক্তি পেতে গেলে বিষ্ণুর আরাধনা করতে হবে, তা না হলে মুক্তি হবে না। ওটা আমাদের হাতে নাই, আমরা পারব না দিতে। তা আপনি আমাদের পরিরক্ষণ করতে গিয়ে দেবসেনাপতির কাজ করেছেন বহুকাল ধরে, আপনার নিদ্রা হয় নাই, আমরা আপনাকে আশীর্ব্বাদ করছি আপনি কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়ে নিদ্রাসুখ ভোগ করুন। ঐ বর দিলেন। মুক্তি দিতে পারেন নাই। খট্বাঙ্গ রাজার ক্ষেত্রেও একই ইতিহাস। তিনিও বলেছিলেন, আপনারা আমাকে মুক্তি দিয়ে দেন। পারেন? না, পারব না। যেটা সম্ভব নয়, সেটা বলবেন কি করে? সেই কথাই এই তত্ত্বদর্শনের ভিতরে রয়েছে।

শিবঠাকুরের কাছে কৈলাসে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন দশভাই প্রচেতা। তাঁরা গিয়ে বলছেন, আপনাদের দুজনকে (শিব-শিবানীকে) দর্শন করতে এসেছি। গিয়ে দেখছেন, ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন শিব-শিবানী দুজনে। ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে যখন তখন বললেন,—আমরা ত' জানি আপনি জগতের আদিকারণ, পরাৎপর তত্ত্ব। আপনার আবার উপরওয়ালা কেউ আছেন নাকি? আপনারা কার ধ্যান করছিলেন? যখন ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন, তখন আপনাদের উপরওয়ালা নিশ্চয় কেউ আছেন বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের উপরওয়ালা আছেন একজন, তাঁরই ধ্যান করছিলাম আমরা। আমরা (দশভাই প্রচেতা) আত্মকল্যাণ কিছু জানি না, সাধন-ভজন কিছু বুঝি না, আমাদের দয়া করে উপদেশ করুন।

সেখানে শিবঠাকুর তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র উপদেশ করেছেন। যে মহামন্ত্র সবসময়

কীর্ত্তন করার ব্যবস্থা রয়েছে। আর বললেন, এই মন্ত্র দিচ্ছি, এই গায়ত্রী মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা তোমরা জপ করবে। কৃষ্ণমন্ত্র, কৃষ্ণগায়ত্রী দিয়ে দিলেন। এই মন্ত্র, এই গায়ত্রী আমরা উভয়েই জপ করি। আর এই মহামন্ত্র সবসময় জপ করি আমরা। তোমরাও এই মহামন্ত্র সবসময় জপ কর, কীর্ত্তন কর, আর এই গায়ত্রী মন্ত্র জপ কর। এতে তোমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হবে। ঈশ্বরানুধ্যান তোমরা লাভ করবে, ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করবে। তাঁরা তাই করলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইরকম বহু উদাহরণ রয়েছে। তাই এখানে ঐ তত্ত্ব এইভাবে বর্ণনা করছেন।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।

মায়ার স্বামী হচ্ছেন মহেশ্বর। মায়া কাকে বলে? প্রকৃতি। যার থেকে "যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ।" যার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে সমগ্র জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। ভগবানের তিনশক্তির কথা শাস্ত্রে সর্ব্বত্র বর্ণনা করা হয়েছে। অনন্ত শক্তিমান্ ভগবান্। প্রধানতঃ তিনশক্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে সর্ব্বশাস্ত্রে—বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে, গীতা, ভাগবতে, রামায়ণে, মহাভারতে। প্রথম শক্তি—হ্লাদিনীশক্তি, পরাশক্তি, অন্তরঙ্গা-শক্তি। দ্বিতীয় শক্তি আলোচিত হয়েছে—জীবশক্তি। যে শক্তি থেকে সমগ্র জৈবজগৎ সৃষ্টি হচ্ছে। তটস্থাশক্তি বা জীবশক্তি। তৃতীয় শক্তি হল—মায়াশক্তি। ঠিক এই তিন শক্তি নিয়ে শাস্ত্রের সর্ব্বত্র আলোচনা করা হয়েছে। এই তিন শক্তি প্রধান। উল্টোপাল্টা করলে হবে না। জীবশক্তিকে যদি বলি মায়াশক্তি, মায়াশক্তকে যদি বলি স্বরূপশক্তি, তাহলে ভুল হয়ে যাবে। সম্মোহন-তন্ত্রে একটা বাক্য রয়েছে। যেখানে বলছেন,—গোকুলেশ্বরী আর অখিলেশ্বরী।

জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যা পরা পরমাশক্তির্মহাবিষ্ণু-স্বরূপিণী।।

তাঁকে বললেন গোকুলেশ্বরী।

অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদি দেবোঽখিলেশ্বরঃ।
অস্যা আবরিকাশক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্ব সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ।।

মহামায়া দুর্গাদেবীর কথা বললেন। প্রথমে স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি, হ্লাদিনী শক্তির কথা বললেন। তাঁকে বললেন,—যোগমায়া শক্তি। আর এক শক্তিকে বলছেন মহামায়া শক্তি। এইভাবে ভাগ করে বলছেন।

নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রুতি-সংবাদে বলছেন,—

তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে।

কথাটা কে বললেন? শুনলে মনে হয়, দেবী পার্ব্বতী বলেছেন। কিন্তু তিনি তা বলেন নাই, কথাটা বলেছেন যোগমায়া। যোগমায়া ত' ভগবানের স্বরূপশক্তির অন্তর্গত

শক্তি, হ্লাদিনীশক্তির অন্তর্গত শক্তি, ভগবানের লীলাবিস্তারিণী শক্তি। তাঁকেই বলে যোগমায়া শক্তি। তিনি যদি বলেন,—হে ভগবান্! বৃন্দাবনে আমি তোমার বক্ষঃ-বিলাসিনী, কথাটা ভুল হয় নাই, ঠিকই হয়েছে। মায়া-শব্দটা হল Nutral শব্দ। ওর আগে যোগ-শব্দ ব্যবহার করে যোগমায়া বললে স্বরূপশক্তিকে লক্ষ্য করবে, আর মহা-শব্দ ব্যবহার করলে মহামায়া, জড়মায়াকে লক্ষ্য করবে।

চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড—তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, ভূঃ, ভুব, স্বঃ, মহ, জন, তপ, সত্য—এই চতুর্দ্দশ ভুবন, চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড সব মহামায়া দুর্গাদেবীর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। সেইজন্যই তাঁর অপর নাম হল 'ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী'। এই যে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভাণ্ড সেটা সবটা তাঁর উদরে রেখে Control—নিয়ন্ত্রণ করছেন। দুর্গা-শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন শাস্ত্রে। এই যে চতুর্দ্দশ ভুবনরূপ দুর্গ, এই দুর্গের রক্ষয়িত্রী, কারা-রক্ষয়িত্রী—Jailor। তাঁকে বলে দুর্গাদেবী।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

সেই ভগবানের স্বরূপশক্তির অধীনে যে ছায়াশক্তি, সেই ছায়াশক্তির দ্বারা এই জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। মহামায়া দুর্গাদেবী তিন চাবুক নিয়ে বসে আছেন হাতে। চাবুক তিনটে কি কি?—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপ জ্বালারূপ তিন চাবুক। কিছুতেই যখন আমরা ভগবানকে পেতে চাই না, ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে চাই না, তাঁকে ভালবাসতে চাই না, তখন মায়াদেবী তাঁর এই চাবুক প্রয়োগ করেন।

মানসিক অশান্তি, আধি-ব্যাধি ইত্যাদি সব আধ্যাত্মিক তাপের মধ্যে। আধিভৌতিক তাপ—প্রাণীজগৎ থেকে যে কষ্ট আসছে এ সংসারে, সাপে কামড়ান, বাঘে ধরা, কুকুরে কামড়ান ইত্যাদি। আর আধিদৈবিক তাপ—দেবতাগণ থেকে যে কষ্ট আসে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, প্লাবন, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি। এইভাবে মহামায়া দুর্গাদেবী বদ্ধজীব আমাদের শাসন করছেন। সেই শাসন যদি আমরা মেনে নেই, তাহলে আমাদের কল্যাণ। শাসন কেন করছেন? যাতে আমরা ভালটা ঠিক বুঝি। যদি সেই মহামায়া দুর্গাদেবীর কাছে প্রার্থনা রাখতে পারি,—হে দেবি! পথ দেখাও আমাকে, তাহলে তিনি পথ দেখাতে পারেন। সেইজন্য সেই মহামায়া দুর্গাদেবীর আবার দুটো Function আছে, দুটো নামও আছে। একস্থানে তিনি উন্মুখমোহিনী, আর একস্থানে তিনি বিমুখমোহিনী। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৮ ; ১৬ নভেম্বর, ২০০১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৩শ বর্ষ } ১৬ কেশব, বাসুদেব, ৫১৫ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৪০৮, ইং ১৬/১২/২০০১ { ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্

[লীলাশুক-শ্রীল-বিল্বমঙ্গল-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

অগ্রে কুরূণামথ পাণ্ডবানাং, দুঃশাসনেনাহৃতবস্ত্রকেশা।
কৃষ্ণা তদাক্রোশদনন্যনাথা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১।।

কৌরব ও পাণ্ডবদের সম্মুখে দুঃশাসনকর্ত্তৃক বস্ত্র ও কেশ আকর্ষিত হইলে কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) অনন্যগতি হইয়া "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" বলিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিলেন।। ১।।

শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণো মুধুকৈটভারে, ভক্তানুকম্পিত ভগবন্ মুরারে।
ত্রায়স্ব মাং কেশব লোকনাথ, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২।।

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে বিষ্ণো! হে মধুকৈটভহন্তা! হে ভক্তানুগ্রহকারিন্! হে ভগবন্ মুরারে! হে কেশব! হে লোকনাথ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! আমাকে ত্রাণ কর, ত্রাণ কর।। ২।।

বিক্রেতুকামাখিল-গোপকন্যা, মুরারি-পাদার্পিত-চিত্তবৃত্তিঃ।
দধ্যাদিকং মোহবশাদবোচদ, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩।।

কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পিতচিত্ত গোপকন্যা দধ্যাদি বিক্রয়মানসে দধিদুগ্ধাদির নাম না করিয়া মোহবশতঃ কীর্ত্তন করিতে থাকেন,—'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!'।। ৩।।

উলূখলে সম্ভৃত-তণ্ডুলাং শ্চ, সংঘট্টয়ন্তো মুষলৈঃ প্রমুগ্ধাঃ।
গায়ন্তি গোপ্যো জনিতানুরাগা, গেবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪।।

কৃষ্ণানুরাগিণী গোপীগণ উলূখলে মুষলদ্বারা ধান্যাদি পেষণ করিতে করিতে তৎপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া 'গোবিন্দ! দামোদর! মাধব' বলিয়া গীতি-রতা হইলেন।। ৪।।

কাচিৎ করাম্ভোজপুটে নিষণ্ণং, ক্রীড়াশুকং কিংশুকরক্ততুণ্ডম্।
অধ্যাপয়ামাস সরোরুহাক্ষী, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫।।

কোন কমললোচনা উভয়করপদ্মে স্থিত পলাশপুষ্পের ন্যায় রক্তিমবদন ক্রীড়া-শুককে 'বল গোবিন্দ-দামোদর-মাধব'—বলিয়া পাঠ করাইতেছিলেন।। ৫।।

গৃহে গৃহে গোপবধূসমূহঃ, প্রতিক্ষণং পিঞ্জরসারিকাণাম্।
স্খলদ্গিরং বাচয়িতুং প্রবৃত্তো, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬।।

প্রতিগৃহে গোপবধূগণ তাঁহাদের পিঞ্জরস্থিত সারিকা পক্ষীকে নিরন্তর 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব'—এই সুমধুর বুলি শিক্ষা করাইতে প্রবৃত্ত থাকিতেন।। ৬।।

পর্য্যঙ্কিকাভাজমলং কুমারং, প্রস্বাপয়ন্ত্যোঽখিল-গোপকন্যাঃ।
জগুঃ প্রবন্ধং স্বরতালবন্ধং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৭।।

শয্যাস্থিত স্বীয় শিশুদিগের নিদ্রাকর্ষণের জন্য সুর-তালের সহিত নিখিল গোপকন্যাগণ 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব'—এই প্রবন্ধ গান করিতেন।। ৭।।

রামানুজং বীক্ষণকেলিলোলং, গোপী গৃহীত্বা নবনীতগোলম্।
আবালকং বালকমাজুহাব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৮।।

হস্তে ননীর মণ্ড লইয়া গোপী যশোদারাণী বলরামের অনুজ শ্রীকৃষ্ণকে গোপ-বালকদিগের সহিত ক্রীড়াচঞ্চল-দর্শনে তাহাদের মধ্য হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন,—'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!'।। ৮।।

বিচিত্রবর্ণাভরণাভিরামে-, ঽভিধেহি বক্ত্রাম্বুজরাজহংসি।
সদা মদীয়ে রসনেঽগ্ররঙ্গে, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৯।।

হে বিচিত্র-অলঙ্কার-শোভিতে সুন্দরি বদনকমলরূপিণি রাজহংসি! মদীয় জিহ্বাগ্রে 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব' বলিয়া অভিনেত্রীর ন্যায় সর্ব্বদা গীতালাপ করিতে থাক।। ৯।।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪০৮ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০১

অঙ্কাধিরূঢ়ং শিশুগোপগূঢ়ং, স্তনং ধয়ন্তং কমলৈককান্তম্।
সম্বোধয়ামাস মুদা যশোদা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১০।।

মাতা যশোদারাণী গোপশিশুরূপে গূঢ়ভাবে লীলাকারী ভগবান্ লক্ষ্মীকান্তকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্যপান করাইতে করাইতে, আনন্দ-সহকারে সম্বোধন করিতে লাগিলেন, —'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!' ।। ১০।।

ক্রীড়ন্তমন্তর্ব্রজমাত্মজং স্বং, সমং বয়স্যৈঃ পশুপালবালৈঃ।
প্রেম্না যশোদা প্রজুহাব কৃষ্ণং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১১।।

গোষ্ঠে বয়স্য গোপবালকগণসহ ক্রীড়ারত আত্মজ সন্তান শ্রীকৃষ্ণকে মাতা যশোদা আনন্দে প্রেমভরে 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন।। ১১।।

যশোদয়া গাঢ়মুলূখলেন, গোকণ্ঠপাশেন নিবধ্যমানঃ।
রুরোদ মন্দং নবনীতভোজী, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১২।।

নবনীত প্রস্তুতকালে দধিভাণ্ড-ভঙ্গের ও গৃহস্থিত নবনীত মর্কটদিগকে প্রদানের নিমিত্ত অপরাধের শাস্তিস্বরূপ মাতা যশোদা গাভিবন্ধন-রজ্জুদ্বারা উলূখলের সহিত নবনীতভোজী কৃষ্ণকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করায়, 'গোবিন্দ! দামোদর! মাধব!' বলিয়া ধীরে ধীরে কাঁদিতে লাগিলেন।। ১২।।

নিজাঙ্গনে কঙ্কণকেলিলোলং, গোপী গৃহীত্বা নবনীতগোলম্।
আমর্দ্দয়ৎ পাণিতলেন নেত্রে, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১৩।।

শ্রীকৃষ্ণ নিজ অঙ্গনে স্বহস্তকঙ্কণের সহিত ক্রীড়ায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন গোপী যশোদারাণী এক হস্তে নবনীত মণ্ড লইয়া এবং অপর হস্তে তাঁহার লোচনদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া প্রেমভরে বলিতে লাগিলেন,—'হে আমার গোবিন্দ! আমার দামোদর! আমার মাধব!' ।। ১৩।।

গৃহে গৃহে গোপবধূকদম্বাঃ, সর্ব্বে মিলিত্বা সমবায়যোগে।
পুণ্যানি নামানি পঠন্তি নিত্যং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১৪।।

শ্রীবৃন্দাবনস্থ গোপবধূগণ স্ব-স্ব-গৃহে একত্র মিলিত হইয়া মনোযোগ-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের 'গোবিন্দ' 'দামোদর' 'মাধবা'দি পবিত্র নাম নিত্য পাঠ করেন।। ১৪।।

মন্দারমূলে বদনাভিরামং, বিম্বাধরে পূরিতবেণুনাদম্।
গো-গোপ-গোপীজন-মধ্যসংস্থং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১৫।।

যাঁহার মুখমণ্ডল মনোমুগ্ধকর এবং যিনি কদম্ববৃক্ষতলে ধেনু-গোপ-গোপীগণে পরিবৃতা হইয়া শোভমান ; তাঁহার বিম্বফল-সদৃশ অধরস্থিত বেণু হইতে 'গোবিন্দ' 'দামোদর' 'মাধব' এই নামসকল ধ্বনিত হইতেছে।। ১৫।।

উত্থায় গোপ্যোঽপর-রাত্রভাগে, স্মৃত্বা যশোদাসুতবালকেলিম্।
গায়ন্তি প্রোচ্চৈর্দধি মন্থয়ন্ত্যো, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১৬।।

নিশান্তে শয্যাত্যাগ করিয়া গোপীগণ যশোদাসুত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা স্মরণ করত দধি-মন্থনকালে 'গোবিন্দ' 'দামোদর' 'মাধব' এই নাম উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে থাকেন।। ১৬।।

জগ্ধোঽথ দত্তো নবনীতপিণ্ডো, গৃহে যশোদা বিচিকিৎসয়ন্তী।
উবাচ সত্যং বদ হে মুরারে, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১৭।।

একদিন গৃহে পূর্ব্বসঞ্চিত নবনীত নিজে অল্প ভক্ষণ করিলেন এবং কিয়দংশ বানরগণকেও দিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দিগ্ধচিত্তা মাতা যশোদা পুত্রকে বলিলেন,—'হে মুরারে! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! সত্য করিয়া বল, নবনীত চুরি করিয়াছ??' ১৭।।

অভ্যর্চ্চ্য গেহং যুবতিঃ প্রবৃদ্ধ-, প্রেমপ্রবাহা দধি নির্ম্মমন্থ।
গায়ন্তি গোপ্যোঽথ সখীসমেতা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১৮।।

প্রেমাপ্লুত-হৃদয়ে মাতা যশোদা গৃহ পরিষ্কৃত করিয়া দধিমন্থন করিতে বসিলেন। এমন সময় গোপীগণ সখীপরিবেষ্টিত হইয়া 'গোবিন্দ' 'দামোদর' 'মাধব' এই নাম গান করিতে লাগিলেন।। ১৮।।

ক্বচিৎ প্রভাতে দধিপূর্ণপাত্রে, নিক্ষিপ্য মন্থং যুবতী মুকুন্দম্।
আলোক্য গানং বিবিধং করোতি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১৯।।

কোন এক প্রাতঃকালে যশোদাদেবী দধিপূর্ণপাত্রে মন্থনদণ্ড নিক্ষেপ করিতে যাইবেন, এমন সময় শয্যোপরি বালক মুকুন্দের উপর দৃষ্টি পড়িল। দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে বিহ্বল হইয়া 'ও আমার গোবিন্দ, আমার দামোদর, আমার মাধব' বলিয়া গান করিতে লাগিলেন।। ১৯।।

ক্রীড়াপরং ভোজনমজ্জনার্থং, হিতৈষিণী স্ত্রী তনুজং যশোদা।
আজুহবৎ প্রেমপরিপ্লুতাক্ষী, গোবিবন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২০।।

প্রেমবিভোরলোচনা হিতাকাঙ্ক্ষী মাতা যশোদা বয়স্যগণসহ ক্রীড়ারত পুত্রকে ডাকিতে লাগিলেন,—'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! স্নান ও ভোজন করিবে, আইস।।' ২০।।

সুখং শয়ানং নিলয়ে চ বিষ্ণুং, দেবর্ষিমুখ্যা মুনয়ঃ প্রপন্নাঃ।
তেনাচ্যুতে তন্ময়তাং ব্রজন্তি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২১।।

শ্রীনন্দগৃহে সুখে শায়িত বিষ্ণুকে (কৃষ্ণকে) দর্শন করিয়া নারদাদি প্রমুখ মুনিগণ তদীয় চরণে শরণাগত হইলেন এবং 'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!' বলিতে বলিতে অচ্যুত ভগবানে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন।। ২১।।

বিহায় নিদ্রামরুণোদয়ে চ, বিধায় কৃত্যানি চ বিপ্রমুখ্যাঃ।
বেদাবসানে প্রপঠন্তি নিত্যং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২২।।

শ্রেষ্ঠ বিপ্রগণ অরুণোদয় সময়ে শয্যাত্যাগ করেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বেদপাঠ করত 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব' নাম নিত্য পাঠ করেন।। ২২।।

বৃন্দাবনে গোপগণাশ্চ গোপ্যো, বিলোক্য গোবিন্দ-বিয়োগখিন্নাম্।
রাধাং জগুঃ সাশ্রু-বিলোচনাভ্যাং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২৩।।

শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দ-বিরহকাতরা শ্রীমতী রাধারাণীকে দর্শন করিয়া গোপ-গোপীগণ 'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!' বলিয়া সাশ্রুনয়নে গান করিতে লাগিলেন।। ২৩।।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন

বহুকাল হইতে শক্তি ও শক্তিমানের বিষয় আলোচনা হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, জগতে যতপ্রকার অনুভব আছে, সে সমুদয়ই শক্তির অনুভব। শক্তি ব্যতীত কেহ শক্তিমান আছেন কিনা সন্দেহ। শক্তির বস্তুর পরিচায়ক ও প্রকাশক ; অতএব বস্তুর অনুভূতি কিছুমাত্র হয় না, কেবল বস্তুশক্তির অনুভূতি হইয়া থাকে। তাঁহারা যে উদাহরণ দেন, তন্মধ্যে একটী উদাহরণ এইস্থলে প্রদত্ত হইতেছে—"পৃথিবীতে আকৃতি-বিস্তৃতি প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্ম আছে। আমরা যাহাকে পৃথিবী বলি, তাহা কেবল ঐ সকল গুণগণের সমষ্টিমাত্র। গুণগণ পৃথক্ হইয়া গেলে পৃথিবীর আর কিছু থাকে কিনা বলা যায় না। গুণ ও কর্ম্ম—সমস্তই শক্তি। অতএব শক্তিই একমাত্র তত্ত্ব।" আবার কেহ কেহ এরূপ বিতর্ক করেন যে,—"শক্তি কিছুই নয়, বস্তুর অপৃথক্ ধর্ম্মমাত্র। বস্তু যাহা প্রকাশ করে, তাহাকেই শক্তি বলে।" এই বিতর্কে সারগ্রাহী মহাপুরুষগণ এইমাত্র স্থির করিয়াছেন যে,—**শক্তি একটী তত্ত্ব এবং শক্তিমান্ একটী তত্ত্ব। এই দুই তত্ত্ব পৃথক্ হইয়াও অপৃথক্।** মানব-চিন্তা সর্ব্বদা সীমাবিশিষ্ট ; অতএব শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর নিগূঢ়-সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারে না। বস্তুতঃ পৃথক্ হইয়াও **বস্তু ও বস্তুশক্তি** অপৃথক্। **পার্থক্য ও অপার্থক্য যুগপৎ সিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন বস্তু ও বস্তুশক্তির অচিন্ত্য ভেদাভেদাত্মক স্বভাব।** শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত আছে,—

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ।।
মৃগমদ, তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ।।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৯৬-৯৮)

বেদ-বেদান্তেও এই সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে দেখা যায় যে,—'শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ।"

বস্তুতত্ত্ব-বিচারে কৃষ্ণ ব্যতীত আর বস্তু নাই। এইজন্যই শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বয়তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা ব্রহ্মপর বা পরমাত্মপর, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্ব-রূপ বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সহসা সাহস করেন না। বস্তু 'একমাত্র' হইলেও বস্তু-লক্ষ্যকারী পাত্রদিগের অধিকারভেদে বস্তু তিনপ্রকারে প্রকাশ পান। একটী পর্ব্বতকে তিন দিক্ হইতে তিন জনে লক্ষ্য করিতেছেন। পর্ব্বতের উত্তরভাগে কুজ্ঝটিকা আছে। যিনি সে দিক্ হইতে দেখিলেন, তিনি কুজ্ঝটিকা-আবৃত বৃহৎ শিলাখণ্ডকেই পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। পর্ব্বতের দক্ষিণভাগে রৌদ্র পড়িয়াছে। যিনি সে দিক্ হইতে দেখিলেন, তিনি জ্যোতির্ম্ময় শৈল-প্রাচীর বলিয়া পর্ব্বতকে নির্দ্দেশ করিলেন। পর্ব্বতের যে দিকে কোন উপাধি নাই, সেই দিক্ হইতে যিনি দেখিলেন, তিনি পর্ব্বতের সর্ব্বাঙ্গ ভালরূপে দেখিয়া পর্ব্বতের স্বরূপ নির্ণয় করিলেন। অদ্বয়বস্তু-নির্দ্দেশেও পণ্ডিতগণ নিজ নিজ দিগ্‌ভেদে বস্তুকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা কেবল-জ্ঞানের অনুশীলনপূর্ব্বক বস্তু নির্দ্দেশ করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা জড়াস্তিত্বের বিপরীত ভাবকে একটী বিশেষ-রহিত-বস্তুজ্ঞানে অনুসন্ধেয় বস্তুকে নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিঃশক্তি ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাহাতে বস্তুর স্বরূপ পাওয়া গেল না। যাঁহারা বুদ্ধিযোগে বস্তু অন্বেষণ করিলেন, তাঁহারা স্বীয় আত্মার অবিরোধী স্বরূপবিশেষ আত্মসহচর পরমাত্মার দর্শন করেন। যাঁহারা নিরুপাধি-ভক্তিযোগে বস্তু নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার সেই অদ্বয়বস্তুর স্বরূপ লাভ করত সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্বমাধুর্য্যপূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান্ একটী পৃথগ্‌ভূত পরমতত্ত্বরূপ ভগবান্‌কে দর্শন করেন। কঠে (১।২।২৩) লিখিত আছে যে,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।।

[এই পরমাত্মাকে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণাশক্তি বা বহুশাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই 'একমাত্র প্রভু' বলিয়া বরণ করেন, সেই ব্যক্তির নিকটই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন। সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন।]

ভাগবতেও এইরূপ লিখিত আছে,—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।।

(ভাঃ ১০।১৪।২৮)

[হে দেব! যাঁহারা আপনার পাদপদ্মযুগলের কৃপালেশ-মাত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন,

তাঁহারাই কেবল আপনার মহিমাতত্ত্ব জানিতে পারেন ; কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুমানের দ্বারা শাস্ত্র বিচারপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না।]

ব্রহ্মদর্শন ও পরমাত্মদর্শন সোপাধিক অর্থাৎ মায়িক উপাধির বিপরীতভাবে ব্রহ্মদর্শন এবং মায়িক উপাধির অন্বয়ভাবে পরমাত্মদর্শন হয়। কিন্তু নিরুপাধিক চিচ্চক্ষুদ্বারা বস্তু দর্শন করিলে একমাত্র চিন্ময়-ভগবৎ-স্বরূপমাত্র লক্ষিত হয়। ভগবৎ-স্বরূপই বস্তু ও ভগবচ্ছক্তিই শক্তিতত্ত্ব। শক্তিরহিত করিয়া ভগবান্‌কে দর্শন করিলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মদর্শন হয়। প্রবৃত্তি-অনুসারে কেহ কেহ ব্রহ্মদর্শনকেই চরমদর্শন মনে করেন। বস্তুতঃ নিঃশক্তি, নির্ব্বিশেষ ভগবদ্ভাবই ব্রহ্ম এবং শক্তিমান্ সবিশেষ ব্রহ্মই ভগবান্। অতএব ভগবানই স্বরূপতত্ত্ব এবং ব্রহ্ম কেবল তাঁহার স্বরূপের নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব-জ্যোতিঃ। পরমাত্মাও তাঁহার জগৎ-প্রবিষ্ট অংশ। নির্ব্বিশেষ-সন্ধানে ব্রহ্মরূপে প্রতিফলিত হইয়াও ভগবান্ স্বীয় সবিশেষ অচিন্ত্যস্বরূপে জগৎ ও জীব হইতে পৃথগ্‌রূপে নিত্য বিরাজমান। অতএব ভাগবতে বলিয়াছেন,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।। (ভাঃ ১।২।১১)

[যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয়-বাস্তব-বস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই তত্ত্ববস্তু বলেন। সেই তত্ত্ববস্তুর প্রথম প্রতীতি 'ব্রহ্ম', দ্বিতীয় প্রতীতি 'পরমাত্মা' এবং তৃতীয় প্রতীতি 'ভগবান্'।]

অদ্বয়জ্ঞানের শুষ্ক ও নিঃশক্তি-প্রতীতিই 'ব্রহ্ম'। জড়মধ্য-প্রবিষ্ট সূক্ষ্ম আত্মময় প্রতীতিই 'পরমাত্মা'। অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণ সবিশেষ-প্রতীতিই 'ভগবান্'। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ঐশ্বর্য্য-প্রধান ভগবৎ-প্রকাশের নাম—**শ্রীপতি নারায়ণ**। মাধুর্য্য-প্রধান ভগবৎ-প্রকাশের নাম—**রাধানাথ কৃষ্ণ**। অতএব কবিরাজ গোস্বামীর "রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্" এই পদ্য যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা সার্থক।

ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি অঙ্গীভূত করিয়া নারায়ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যধর্ম্মদ্বারা কিয়ৎপরিমাণে আচ্ছাদন করত চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র অদ্বয় বস্তু। অতএব শ্বেতাশ্বতর এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

ন তস্য কার্য্য করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।। (শ্বেঃ ৬।৮)

সেই কৃষ্ণের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ-চিৎস্বরূপ, অতএব জড়দেহ

যেরূপ সৌন্দর্য্য-পরিমিতি-সহকারে একসময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। কৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময়-বৃন্দাবনে নিত্য-লীলাবিশিষ্ট। এরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোন স্বরূপই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না, যেহেতু তাহা অবিচিন্ত্য শক্তির আধার। তাঁহার অবিচিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্য শক্তির নাম—পরাশক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) ভেদে ত্রিবিধা ; অতএব চৈতন্যচরিতামৃতে,—

কৃষ্ণের স্বরূপ, আর শক্তিত্রয়জ্ঞান।
যা'র হয়, তা'র নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান।।
চিচ্ছক্তি-স্বরূপ-শক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম।।
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎকারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ।।
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত।।
এই ত' স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি।।

(চৈঃ চঃ আঃ ২।৯৬, ১০১-১০৪)

অন্যত্র শ্রীমৎ প্রভুবাক্যে,—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১১)

অত্র কারিকা,—

শক্তিঃ স্বাভাবিকী কৃষ্ণে ত্রিধা চেত্যুপপদ্যতে।
সন্ধিনী তু বলং সম্বিজ্জ্ঞানং হ্লাদকরী ক্রিয়া।।
শক্তি-শক্তিমতো ভেদো নাস্তীতি সারসংগ্রহঃ।
তথাপি ভেদবৈচিত্র্যমচিন্ত্যশক্তিকার্য্যতঃ।।
সন্ধিন্যা সর্ব্বমেবৈতৎ নামরূপগুণাদিকম্।
চিন্মায়াভেদতোভেদো বিশ্ববৈকুণ্ঠয়োঃ কিল।।
সম্বিদা দ্বিবিধং জ্ঞানং চিন্মায়াভেদতঃ ক্রমাৎ।
চিন্মায়াভেদতঃ সিদ্ধং হ্লাদিন্যা দ্বিবিধং সুখম্।।
হ্লাদিনী শ্রীস্বরূপা যা সৈব কৃষ্ণ-প্রিয়ঙ্করী।
মহাভাব-স্বরূপা সা হ্লাদিনী বার্ষভানবী।।

[শাস্ত্রে স্বাভাবিকী ত্রিবিধা শক্তি কথিত হইয়াছে। 'বল' (সন্ধিনী), জ্ঞান (সম্বিৎ) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন---ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের সার। তথাপি অচিন্ত্যশক্তির কার্য্য হইতে ভেদবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। নাম-রূপ-গুণ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার সন্ধিনী শক্তির কার্য্য। **চিদ্‌গত-সন্ধিনী ও মায়াগত-সন্ধিনী-ভেদে প্রাপঞ্চিক ও বৈকুণ্ঠগত সত্তার ভেদ সিদ্ধ হইয়াছে।** চিদ্‌গত সম্বিৎ ও মায়াগত সম্বিদ্‌ভেদে জ্ঞানও দ্বিবিধ। সেইরূপ চিদ্‌গত হ্লাদিনী ও মায়াগত হ্লাদিনী-ভেদে হ্লাদিনী শক্তি হইতে 'চিৎসুখ' ও 'মায়িকসুখ' এই দ্বিবিধ সুখ সিদ্ধ হইয়াছে। হ্লাদিনী-শক্তি কৃষ্ণপ্রিয়-দাসী শ্রী-স্বরূপিণী। তিনি মহাভাব-স্বরূপা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা।] **(ক্রমশঃ)**

---জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

❑❑❑❑

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩০ পৃষ্ঠার পর]

আমার কি বৈরাগ্য কম? আমি কি হরিভজন কম করি? আমি আবার আপনাদের নিকট হরিকথা শুনব?" গোপালদাস বৈষ্ণবতার কিছু বুঝিত না। অথচ বৈষ্ণবের গুরু বলিয়া অভিমান করিত। যদিও রাঁধা ভাত চাউল হইতে হইয়া থাকে কিন্তু চাউল সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। কাঁচা চা'ল ও জুড়ান ভাত এক নয়। গোপালদাসের কথার উত্তরে আমি বলিলাম,---"শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ শুধু জিহ্বার দ্বারা হরিনাম করেন না, হরিনাম লইবার অভিনয় করিয়া নামাপরাধ করেন না, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি হরিনাম করিতেছেন। তিনলক্ষ হরিনাম ক'রেও আপনার নরকে গমন হ'বে, আর তিনি নিত্যকাল বৈকুণ্ঠে অবস্থিত।" আমাদের বাবাজী মহারাজ যুক্তবৈরাগ্যের জ্বলন্ত আদর্শ ছিলেন। তিনি অনিকেত ছিলেন। তিনি যে সে কুলে অবস্থিত ধামবাসীর অন্নকে প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতেন। তিনি কায়মনোবাক্যে কাহাকেও উদ্বেগ দিতেন না।

বাবাজী গোপালদাসকে মহাপ্রভুর বাড়ীর উত্তরে কলার বাগিচায় বাসস্থান দেওয়া হইল। সেখানে একটী কুঁড়েঘর করিয়া থাকিতে লাগিল। মাঝে মাঝে অন্যের বাড়ীতে রাঁধা ভাত খাইত। ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ লইত না। সে গৌরকিশোরদাস বাবাজীর অনুকরণ করিতে লাগিল। সে গোয়ালা এবং মুচির অন্ন খাইত। এই মায়াপুরের মুসলমান অধিবাসী ইজ্জৎ মণ্ডল তাহাকে বলিত,---"তুমি গৌরকিশোর বাবাজীর অনুকরণ কর। তুমি যাহাদের অন্ন খাচ্ছ, তুমিও সেই জাত। ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ ছেড়ে ছোট লোকের ভাত খাও। তোমার জাত গিয়াছে। গৌরকিশোরদাস বাবাজীর নজীর দেখাইও না। গৌরকিশোরদাস বাবাজী জাতিবিচারের অতীত।"

গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ তখন কুলিয়ার গঙ্গার চড়ায় ছইএর নীচে বাস করিতেন। তাঁহার ভজনখ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। গোপালদাস শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজীর অনুকরণ করিবার জন্য এস্থান হইতে চলিয়া গিয়া বাবাজী মহারাজের খানিক দূরে কুলিয়ার চড়ায় বাস করিতে লাগিল। যাহারা বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে যাইত তাহাদের নিকট সে তাঁহার অযথা নিন্দা করিত। পরে সকলেই তাহার কপটতা ও হিংসা জানিতে পারিয়া তাহার নিকটে আসিত না। কুলিয়ায় থাকিয়া প্রতিষ্ঠালাভের সুবিধা হইল না বলিয়া পরে রাধাকুণ্ডতীরে বাস করিতে লাগিল। এখান হইতে যাওয়ার প্রায় পাঁচ বৎসর পর তাহার মৃত্যু হয়। বৈষ্ণব-অপরাধের ফলে তাহার নরক-গমন হইয়া থাকিবে।

"অহংমম ভাব"—নামাপরাধ। নাম ও নামাপরাধ দেখিতে এক রকমই। বাহিরের দিকের বিচার থাকিলে অবিবেচনা থাকিবে। আধ্যক্ষিক বিচারে মিছা-ভক্ত ও অন্তরঙ্গ ভক্তকে একরকম মনে হইবে। রূপানুগ-ভজনের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া জড়দেহকে সাজাইতে গিয়া কপট ব্যক্তিগণ সখীভেকী ও সহজিয়া হইয়া পড়ে। প্রকৃতিজাত জগদ্দর্শনে অপ্রাকৃত জগতের বিচার বুঝা যায় না। সহজিয়াগণ নাকে তিলক, গলায় মালা পরেন। শঙ্খ, ঘণ্টা বাজাইয়া স্মার্ত্তবিধি-অনুসারে ধূমধামের সহিত পূজার্চ্চনা করেন। কিন্তু তাঁহাদের দিব্যজ্ঞানের অভাব। দিব্যজ্ঞানের অভাবে অর্চ্চনা হয় না, পুতুলপূজা হয়। অক্ষর মন্ত্র চিন্ময়। অক্ষর-শব্দে যাহা অচ্যুত, তাহাকে বুঝায়। অচেতনের বিচারে নিত্যত্ব নাই। সংখ্যানাম করিলেও প্রাকৃত বিচার থাকা পর্য্যন্ত হরিনাম হইবে না।

দিব্যজ্ঞানযুক্ত হরিকীর্ত্তনকারীকে মায়ার কোন প্রলোভনই প্রলুব্ধ করিতে পারে না। ঠাকুর হরিদাস যখন বেনাপোলের নির্জ্জন গুহায় একান্তভাবে নামভজন করিতেছিলেন, তাঁহর ভজন-প্রতিষ্ঠা যখন চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তখন রামচন্দ্র খাঁ নামে একজন স্থানীয় জমিদার হরিদাস ঠাকুরের ভজন নষ্ট করিবার জন্য একটী যুবতী বেশ্যাকে প্রেরণ করিয়াছিল। বেশ্যা একদিন রাত্রিতে হরিদাসের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজের অসদ্ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। হরিদাস ঠাকুর বলিলেন,—"আমার 'দিব্যজ্ঞান' হয় নাই ব'লে আমি নির্ব্বন্ধসহকারে হরিনাম করি। আমার শতকোটী নামযজ্ঞ সমাপ্ত হয় নাই। আমার কথা বলিবার অবসর নাই। আমার দীক্ষা সমাপ্ত হয় নাই।" দিব্যজ্ঞান না হইলে হরিনাম হয় না। আবার হরিনাম আশ্রয়েই দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। হরিদাস ঠাকুর পতিতার কথায় রাজী হন নাই। রামচন্দ্র খাঁ হরিদাস ঠাকুরের প্রতিহিংসা-পরায়ণ ছিল। রামচন্দ্র খাঁর অপরাধময় বিচারে আমরা বলিতে পারি—যবনের (?) মুখে হরিনাম শুনিব না। শাক্ত ব্রাহ্মণের নিকট হরিনাম ও ভাগবতপাঠ শুনা যাবে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪০৮ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০১

পরবর্ত্তী সময়ে রামচন্দ্র খাঁ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে অবজ্ঞা করিয়াছিল। তাঁহার জন্য গোশালাতে থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিল। শ্রীমন্নিত্যানন্দের শ্রীচরণে অপরাধফলে সে নির্ব্বংশ হইয়াছিল। তাহার গ্রাম জনশূন্য হইয়াছিল।

বৈষ্ণব সাংসারিক বস্তুতে আকৃষ্ট হন না। তিনি যশঃ বা প্রতিষ্ঠা চান না। দিব্যজ্ঞান ও জড়জ্ঞান এক নহে। ভগবদ্ভক্তি কি জিনিষ—এটী অভক্ত-সম্প্রদায় আলোচনা করেন না। আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ও আলোচনা করেন না। যাঁরা দিব্যজ্ঞান লাভ না করেন, তাঁদের অর্চ্চন হয় না। বিদ্বান্, ধনী, কুলীন ও বৈষ্ণব হইবার অভিমান ছাড়িতে হইবে। নামাপরাধ পরিত্যাগ করিতে হইবে। নামাপরাধ দূর না হইলে নাম হয় না।

আধ্যক্ষিক-জ্ঞানের আলোচনা বৃদ্ধি পাইলে বা ভক্তির কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচিত না হইলে জীবব্রহ্মৈক্যবাদ এ'সে পড়ে। জ্ঞানিগণ মুক্ত অভিমান করিয়াও ভগবৎ-সেবারহিত হইয়া সংসারে পতিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।

পুণ্যের সহিত হরিনামে স্বর্গাদিলাভ। পাপের সহিত হরিনামে নরকলাভ। কিন্তু ভক্তগণের বিচার অন্যপ্রকার। তাঁহার স্বর্গ-নরক চান না। ভুক্তিমুক্তি চান না।

প্রকৃত ভারতবাসী কে?

সাধারণতঃ ভারত-ভূখণ্ডে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদিগকে ভারতবাসী বলা হয়। কিন্তু ইহাতে ভারতবাসীর তাৎপর্য্য সংরক্ষিত হয় না। প্রাচীন ভারত যে বিচারধারায় ও আচরণে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল, ভারতীয় ভূখণ্ডবাসী সে ধারায় না চলিলে বা তাহা আচরণ না করিলে তাহাদিগকে ভারতবাসী বলা সঙ্গত হইতে পারে না। পাশ্চাত্ত্যদেশ ভারতকে তাহার গুণ-গরিমার জন্যই ভারতবাসী বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন। সুতরাং ভারতীয় বলিতে প্রাচীন ভারতীয় গুণ ও বিচারধারার আচরণকারীকে বুঝায়। প্রাচীন ভারত বৈদিক শিক্ষাকেই মনে-প্রাণে আচরণ করিতেন। সুতরাং সেই আচরণ যাঁহারা বর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতীয় বলিয়া পরিচয় প্রদানে অযোগ্য হইয়াছেন। বেদই প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের মূল। বেদের শিক্ষাই সেই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র কারণ। তজ্জন্য ভারতীয়গণ ভারতের শিক্ষা মস্তকে ধারণ করিয়া কেশগুচ্ছরূপে পরিচয় প্রদান করিতেন। বর্ত্তমানে ভারতবাসিগণের মধ্যে ইহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া কেশগুচ্ছ-ধারণ বর্জ্জন করিলে ভারতীয় বৈদিক শিক্ষাভ্রষ্ট বলিয়াই তাঁহাদিগকে বুঝা যায়।

মূলতঃ বৈদিক শিক্ষার আচরণকারীকে ভারতবাসী বলা সঙ্গত। বর্ত্তমান ভারত

যে-সব ধর্ম্ম বা শিক্ষা আচরণ করেন, তাহা বৈদিক শিক্ষার অনুকূল ত' নহেই, পরন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার প্রতিকূল। বেদের শিক্ষাই ব্রহ্মবস্তুকে জানা। সেই ব্রহ্মজ্ঞান যে ধর্ম্ম বা আচরণে প্রকাশিত নহে, তাহা ভারতীয়ত্বের পরিচয় হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণই প্রকৃত ভারতবাসী, তাঁহাদের গৌরবেই ভারতের গৌরব। ব্রহ্মজ্ঞ না হইয়া সেই গৌরবের অধিকারী হওয়া যায় না, ইহা খুবই সত্য কথা।

বেদশাস্ত্র যে ভাষায় লিখিত, তাহার নাম সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ব্যতীত কোন ভাষাই ব্রহ্মকে বর্ণন করিতে সক্ষম নহে। অসংস্কৃত ভাষা তজ্জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের অনুপযোগী। একমাত্র যে ভাষা সংস্কৃত অর্থাৎ পরিশুদ্ধ বা ব্রহ্মসেবার উপযোগী, তাহার নাম সংস্কৃত ভাষা। বর্ত্তমান ভারত এই সংস্কৃত ভাষাকে বর্জ্জন করিয়া কিরূপে ভারতীয়ত্ব দাবী করিতে সক্ষম, তাহা সহজেই অনুমেয়। সংস্কৃত ভাষাকে Dead Language বলিয়া বর্জ্জন করিয়া ভারত ভারতীয়ত্বের প্রকৃত দাবীদার হইতে পারে না। বেদের জ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া একান্ত আবশ্যক; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান ভারত এরূপ কুবুদ্ধি আশ্রয় করিয়াছে যে, সেই সংস্কৃত শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে একটুও দ্বিধাবোধ করেন না। সংস্কৃত না জানিলে ব্রহ্মবস্তুকেও জানা অসম্ভব। "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ"—এই বাক্যানুসারে ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞানলাভ করা সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান ব্যতীত অসম্ভব। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষাকেই শীর্ষস্থান প্রদান করা হইত। তখন ইহা আন্তর্জাতিক ভাষারূপেই ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমানে তাহার স্থলে ইংরাজী ভাষা অধিকার লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান ভারত ইংরাজী ভাষা-ভাষীর অনুগত সব কিছু শিক্ষা বা আচরণ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় বলিবার অধিকার তাহারা হারাইয়াছে।

অনুকূল আচরণ গ্রহণ না করিলে অর্থাৎ সত্ত্বগুণ-প্রধান না হইলে বৈদিক শিক্ষা আচরিত হইতে পারে না। তামসিক ব্যবহার ও আচরণদ্বারা কখনই বৈদিক আচরণ পালন করা সম্ভব হয় না। ইহাই বৈদিক শাস্ত্রের শিক্ষা। সুতরাং সত্ত্বগুণ যাহাতে রক্ষিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদনুরূপ আহার-বিহার, আচরণ প্রভৃতি হওয়া আবশ্যক। প্রাচীন ভারতের মনীষীদের আচরণকে অবহেলাপূর্ব্বক দুঃসঙ্গপ্রভাবে ভারত অত্যন্ত তামসিক আচরণ করিতে বর্ত্তমানে গৌরববোধ করে। মৎস্য, মাংস, ডিম প্রভৃতি বর্ত্তমানে উত্তম খাদ্য বলিয়া বর্ত্তমান ভারত তাহাতে অভ্যস্ত হইয়াছে। ইহাতে তাহারা বৈদিক শিক্ষাপালনে সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। বেদ পড়িতে হইলে সত্ত্বগুণ প্রবল হওয়া একান্ত আবশ্যক। কোন বিধর্ম্মীও বেদ জানিতে ইচ্ছা করিলে তজ্জন্য তাহাকে বেশ কিছুদিন অর্থাৎ কয়েকমাস যাবৎ হবিষ্যান্ন বা সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইত।

"ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসা।।" (গীতা ১৪।১৮)

অতএব জঘন্য দেশজ গুণ অর্থাৎ স্ত্রী-সম্ভোগজনিত কদাচারদ্বারা কখনই বৈদিক শিক্ষা আচরিত হইতে পারে না। বিমল ব্রহ্মবিদ্যাই চরমে প্রেমভক্তিতে উন্নীত হইয়া থাকে। সেই প্রেমভক্তিপ্রদাতা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তজ্জন্য সমস্ত পৃথিবীকে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইবার আচরণ শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে মৎস্য-মাংসাদি অমেধ্য বস্তু ও তামসিক বস্তু অবশ্যই বর্জ্জন করিতে হইবে। অধুনা সমগ্র বিশ্ব তাঁহার প্রেমভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, ইহা বড়ই সৌভাগ্যের কথা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শানুযায়ী তাহারা আজন্ম অভ্যস্ত তামসিক আহার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করত সাত্ত্বিক আহার নিরামিষ ও সত্ত্বগুণ-প্রধান আহার্য্য গ্রহণ করিতে সর্ব্বতোভাবে আদরযুক্ত হইয়াছেন। তাহারাই প্রকৃত ভারতবাসী বলিলে কিছু-মাত্র ভুল হয় না। আর ভারতে বসবাস করিয়া যাহারা সাত্ত্বিকবস্তুকে অনাদর করত তামসিক আহার্য্য গ্রহণ করিতেছেন, তাহারা প্রকৃত ভারতবাসী হইবেন কি-প্রকারে? স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে প্রাচীন ভারতীয় আচার-বিচার, বেশভূষা, আহার্য্যাদিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা ভারতীয় বলিবার অধিকারী হইতেছেন এবং ভারতবাসিগণ তদ্বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া ভারতীয়ত্বের দাবী হারাইয়া তমোগুণাপন্ন দেশীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। ভারতবাসী হইয়া নিরামিষ গ্রহণ ও হরিনাম করিতে ঘৃণা ও লজ্জাবোধ করেন। আর বিদেশীয়গণ ভারতীয় আচার-বিচারকে মঙ্গলজনক বিবেচনা করিয়া তাহা আচরণ করিতে পরমোৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। ইহা কি বর্ত্তমান ভারতে দুর্ভাগ্যজনক নহে?

শিক্ষাবিভাগে এইরূপ পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছে। তাঁহারা সংস্কৃত শিক্ষার অনাদর করিতেছেন এবং তামসিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতেছেন—ইহা বড় দুঃখের বিষয় নহে কি? ছাত্রছাত্রীদের বেশভূষার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহারা বৈদেশিক বলিয়া ধারণা জন্মে। খাদ্যাদির বিচারেও তামসিক আহার্য্যাদি যাহা তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতেন, তাহা তাহাদের রুচিকর হইয়া পড়িয়াছে। ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় অধিক আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমান স্কুল-কলেজে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা বর্জ্জিত হইয়াছে। হরিনাম করা লজ্জাকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং ইহাদিগকে ভারতবাসী বলা কি সঙ্গত হইতে পারে?

ভোগ ও সেবা বা ভক্তি পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম। নিজ ইন্দ্রিয়ের সুখচেষ্টাকে ভোগ বলা হয়। কৃষ্ণের সুখবিধানকে ভক্তি বা উন্নত-অবস্থায় প্রেম বলে। শ্রীমন্ গৌর-নিত্যানন্দ প্রভুর ইহাই বিচার। শুধু তাহাই নহে, বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের ইহাই অভিমত। ধর্ম্ম, অর্থ এমন কি মোক্ষকেও ভক্তি বলিয়া বলা হয় নাই। মোক্ষকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোগ বলা হইয়াছে। 'তাহার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতবপ্রধান। যাহা হৈতে

কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।।" যাবতীয় জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিজ সুখস্বরূপ ব্রহ্মে সেবাবিহীনভাবে যুক্ত হওয়া ভোগেরই পরিচয়। প্রকৃত মোক্ষকে বিষ্ণুপাদপদ্ম-সেবা বলিয়াই বলা হইয়াছে। সাযুজ্য-মুক্তিতে সেই সেবা প্রকাশ পায় না। তজ্জন্য ঐরূপ মোক্ষকে জড় ভোগবাদ বলা হইয়াছে। মহাপ্রভুর শিক্ষা আলোচনা করিলে দেখা যায়, এইরূপ মোক্ষে কৃষ্ণভক্তির উৎপত্তি হয় না। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণের সেবা বা প্রীতিবিধানই তাহার নিত্যধর্ম্ম। সাযুজ্য-মুক্তিতে সেবার কোন সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য প্রকৃত বৈদিকশিক্ষায় সাযুজ্য-মুক্তিকে প্রশ্রয় দেন নাই। তটস্থাশক্তি জীব কৃষ্ণদাস্যেই প্রতিষ্ঠিত। পরন্তু কৃষ্ণবিমুখতা-হেতু তাহার এই ধর্ম্মের বিপর্য্যয় হইয়া থাকে।

"কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে।।"

কৃষ্ণদাস্য পরিত্যাগ করত মায়ামোহিত জীব ভোগী সাজিলে দুঃখই তাহার ফলস্বরূপে লভ্য হয়। জীবকে ইহা বুঝাইবার জন্য বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের আবির্ভাব।

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ।।"

অসৎসঙ্গ-প্রভাবে জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা লাভ করে এবং সৎসঙ্গ-প্রভাবে বিমুখতা পরিত্যাগ করত কৃষ্ণসেবায় অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে। সুতরাং শাস্ত্রের উপদেশ,—"মহৎ-সেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্"—বাক্যানুসারে বহির্ভারত সর্ব্বাধিকরূপে যোষিৎসঙ্গসুখ-উপযোগী আচার-বিচারকে উন্নতি বলিয়া বিচার করিলেও তাহা চরম অবনতি বলিয়া বিবেচিত হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব বহির্ভারতে উন্নতিশীল দেশগুলিকে প্রকৃত উন্নত বলা উচিত নহে, পরন্তু তাহা পরম অনুন্নত। যোষিৎসঙ্গ পরম উন্নতি লাভের প্রধান অন্তরায় বলিয়া সমস্ত শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। যোষিৎসঙ্গের উন্নতি নরকাদি জ্বালা-যন্ত্রণার হেতু হইয়া থাকে।

যমরাজের উক্তিতে প্রকাশ পায়, মুকুন্দপাদপদ্ম অনুশীলনবিহীন যে গৃহ, তাহা নরকের দ্বার। তাহাতে আসক্ত ব্যক্তিগণ অবশ্যই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেন। পরন্তু যে গৃহে ভগবৎসেবা আচরিত হয়, তথায় যমরাজ পর্য্যন্ত দণ্ডপ্রদানে অসমর্থ। সুতরাং বর্ত্তমান ভারত ভোগবিলাসে যত উন্নত বলিয়া মনে করেন, ততই তাহার নিজ মঙ্গল হইতে বিচ্যুত হইয়া যমযাতনার পাত্র হইতেছেন। ইহা প্রকৃত আদিকালের ভারতীয় শিক্ষা।

মহাবদান্য গৌর-নিত্যানন্দ এই শিক্ষাই সমস্ত জগতে তাঁহার নিজ ভক্তগণদ্বারা প্রচার করত পতিত জনগণের প্রতি পরমমঙ্গল প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার নিজমুখের অভিব্যক্তি,—

"পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবেক মোর নাম।।"

সুতরাং যাঁহারা এই বাণীকে সার্থকভাবে রূপদান করিতেছেন, তাঁহারা মহাবদান্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলকারী বলিয়া সর্ব্ববরেণ্য হইতেছেন। তাঁহারাই প্রকৃত ভারতবাসী।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

বৈষ্ণবসেবা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩৩৮ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীকৃষ্ণসেবায় কেবলমাত্র ভজনীয় বস্তুর সেবা হয়, কিন্তু ভক্তসেবায় ভক্তিদাতা ভক্তের ও ভজনীয় ভগবানের সেবা পূর্ণ হয়। বৈষ্ণবের সেবা আমাদের নিত্য কৃত্য। ভক্তিসন্দর্ভ ২৬১ অনুচ্ছেদে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

তেষাং পূজাদিকং গন্ধধূপাদ্যৈঃ ক্রিয়তে নরৈঃ।
তেন প্রীতিং পরাং যামি ন তথা মম পূজনাৎ।।

"যাহারা গন্ধ-পুষ্পাদিদ্বারা মদীয় ভক্তগণের পূজা করেন, তাহাতে আমি পরমপ্রীতি লাভ করিয়া থাকি, পরন্তু নিজের পূজাতে সেইরূপ প্রীতিলাভ করি না।" ভগবানের সেবা হইতে ভক্তসেবা বড় শুনিয়া ভগবানের সেবাকে লঘুজ্ঞান করা অপরাধ। বরং ভক্ত ও ভগবানের ভক্ত থাকিয়া যে ভক্তের সেবায় ভক্তারাধ্য ভগবানের সেবালাভ হয়, সেই ভক্তের অধিক সেবায় ভগবানের অধিক প্রীতি হইবে জানিয়া নিরন্তর ভক্তানুগত্যে ভগবানের সেবা করিতে হইবে। ভক্ত বিদুর শ্রীমৈত্রেয়কে (ভাঃ ৪।১৭।৭) "ভক্তায় চানুরক্তায় এব চাধোক্ষজস্য চ" শ্লোকে বলিয়াছেন,—"আমি আপনার ও অধোক্ষজ ভগবানের ভক্ত ও অনুরক্ত।"

বৈষ্ণবগণই জীবের প্রকৃত পূজার দেবতা

ভক্তিপথাশ্রিত সজ্জনগণের পক্ষে বৈষ্ণবই দেবতা, বান্ধব, আত্মীয় ও একমাত্র প্রীতির পাত্র। বৈষ্ণবে প্রীতি ও বৈষ্ণবসেবাই কৃষ্ণপ্রীতিলাভের একমাত্র উপায়। বৈষ্ণবের নাম, গুণ, লীলাকীর্ত্তন, বৈষ্ণবের আরাধনা, বৈষ্ণবের পরিচর্য্যা, বৈষ্ণবের পদধূলি, বৈষ্ণবের চরণামৃত, অধরামৃত কৃষ্ণভক্তি প্রদানে কি অমূল্য সম্পদ্ তাহা ভাষায় বর্ণনা করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। বৈষ্ণবগণ নিমেষকাল যেস্থানে অবস্থান করেন, নিখিল মঙ্গল তথায় উপস্থিত হয়, সেই স্থান "তত্তীর্থং তত্তপোবনং" তীর্থস্বরূপ ও তপোবনে পরিগণিত হয়। বৈষ্ণবের দর্শনে, স্পর্শনে ও সেবায় কোটি কোটি পিতৃপুরুষ পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ করেন। সুতরাং তীর্থ অপেক্ষাও বৈষ্ণবের মহিমা অধিক। বৈষ্ণব

নিখিল তীর্থরাজিরও পবিত্রতা বিধানকারী অর্থাৎ তীর্থেরও তীর্থস্বরূপ। ক্ষণমাত্র বৈষ্ণবসেবায় অভিলষিত বস্তু লাভ হয়।

কিং দানৈঃ কিং তপোভির্ব্বা যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ কৃতৈঃ।
সর্ব্বং সম্পদ্যতে পুংসাং বিষ্ণুভক্তাভি পূজনাৎ।।
পূজয়েৎ বৈষ্ণবানেতান্ প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।
স্বভক্ত্যা বৈষ্ণবেভ্যো যদত্তং স্যাদক্ষয়ং ভবেৎ।।

"দান, তপস্যা ও বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের কি ফল? কিন্তু বৈষ্ণবের সেবাপূজা করিলে নিখিল সম্পত্তি লাভ করা যায়। সজ্জনব্যক্তিমাত্রেরই যত্নসহকারে বৈষ্ণবগণের পূজা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যিনি সাধ্যানুসারে বৈষ্ণবগণকে যাহা দান করেন, তাহা অক্ষয় ফলদ হইয়া থাকে।" এই প্রসঙ্গে পাদ্মোত্তরখণ্ডে পাওয়া যায়,—

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ।।

"সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা বৈষ্ণবগণকে পূজা করিবে। মহাভাগবতগণের পূজায় সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নাশ হয়।" শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—"যদি থাকে বহুধন, নিজে হবে অকিঞ্চন, বৈষ্ণবের কর সমাদর।" বৈষ্ণবসেবার ফলেই সকলপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

পদ্মপুরাণে যমরাজ যমদূতগণকে বলিয়াছেন,—

বৈষ্ণবো যদ্গৃহে ভুঙ্ক্তে যেষাং বৈষ্ণব-সঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গহতকিল্বিষাঃ।।

"যাঁহাদের গৃহে বৈষ্ণব ভোজন করেন, যাঁহাদের বৈষ্ণবসঙ্গ লাভ হয়, হে দূতগণ, তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, তাঁহারা বৈষ্ণবসঙ্গগুণে নিষ্পাপ।"

দেবতাগণ নিজ নিজ আরাধকের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিয়াও সেবকগণকে অনিত্য দুঃখপ্রদ বিষয়দানে বিষয়ী করিয়া রাখেন এবং সমুপেত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেন না, আর বৈষ্ণবগণ আশ্রিত জনগণকে জীবন্তেই কৃষ্ণসেবানন্দ প্রদানে চিরকৃতার্থ করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অক্রূরকে বলিয়াছেন,—

ভবদ্বিধা মহাভাগা নিষেব্যা অর্হসত্তমাঃ।
শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ।। (ভাঃ ১০।৪৮।৩০)

"আপনার ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণ আত্মকল্যাণাকাঙ্ক্ষী মানবগণের নিকট সর্ব্বদাই পূজার যোগ্য—দেবগণ কেবল স্বার্থপর, সাধুরা তদ্রূপ নহেন।" শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৪৮।৩০) টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন,—"মনুষ্যগণ দেবতাদিগের সেবা করিয়া থাকে ইহা প্রসিদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু দেবগণ কেবল স্বকার্য্যসাধনে তৎপর, সাধুগণ স্বার্থপর নহে, কেবল পরানুগ্রহপরায়ণ। পরমার্থবিচারে সাধুগণই দেবতা, অতএব তাঁহারাই সেব্য।" আদিপুরাণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয়ঃ মা ভজস্বান্য দেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবমিদং জগৎ।।

"হে অর্জ্জুন! একমাত্র বৈষ্ণবগণকে ভজনা কর, অন্য কোন দেবতার ভজন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। একমাত্র বৈষ্ণবগণই সর্ব্বদেবতা ও সমগ্র জগৎকে পবিত্র করিয়া থাকেন।"

বৈষ্ণবসেবায় অনাদরকারীই দাম্ভিক

'বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত ভগবৎসেবা হয় না'—শাস্ত্রের এই বাক্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা ভগবানের সেবা করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন, তাহারা ভক্তের অভিমানে দাম্ভিক। তাহাদের সেবাপূজা ভগবান্ কখনও গ্রহণ করেন না। এই প্রসঙ্গে হরিভক্তিসুধোদয়ে পাওয়া যায়,—

অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ।।

"যাহারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া সেই গোবিন্দের ভক্তগণের পূজা না করে, তাহারা দাম্ভিক, কখনই বিষ্ণুর কৃপাপাত্র নহে।", যাহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবাবিমুখ, তাঁহাদিগকে ধিক্কার দিতে গিয়া পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন,—

যদাগারেঽকৃষ্ণসেবা কার্ষ্ণ্যসেবা তথৈব চ।
শ্মশানতুল্যং তদ্বিপ্র স এব শ্বপচাধমঃ।।
তন্মন্দিরং চিতাতুল্যং তদ্বর্ণনং খরোপমম্।
শুনস্তুল্যং তদাস্যং যঃ কার্ষ্ণ্য-কৃষ্ণবহির্ম্মুখঃ।।

"যে গৃহে শ্রীকৃষ্ণের বা তাঁহার ভক্তের সেবা হয় না, তাহা শ্মশানতুল্য ; সেই গৃহস্বামী বিপ্র হইলেও চণ্ডাল হইতে অধম। যে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের প্রতি বিমুখ তাহার গৃহ চিতাসদৃশ, তাহার বর্ণনা গর্দ্দভের ন্যায় ও তাহার মুখ কুকুরের মুখের তুল্য।"

বৈষ্ণবের সেবাপূজাই মঙ্গললাভের একমাত্র পথ

ভক্তের আনুগত্যেই অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা করা আবশ্যক। এই জন্যই পূজার আদিতে শ্রীগুরুপূজা এবং পূজার অন্তে গুরুপূজার ব্যবস্থা রহিয়াছে। অর্চ্চামূর্ত্তি সাক্ষাৎ ভগবান্। আবার ভক্তের হৃদয়ে সাক্ষাৎ ভগবান্ সর্ব্বদা অনুভূত হইয়া বিরাজিত। কিন্তু শ্রদ্ধার অভাবে অর্চ্চামূর্ত্তির বহুকাল সেবা করিলেও জীবের মঙ্গললাভ হয় না, কিন্তু স্বল্পকাল ভক্তের সেবা করিলে তৎফলে শ্রদ্ধালাভ হয় এবং অর্চ্চার অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি হয়। শুধু তাহাই নহে, শ্রদ্ধা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রতিভক্তি ও প্রেমলাভে নিজহৃদয়ে ও সর্ব্ববস্তুর অভ্যন্তরে অবস্থিত শ্রীভগবানের দর্শনলাভ হয়। অতএব অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা অপেক্ষা অপ্রাকৃত ভক্তসেবাই জীবের মঙ্গলদায়ক—ইহা স্বয়ং ভগবানেরই মত।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪০৮ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০১

জ্ঞান

আমরা সকলেই জ্ঞানলাভ করিবার জন্য প্রয়াসী। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। সেই সচ্চিদানন্দের নিত্যদাস্যসূত্রে জীব স্বরূপতঃ চিন্ময়তত্ত্ব এবং তজ্জন্যই জ্ঞানলাভে সর্ব্বদা প্রয়াসী। কিন্তু মায়াগ্রস্থ জীব আমরা আজকাল সন্তান-সন্ততিকে জ্ঞানী করিয়া তুলিবার জন্য কতই না প্রযত্ন করিতেছি। পিতামাতা বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহাদের জ্ঞানার্জ্জনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হইতেছে—বিষয়সুখ ভোগ। ইহজগতে প্রায় সকলেই জড়জ্ঞানে মত্ত হইয়া বিষয়সুখ ভোগের জন্য ধাবমান হইতেছেন বটে, তাহাতে কিন্তু মঙ্গলের কোনও সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য আমরা প্রকৃত জ্ঞান কি? অর্থাৎ কি-প্রকার জ্ঞানার্জ্জনের দ্বারা শোক-মোহ-ভয় দূরীভূত করিয়া শান্তিলাভ করা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

যন্মৈথুনাদি- গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেতধীরঃ।। (ভাঃ ৭।৯।৪৫)

হস্তদ্বয়ের কণ্ডূয়নতুল্য অত্যন্ত দুঃখদায়ক গৃহস্থগণের স্ত্রীসম্ভোগাদি তুচ্ছ সুখে বহু দুঃখভাক্ কামুকগণ তৃপ্তিলাভ করে না, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিই ভগবৎকৃপায় কণ্ডূয়নের ন্যায় কামকে সংযত করিয়া থাকেন।

জগতের তথাকথিত জ্ঞানিগণ যতই জড়জ্ঞান অর্জ্জন করুন না কেন, তাঁহারা ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই চারিটী দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত যে সমস্ত জ্ঞান বা বিজ্ঞান পদ্ধতি, তদ্দ্বারা দেশের বা জীবের কোনই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না।

ভ্রম ঃ—অর্থাৎ যে বস্তু যাহা নহে, তৎসম্বন্ধে মিথ্যা জ্ঞান। যথা—রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম।

প্রমাদ ঃ—অর্থাৎ অনবধানতা। এক কথা অন্যপ্রকারে উপলব্ধি করা বা শ্রবণ করা বা বলা।

বিপ্রলিপ্সা ঃ—অর্থাৎ বঞ্চনেচ্ছা।

করণাপাটব ঃ—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অপটুতা। যথা—চক্ষুর দূরদর্শনরাহিত্য, ক্ষুদ্রবস্তু দর্শনরাহিত্য, কামলাদি রোগে বর্ণ (রূপ) জ্ঞানের বিপর্য্যয়, সুদূরস্থিত শব্দগ্রহণে অক্ষমতা।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪০৮ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০১

পাঁচপ্রকারের অজ্ঞানতাবশতঃ আমাদের জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয় না।

১। অজ্ঞান—জড়দেহে আমি বুদ্ধি, ২। বিপর্য্যয়—জড় ভোক্তা-অভিমান, ৩। ভেদ—দ্বিতীয় অভিনিবেশ, ৪। ভয় ও বিরূপ গ্রহণ, ও ৫। শোক।

এই পাঁচটী অজ্ঞান হইতে বিমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ কোনমতেই সম্ভব নয়।

তজ্জন্যই শ্রীগীতায় বলিলেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।। (গীতা ৪।৩৪)

তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট প্রণতিদ্বারা, পরিপ্রশ্নদ্বারা ও সেবাদ্বারা সেই তত্ত্বজ্ঞান জানিও, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ প্রদান করিবেন।

উপনিষদেও বলিয়াছেন,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণি শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।। (মুণ্ডক ১।২।১২)

জড় ইন্দ্রিয় হইতে অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকাদি হইতে লব্ধ যে জ্ঞান অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ অনুভূতিকে যে জ্ঞান বলা হয়, উহা কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান নহে ; উহা জড়ীয় জ্ঞান।

অনেকে অষ্টাঙ্গ যোগবিভূতির দ্বারা জ্ঞান আহরণ করিতে যান। অষ্টাঙ্গযোগ হইতেছে,—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। কিন্তু ইহাতেও প্রকৃত জ্ঞান বা সম্যক্ জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে।

আবার কেহ কেহ বলেন,—ব্রহ্মানুভূতিই একমাত্র জ্ঞান। যদি ইহাই একমাত্র জ্ঞান হইত অর্থাৎ এই জ্ঞান সুখের হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানী, নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মানন্দে বিহ্বলচিত্ত, মায়াশয়ন হইতে উদ্বুদ্ধ ও মহাযোগী শ্রীশুকদেব গোস্বামী এই ব্রহ্মানুভূতিকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া বন হইতে তাঁহার পিতৃদেব শ্রীবেদব্যাসের নিকট ফিরিয়া আসিয়া লোকসমূহের মঙ্গলকারী, ভগবল্লীলাময়, সর্ব্বশান্তিনিকেতন, সর্ব্বপুরুষার্থসাধক, সর্ব্ববেদতুল্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ অধ্যয়ন করিতেন না এবং শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তনে মগ্ন হইতেন না। সুতরাং শুদ্ধজ্ঞানই জ্ঞান। চিৎতত্ত্বের শুদ্ধ অবস্থায় শুদ্ধজ্ঞান হয়। এই জ্ঞান হইতেছে ভক্তিপোষক। "কেবলজ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনা।"

জ্ঞান পাঁচপ্রকার ; যথা,—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় জ্ঞানকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। যাহাকে প্রাকৃত বা জড় প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান বলা হয়, তাহাই জীবের অজ্ঞান বা অবিদ্যা। অপ্রাকৃত জ্ঞানই বিদ্যা। যে-সকল জীবের অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয়ে প্রাকৃত জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের নিকট পরমজ্ঞানরূপ অপ্রাকৃত জ্ঞান উদিত হইয়া অপ্রাকৃত পরতত্ত্বকে প্রকাশ করে।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।। (গীতা ৭।২)

হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে জ্ঞানানুভূতির সহিত এই শাস্ত্রীয় জ্ঞান সমগ্রভাবে বলিব। যাহা জানিলে তোমার শ্রেয়মার্গে অবস্থিত জানিবার বিষয় আর অবশিষ্ট থাকিবে না। অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন,—আমার চিৎ ও অচিৎশক্তিসম্পন্ন স্বরূপবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাকে জ্ঞান বলা যায়। সেই শক্তিদ্বয় হইতে বিবিক্ত স্বরূপবিষয়ক জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান। আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপদেশ করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। যাঁহা অবগত হইলে জগতে আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকিবে না।

এই শ্লোকে ভগবান্ জ্ঞান ও বিজ্ঞান দুইটী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। শাস্ত্রসমূহের আলোচনা ও গুরুপদেশের অনুসরণক্রমে যে ধারণা জন্মে, তাহাই জ্ঞান। বিচারে পরিপক্কদশায় অপরোক্ষভাবে স্বতঃ হৃদয়ে যে অনুভূতি আবির্ভূত হয়, তাহাই বিজ্ঞান। একটী ক্ষুদ্র উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।—

একজনকে রসগোল্লা সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া হইল যে, দুগ্ধ হইতে ছানা প্রস্তুত হয়। সেই ছানাকে গোলাকার করিয়া চিনির রসে ডুবাইলে সুমিষ্ট রসগোল্লা হয়। রসগোল্লা সম্বন্ধে তাহার কিছুটা জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু তাহার কোন রসানুভূতি হইল না। তাহাকে যদি মিষ্টি দোকান হইতে একটী রসগোল্লা আনিয়া খাওয়ান যায়, তাহা হইলে রসগোল্লা সম্বন্ধে তাহার সম্যক্ জ্ঞান উপলব্ধি হইবে অর্থাৎ সে পরিতৃপ্তি লাভ করিবে।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে,—মদ্বিষয়িণী আসক্তি জন্মিবার পূর্ব্বে ভক্তের হৃদয়ে মদ্বিষয়ক ঐশ্বর্য্যময় জ্ঞান জন্মে। তদনন্তর আমার মাধুর্য্যময় ভাব উপলব্ধিরূপ বিজ্ঞানের উপলব্ধি হয়। এতদুভয় তুমি শ্রবণ কর। সংসারের সকল জ্ঞানই এই অনির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই পরমতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে আর কোনই জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে না।

শ্রীল জীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের (১।২।২১) টীকায় জ্ঞান বলিতে বলিয়াছেন,—"জ্ঞানং চিদেকরূপম্। অদ্বয়ত্বং চাস্য স্বয়ংসিদ্ধ তাদৃশাতাদৃশতত্ত্বান্তরা ভাবাৎ সশক্ত্যেক সহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ। তত্ত্বমিতি পরম পুরুষার্থতাদ্যোতনায় পরমসুখরূপত্বং তস্য জ্ঞানস্য বোধ্যতে।"

ব্রহ্মজ্ঞ ভরত রাজা রহূগণকে জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন,—

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরন্ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি।।

(ভাঃ ৫।১২।১১)

অদ্বয়জ্ঞানই সত্য। সেই জ্ঞান বিশুদ্ধ (গুণাতীত), পরমার্থ (মোক্ষপ্রদ), এক (অদ্বিতীয়) সর্ব্বব্যাপক ও নির্ব্বিকল্প। ইহার দ্বারা অদ্বয়জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি "ব্রহ্ম" লক্ষিত হইতেছেন এবং প্রত্যক্ (সর্ব্বজীবের অন্তরে বিরাজমান) ও প্রশান্ত (ক্ষোভশূন্য)—ইহার দ্বারা অদ্বয়জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রতীতি "পরমাত্মা" লক্ষিত হইতেছেন এবং সেই জ্ঞানের পূর্ণ প্রতীতির নাম "ভগবান্"। কবিগণ তাঁহাকেই বাসুদেব বলেন। তিনিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, আশ্রয়, পরমাত্মার অংশী এবং ভক্তগণের উপাস্য বস্তু।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"যাহার দ্বারা জ্ঞাতার জ্ঞেয়বস্তুর উপলব্ধি হয়, তাহাই জ্ঞান বা সম্বিৎ। সেই জ্ঞেয় চিৎ এবং অচিৎ। অতএব জ্ঞান চিদ্বস্তুকে উপলব্ধি করিতে পারে না। কারণ জ্ঞান রজস্তম অতিক্রম করিতে না পারিলে তাহার পক্ষে চিজ্জগতের উপলব্ধি অসম্ভব। যাহা রজস্তম মিশ্রিত তাহাই জড়জ্ঞান এবং যাহা রজস্তমবর্জ্জিত তাহাই প্রকৃত জ্ঞান বা সম্বিৎ।"

ভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাকে এইরূপ উপদেশদ্বারা অনুভব করাইয়াছিলেন,—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতম্।
স রহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।। (ভাঃ ২।৯।৩০)

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—'হে ব্রহ্মন্! ভগবৎস্বরূপোপলব্ধি ও রহস্য প্রেমভক্তির সহিত অত্যন্ত গোপনীয় শব্দশাস্ত্র প্রতিপাদ্য আমার জ্ঞান ও সেই প্রেমভক্তির অঙ্গ সাধনভক্তি আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর অর্থাৎ ভক্তিই হইতেছে প্রকৃত জ্ঞান।

জ্ঞান কথাটী বলিলেই তিনটী কথা আসিয়া পড়ে। যথা,—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা। জ্ঞান স্বরূপতঃ একবস্তু এবং সম্বন্ধতঃ তিন বস্তু। এ বিষয়ে গীতায় বলিতেছেন,—

জ্ঞানং জ্ঞেয় পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ।। (গীতা ১৮।১৮)

জ্ঞান, জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বস্তু ও পরিজ্ঞাতা অর্থাৎ যিনি জানেন—এই তিনপ্রকার কর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ এবং করণ অর্থাৎ সাধন। কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়ার ইপ্সিত বিষয় ও কর্ত্তা অর্থাৎ অনুষ্ঠানকারী—এই তিনপ্রকার কার্য্যের ব্যবস্থা।

পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিয়াছিলেন,—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ।। (গীতা ৯।১)

হে অর্জ্জুন! এই সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয় পরম রহস্যযুক্ত জ্ঞান—ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান অসূয়াশূন্য তোমাকে বলিতেছি, যাহা জানিলে অমঙ্গল হইতে মুক্ত হইবে। এখানেও জ্ঞান ও বিজ্ঞান দুইটী শব্দের প্রয়োগ আছে।

শাস্ত্রে ও আচার্য্যের উপদেশজনিত পরোক্ষ অনুভবের নাম জ্ঞান। বিচারদ্বারা

বিরুদ্ধ আশঙ্কা অপগমজনিত যে অনুভব, তাহাই বিজ্ঞান। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি অপেক্ষা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই ভক্তিই প্রধানীভূতা ও কেবলা। তন্মধ্যে কেবলাভক্তিই নিরতিশয় প্রবলা।

এখানে গুহ্যতম বলিয়াছেন, কারণ মোক্ষ উপযোগী জ্ঞান—গুহ্য, ভক্তিতত্ত্ব স্বরূপজ্ঞান—গুহ্যতর এবং কেবল যে শুদ্ধাভক্তি লক্ষণজ্ঞান—তাহা গুহ্যতম।

উপনিষদ্ বলিলেন,—

যদাহতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসস্থিত এব কেবল।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী।।

(শ্বেতাশ্বতর ৪।১৮)

যে-সময়ে 'অতম' অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন প্রাকৃত দিবা বা রাত্রি থাকে না, সৎ ও অসৎ থাকে না অর্থাৎ দ্বৈত ভদ্রাভদ্রজ্ঞানরূপ মনোধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়। কেবল পরম মঙ্গলময় অদ্বয়জ্ঞান ভগবানই থাকেন। তিনিই অক্ষর। তিনি সবিতার বরণীয় তেজ। তাঁহা হইতেই সনাতনজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ।।

(ভাঃ ১১।১১।৩২)

ইহার ভাবার্থ এই যে,—আমাকর্ত্তৃক বেদরূপে নির্দ্দিষ্ট স্বধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের গুণদোষ সম্যক্ রূপে বিচার করিয়া যে ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে, হে উদ্ধব! তিনি সত্তম। অজ্ঞানপ্রযুক্ত বা নাস্তিক্যহেতু বেদবিহিত স্বধর্ম্ম পরিহার করিলে কি সত্তমরূপে পরিগণিত হইবেন? উত্তরস্বরূপে কথিত হইতেছে যে,—না। "ধর্ম্মাচরণ-বিষয়ে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি গুণসমূহ এবং বিরোধী দোষসমূহের বৃত্তান্ত যথাযথরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া অন্যান্য কর্ম্ম আমার ধ্যানের বিক্ষেপক বুঝিয়া এবং কেবল আমার ভক্তির দ্বারা সকলই সিদ্ধ হইবে—এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে সত্তম নামে অভিহিত হইবেন।

এস্থলে ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মফলসমূহ পরিত্যাগ করিয়া—এইরূপ অভিপ্রায় লক্ষিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। জ্ঞান নিশ্চয়ই চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। সম্যক্ জ্ঞানোদয়নিমিত্ত সন্ন্যাসীদিগেরও নিষ্কাম কর্ম্মসাধন একান্ত কর্ত্তব্য। কর্ম্মদ্বারা সম্যক্ চিত্তশুদ্ধি সংঘটিত হইলে তাঁহাদিগের আর কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। ভক্তির ভাব অন্যরূপ। তাহা পরম স্বতন্ত্রা, মহাপ্রবলা। তাহা চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে না। মধুময় শ্রীবৃন্দাবনে যে মধুর রাসলীলার অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীভগবান্ বসুন্ধরাকে ধন্য করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে উপসংহারকালে শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে যে,—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।। (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

ব্রজাঙ্গনাগণসহ শ্রীভগবানের এই ক্রীড়ালীলা যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া নিরন্তর শ্রবণ ও বর্ণন করেন, তিনি শ্রীহরির প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তিলাভ করিয়া শীঘ্রই বাসনাজনিত পাপ-তাপাদি হৃদ্রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যাহারা পাপ-তাপাদিরূপ হৃদ্রোগে পরিক্লিষ্ট, তাদৃশ অধিকারিগণের হৃদয় অপ্রাকৃত জ্ঞানদ্বারা নির্ম্মল হইয়া যায় এবং তদ্দ্বারা কামাদি তিরোহিত হইয়া যায়।

প্রবৃষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি সমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ।। (ভাঃ ২।৮।৫)

অর্থাৎ শ্রীহরির সুপবিত্র নাম কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিলে হৃদয়ের ভাবসমূহ পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ সুপরিষ্কৃত করিয়া দেন। শরৎকালাগমে সলিলরাশি যেরূপ নির্ম্মল হইয়া থাকে, শ্রীভগবানের কৃপায় তদীয় নামপ্রভাবে মানবের হৃৎপদ্মও সেইরূপ সুনির্ম্মল হয়। ইহাতে মনে হইতে পারে—যদি কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারাই চিত্তসংশুদ্ধি জন্মে, তাহা হইলে ভক্তগণ কেন অনর্থক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন? ইহার প্রকৃত তত্ত্ব হইতেছে যে,—অভীষ্টসিদ্ধির জন্য যে যে সাধনা মনুষ্য অবলম্বন করিয়া থাকে, ভক্তির তুলনায় তৎসমস্ত অতি অকিঞ্চিৎকর। হৃদয়ে ভক্তিকণার আবির্ভাব হইলে ক্রমশঃ পাপতাপ তিরোহিত হইয়া যায় এবং মনুষ্য চিত্ত শুদ্ধ্যাদিরূপ পরমসুখময় অবস্থা অর্থাৎ অপ্রাকৃত জ্ঞানময় অবস্থা স্বতঃপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং যে ভাগ্যবানের হৃদয়ে দেবদুর্ল্লভ ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তাহার কঠোর কর্ম্ম সাধনাদিরূপ অনুষ্ঠানপরম্পরা অবলম্বন করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

শ্রেয়সামিহ সর্ব্বেষাং জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পরম্।
সুখং তরতি দুষ্পারং জ্ঞান-নৌর্বসনার্ণবম্।। (ভাঃ ৪।২৪।৭৫)

অর্থাৎ ইহলোকে যতপ্রকার কল্যাণ আছে, শ্রীভগবানের জ্ঞানই তাহার মধ্যে চরম কল্যাণ। কারণ যিনি জ্ঞানরূপ নৌকা আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি দুষ্কর বিপদপূর্ণ এই সংসারসমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ কো
নির্ব্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ।। (ভাঃ ২।৩।১২)

ভাগবতগণের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে এইরূপ জ্ঞানোদয় হয় যে,

তাহাতে রাগাদিসকল উপরত হইয়া আত্মা প্রসন্ন হয়। আত্মপ্রসাদ লাভ ঘটিলে কৈবল্যপথস্বরূপ প্রাকৃত গুণনির্ম্মুক্তি লাভ ঘটে। তদনন্তর ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব কোন্ নিবৃত্তপুরুষ হরিকথাতে রতি না করিবেন? অর্থাৎ হরিকথায় রতি না উৎপন্ন হইলে সমূহ জ্ঞানার্জ্জন পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইবে।

ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তি সাধন করে যেই "প্রাপ্ত ব্রহ্মলয়।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১০৪)

অতএব জ্ঞান ভক্তি ব্যতীত নিষ্ফল। সুতরাং "যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং জ্ঞাতং ভবতি"—যাঁহাকে জানিলে পর সমস্ত জ্ঞানলাভ হইয়া যায়, শোক-মোহ-ভয় সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া প্রেমানন্দের উদয় হয়, সেই পরমজ্ঞানস্বরূপ ভগবদ্ভজন ছাড়িয়া অন্য যে সমস্ত জ্ঞানের প্রয়াস বা চেষ্টা, তাহা নিরর্থক।

—**শ্রীহরিদাস রায়**, ভক্তিশাস্ত্রী

গৌড়ীয়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩৪৭ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীগৌরসুন্দর তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ, সন্ন্যাসকালে তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাঁহার রূপ গৌরবর্ণ, মহাবদান্যতা তাঁহার গুণ এবং কৃষ্ণপ্রেমদানই তাঁহার লীলা। শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলিত তনু।

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৯৯)

শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম বিলাইবার নিমিত্ত শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণের গৌরাবতার। পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তি শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া কলিক্লিষ্ট জীবকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।। (চৈঃ চঃ আঃ ৩।২৬)

দুইটী বিষয়—নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম ও ব্রজপ্রেম। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"যদিও যুগধর্ম্ম প্রচারকার্য্য অংশাবতারদ্বারা হইতে পারে, কিন্তু পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমি ব্যতীত ব্রজপ্রেম প্রচার আর কেহই করিতে পারেন না।"

এই ব্রজপ্রেম দুর্ল্লভ বস্তু। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চরম ও পরম লক্ষ্য, চরম ও প্রেম প্রাপ্তি। এই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে, এই প্রাপ্তি লাভ করিতে হইলে রাধাকৃষ্ণের মিলিততনু মহাবদান্য ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা একান্তই

প্রয়োজন। তাঁহার চরণ নিত্য স্মরণীয়, তাঁহার চরণ বন্দনা নিত্য করণীয়, তাঁহার কৃপা প্রার্থনা আবশ্যিকভাবে করণীয়। কারণ একমাত্র তিনিই ব্রজপ্রেম দিতে পারেন।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য আরাধনা করিয়া থাকেন। সকল গৌড়ীয় মঠে এই তিন বিগ্রহের সেবা-পূজা নিত্য হইয়া থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে কেমনভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা গৌরসুন্দরের লীলার আলোকে দেখিবার চেষ্টা করিব।

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরে কৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।
ইতি প্রায়াং শিক্ষাং চরণমধুপেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুং কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পদম্।। (স্তবাবলী)

যিনি জগৎমধ্যে গৌড়ীয়গণকে নিজত্বে অর্থাৎ পরমাত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং শ্রীচরণকমলের মধুপ ভক্তগণকে গণনবিধিদ্বারা অর্থাৎ সংখ্যাপূর্ব্বক 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিবার বহুল শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শ্রীশচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়ন-পথগোচর হইবেন?

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়ীয় ভক্তগণকে আপনার স্নেহডোরে আবদ্ধ করিয়াছেন। অতি আপনার জন করিয়া লইয়াছিলেন।

এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়ারে করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এ তিনের চরণ বন্দোঁ তিনে মোর নাথ।। (চৈঃ চঃ আঃ ১।১৯)

"শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ—এই তিন ঠাকুর বৃন্দাবনের অধিদেব; গৌড়ীয় ভক্তগণকে নিজ নিজ সেবার অধিকার দান করিয়া আপনার নিজজন করিয়াছেন।" (অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য)

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তত্ত্বত্রয়াশ্রয় ভগবদ্বিগ্রহ যথাক্রমে শ্রীমদন-মোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ। সম্বন্ধতত্ত্বের আচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামি-পাদের উপর শ্রীমদনমোহনের সেবাভার অর্পণ করিয়া, অভিধেয়-তত্ত্বাচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের উপর শ্রীগোবিন্দের সেবার অধিকার প্রদান করিয়া, প্রয়োজন তত্ত্বের আচার্য্য শ্রীমধুপণ্ডিতের উপর শ্রীগোপীনাথের সেবাধিকার দান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু গোস্বামিত্রয়কে আপনার নিজজন করিয়াছেন। এই তিন গোস্বামী গৌড়দেশবাসী গৌড়ীয় ভক্ত।

কিন্তু কেবলমাত্র এই তিন গৌড়ীয়াকে আপন করিয়াছেন তাহা নহে, অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্তগণও যে মহাপ্রভুর কত অন্তরঙ্গ তাহার পরিচয় আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই। নীলাচল-লীলায় গৌড়ীয়গণের প্রতি নিজত্ববোধে মহাপ্রভু কতখানি স্নেহকৃপা

বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষ স্মরণীয়।

প্রতিবর্ষে আইসে সবে আমারে দেখিতে।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহুমতে।। (চৈঃ চঃ অঃ ১২।৬৭)

ভক্তের দুঃখে ভগবানের দুঃখানুভূতি। প্রতি বৎসর গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিতেন। কয়েকদিবস মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে থাকিয়া গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এই আগমন ও প্রত্যাগমনে গৌড়ীয় ভক্তরা অনেক দুঃখ পাইতেন। ভক্তগণের এই দুঃখ মহাপ্রভুও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন।

তোমা-সবার দুঃখ জানি' চাহি নিষেধিতে।
তোমা-সবার সঙ্গসুখে লোভ বাড়ে চিত্তে।। (চৈঃ চঃ অঃ ১২।৬৮)

ভক্তের দুঃখে তিনি দুঃখিত। এই দুঃখানুভবহেতু তিনি ভক্তগণকে তাঁহার দর্শনে আসিতে নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু ভক্তসঙ্গ-লোভহেতু তিনি তাহা করিতে পারেন না। যেখানে আপনত্বের বন্ধন, যেখানে নিজত্বের শৃঙ্খল, সেখানে আপনজনের সঙ্গ খুবই সুখকর। গৌড়ীয় ভক্তরা মহাপ্রভুর অতি আপনজন। সেই কারণে মহাপ্রভু বলিলেন,—"তোমাদের সকলের সঙ্গসুখের লোভ আমার চিত্তে বাড়িতে থাকে।"

সন্ন্যাসী মানুষ মোর, নাহি কোন ধন।
কি দিয়া তোমার ঋণ করিমু শোধন।। (চৈঃ চঃ অঃ ১২।৭৩)

ভক্তসমীপে ভগবানের ঋণ অপরিশোধ্য। বিশেষ করিয়া যে ভক্তকে নিজত্বে আপন করিয়া লইয়াছেন, সে ভক্তের প্রেমভক্তিতে ভগবান্ আবদ্ধ। ভগবান্ ভক্তের নিকট ঋণী থাকিয়া ভক্তবশ হইতে ভালবাসেন। তাই ভগবান্ বলিতেছেন,—"অহং ভক্তপরাধীনঃ।" ঋণ শোধ করিলে ভক্তের নিকট পরাধীন থাকিবার সুযোগ থাকে না।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহ-শৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।।
(ভাঃ ১০।৩২।২২)

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণকে বলিতেছেন,—"আমার সহিত তোমাদিগের যে সংযোগ, তাহা বিশুদ্ধ প্রেমময়। তোমরা দুর্জ্জয় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ, তজ্জন্য আমি দেবতাদিগের ন্যায় দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইলেও উহার প্রত্যুপকার সাধন করিতে সমর্থ হইব না। অতএব তোমরা নিজ নিজ সাধুকৃত্যদ্বারা প্রত্যুপকৃত হও।"

ব্রজগোপীগণের প্রেমের প্রতিদান শ্রীকৃষ্ণ দিতে না পারিয়া তাঁহাদের নিকটে চিরঋণী হইয়া রহিলেন। সেইরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রেমের ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া তাঁহাদের নিকট আত্মবিক্রয়

করিলেন।

দেহ মাত্র ধন তোমায় কৈলুঁ সমর্পণ।
তাঁহা বিকাই, যাঁহা বেচিতে তোমার মন।। (চৈঃ চঃ অঃ ১২।৭৪)

ভক্তসমীপে যে ঋণ অপরিশোধ্য তাহা পরিশোধের উপায় মহাপ্রভু ভক্তদিগের নিকট বর্ণন করিলেন। উপায় আর কিছু নহে—আত্মসমর্পণ। ভক্তের প্রেমের বশীভূত হইয়া ভক্তের নিকটে আত্মসমর্পণ। প্রেমমূল্যে মহাপ্রভু নিজেকে বিকাইয়া দিলেন ভক্তসমীপে।

প্রভুর বচনে সবার প্রীত হৈল মন।
অঝোর নয়নে সবে করেন ক্রন্দন।।
প্রভু সবার গলা ধরি' করেন রোদন।
কান্দিতে কান্দিতে সবায় কৈলা আলিঙ্গন।।

(চৈঃ চঃ অঃ ১২।৭৫-৭৬)

মহাপ্রভুর দৈন্য-বিলাপোক্তি শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ ক্রন্দন করিয়াছেন। এমতাবস্থায় মহাপ্রভু সকল ভক্তকে কাঁদিতে কাঁদিতে আলিঙ্গন করিলেন। যে ভক্তের জন্য স্বয়ং মহাপ্রভু ক্রন্দন করিতেছেন এবং আলিঙ্গন করিতেছেন, সে ভক্ত যে তাঁহার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ইহাই 'নিজত্বে গৌড়ীয়ান্'-এর সর্ব্বোত্তম প্রমাণ।

আবার তারে বান্ধ'—ঐছে কৃপা-বাক্য ডোরে।
তোমা ছাড়ি' কেবা কাঁহা যাইবারে পারে।।

(চৈঃ চঃ অঃ ১২।৭৯)

গৌড়ীয় ভক্তগণ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করা হইল না। কারণ ভগবদ্-বাৎসল্যপ্রেমে ভক্ত আবদ্ধ হইয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"তোমার কৃপাপূর্ণ-বাক্যে সকলেই বাঁধা পড়িয়াছেন, সেই কারণে কেহই তোমকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না।" যে ভক্তকে ভগবান্ প্রেমের নিগড়ে বন্ধন করিয়াছেন, সে ভক্ত যে ভগবানের অতি আপনজন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সুতরাং 'নিজত্বে গৌড়ীয়ান্'—এ বাক্য সার্থক বাক্য, এ বাক্য মহাবাক্য, এ বাক্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদের অন্তরের অতলান্তিক গভীরতায় অনুভূত বাস্তব সত্য।

—শ্রীভবতারণ দাসাধিকারী

ধাম-বৈশিষ্ট্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩৫০ পৃষ্ঠার পর]

[ধামাপরাধ বর্ণন ও তদ্‌বর্জ্জনোপায়]

জড়ীয় ভোগবুদ্ধিতে শ্রীধাম-দর্শনে।
মহা অপরাধ হয় ধামেশ্বর-চরণে।। ১।।
ধাম-প্রদর্শক সাধুরে কৈলে হেয় জ্ঞান।
শ্রীধামে অনিত্য বলি' যদি কর জ্ঞান।। ২।।
ধামবাসী আর পরিক্রমাকারী-জনে।
হিংসা এবং জাতিবুদ্ধি কৈলে মনে মনে।। ৩।।
ধামে বসি' বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠানে।
মহা অপরাধ হয় শাস্ত্রের বিধানে।। ৪।।
নাম-বিগ্রহ-ব্যবসা ও অর্থোপার্জ্জন।
ধাম-সেবাচ্ছলে তাহা অবৈধ গণন।। ৫।।
শ্রীধামে ভাবিলে অন্য দেব-তীর্থ সমান।
চিন্ময় ধামের তাহে হয় অসম্মান।। ৬।।
ধাম-বসবাসছলে পাপ-আচরণ।
নদীয়া ও বৃন্দাবনে প্রভেদ চিন্তন।। ৭।।
শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-সূচক শাস্ত্রের নিন্দন।
তন্মাহাত্ম্যে অর্থবাদ ও কল্পিত চিন্তন।। ৮।।
হেন দশ ধামাপরাধ শাস্ত্রেতে লিখিত।
ধামাপরাধী সদা হরি-সেবাতে বঞ্চিত।। ৯।।
"সানন্দ-সচ্চিদ্"-শ্লোকে প্রবোধানন্দ-যতি।
কহে,—'ধামাপরাধে অলভ্য ভক্তি-পদবী'।। ১০।।
অতএব ধামাপরাধ করি' বিবর্জ্জন।
শ্রীগুরু-চরণে করি' আত্মনিবেদন।। ১১।।
সাধুসঙ্গে সদৈন্যে সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে।
ধাম-পরিক্রমা কৈলে ধামাপরাধ টুটে।। ১২।।
পাদসেবনরূপ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-দ্বারে।
মোদের জীবন-গতি যায় ক্রমে ফিরে।। ১৩।। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

উড়ুপীতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

প্রভু কহে,—"কর্ম্মী, জ্ঞানী, দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি দুই চিহ্ন।।" (চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৭৬)

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু উড়ুপী-গ্রামস্থ মূল মাধ্বমঠের তৎকালীন তত্ত্ববাদাচার্য্য শ্রীরঘুবর্য্যতীর্থের কথিত সাধ্য-সাধন-বিচার খণ্ডন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য এবং বিশেষতঃ মহাপ্রভুর উক্ত আচার্য্য-প্রতি 'তোমার সম্প্রদায়' বাক্য হইতে কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্ত নহেন। তাঁহারা উক্ত কথোপকথন হইতে বিচার করিয়া বসেন,—"শ্রীমধ্বমতে 'সাধন'—কর্ম্মার্পণ এবং 'সাধ্য',—জ্ঞানমার্গগত মুক্তি, অতএব উহাতে ভক্তিহীন কর্ম্ম ও জ্ঞানের চিহ্ন থাকায় তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তি-রূপ 'সাধন' এবং 'কৃষ্ণপ্রেম'-রূপ সাধ্যের বিচার হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। অতএব শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ংই পৃথক্ সাধ্য-সাধন-বিচারসম্পন্ন এক পঞ্চম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।" সম্প্রদায়-বিজ্ঞান-বৈভব-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ ভাবনা অস্বাভাবিক নহে।

শ্রীমধ্বমতে কনিষ্ঠাধিকারী সাধকের পক্ষে প্রথমমুখে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণের কথা স্বীকৃত হইলেও অমলাভক্তিই প্রধান সাধনরূপে স্থাপিত হইয়াছে। দেহধর্ম্মাসক্ত ফলভোগাকাঙ্ক্ষী জীবগণ—'কর্ম্মী' ; তাহাদিগকে কৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ করিতে হইলে প্রথমমুখে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ ব্যতীত আর উপায় নাই। তজ্জন্য শ্রীমধ্ব ভক্তির অধীন তথা শুদ্ধ-ভগবৎজ্ঞানের অনুকূল-কর্ম্মকে সামান্যভাবে স্বীকার করিয়াছেন। "ওঁ সহকারিত্বেন ওঁ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।৩৩)—এই সূত্রভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন,—"যথা রাজ্ঞঃ সহকার্য্যে মন্ত্রী তথা ঋতেঽত্র ক্ষিতিপঃ কার্য্যমৃচ্ছেৎ। এবং জ্ঞানং কর্ম্ম বিনাপি কার্য্যং সহায়ভূতং ন বিচারঃ কুতশ্চিদিতি কমঠশ্রুতৌ সহকারিত্বোক্তেশ্চ।" তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ রাজার কর্ম্মসচিবরূপে মন্ত্রী বর্ত্তমান থাকেন, কিন্তু রাজা মন্ত্রী ব্যতীতও স্বয়ং কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ, সেইরূপ শুদ্ধ-ভগবৎজ্ঞানও কর্ম্ম ব্যতীত মোক্ষপ্রদানে সমর্থ হইলেও কোনও কোনও স্থানে তাহার কর্ম্মসচিবত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট যে, শ্রীমধ্বপাদ কর্ম্মকে মুখ্যরূপে মুক্তির উপায় বা 'সাধন' বলিয়া স্বীকার করেন নাই—গৌণকর্ম্মনির্ব্বাহক মন্ত্রীর আসন দিয়াছেন মাত্র। শ্রীভাগবত-মতের সহিত এই মতের কোন বিরোধ নাই,—তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৪৭।২৪) "দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ। শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে।।" —শ্লোক আলোচনাদ্বারা বুঝা যায়। তবে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণমূলে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যে যাগযজ্ঞাদি, সেইরূপ কর্ম্ম গৌণরূপেও ভক্তির সচিব হইতে পারে না। কর্ম্ম সাধারণতঃই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যেই সাধিত হয় বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।।" কিন্তু, যে কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে কৃত হয় এবং যে ধর্ম্ম বিরাগের উদ্দেশ্যে সাধিত হয় ও যে বিরাগ ভগবৎপাদপদ্ম-সেবার জন্যই হইয়া থাকে, তাহা গৌণরূপে অভিধেয় হইতে পারে। শ্রীমন্মধ্ব তাদৃশ কর্ম্মকেই মাত্র ভক্তির সচিবের আসন প্রদান করিয়াছেন। পরমার্থের উদ্দেশক নহে, এরূপ কর্ম্ম যে নিন্দনীয় ও বর্জ্জনীয়, তাহা তিনি সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"**কর্ম্মণা বধ্যতে** জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে। **তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি** যতয়ঃ পারদর্শিনঃ।।" (সূত্রভাষ্য ৩।৩।৫০)

শ্রীমধ্বমতে অমলাভক্তিই একমাত্র 'সাধন' বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। মধ্ব-সম্প্রদায়ে সুপ্রচলিত সংক্ষিপ্ত মধ্বমত-প্রকাশক একটী শ্লোকে তাহা ব্যক্ত আছে। যথা—"শ্রীমধ্বমতে হরিঃ পরতরঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো, ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ। মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা **ভক্তিশ্চ তৎসাধনং**, হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ।।" এই শ্লোকেরই অনুরূপ একটী শ্লোক—"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমম্" শ্রীপ্রমেয়-রত্নাবলী-গ্রন্থে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রকাশ করিয়া শ্রীমধ্বমত ও শ্রীচৈতন্যমতের অপার্থক্য দেখাইয়াছেন।

শ্রীমন্মধ্ব তাঁহার বিভিন্ন ভাষ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণা ভক্তিকেই সাধনরূপে মুহুর্মুহুঃ ঘোষণা করিয়াছেন। যথা—'দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ। **কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ**।।" (মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্য-ধৃত নারায়ণ-সংহিতা-বচন) ; "**ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সীতি** মাঠর শ্রুতেঃ।" (৩।৩।৫৩ সূত্রভাষ্য) ; **ভক্ত্যৈব তুষ্টিমভ্যেতি** বিষ্ণুর্নান্যেন কেনচিৎ। স এব মুক্তিদাতা চ **ভক্তিস্তত্রৈব কারণম্**।।" (মহাভারত-তাৎপর্য্য ১।১১৮)। এইরূপ তিনি পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন শাস্ত্রবচন উদ্ধারপূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে, 'ভক্তি' ব্যতীত সাধ্য-মুক্তি লাভের অন্য উপায় নাই।

শ্রীমধ্বমতে যে মুক্তি 'সাধ্য'রূপে নির্ণীত হইয়াছে, তাহা পঞ্চবিধা মুক্তির অন্তর্গত জীব-পরমাত্মৈক্য-রূপা সাযুজ্য-মুক্তি নহে। যদি তিনি জীব-পরমাত্মার ঐক্যই স্বীকার করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শুদ্ধদ্বৈতবাদী বা নিত্য পঞ্চভেদবাদী বলিবার পরিবর্ত্তে ভাস্কর-ভট্টাদির ন্যায় ঔপচারিক ভেদবাদী বলিতে হয়। শ্রীমধ্ব জীবগণকে শ্রীহরির নিত্য অনুচর (সেবক) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মুক্তাবস্থাতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ এবং জীবের ঈশ্বর-উপাসনার কথা তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

"ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতা ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিষু তাৎপর্য্য **মুক্তানাং ভেদস্যৈবোক্তেঃ**।" (ছান্দোগ্য-ভাষ্য ৬ অঃ)—অর্থাৎ যে স্থানে অন্যের কথা কি, স্বয়ং মায়াও প্রবেশলাভে সমর্থ নহে, তথায় দেবাসুরাদি নিখিল-জীবগণের পূজনীয় হরিসেবকগণ অবস্থান করিতেছেন, ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতির তাৎপর্য্য

এই যে, সর্ব্বত্রই মুক্তজীব ভগবান্ হইতে ভিন্ন। "**কৃষ্ণোমুক্তৈরিজ্যতে বীতমোহৈঃ**" (মহাভারত তাৎপর্য্য ২।৬২)—অর্থাৎ, মোহরহিত মুক্তগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হইয়া থাকেন। "**মুক্তা অপি হি কুর্ব্বন্তি স্বেচ্ছয়োপাসনং হরে।।**" (সূত্রভাষ্য ৩।৩।২৭); "**মুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী**" (মঃ তাঃ ১।১০৫) প্রভৃতি বাক্যে মুক্তগণেরও শ্রীহরি-উপাসনা এবং ভক্তিই যে সেই মুক্তগণের নিত্য আনন্দস্বরূপিণী, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। "ভেদ ব্যপদেশাচ্চ" (১।১।১৭) সূত্রের ভাষ্যেও তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তই মুক্তির স্বরূপরূপে বর্ণন করিয়াছেন,—"**মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ**" (ভাঃ ২।১০।৬) অর্থাৎ মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মরূপদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদরূপে অবস্থানের নামই মুক্তি। এমন কি, উক্ত মতে মুক্তি ও মুক্তজীবগণের মধ্যেও তারতম্য তথা আনন্দের তারতম্য স্বীকৃত আছে—"জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ" (সংক্ষিপ্ত মধ্বমত), "মুক্তাবানন্দো বিশিষ্যতে" (সূত্রভাষ্য ৩।৩।৩৩)।

সুতরাং মায়াবাদ-দলনবানা শ্রীমধ্বপাদ যে মুক্তিকে সাধ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই ভক্তিপর এবং শ্রীমদ্ভাগবত-বিচারপর—কিছুমাত্র জ্ঞানদুষ্ট নহে। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীমধ্ব-কথিত উক্ত মুক্তিকে "মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঘৃতে যেমন ক্ষীরের মৌলিকতা আছে, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সাধ্যসার প্রেমার মধ্যেও শ্রীমধ্ব-প্রতিপাদ্য 'সাধ্য' শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম লাভরূপা মুক্তি অনুস্যূত হইয়া আছে।

তদানীন্তন তত্ত্ববাদি-আচার্য্য রঘুবর্য্যতীর্থের বা তদনুগত শিষ্যবর্গের কিম্বা পরবর্ত্তী তত্ত্ববাদিগণের বিচারধারা কালক্রমে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকৃত মত হইতে অনেক পার্থক্য লাভ করিয়াছে, তাহা শ্রীমন্মধ্বের লেখনী ও আধুনিক তত্ত্ববাদিগণের আচার-প্রচার লেখনী আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। তজ্জন্য পরবর্ত্তী বিকৃত মতকে মূল-আচার্য্যের সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করা যাইতে পারে না। শ্রীমহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াও উক্ত তত্ত্ববাদি-আচার্য্যকে 'তোমার সম্প্রদায়' বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, ইহাতে উক্ত তত্ত্ববাদি-মহাশয় যে মূল 'মধ্ব-সম্প্রদায়'-ধারা হইতে অনেক বিচ্যুত হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাই সূচিত হইয়াছে।

তিনি উক্ত বাক্যে সেই তত্ত্ববাদি-আচার্য্যকে এইমাত্র বুঝাইয়াছেন,—"আমার অভিপ্রেত ও স্বীকৃত যে মধ্ব-সম্প্রদায়, তুমি তাঁহার প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া কেবল বহিরঙ্গ-মতজালে আবদ্ধ হইয়া কার্য্যতঃ এক পৃথক্ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছ,—উহাতে এক ভগবদ্বিগ্রহের সত্যতা স্বীকার ছাড়া আর কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত দেখা যায় না। অতএব তোমার কল্পিত এই সম্প্রদায়ের সহিত ব্যাসশিষ্য শ্রীমধ্বের তথা আমার কোন সম্বন্ধ নাই।"

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪০৮ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০১

'আউল', 'বাউল', 'প্রাকৃত সহজিয়া' প্রভৃতি গোষ্ঠী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের অপসিদ্ধান্তকে মহাপ্রভুর প্রচারিত মত বলা যাইতে পারে না। কিংবা কেহ উক্ত অপসিদ্ধান্তগুলি খণ্ডন করিলে তিনি মহাপ্রভুর মত খণ্ডন করিয়াছেন, এরূপ বিচারও নিতান্ত অযৌক্তিক। তথাকথিত তত্ত্ববাদিগণের অপসিদ্ধান্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া তিনি সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমধ্বের প্রবর্ত্তিত শ্রৌতমত খণ্ডন করিয়াছেন, অতএব তিনি কখনও শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই—এরূপ যুক্তি নিতান্ত বালভাষিতা।

—সংগৃহীত

❑❑❑

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩৬০ পৃষ্ঠার পর]

তাঁর কাছে যদি বঞ্চিত হওয়ার জন্য শুধু জাগতিক বিষয়-আশয় প্রার্থনা করে যাই, তাহলে তিনি বলবেন, ও তুমি চাচ্ছ, দিলাম, নাও, কিন্তু সুখী হতে পারবে না। এইখানে তাঁর যে বৃত্তি প্রকাশিত হয়েছে, সে বৃত্তির নাম হল—বিমুখমোহিনী। আর যখন আমরা নিজের ভুল বুঝতে পারি, তখন বলি তুমি যা দিচ্ছ এটা আর চাই না। যাতে আমার নিত্যকল্যাণ হয়, সেই বস্তু তুমি প্রদান কর, আমাকে সেই পথ দেখিয়ে দাও। তখন তিনি উন্মুখমোহিনী মায়া হয়ে ভগবানের পথ ধরিয়ে দেন, দেখিয়ে দেন। দুটো জিনিসই রয়েছে তাঁর বৃত্তির মধ্যে। আমাদের চাহিদা অনুসারে ব্যবস্থাটা হচ্ছে। আমরা ত' চাইতে জানি না, ভগবানের কাছে কি চাইতে হবে আমরা শিখি নাই। দেবদেবীর কাছে কৃষ্ণভক্তি, ভগবদ্ভক্তি প্রার্থনা করতে হয়, তাঁদের কাছ থেকে চেয়ে নিতে হয়, ওটাও শিখি নাই আমরা। এই দুনিয়াদারির জিনিস নিয়ে ভুলে থাকতে চাই, তাতে বঞ্চিত হতে চাচ্ছি। সুতরাং চাওয়াটা ত' আমাদের শেখা হয় নাই। দেবতার সামনে প্রণাম করছি, মাথা কুড়ছি অনেকক্ষণ ধরে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এতক্ষণ ধরে কি বললে? তদুত্তরে বলবেন,—আমার স্বামীর অসুখ করেছে, আমার বউয়ের অসুখ করেছে, সারিয়ে দাও তুমি ; বহু মামলা-মোকর্দ্দমা আছে, সেগুলি জয় করিয়ে দাও ; জমিজমা সব চলে যাচ্ছে, এগুলো রক্ষা করে দাও। এই জাতীয় প্রার্থনা, আকাঙ্ক্ষা। এগুলো চাইতে নাই। চাইতে যদি হয় তাঁদের কাছে, তাহলে হরিভক্তি, ভগবদ্ভক্তি প্রার্থনা করতে হয়। অন্য দুনিয়াদারির কোন জিনিস চাইতে নাই। এটাই হল শিক্ষা।

সেই শিক্ষাই দেন তাঁরা, যদি তাঁদের কাছে চাওয়া যায়। কিন্তু আমরা ত' চাইতে জানি না, সুতরাং সে শিক্ষা পাব কোথা থেকে? আমরা ত' বঞ্চিত হতে চাচ্ছি। 'কেন বঞ্চিত হও চরণে।' আমরা বঞ্চিত হওয়ার জন্য তাঁদের কাছে Demand নিয়ে এগোচ্ছি। তাই তাঁরা বঞ্চিত হওয়ার মত ব্যবস্থা দিয়ে দিচ্ছেন। তাঁদের দোষ দেওয়া যাবে না।

'হরি কে'? হরি নিয়ে কথা আসছে। যে হরি নিয়ে আগে কথা হয়েছে। যদি হরিনাম করি, হরির উপাসনা করি, হরিকে ভালবাসি, তাহলে দুঃখ-দুর্দ্দশার চরম, একশেষ, নাকানি-চুবানি। যারা ভগবানের নাম করছেন, কত কষ্ট, কত যাতনা, কত উৎপীড়ন সংসারে তাদের উপরে। সংসারে থেকে যারা হরিভজন করতে যাচ্ছেন, সাধন-ভজন করতে যাচ্ছেন, তারা একঘরে। সব একঘরে হয়ে যাচ্ছেন তারা। তাদের যেন আর কোন উপায় নাই। তারা যেন খাপছাড়া, তারা যেন সমাজছাড়া, তারা যেন অপাংক্তেয়। কিন্তু এ বিচার ত' আজ দেখা যাচ্ছে দুনিয়ায়, সংসারে। ভালর Percentage নাই, খারাপের Percentage বেশী। যারা ভাল হতে চাচ্ছে সব হটাও, চাই না তোমাদের। এই ত' দুনিয়া আজ! আমরা আমাদের ভালটা চাচ্ছি কোথায়? চাচ্ছি না ত'। ভলো কাকে বলে তা বুঝি না। যদি কেউ বুঝান, তাও সেটাকে অস্বীকার করছি, Ignore করে যাচ্ছি। এই ত' সমাজ, এই ত' পরিবেশ! আমাদের ভালটা কেউ শিখাবার নাই। যদি কেউ শিখান, তাকে ভুলবার জন্য শতচেষ্টা, ভুলাবার জন্য শতচেষ্টা।

এখানে শুকদেব গোস্বামী আরম্ভ করেছেন তাঁর ব্যাখ্যা।—

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ।।

হরিভজনের কথা বলছ, হরির কথা বলছ, তাঁর অশেষ গুণ আছে। কি? হরি মানে যিনি হরণ করেন। কি হরণ করেন? পাপ-তাপ, শোক-দুঃখ। "হরতি হৃদয়গ্রন্থিং বাসনারূপমিতি হরিঃ"—যিনি জীবের বাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থি হরণ করেন, তিনি হরি। জীবকে আনন্দপ্রদান করেন। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সেই হরি সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বস্তু। মানুষ বাঁচতে চায় কেন? সে আনন্দের পিয়াসী। আনন্দ পেতে চায় সে। জীবনধারণ করা মানে হল আনন্দলাভ করা। আমরা বাঁচতে যাচ্ছি কেন? যদি প্রশ্ন করা হয়, তুমি মরতে চাও? তর্কের খাতিরে অনেকেই বলতে পারেন আমি মরতে চাই। কিন্তু তার ভিতরকার উদ্দেশ্য মরার নয়, বাঁচার, তার অস্তিত্ব সংরক্ষণ করা। এ অস্তিত্ব সংরক্ষণ কেন? যেহেতু জীবাত্মার বিনাশ নাই, সেইজন্য জীবাত্মা বাঁচতে চায়। সেই প্রেমময় ভগবান্ তিনি সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব। তাঁর ভিতরে সেই শান্তি, সেই আনন্দ আছে। তাঁকে লাভ করলে জীবাত্মা খুশী হয়, আনন্দিত হয়। সেইজন্য বেদে, উপনিষদে বললেন,—

"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"—সেই ভগবান্ যদি আনন্দময় না হতেন, তাহলে জগতের লোক তাঁকে ডাকত না, জগতের লোকের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। যেহেতু সেই প্রেমময় ভগবান্ সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব, সেইজন্য আনন্দলাভের জন্য, শান্তিলাভের জন্য ইহসংসারে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। কেউ মরতে চায় না। এই হল যুক্তি।

সেই হরি কে?—যিনি জীবের যাবতীয় কামনা-বাসনা সব দূর করে দিয়ে প্রেমানন্দ দান করেন, তিনি হলেন ভগবান্ হরি। এই হল হরি-শব্দের সবথেকে শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। 'প্রেমানন্দং দদাতি যঃ স হরিঃ।' 'পুরুষঃ প্রকৃতে পরঃ'—সেই যে পরমপুরুষ, লীলা-পুরুষোত্তম, তিনি প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত। প্রকৃতির অন্তর্গত ব্যাপার তিনি নন। তাই শিবঠাকুর তাঁকে বলেছেন 'অধোক্ষজ'। হে ভগবান্ অধোক্ষজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। অধোক্ষজ-শব্দের অর্থ কি? ইন্দ্রিয়াতীত, অপ্রাকৃত। সেই অর্থ করেছেন। "অধঃ কৃতমতিক্রান্তং বদ্ধজীবানাম্ ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ অধোক্ষজ।"—যিনি বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জগণের অতীত বস্তু, তিনি হলেন অধোক্ষজ। "God is He who has reserved the Absolute Right of not being exposed to human senses"। মানুষ যে Organ—ইন্দ্রিয়গুলো পেয়েছে, এগুলো Defective organ। এরদ্বারা মানুষ যদি অহঙ্কার করে আমি সব জেনে নেব, বুঝে নেব সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব ভগবানকে, তা হবে না কোনদিন। সেইজন্য ভগবানের বিশেষণ রয়েছে—অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত। আমরা যে ইন্দ্রিয়গুলো পেয়েছি, সেগুলো সব দোষযুক্ত। অথচ ভগবানকে চাই। ঠাকুর তোমায় পেতে চাই। কিন্তু আমার ত' কোন যোগ্যতা নাই। তবে কি করে পাব? কান্নাকাটি করতে হবে। "করুণা (যোগ্যতা) না হলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর।।"—এই প্রার্থনা চাই। তাহলে সে অধিকার পেতে পারি।

তাই বলছেন,—"স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা"—তিনি বিশ্বান্তর্যামী ভগবান্। "তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ"—সেই নির্গুণ পরব্রহ্ম ভগবানকে যদি তুমি ভজনা কর, তাহলে তুমিও নির্গুণ হতে পারবে। তাহলে তোমারও কল্যাণ। নির্গুণ হওয়া মানে ভগবান্ যেমন নির্গুণ, সেইরকম ভক্তও নির্গুণ। ভক্ত ভক্তিলাভ করলে ভগবানের সঙ্গে সাম্যাবস্থা লাভ হয় তাঁর, যেহেতু ভগবান্ এবং জীবাত্মা জাতীয়ত্বে এক। ভগবানের নির্গুণতা লাভ হয়, ভক্তেরও নির্গুণতা লাভ হয়। তাই এখানে শুকদেব গোস্বামী বলছেন পরীক্ষিৎ মহারাজকে লক্ষ্য করে,—তুমি যদি সেই প্রেমময় ভগবানের উপাসনা কর, তুমি যদি সেই নির্গুণ ভগবানের উপাসনা কর, তাহলে তুমিও নির্গুণ হতে পার। সে অধিকার ভগবান্ দিয়ে রেখেছেন। অনন্ত বিশ্বের মালিক অনন্ত জীবাত্মাকে সেই অধিকার দিয়েই তিনি সৃষ্টি করেছেন। এখন একটা ইতিহাস বলতে চাচ্ছেন। তিনি যে কথা বললেন, তারই প্রমাণ দেওয়ার জন্য একটা উদাহরণ আনছেন।—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪০৮ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০১

নিবৃত্তেষ্বশ্বমেধেষু রাজা যুষ্মৎপিতামহঃ।
শৃণ্বন্ ভগবতো ধর্ম্মানপৃচ্ছদিদমচ্যুতম্।।

তুমি যে প্রশ্ন করেছ, সে প্রশ্নটাকে আমি নূতন প্রশ্ন বলে ধরছি না। প্রশ্নটা কি হয়েছিল? শিব-ব্রহ্মাকে উপাসনা করলে অনেক ধন-দৌলত বাড়ে, আর ভগবানের উপাসনা করলে অনেক গরীব হতে হয়, খাওয়া-পরাতে বড় কষ্ট হয়—এই ছিল প্রশ্ন পরীক্ষিৎ মহারাজের। তারই উত্তর দিতে গিয়ে বলছেন,—দেখ, এই প্রশ্নটা তুমি করেছ, এটা তোমার নিজের প্রশ্ন বলে আমি মানব না। এটা তোমার নিজের প্রশ্ন নয়। আমি প্রশ্ন করলাম, আর এটা আমার প্রশ্ন নয়, তা কি করে হয়, এ আবার কি কথা? শুকদেব গোস্বামী বললেন,—হ্যাঁ, প্রশ্নটা অন্যের, তুমি নিজে আবার করছ। তাই বলছেন, এই প্রশ্ন তোমারই পিতামহ যুধিষ্ঠির মহারাজের তিনি যখন সিংহাসনে বসেছিলেন, তখন ভগবান্ কৃষ্ণকে এই প্রশ্ন করেছিলেন। ভগবান্ ঐ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, তা আমি এখানে আলোচনা করব, তাহলে তোমার প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে। অর্থাৎ শুকদেব নিজের কথা বলতে চাচ্ছেন না। আমার নিজস্ব কোন বক্তব্য নাই। যদি এই প্রশ্নের উত্তর শুনতে হয়, তাহলে শোন স্বয়ং ভগবান্ কি উত্তর দিয়েছিলেন এই প্রশ্নের। যাঁর কথা ত্রিভুবন মান্য করেন, সেই পরাৎপরতত্ত্ব ভগবান্ তিনি কি উত্তর দিয়েছেন, সেটা শোন। এর ভিতরে আমার নিজস্ব কোন উক্তি নাই।

স আহ ভগবাংস্তস্মৈ প্রীতিঃ শুশ্রূষবে প্রভুঃ।
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় যোঽবতীর্ণো যদোঃ কুলে।।

যিনি যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন জগতের কল্যাণবিধাতারূপে, সেই ভগবান্ এই প্রশ্নের যা উত্তর দিয়েছেন সেটা শোন, আমি বলছি। এই বলে শুকদেব আরম্ভ করলেন। ভগবান্ ঐ প্রশ্নের কি উত্তর দিয়েছেন?—

শ্রীভগবানুবাচ—

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্।।

যুধিষ্ঠির! এতকাল বাদে শেষে তুমি আমার কথায়, আমার বাক্যে সংশয়, সন্দেহ পোষণ করছ? ভক্তের ত' কোন সন্দেহ নাই, ভক্তের যাবতীয় সন্দেহ সব নিরসন হয়ে গেছে। ভক্ত কাকে বলা হবে?—যাঁর যাবতীয় সংশয়, সন্দেহ দূরীভূত হয়ে গেছে, তাঁকে বলা হয় ভক্ত। "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি।"—যাঁর সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়েছে, সমস্ত কামনা-বাসনা চলে গেছে, তিনি হলেন ভক্ত। তা তোমার আবার এইরকম প্রশ্ন হল কেন যুধিষ্ঠির? তুমি আমাকে সন্দেহ করছ! আমার ভক্ত না খেতে পেয়ে মরবে? আমার ভক্ত কষ্ট পাবে? তুমি এটুকু শুধু বুঝলে। না, তা নয়।

"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" দেখ, আমার ভক্ত আমাকে বহু পরীক্ষা করে। আমি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ হয়ে ভক্তের কাছে নিত্য পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি। আমিও ত' আমার ভক্তকে পরীক্ষা করতে পারি। সে ক্ষমতা, সে অধিকারও ত' আমার আছে। তাই আমি মাঝে মাঝে ভক্তকে পরীক্ষা করি। কিরকম পরীক্ষা? 'হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ'। আমি ভক্তকে যে পরীক্ষা আরম্ভ করি, তার প্রথমে তাকে যা ধনসম্পদ্ দিয়েছিলাম, তা ছিনিয়ে নেই। এই হল আমার প্রথম পরীক্ষা। তারপর দ্বিতীয় পরীক্ষা হল জন, জন নিয়ে টানাটানি করি। দেখি, ওর আমার প্রতি কত টান আছে। আমাকে ও কেমন ভালবাসে। 'ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্।।' যখন ধন গেল, জন গেল, তখন ত' সে ভীষণ চিন্তিত সে, কি খাব-পরব, সংসারে কারও সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না, খাই কি করে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, তা না হলে মুস্কিল। চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে, পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সব জায়গায়। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পরামর্শ করছে কি করব, কি করে চলবে সংসারে? পরামর্শ পেয়ে যাচ্ছে, তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর। ভগবান্ ভক্তকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন তাকে স্বান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। চারিদিকে পাগলের মত ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে কি করব, কি করব? শান্তি নাই, স্বস্তি নাই মনে। ভগবান্ ভক্তকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, যাও ওকে স্বান্ত্বনা দাও, ও হয়ত' Heartfail করে মরবে, অথবা Suicide করবে। যাও, ওকে গিয়ে বুঝিয়ে দাও, যেন মাথা খারাপ না করে। তাই এখানে বলছেন,—

স যদা বিতথোদ্‌যোগো নির্ব্বিণ্ণঃ স্যাদ্ধনেহয়া।
মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্।।

ভগবান্ এত দয়ালু, এত কৃপালু। ভক্ত যখন ঐরকম ছুটাছুটি করছে, সেইসময় দেখা যাচ্ছে ভগবান্ ভক্তকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যাও, ওকে বুঝাও গিয়ে, স্বান্ত্বনা দাও ওকে। কি, তুমি কান্নাকাটি করছ কেন? আমার এজগতে কেউ নাই, আমার কোন আত্মীয়-স্বজনও নাই নিজের বলতে, আর পয়সাকড়িও নাই খাওয়ার দাওয়ার, থাকার কোন ব্যবস্থাই নাই। তাহলে কি করব? "এ জগতে কেউ যার নাই, মরণ তুমি তার ভাই।" সুতরাং আমার মরা ভাল, এটাই শ্রেয়ঃ। আর বেঁচে থেকে কি হবে! তখন সেই ভক্ত তাকে স্বান্ত্বনা দিয়ে বলছেন,—না গো মরতে হবে না, আত্মহত্যা করে মরলে পরে কি রেহাই আছে। আবার ত' ভূত হয়ে এসে তুমি কারও ঘাড়ে চাপবে। তার থেকে তুমি ভগবানের পরে নির্ভর কর। সেই ভগবানের নাম 'জগন্নাথ' শুনেছ? হ্যাঁ, শুনেছি। যদি তাই শোন, তাহলে চিন্তা কর, সেই জগন্নাথ তিনি জগতের পালন-পোষণকর্ত্তা। তিনি অনন্ত বিশ্বকে পালন-পোষণ করছেন। তিনি তোমার মত, আমার মত একজনকে পালন-পোষণের দায়িত্ব নিচ্ছেন না, নেবেন না! কেন এ অবিশ্বাস? তুমি সেটা বিশ্বাস কর। ভক্ত এসে সেটা শিক্ষা দিচ্ছেন। ভগবানের পরে নির্ভরতা

স্থাপন করবার জন্য তাকে উপদেশ করছেন। আত্মবল পেয়ে গেল সে। "তুঁহু জগন্নাথ, জগতে কহাওসি, জগ বাহির নহ মুঞি ছার।" হে ভগবান্, তোমাকে ত' লোকে জগন্নাথ বলে, জগতের পালন-পোষণকর্ত্তা তুমি, জগতের দেখভাল করছ তুমি। আর আমার মত হতভাগা একজনকে কি তুমি দেখবে না? নিশ্চয়ই দেখবে, আমি বিশ্বাস করি, তুমি আমারও ভরণ-পোষণকর্ত্তা। ঠিক এই বিশ্বাস যখন তার এসে গেল, পরীক্ষায় তখন সে পাশ। যে ফেল করতে যাচ্ছিল, পরীক্ষায় পাশ করে গেল তখন। তখন কি হল? ভগবান্ তার কাছ থেকে যা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, তার শতগুণ তিনি তাকে দিয়ে দিলেন। এই নাও, তুমি পরীক্ষায় পাশ করে গেছ। পরীক্ষার পাশ মানে ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যের পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। ভগবান্ খুশী হয়ে তাকে দিয়ে দিলেন। আমি যা নিয়েছিলাম তার শতগুণ দিয়ে দিলাম, যাও, তুমি এই দিয়ে সেবা কর। এই দিয়ে তুমি সেবা করবে।

দেখ যুধিষ্ঠির! আমি এত ব্যবস্থা নিয়েছি জগজ্জীবের পরে, তথাপি জগজ্জীব আমার পরে সন্দেহ পোষণ করে। কিরকম জান? তারা শেষ পর্য্যন্ত তাদের প্রতি অবজ্ঞা করে। কিরকম? "মত্তা প্রমত্তা বরদান্ বিস্ময়ন্ত্যবজানতে।" যাঁরা তাদের কিছু কিছু বর দিচ্ছেন, হ্যাঁ তোমার এটা হোক, ওটা হোক, তাদের প্রতিও তারা দুর্ব্যবহার করে, অন্যায় ব্যবহার করে। তার ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে। শোন,—

শাপপ্রসাদয়োরীশা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
সদ্যঃ শাপপ্রসাদোঽঙ্গ শিবো ব্রহ্মা ন চাচ্যুতঃ।।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই তিনজনের ভিতরে মহেশ্বর এবং ব্রহ্মা হলেন ভক্ততত্ত্ব। আর ভগবান্ এঁদের উপরওয়ালা মালিক হয়ে বসে আছেন। তথাপি কখনও শিবঠাকুর ভুল করে ফেলছেন। তিনি ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ লাগিয়ে দিচ্ছেন। কখনও ব্রহ্মা তিনি ভুল করে ভগবানের গোবৎস হরণ করছেন, আবার গিয়ে ক্ষমা চাইছেন—এইসব ব্যাপার হচ্ছে। নিজে দুঃখ করে কৃষ্ণ বলছেন একজায়গায়,—

প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চ অহমেব সৃজামি বৈ।
তৌ হি মাং বিজানীতো মম মায়া বিমোহিতৌ।।

প্রজাপতি ব্রহ্মাকে আমি সৃষ্টি করেছি, শিবকে আমি সৃষ্টি করেছি, দায়িত্বও দিয়েছি, কিন্তু তাঁরা আমাকেও সবসময় বুঝে উঠতে পারছেন না, মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলেন। "তৌ হি মাং ন বিজানীতৌ মম মায়া-বিমোহিতৌ।।" আমার মায়ায় বিমোহিত হয়ে তাঁরা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে উল্টোপাল্টা ব্যবহার করে ফেলছেন। দুঃখের কথা বলছেন কৃষ্ণ এইভাবে। দেখ, একটা উদাহরণ দিয়ে আমার এই বক্তব্য আরও পরিষ্কারভাবে তোমাদের জানাচ্ছি।—

অত্র চোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বৃকাসুরায় গিরিশো বরং দত্তাপ সঙ্কটম্।।

একসময়ে শিবঠাকুর একটা অসুরকে (বৃকাসুর) বর দিয়েছিলেন। দিয়ে শেষকালে নিজে বড় মুস্কিলে পড়ে গিয়েছিলেন। সেই উদাহরণটা শোন।—

বৃকো নামাসুরঃ পুত্রঃ শকুনেঃ পথি নারদম্।
দৃষ্ট্বাশুতোষং পপ্রচ্ছ দেবেষু ত্রিষু দুর্ম্মতিঃ।।

নারদ ঋষি যখন যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে হঠাৎ সেই বৃকাসুরের সঙ্গে দেখা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করল সেই অসুর, ঠাকুর! কার উপাসনা করব বলুন ত'? তাড়াতাড়ি করে কোন্ দেবতাকে সন্তুষ্ট করা যাবে বলুন?

স আহ দেবং গিরিশমুপাধাবাশু সিদ্ধ্যসি।
যোঽল্পাভ্যাং গুণদোষাভ্যামাশু তুষ্যতি কুপ্যতি।।

নারদঋষি বললেন,—শঙ্করকে আরাধনা কর। তবে একটা কথা আমি বলে রাখছি, আমার পরে রাগ কর না আবার শেষকালে। কি? তিনি অল্পেতে যেমন সন্তুষ্ট হন—জল আর বেলপাতায় সন্তুষ্ট হন, আবার যখন রেগে যাবেন, তখন কখন যে তিনি ত্রিশূল উঁচিয়ে ধরবেন, তার কোন ঠিক নাই। সুতরাং আমি দুটো দিকই বলে রাখলাম। এ দুটো দিক্ আছে তাঁর মধ্যে। তবে হ্যাঁ, প্রমাণ আছে তিনি তাঁর ভক্তকে ভালবাসেন।

দশাস্য-বাণয়োস্তুষ্টঃ স্তুবতোর্বন্দিনোরিব।
ঐশ্বর্য্যমতুলং দত্ত্বা তত আপ সুসঙ্কটম্।।

দশমাথাওয়ালা যে রাবণ তার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য শিবঠাকুর কৈলাস উৎপাটন-রূপ পরিশ্রম স্বীকার করেছেন, উদাহরণ আছে। 'বানয়োস্তুষ্টঃ'—বাণরাজার গৃহ-প্রহরী নিযুক্ত হয়েছিলেন শিবঠাকুর। কিন্তু এত করেও ঐ দুই শয়তানের মন পাননি শিব-ঠাকুর। 'ঐশ্বর্য্যমতুলং দত্ত্বা'—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেছিলেন, কিন্তু শিবঠাকুর নিজে মহাসঙ্কটে পড়েছিলেন শেষকালে। এ উদাহরণ আছে। জান ত' তুমি, শোন। যুধিষ্ঠিরকে সেই উপাখ্যান বলছেন,—

ইত্যাদিষ্টস্তমসুর উপাধাবৎ স্বগাত্রতঃ।
কেদার আত্মক্রব্যেণ জুহ্বানোঽগ্নিমুখং হরম্।।

যখনই নারদঋষির কাছ থেকে শুনে নিল, তখনই সঙ্গে সঙ্গে কেদারনাথে গিয়ে হাজির। নারদঋষি কি বলে দিয়েছেন? জল-বেলপাতা দিয়ে তুমি শিবকে সন্তুষ্ট করবে। আর সেই অসুর কি করছে? গায়ের মাংস কেটে কেটে যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছে 'ওঁ শিবায় স্বাহা, ওঁ শিবায় স্বাহা' বলে। এই করতে করতে গায়ে আর মাংস নাই, শুধু হাড় সার। শিবঠাকুর উঠছেন না, দেখাও দিচ্ছেন না। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪০৮ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

☎ ০৩৫৩/৪৬২৮৩৭

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ৪০০৬৮

শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ
পোঃ শক্তিগড়, পিন্-৭৩৪৪০৫
শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে আগামী ৮ই নারায়ণ, ৫১৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ২২শে পৌষ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ (ইং ৭/১/২০০২) সোমবার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর পরিব্রাজকাচার্য্য **ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের ৮১তম শুভাবির্ভাব পৌষী কৃষ্ণা-নবমী তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরুপঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। ইতি ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৪০৮

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সেবকবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

---

*দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডি মহারাজের** নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।*

卐 অনুষ্ঠান-সূচী 卐

২১শে পৌষ (ইং ৬/১/২০০২), রবিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।

অপরাহ্নে—নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে মহাজন-পদাবলী ও অধিবাস কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

২২শে পৌষ (ইং ৭/১/২০০২), সোমবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

প্রাতঃ—৬-৩০ মিঃ হইতে ৮টা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ।

পূর্ব্বাহ্ন—৮-৩০মিঃ হইতে ১১টা পর্য্যন্ত শ্রীগুরুপূজা এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্ম্মসভা—"শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাসতত্ত্ব" সম্বন্ধে ভাষণ।

২৩শে পৌষ (ইং ৮/১/২০০২), মঙ্গলবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

প্রাতঃ—৬-৩০ হইতে ৮টা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

মধ্যাহ্নে—ভোগরাগ ও আরতি কীর্ত্তন।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্ম্মসভা—"শ্রীগুরু-পরম্পরা এবং সম্প্রদায়-প্রণালী" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য।

☆ **"শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট"**-এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয় দান (৮০জি ধারা) আয়কর-মুক্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-প্রসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৩শ বর্ষ } ১৫ নারায়ণ, সঙ্কর্ষণ, ৫১৫ শ্রীগৌরাব্দ
২৯ পৌষ, সোমবার, ১৪০৮, ইং ১৪/১/২০০২ { ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্

[লীলাশুক-শ্রীল-বিল্বমঙ্গল-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

প্রভাতসঞ্চারগতা নু গাব-
স্তদ্ রক্ষণার্থং তনয়ং যশোদা।
প্রাবোধয়ৎ পাণিতলেন মন্দং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২৪।।

প্রভাতকালে ধেনুগণ বনগমনে উদ্যত হইলে তাহাদিগকে রক্ষার জন্য নিদ্রিত কৃষ্ণকে যশোদাদেবী করতলের মৃদু আঘাতে জাগরিত করিয়া বলিতেন,—"হে আমার গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! গাভিগণকে চরাইতে যাও বাবা।।" ২৪।।

প্রবালশোভা ইব দীর্ঘকেশা
বাতাম্বুপর্ণাশন-পূতদেহাঃ।

মূলে তরূণাং মুনয়ঃ পঠন্তি
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২৫।।

বায়ু, জল, পত্রভুক্ত পবিত্রদেহ ও প্রবালরত্নবর্ণ দীর্ঘ জটাধারী মুনিগণ তরুতলে বসিয়া "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" নাম পাঠ করিয়া থাকেন।। ২৫।।

এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ।
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২৬।।

শ্রীকৃষ্ণাসক্তচিত্তা বিরহাতুরা ব্রজগোপীগণ লোকলজ্জা পরিহারপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!"—এইরূপ সুললিতস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।। ২৬।।

গোপী কদাচিন্মণিপিঞ্জরস্থং
শুকং বচো বাচয়িতুং প্রবৃত্তা।
আনন্দকন্দ ব্রজচন্দ্র কৃষ্ণ
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২৭।।

গোপী রাধিকা কোন এক সময়ে মণিপিঞ্জরমধ্যস্থ শুক পক্ষীকে 'হে আনন্দকন্দ! হে ব্রজচন্দ্র! হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" নামসমূহ শিক্ষা করাইতে প্রবৃত্তা হইলেন।। ২৭।।

গোবৎসবালৈঃ শিশুকাকপক্ষং
বধ্নন্তমম্ভোজদলায়তাক্ষম্।
উবাচ মাতা চিবুকং গৃহীত্বা
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২৮।।

কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে কোন এক গোপবালকের শিখণ্ডের সহিত ধেনুবৎসের পুচ্ছ বন্ধন করিতে দেখিয়া মাতা যশোদা পুত্রের চিবুক ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'ও গোবিন্দ! ও দামোদর! ও মাধব!' এ কি করিতেছ?? ২৮।।

প্রভাতকালে বরবল্লবৌঘা
গোরক্ষণার্থং ধৃতবেত্রদণ্ডাঃ।
আকারয়ামাসুরনন্তমাদ্যং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২৯।।

প্রভাতকালে প্রিয় বয়স্যগণ বেত্রদণ্ডহস্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অনন্ত, আদিপুরুষ কৃষ্ণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন,—হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! গোধন চরাইতে যাইবে, আইস।। ২৯।।

জলাশয়ে কালিয়মর্দ্দনায়
যদা কদম্বাদপতন্মুরারিঃ।
গোপাঙ্গনাশ্চুক্রুশুরেত্য গোপা
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩০।।

যখন মুরারি কৃষ্ণ কালিয়নাগকে মর্দ্দন করিবার নিমিত্ত কদম্ববৃক্ষ হইতে কালিয়হ্রদে নিপতিত হইলেন, তখন গোপগোপীগণ "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।। ৩০।।

অক্রূরমাসাদ্য যদা মুকুন্দ-
শ্চাপোৎসবার্থং মথুরাং প্রবিষ্টঃ।
তদা স পৌরৈর্জয়তীত্যভাষি
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩১।।

যখন মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ ধনুর্যজ্ঞোৎসবে যোগদান করিবার জন্য অক্রূরের সহিত মথুরায় প্রবিষ্ট হইলেন, তখন মথুরাবাসিগণ "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও"—এইরূপ বলিতে লাগিলেন।। ৩১।।

কংসস্য দূতেন যদৈব নীতৌ
বৃন্দাবনান্তাদ্ বসুদেবসূনু।
রুরোদ গোপী ভবনস্য মধ্যে
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩২।।

যে-সময় কংসদূত অক্রূর বসুদেবসুত শ্রীকৃষ্ণ, বলরামকে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া গেলেন, তখন কোন গোপী (শ্রীরাধিকা) নিজ ভবনে "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।। ৩২।।

সরোবরে কালিয়নাগ-বদ্ধং
শিশুং যশোদাতনয়ং নিশম্য।
চক্রুর্লুঠন্ত্যঃ পথি গোপবালা
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩৩।।

যখন গোপবালকগণ শুনিলেন যে, কালিয়হ্রদে শিশু যশোদাসুত কালিয়নাগকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াছে, তখনই পথিমধ্যে "হায় গোবিন্দ! হায় দামোদর! হায় মাধব!" বলিয়া ভূমিতলে লুটোপুটি খাইতে লাগিলেন।। ৩৩।।

অক্রূরযানে যদুবংশনাথং
সংগচ্ছমানং মথুরাং নিরীক্ষ্য।
উচুর্বিয়োগাৎ কিল গোপবালা
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩৪।।

অক্রূরের রথে আরূঢ় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে মথুরাভিমুখে যাইতে দেখিয়া কৃষ্ণবিরহে গোপবালকগণ বলিতে লাগিলেন,—"হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলে??" ৩৪।।

চক্রন্দ গোপী নলিনীবনান্তে
কৃষ্ণেন হীনা কুসুমে শয়ানা।
প্রফুল্ল-নীলোৎপল-লোচনাভ্যাং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩৫।।

প্রফুল্লকমললোচনা শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণবিরহে পদ্মবনান্তে কুসুম-শয্যায় শায়িত হইয়া "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।। ৩৫।।

মাতাপিতৃভ্যাং পরিবার্য্যমানা
গেহং প্রবিষ্টা বিললাপ গোপী।
আগত্য মাং পালয় বিশ্বনাথ
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩৬।।

পিতামাতা-কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও কোন গোপী (শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী) গৃহে প্রবেশ করত "হা বিশ্বনাথ! হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব! শীঘ্র আসিয়া আমাকে রক্ষা কর ও পালন কর"—এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।। ৩৬।।

বৃন্দাবনস্থং হরিমাশু বুদ্ধা
গোপী গতা ক্বাপি বনং নিশায়াম্।
তত্রাপ্যদৃষ্টাতিভয়াদবোচৎ
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩৭।।

বৃন্দাবননাথ শ্রীবৃন্দাবনেই সতত বিরাজমান—মনে করিয়া কোন একদিন নিশাকালে গোপী বনগমন করত তথায় তাঁহার অদর্শনে অতিভয়ে "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" নাম উচ্চারণ করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন।। ৩৭।।

সুখং শয়ানা নিলয়ে নিজেঽপি
নামানি বিষ্ণোঃ প্রবদন্তি মর্ত্ত্যাঃ।
তে নিশ্চিতং তন্ময়তাং ব্রজন্তি
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩৮।।

যে-সকল মর্ত্ত্যবাসী নিজগৃহে সুখে-স্বচ্ছন্দেও "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর নাম গান করেন, তাঁহারা নিশ্চিতই শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তা প্রাপ্ত হন।। ৩৮।।

সা নীরজাক্ষীমবলোক্য রাধাং
রুরোদ গোবিন্দ-বিয়োগখিন্নাম্।
সখী প্রফুল্লোৎপল-লোচনাভ্যাং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩৯।।

কোন সখী কমললোচনা শ্রীমতী রাধিকাকে শ্রীগোবিন্দবিয়োগবিধূরা দেখিয়া "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" বলিতে বলিতে প্রফুল্ল কমলনয়নে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।। ৩৯।।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬৯ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণে স্বাভাবিকী একটী পরাশক্তি বলিয়া শক্তি আছে। তাহা বিচিত্র বিলাসময়ী ও বিচিত্র-আনন্দসম্বন্ধিনী। সেই শক্তির অনন্ত প্রভাব থাকিলেও জীবের নিকট তিনটী প্রভাবের পরিচয়মাত্র আছে। সেই প্রভাব-ত্রয়ের নাম চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। বেদবাক্যে অনেকস্থলে এই পরাশক্তির প্রভাব-ত্রয়ের বর্ণন আছে, যথা ;—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদু স্ত ইমে সমাসতে।।

(শ্বেতাশ্বতর ৪।৮ মন্ত্র)

[ঋগ্বেদে যে অক্ষর পরব্যোমের কথা আছে—যাহাতে সমস্ত দেবতা অবস্থান করিতেছেন, যিনি সেই তত্ত্ব জানেন না, তিনি ঋক্‌দ্বারা কি করিবেন? যাঁহারা সেই তত্ত্ব জানেন, তাঁহারাই কৃতার্থ হইয়া থাকেন।]

অত্র কারিকা,—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা পুরাণে বৈষ্ণবে তু যা।
সা চৈবাত্রাত্মশক্তিত্বে বর্ণিতা তত্ত্বনির্ণয়ে।।

[বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর পরাশক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। তত্ত্বনির্ণয়ে সেই শক্তিকেই ভগবানের 'স্বরূপশক্তি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।]

তে ধ্যান-যোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ।।

(শ্বেতাশ্বতর ১।৩ মন্ত্র)

[এক শক্তিমান দেব কাল ও জীবের সহিত স্বভাবাদি-কারণসকলকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই স্বরূপভূতা ও নিজপ্রভাবদ্বারা সংবৃতা শক্তিকেই ধ্যান-যোগপরায়ণ হইয়া নিখিল কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।]

মায়াশক্তি-বিষয়ে কারিকা,—

অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞা যা বৈষ্ণবেহ্যনুবর্ণ্যতে।
মায়াখ্যয়া চ সা প্রোক্তা হ্যাম্নায়ার্থবিনির্ণয়ে।।

[বিষ্ণুপুরাণে যে 'অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞা'-নাম্নী শক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, বেদার্থ-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে উহাই **'মায়া-নাম্নী-শক্তি'** বলিয়া কথিত।]

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।।

(শ্বেতাশ্বতর ৪।৮ মন্ত্র)

[বেদ, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, অশ্বমেধাদি ক্রতু, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ভূত ও ভবিষ্যৎ যাহা কিছু বেদ কীর্ত্তন করেন, তৎসমস্তই মায়াধীশ পুরুষ সৃষ্টি করেন। সেই বিশ্বে অন্য জীব মায়াদ্বারা আবদ্ধ হইয়া বিচরণ করেন।]

তটস্থ জীবশক্তি-বিষয়ে কারিকা,—

ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা চ যা শক্তিঃ সা তটস্থা নিরূপিতা।
জীবশক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া জীবাশ্চনেকধা।।

[(বিষ্ণুপুরাণে ৬।৭।৬১ শ্লোকে) যে **ক্ষেত্রজ্ঞা-নাম্নী** শক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, উহাই **'তটস্থা'** বলিয়া নিরূপিতা হইয়াছে। তাহাকেই 'জীব-শক্তি' বলে। সে শক্তি হইতে অনন্ত জীবের উৎপত্তি হইয়াছে।]

অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্ত-ভোগামজোঽন্যঃ।। (শ্বেতাশ্বতর ৪।৫ মন্ত্র)

[সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা, বহুপ্রকার জননীস্বরূপা সমানরূপা, এক অজা-নাম্নী প্রকৃতিকে অন্য এক অজ পুরুষ (জীব) সেবা করিতে করিতে ভজন করেন। অপর অজ পুরুষ (পরমাত্মা) ভুক্ত-ভোগা ঐ প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন।]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়,—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।। (গীতা ৯।৮)
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে।। (গীতা ৯।১০)
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।। (গীতা ৭।৪-৫)

[আমি স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে (মায়াকে) আশ্রয় করিয়া এই ভূতগ্রাম পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমার স্বরূপ তদ্দ্বারা বিচলিত হয় না। হে অর্জ্জুন! আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য্য করে। আমার ইচ্ছা হইতে প্রকৃতিতে কটাক্ষ করি। সেই সব কার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষদ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করে। এজন্য এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়। হে অর্জ্জুন! আমার অপরা বা জড়া প্রকৃতি ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই আট ভাগে বিভক্ত ; এতদ্ব্যতীত আমার আর একটী পরা-প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে জীবসমূহ নিঃসৃত হইয়া জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে।]

উক্ত তিন শক্তি-প্রভাবদ্বারা চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। **চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনী-বৃত্তি**—তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম, চিদবয়ব, চিদুপকরণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার চিদ্বৈভব উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা সমুদায়ই সন্ধিনী-কার্য্য। **চিচ্ছক্তির যে সম্বিদ্বৃত্তি**—তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত চিন্তামণি-ভাবোদয় হইয়াছে। **চিচ্ছক্তির যে হ্লাদিনী-বৃত্তি**—তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত প্রেমানন্দানুশীলন হইতেছে। **জীবশক্তিতে যে সন্ধিনী**—তাহার কার্য্যস্বরূপ জীবের চিন্ময়সত্তা, নাম ও স্থান সমুদিত হইয়াছে। **তাহাতে যে সম্বিৎ-শক্তি**—তাহার কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞানাদির উদয় হয়। **তাহাতে যে হ্লাদিনী**—তৎকার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ ক্রিয়ালাভ করে। অষ্টাঙ্গ-যোগগত সমাধি-সুখ বা কৈবল্যসুখও তাহার কার্য্যবিশেষ। **মায়াশক্তিতে যে সন্ধিনী-বৃত্তি আছে,** তাহার কার্য্যস্বরূপ চতুর্দ্দশ-লোকময় সমস্ত জড়বিশ্ব, বদ্ধজীবের জড় ও লিঙ্গ-শরীর, বদ্ধজীবের স্বর্গাদি-লোক-গতি ও সমস্ত জড়েন্দ্রিয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে। বদ্ধজীবের জড়ীয় নাম, জড়ীয় রূপ, জড়ীয় গুণ ও জড়ীয় কার্য্য সমুদায়ই তদুদ্ভূত। **মায়াতে যে সম্বিদ্বৃত্তি** তদ্দ্বারা জড়বদ্ধ জীবের চিন্তা, আশা, কল্পনা ও বিচার-সমুদায় উদিত হয়। **মায়াতে যে হ্লাদিনী-বৃত্তি**—তদ্দ্বারা স্থূল-জড়ানন্দ ও স্বর্গাদিগত সূক্ষ্ম-জড়ানন্দ উদিত হইয়াছে।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-বৃত্তিত্রয় চিচ্ছক্তিতে নির্ম্মল ও নিরূপাধিকরূপে পূর্ণতার সহিত নিত্য-ক্রিয়াবতী। জীবশক্তিতে পরমাণুপ্রায় হইয়া অতি ক্ষুদ্রভাবে প্রকাশ পায়। মায়াশক্তিতে বিকৃতভাবে তত্তদ্বৃত্তির আভাসমাত্র দেখা যায়। জীবের পক্ষে মায়াবত্তিসকল হেয়। জীবশক্তির স্বীয়-বৃত্তিসমুদায় হেয় নয়, কিন্তু অপ্রচুর। চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী-সংযোগ ব্যতীত জীব পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারেন না। তাহা কেবল কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণপাত্রের কৃপা ব্যতীত কখনই সম্ভব হয় না।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৮ ; ১৪ জানুয়ারী, ২০০২

এস্থলে কয়েকটী কারিকা প্রদত্ত হইল, যথা,—

বিরোধ-ভঞ্জিকা-শক্তিযুক্তস্য সচ্চিদাত্মনঃ।
বর্ত্তন্তে যুগপদ্ধর্ম্মাঃ পরস্পর-বিরোধিনঃ।।
সরূপত্বমরূপত্বং বিভুত্বং মূর্ত্তিরেব চ।
নির্লেপত্বং কৃপাবত্ত্বমজত্বং জায়মানতা।।
সর্ব্বারাধ্যত্বং গোপত্বং সার্ব্বজ্ঞ্যং নর-ভাবতা।
সবিশেষত্ব-সম্পত্তিস্তথা চ নির্ব্বিশেষতা।।
সীমাবদ্-যুক্তিযুক্তানামসীম-তত্ত্ব-বস্তুনি।
তর্কো হি বিফলস্তস্মাচ্ছ্রদ্ধাম্নায়ে ফলপ্রদা।।

সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে অবিচিন্ত্য বিরোধভঞ্জিকা-নাম্নী একটী শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই তাঁহাতে পরস্পর-বিরোধী সমস্ত ধর্ম্মই অবিরোধে যুগপৎ নিত্য বিরাজমান। সরূপতা ও অরূপতা, বিভুতা ও শ্রীবিগ্রহ, নির্লেপতা ও ভক্তকৃপালুতা, অজত্ব ও জন্মবত্তা, সর্ব্বারাধ্যত্ব ও গোপত্ব, সার্ব্বজ্ঞ্য ও নরভাবতা, সবিশেষত্ব প্রভৃতি অনন্ত বিরোধী ধর্ম্মসকল শ্রীকৃষ্ণে সুন্দররূপে আপন আপন কার্য্য করিয়া হ্লাদিনী মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সেবাসাহায্যে নিযুক্ত আছে। এ বিষয়ে যাঁহারা তর্ক করেন, তাঁহারা নিতান্ত বঞ্চিত। তর্কারম্ভের পূর্ব্বেই বিবেচনা করা উচিত যে, নর-যুক্তি সহজে সীমাবিশিষ্ট, অতএব অসীমতত্ত্বে তাহার কোন পরিচয়ই সম্ভব নয়। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শুষ্ক তর্ককে পরিত্যাগ করিয়া আম্নায়বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সেই শ্রদ্ধা-বীজ হইতে ভক্তিলতা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আরোহণ করে। আম্নায়বাক্য-সকল অনেক। দুই একটী এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।।

(শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯ মন্ত্র)

[ভগবানের প্রাকৃত হস্ত-পদাদি নাই, অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই, অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন এবং প্রাকৃত কর্ণশূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে আদি ও মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন।] (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭১ পৃষ্ঠার পর]

আধ্যক্ষিকের কিরূপ দুর্গতি হয় তাহা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে চিত্রকেতু রাজার উপাখ্যানে জানিতে পারি। চিত্রকেতু রাজা পার্ব্বতীকে মহাদেবের ক্রোড়ে অবস্থিত দেখিয়া তন্নিন্দা (মহাদেবের) করিয়াছিল। শিবের প্রতি দোষদৃষ্টি করার দরুণ পার্ব্বতী তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। পার্ব্বতীর অভিসম্পাতে সে বৃত্রাসুর হইল। এইজন্যই শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিয়াছেন,—

'বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।'

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে।।

মহাদেব দক্ষকে প্রণাম করেন নাই বলিয়া একসময়ে পার্ব্বতী শিবকে অনুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। পার্ব্বতীর সেই ভ্রম দূর করিবার জন্য মহাদেব পার্ব্বতীকে উপরিউক্ত শ্লোক বলিয়াছিলেন। মহাদেবের আচরণে দোষদর্শন করিলেও মহাদেব পার্ব্বতীকে অভিসম্পাত দেন নাই। কিন্তু চিত্রকেতু রাজা আধ্যক্ষিক বিচারে মহাদেবের নিন্দা করায় পার্ব্বতী তাহাকে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন। চিত্রকেতু রাজা বৈষ্ণবগুণে অমানী মানদ হওয়ায় কোনপ্রকার দ্বিরুক্তি না করিয়া পার্ব্বতীর অভিসম্পাত মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি পার্ব্বতীকে ফিরিয়া অভিসম্পাত করেন নাই।

ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের কথা ঋগ্বেদে আছে। বৈষ্ণবধর্ম্ম আধুনিক নহে। বৈষ্ণবধর্ম্ম আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বেদ ও বর্ণবিভাগের পূর্ব্বে হংসজাতি পরমেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনা করিত। বৈষ্ণবধর্ম্ম বৈদিকযুগেরও পূর্ব্বকালের। বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রাগ্‌বৈদিক যুগে ছিল। উপনিষদে একায়ন পদ্ধতির কথা আছে।

আধ্যক্ষিক-বিচারে বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তের ক্রিয়াকলাপ সমান বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বৈষ্ণবের চরিত্র জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। তাই শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেন,—"বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।।" জড়জগতের চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ থাকাকাল পর্য্যন্ত ভক্ত ও ভগবানের লীলারহস্য কিছুই অবগত হওয়া যায় না। জড়জ্ঞান ও দিব্যজ্ঞান এক নহে। সাধারণ চিন্তাস্রোত দিব্যজ্ঞানের দ্বারা দূরীভূত না হইলে প্রকৃত মঙ্গল হইবে না। ভগবানের কৃপা না হইলে মায়াজাল এড়ান যাইবে না। যাঁহারা নিষ্কপটভাবে হরিভজন করেন, তাঁহারাই ভগবানের কৃপা পান।

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে।।

কৈতবরহিত ধর্ম্মই বৈষ্ণবধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে প্রোজ্ঝিতকৈতবধর্ম্মের কথা আছে। শ্রীধরস্বামিপাদ উহার টীকায় লিখিয়াছেন,—"প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" ইতর বাসনা রাখিয়া ভগবান্‌কে ডাকার ভাণ কপটতা। পঞ্চোপাসকগণ কপট। যেহেতু তাহারা দেবগণকে প্রকারান্তরে তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য গোলাম করিয়া ফেলিতেছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রার্থিগণ কপট। সুতরাং তাহারা অভক্ত। ভগবানের দয়া না হইলে লোক অভক্ত থাকে। আবার শরণাগত না হইলে ভগবানের কৃপা পাওয়া যায় না। এইজন্যই 'তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং।" ভগবানের শরণাগত হইলে স্ত্রী, শূদ্র, যবন, পক্ষী প্রভৃতিরও সুবিধা হয়। তাহারাও দেবমায়া অতিক্রম করিতে পারে। পাপহেতুই জীবগণ স্ত্রী, শূদ্র, হূন প্রভৃতি হয়।

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূন-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণ-শীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে।।

'অদ্ভুতক্রম'-শব্দে ত্রিবিক্রম বিষ্ণুকে বুঝায়। বিষ্ণুলীলা ও অবতারগণের লীলা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য বলিয়াই উহা অদ্ভুতক্রম-নামে পরিচিত। রাম-নৃসিংহাদি অবতারের সেবকগণ বৈষ্ণব। রামের সেবকগণ রামায়েৎ, নৃসিংহের সেবকগণ নারসিংহী। বরাহবিষ্ণুর সেবকগণ বারাহী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অবতারের ভিন্ন ভিন্ন বৈকুণ্ঠ ও তাঁহাদের নিত্য সেবকগণ আছেন। বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার হইলেও বৌদ্ধগণ বুদ্ধকে বিষ্ণু বলিয়া স্বীকার না করায় অবৈষ্ণব। বৌদ্ধগণ বৈষ্ণব নহেন। দশাবতারের সেবকগণ দশপ্রকারের বৈষ্ণব। প্রাগ্‌বৈদিক যুগে বহু শুদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ছিলেন। যথা—বৈখানস, বালখিল্য, সাত্বত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। মৎস্য-কূর্ম্মাদি বিভিন্ন গৌণরসের উপাস্য বস্তু। ঘৃণিত রসের অর্থাৎ জুগুপ্সা রতির উপাসকগণ মাৎস্য বৈষ্ণব। কিন্তু তাঁহারা ঘৃণিত গন্ধযুক্ত নিম্ন মানবজাতির সেবক নয়। হাড়ি-ডোমের উপাসক বৈষ্ণব নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমৎস্য-অবতারের কথা বর্ণিত আছে। মৎস্যদেব দাক্ষিণাত্যে পয়োষ্ণী নদীর তীরে সত্যব্রত রাজাকে কৃপা করিয়াছিলেন ও হয়গ্রীব-নামক অসুরকে বধ করিয়া বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। **(ক্রমশঃ)**

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—১৯)

শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে যে লোক দর্শন করাইয়াছিলেন, তাহা বৈকুণ্ঠ হইতে ভিন্ন নহে। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত এই শ্লোক তাহার প্রমাণ,—

জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকাম-কর্ম্মভিঃ।
উচ্চাবচানু-গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্।।
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বঃ গোপানাং তমসঃ পরম্।।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ।।
তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতমগ্রাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ।
দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরা।।
নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ।
কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ।।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ গোপগণের সঙ্কল্প অবগত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন,—জনগণ অবিদ্যা-কামকর্ম্মদ্বারা দেব-তির্য্যগাদি নানাযোনিতে ভ্রমণ করে, তজ্জন্য নিজেদের গতি জানিতে পারে না। গোপগণও কৃষ্ণমায়ায় নিজদিগকে তাদৃশ ধারণা করেন। মহাকারুণিক বিভু এই চিন্তা করিয়া প্রকৃতির অতীত নিজ লোক গোপগণকে দেখাইয়াছিলেন। গুণক্ষয়ে অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত হইলে মুনিগণ যাহা দর্শন করিয়া থাকেন, যাহা সত্য, জ্ঞান, অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম, গোপগণ তাহাই দর্শন করিয়াছিলেন।

উপরিউক্ত শ্লোকসমূহ হইতে "স্বাং গতিং", "গোপানাং স্বং লোকং" এবং "কৃষ্ণঞ্চ" প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে, ঐ লোকের সঙ্গে গোপগণের সম্বন্ধ আছে, তথায় তাঁহাদের অধিকার নির্দ্দেশ করিতেছে। কৃষ্ণ-শব্দ হইতে ঐ লোকে তাঁহার সাক্ষাৎ স্থিতিও নিশ্চিত হইতেছে বলিয়া উহা নারায়ণের বিহারস্থল বৈকুণ্ঠধাম নহে, কিন্তু গোলোক। গোপগণও বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন না, গোলোকেই নিত্য অবস্থিতি। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পদ্যে জানা যায়,—গোপগণ সেই ধামে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রজলীলায় ও গোলোকলীলায় শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তদীয় পরিকরগণেরও প্রকাশভেদ জানা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন এক প্রকাশে গোলোকে, অপর প্রকাশে বৃন্দাবনে বিরাজ করেন, তাঁহার পরিকর গোপ-গোপীগণও তদ্রূপ উভয় স্থানে বিরাজিত। যখন প্রকাশভেদ হয়, তখন উভয়-ধামগত বিবিধ লীলারসপুষ্টির জন্য লীলাশক্তি পরিকরগণের

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৮ ; ১৪ জানুয়ারী, ২০০২

অভিমানভেদ এবং পরস্পরের অনুসন্ধান প্রায় সম্পাদন করিয়া থাকেন। এজন্য বলা হইয়াছে, তাঁহারা ভ্রমবশতঃ আপনাদের গতি জানেন না।

এইপ্রকার প্রকাশান্তর অসম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ, ধাম, পরিকর, লীলাদি একই সময়ে একই স্থানে অনন্তপ্রকার বৈভব প্রকাশে সমর্থ।

দ্বারকা ও মথুরায় যাদবগণ এবং বৃন্দাবনে গোপগোপীগণ তাঁহার নিত্য পরিকর। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন,—

এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্‌গণা এব ভামিনি।
সর্ব্বদা মৎপ্রিয়া দেবি মত্তুল্যগুণশালিনঃ।।

হে ভামিনি! এই যাদবগণ আমার নিজজন, আমার সর্ব্বদা প্রিয় এবং আমার তুল্য গুণশালী। এই শ্লোকে 'এব'-পদদ্বারা কেবল যাদবগণই শ্রীকৃষ্ণের পরিকর কিন্তু দেবগণ নহেন, ইহা নির্দ্দিষ্ট হইল।

মথুরায় প্রকটলীলাকালে যে-সকল পরিকর আবির্ভূত হন, তাঁহাদের কেহ কেহ তথায় নিগূঢ়ভাবে বিরাজ করেন (অপ্রকটকালে)। শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে উক্ত আছে,—

যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ।
রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈরুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ।।

যে মথুরায় বিভু শ্রীকৃষ্ণ রাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও রুক্মিণী সহিত অবস্থিত। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, প্রকটাপ্রকট সর্ব্বকালেই তাঁহাদের তথায় নিত্যস্থিতি।

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে,—

অহো অভাগ্যং লোকস্য ন পীতং যমুনাজলম্।
গোবৃন্দ-গোপিকা-সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা।।

কংসঘাতী শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপিকাসহ যথায় ক্রীড়া করেন, সেই বৃন্দাবনস্থ যমুনার জল যে লোক পান করে নাই, সে অভাগা। এই প্রমাণানুসারে জানা গেল যে, বৃন্দাবনস্থ যমুনার জলে শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপীসহ নিত্য বিহার করেন।

স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে,—

বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ।।

শ্রীবলরামসহ শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণ পরিবৃত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বৎস ও বৎসতরীগণের সহিত সতত বিহার করেন।

পাদ্মে শ্রীভগবদ্বাক্য,—

নিত্যং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা।
যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপালবালকান্।
যমাবতারো নিত্যোঽয়মত্র মা সংশয়ং কৃথা।।

আমার এই মথুরাপুরীকে নিত্য বলিয়া জান। বৃন্দাবন নামক বন, যমুনা, গোপকন্যা, গোপগণকে তদ্রূপ নিত্য বলিয়া জানিতে হইবে। এই মথুরা-বৃন্দাবনে আমার নিত্য অবতার, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়,—

তা বাং বাস্তুন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
তত্রাহ তদুরুগায়স্য কৃষ্ণ পরমং পদমবভাতি ভূরীতি।।

তোমাদের (রামকৃষ্ণের) সেই বাস্তু (লীলাস্থান) পাইবার জন্য কামনা করিতেছি। তথায় ভূরিশৃঙ্গ শুভলক্ষণযুক্ত গোসকল বাস করিতেছে। ভূরিশৃঙ্গ অর্থাৎ মহাশৃঙ্গ। কৃষ্ণ অর্থে যাঁহার শ্রীচরণকমল সর্ব্বাভিলাষ-পুরণকারী, তাঁহার পরমপদ প্রপঞ্চাতীত ধাম বহুপ্রকারে প্রকাশমান।

অথর্ব্ববেদোক্ত গোপালতাপনীতে—জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদোঽয়ং যোঽসৌ সূর্য্যে তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোপান্ পালয়তি যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি অর্থাৎ যিনি জন্মজরা-রহিত, ত্রিকালস্থায়ী, অপক্ষয়শূন্য, সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত, গোসকলে অবস্থিত, যিনি গোপগণকে পালন করেন, যিনি গোপমধ্যে অবস্থান করেন ইত্যাদি।

এইসকল দৃষ্টান্তদ্বারা গোপগণসহ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহার প্রমাণিত হইতেছে।

❑❑❑❑

বৈষ্ণবাপরাধ

দশপ্রকার নামাপরাধের অন্যতম হইতেছে বৈষ্ণবাপরাধ। জগতে যতপ্রকার অপরাধ হইতে পারে, তন্মধ্যে বৈষ্ণববিদ্বেষের ন্যায় অপরাধ আর নাই। বৈষ্ণবাপরাধ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। সকল শাস্ত্র বৈষ্ণবাপরাধের ভয়াবহতার কথা বিশেষভাবে বর্ণন করিয়াছেন। বিশেষতঃ সদ্‌গুরু-পদাশ্রিত নাম-মহিমাপ্রচারকারী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধ পরমাপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বিষ্ণুসেবাপরায়ণ বৈষ্ণবের হিংসা বা নিন্দা করিলে সাধারণ জীবের হিংসা বা নিন্দা অপেক্ষা শতগুণ পাপ বা অপরাধ উপস্থিত হয়।

যত পাপ হয় প্রজা-জনেরে হিংসিলে।
তা'র শতগুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দিলে।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৫।১৪৫)

বৈষ্ণবের যিনি নিন্দা করেন, তাঁহাকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য ইহ জগতের কাহারও নাই ; এমন কি, ভক্তবৎসল ভগবান্‌ও বৈষ্ণবাপরাধীকে কোনকালে ক্ষমা করেন না। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে রহিয়াছে,—

বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যা'র গণ।
তা'র রক্ষা-সামর্থ্য নাহিক কোন জন।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।১২৮)

বৈষ্ণব—সর্ব্বদেব-পূজ্য, সর্ব্বনর-পূজ্য, সর্ব্বতোভাবে সকলের পূজ্য। সেই বৈষ্ণবের নিন্দাফলে নিন্দকের কুষ্ঠব্যাধি হয়। শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণবনিন্দক এক কুষ্ঠরোগীকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে বৈষ্ণব-নিন্দার ভয়ানক পরিণামের কথা শিক্ষা দিয়াছেন,—"কুষ্ঠরোগের জ্বালা-যন্ত্রণা ও অসুবিধা বৈষ্ণবনিন্দকের অল্প শাস্তিমাত্র, যম মহারাজ তাহাকে চৌরাশী সহস্র নরক ভুঞ্জাইয়া অধিকতর দণ্ড বিধান করেন। বৈষ্ণবনিন্দক পাপী কখনও কাহারও দর্শনীয় হইতে পারে না। ভগবান্ সেই বৈষ্ণবনিন্দক পাষণ্ডীকে কখনও দণ্ডভোগ হইতে মুক্ত করেন না।"

প্রভু বলে,—"বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠ-রোগ কোন্ তা'র শাস্তিয়ে লিখন।
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র।।
চৌরাশী-সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি' ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে।।

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৩৭৫-৩৭৭)

এই প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণের দ্বারকা মাহাত্ম্যে প্রহ্লাদ-বলি-সংবাদ হইতে পাওয়া যায়,—

করপত্রৈশ্চ ফাল্যন্তে সুতীব্রৈর্যমশাসনৈঃ।
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে পাপা বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।।
পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তরশতৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে।।

"মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দাবাদ করিলে যমদূতসকল সুশাণিত করপত্রদ্বারা সেই পাপীদিগকে বিদীর্ণ করিয়া থাকেন। শত শত জন্ম অর্চ্চিত হইলেও বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরি বৈষ্ণবাপমানকারীর প্রতি প্রসন্ন হন না।" এই প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—

যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম।
করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্ম্মযশঃ সুতাঃ।।
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে।।
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুদ্ধতে যাতি ন হর্ষং দর্শনে পততানি ষট্।।

"হে রাজন্! ভগবদ্ভক্তকে উপহাস করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কীর্ত্তি ও সন্ততি বিনষ্ট হয়। মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দাকারিগণ পিতৃগণের সহিত মহারৌরব নরকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি বৈষ্ণবগণকে প্রহার, নিন্দা, দ্বেষ বা অনাদর করে, তাঁহাদিগের প্রতি ক্রোধ করে ও তাঁহদিগের দর্শনে হর্ষপ্রকাশ করে না, সে নিরয়গামী হয়। এই ছয়টী নরকপতনের কারণ।" বৈষ্ণবগণকে নিন্দা বা প্রপীড়িত করিলে আজন্ম সঞ্চিত যাবতীয় পুণ্যসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

জন্ম প্রভৃতি যৎ কিঞ্চিৎ সুকৃতং সমুপার্জ্জিতম্।
নাশ মায়াতি তৎ সর্ব্বং পীড়য়েদ যদি বৈষ্ণবান্।। (হঃ ভঃ বিঃ)

এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের কৃষ্ণজন্মখণ্ডে পাওয়া যায়,—"যে নিন্দতি হৃষীকেশং তদ্ভক্তং পুণ্যরূপিণম্। শতজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তেষাং নশ্যতি নিশ্চিতম্। তে পতন্তি মহাঘোরে কুম্ভীপাকে ভয়ানকে। ভক্ষিতাঃ কীটসঙ্ঘেন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। তস্য দর্শনমাত্রেণ পুণ্যং নশ্যত নিশ্চিতম্। গঙ্গাং স্নাত্বা রবিং দৃষ্ট্বা তদা বিদ্বান্ বিশুদ্ধ্যতি।" অর্থাৎ যে হৃষীকেশ ও পুণ্যরূপী তাঁহার ভক্তগণের নিন্দা করে, তাহার শতজন্মের অর্জ্জিত পুণ্যসমূহ অবশ্যই বিনষ্ট হয়। সেই পাপী ভয়ানক কুম্ভীপাক নরকে পতিত হইয়া চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থানকাল পর্য্যন্ত কৃমিসমূহের দ্বারা ভক্ষিত হয়। বৈষ্ণবাপরাধীকে দর্শন করিলে সমস্ত পুণ্য ধ্বংস হয় এবং গঙ্গায় স্নান ও সূর্য্যদর্শনের মাধ্যমে বিশুদ্ধতা লাভ হয়।"

সাধারণ পাপিষ্ঠ দুরাচার দস্যুগণ তাহাদের কৃতকর্ম্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কালাবধি ক্লেশভোগ করে মাত্র। কিন্তু বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষকারী অনন্তকাল ধরিয়া জন্মে জন্মে প্রতিমুহূর্ত্তে ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। তাহাদের হীন কর্ম্মের জন্য ভগবান্ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করান।

বাটোয়ারে সবে মাত্র এক জন্মে মারে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহরে।।
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২০।১৪৫)

যে মোহার দাসের সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম কল্পতরু তাহারে সংহারে।। (চৈঃ ভাঃ)

যে-সকল অপরাধী মহাপাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের নিন্দা করিবার দুঃসাহস প্রদর্শন করে, দৈবদুর্ব্বিপাকে সেই সকল পাপিষ্ঠ সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু পাপী মদ্যপকে উদ্ধার করিয়া চরণে ঠাঁই দিয়াছিলেন, কিন্তু মহাপরাধী বৈষ্ণবনিন্দককে কুম্ভীপাক নরকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

মদ্যপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞি।
বৈষ্ণব-নিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলা ঠাঞি।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৩৯)

মদ্যপ কেবলমাত্র পাপী, প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা পাপের ক্ষালন হয় ; কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধীর অপরাধ কিছুতেই ক্ষালিত হয় না, যেহেতু বৈষ্ণবাপরাধ অমার্জ্জনীয়। বরং মদ্যপের সভা অনেক ভাল, কিন্তু যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়, তাহা সন্ন্যাসীর সভা হইলেও অত্যন্ত গর্হণীয়।

যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
সর্ব্বধর্ম্ম থাকিলেও তবু হয় ক্ষয়।।
সন্ন্যাসি-সভায় যদি হয় নিন্দা-কর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৪১-৪২)

যে-সকল ব্যক্তি বিদ্যা, ধন, কুল ও কর্ম্মের নানাবিধ অহঙ্কারের মাদকতায় মত্ত হইয়া নিজকে হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা মনে করিয়া দোষের আরোপ করে, তাহাদিগকে সংসারচক্রে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া দুঃখভোগ করিতে হয়। ভগবান্‌ও বৈষ্ণবাপরাধীর পূজা কখনও গ্রহণ করেন না। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়,—

যে 'বৈষ্ণব' নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যে বৈষ্ণব-চরিত্র।।
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
সে বৈষ্ণব-পূজা হৈতে বড় আর নাই।।

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৩৫৬-৩৫৭)

হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সে-ই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন-মরণ।।
বিদ্যা-কুল-তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে যে পাপী দুরাচার।।
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন।।

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৩৬০-৩৬২)

শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

চারি-বেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জনম জনম কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে।।

(চৈঃ ভাঃ অঃ ২০।১৪৯)

ভগবানের নামপ্রচারকারী বৈষ্ণবদিগের নিন্দা একপ্রকার ভক্তদ্রোহ। ভগবান্ ভক্তদ্রোহ কখনও সহ্য করেন না।

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্।। (পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড)

"সাধুগণের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে, কেননা, যে-সকল নামপরায়ণ বৈষ্ণবদিগের দ্বারা জগতে কৃষ্ণনাম-মহিমা খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি লাভ করেন, সেই নামপ্রচারকারী বৈষ্ণবগণের নিন্দা ভগবান্ কি করিয়া সহ্য করিবেন?" যাহারা জড়দেহকে 'আত্মা' বলিয়া জ্ঞান করে, তাদৃশ অসৎ ব্যক্তি যে নিরন্তর মহদ্ব্যক্তিদিগের নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদিও মহাপুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করেন, তথাপি তাঁহাদের পদরেণুসমূহ মহতের নিন্দা সহ্য করিতে পারে না, উহারা নিন্দকের তেজোনাশ করিয়া থাকে। অসতের মহদ্বিনিন্দাই শোভনীয়। কারণ, তদ্দ্বারা উহাদের সমুচিত প্রতিফলই লভ্য হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবনিন্দকমাত্রেই মহাপাপিষ্ঠ, দুরাচার। সেবা-অপরাধী, নাম-অপরাধী অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া শ্রীনামপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে পরমকরুণাময় শ্রীহরি কৃপাদৃষ্টিদ্বারা তাহার সেই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধীর কোনকালে রক্ষা নাই।

হরি-স্থানে অপরাধে তারে হরিনাম।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান।। (শ্রীল নরোত্তম)

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বৈষ্ণবাপরাধকে এক অতিকায় হস্তিনীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫৬)

বৈষ্ণবাপরাধরূপ হস্তিনী যাহাতে ভক্তিলতিকাযুক্ত কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া ভক্তি-লতিকা সমূলে উৎপাটিত করিতে না পারে, তজ্জন্য ভক্তিপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই সদা সতর্ক থাকিতে হইবে। কমলশোভিত সরোবরে মত্ত হস্তিনীর প্রবেশে যেমন সরসী শ্রীহীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ ভক্তি-দীর্ঘিকায় প্রস্ফুটিত কমলবনে বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্ত হস্তিনীর প্রবেশও ভয়াবহ ও অনিষ্টকর। বৈষ্ণবের নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধ ভজনের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়।

বৈষ্ণবের কাছে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ।
মহা মহা ভজনেতে পড়ে যায় বাদ।।

স্বয়ং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নিজ মাতাকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তিপথের পথিকগণকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সাবধান থাকিতে উপদেশ করিয়াছেন। অন্যের কা কথা, পরমবৈষ্ণব শিবও যদি বৈষ্ণবনিন্দা করেন, তিনিও বিনাশপ্রাপ্ত হন।

২ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৮ ; ১৪ জানুয়ারী, ২০০২

জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ-সাবধান।
শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ পায়,—কহে শাস্ত্রবৃন্দে।।
ইহা না মানিয়া যে সুজন নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।৫৪-৫৬)

বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণ অত্যন্ত দোষাবহ ও অনিষ্টকারক

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৭৪।৪০) উক্ত হইয়াছে,—"বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণেঽপি দোষ উক্তঃ" অর্থাৎ বৈষ্ণবনিন্দাকারিগণ কেবলমাত্র যে দোষী তাহা নহে, যিনি বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণ করেন, তিনিও অপরাধী।

সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত—বেদে এই কয়।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২০।১৪৪)

শাস্ত্রের অন্যত্রও পাওয়া যায়—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাৎ চ্যুতঃ।।

"ভগবান্ বা ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যিনি সেইস্থান ত্যাগ না করেন, সেই ব্যক্তিও সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হন।" যেস্থানে বৈষ্ণবনিন্দা হয়, স্বয়ং মরিতে সামর্থ্য না থাকিলে নিজ কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক ঐ স্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আর যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে ঐ অসতের অকল্যাণবাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদন করাই বিধেয় এবং তদনন্তর স্বীয় প্রাণও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য—ইহাই শাস্ত্রের বিধি। এই প্রসঙ্গে ভক্তিসন্দর্ভের ২৬৫ সংখ্যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডনের উপায়

বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। ভগবান্ স্বয়ং কখনও বৈষ্ণবাপরাধীর অপরাধ খণ্ডন করেন না, কিন্তু যে বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হয়, তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলে তিনি ক্ষমা করা মাত্রই অপরাধীর অপরাধ দূরীভূত হয়। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

প্রভু বলে,—"উপদেশ কহিতে সে পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি।।

যে-বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যা'র।
পুনঃ সে-ই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর।।
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।৩১-৩২)

শাস্ত্রের অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সেই মুখে যায়।
পা'য়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়।।
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৩৮০)

যেমন বিষভক্ষণ করিলে বিষের ক্রিয়ায় শরীর জর্জ্জরিত হয়, আবার বিষনাশক অমৃত পান করিলে ঐ বিষ নষ্ট হইয়া শরীর পুনরায় সবল হয় ; সেইরূপ বৈষ্ণব-নিন্দাজনিত যে অপরাধ কোটি প্রায়শ্চিত্তেও দূর হয় না, সেই অপরাধ একমাত্র বৈষ্ণবের স্তুতিদ্বারাই দূরীভূত হয়।

যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন।
সেই মুখে কর' তুমি বৈষ্ণব-বন্দন।। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৫৩)

বৈষ্ণবগণের নিন্দা পরিত্যাগ করিয়া যিনি একবারমাত্রও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তিনি অনায়াসে ভগবদনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধী কোটি কোটি জন্ম নামভজন করিলেও বৈষ্ণবাপরাধের ফলে ভগবন্নামের ফল প্রেমলাভ করা দূরে থাকুক, অষ্টপাশবদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পর্য্যন্তও লাভ করিতে অসমর্থ হয়। বৈষ্ণবাপরাধী নিজে নরকগামী হয় এবং অপরকেও নরকগামী করায়। ভক্তিপথের পথিকগণ বৈষ্ণবাপরাধের প্রতি তীব্রদৃষ্টি রাখিয়া বিশেষভাবে সজাগ হইয়া কৃষ্ণভজন করিবেন, অন্যথায় সাধন-ভজন সমস্ত ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিরর্থক হইয়া পড়িবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের পার্থক্য

জগতে সর্ব্বত্র রসতত্ত্ব লইয়া আলোচনার বা রসতত্ত্ব-কীর্ত্তনের বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। রাসলীলা, নৌকাবিলাস, মানভঞ্জন, মাথুরলীলা প্রভৃতি কীর্ত্তন গানের আসরে অসংখ্য শ্রোতার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু "না উঠিয়া বৃক্ষোপরি টানাটানি ফল ধরি"—এই বাক্যানুসারে বিপদেরই সম্ভাবনা অধিক। প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যগণ রসতত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে না পারিয়া প্রকৃত তত্ত্ব আলোচনা করিবার পরিবর্ত্তে কেবল তাহার বাহিরের দিক্‌টী নিজের মত করিয়া বলিতেছেন বা বুঝাইতেছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র যে-সকল বর্ণন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য বা শাস্ত্রমর্ম্ম কেবলমাত্র মহাভাগবতগণই উপলব্ধি করিয়াছেন। সেই সমস্ত অপ্রাকৃত

রসবিশেষ ভাবনাচতুর রসজ্ঞ মহাজনগণের যতক্ষণ পর্য্যন্ত আনুগত্য না করা যাইবে অথবা তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ কৃপালব্ধ অনুমোদন না পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাকৃত ভাবনাচালিত জড়রসে আসক্তচিত্ত হইয়া অনর্থ অবস্থায় অপ্রাকৃত রস আস্বাদনের অভিনয় করিলে অধঃপতিত হইতে হইবে—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এইজন্য অপ্রাকৃত রস অভিজ্ঞ মহাজনগণের নিষ্কপট আনুগত্যের বিশেষ প্রয়োজন। শাস্ত্র বলিলেন,—

"যাহ', ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে।।
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ।।

(চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১-১৩২)

রূপানুগগণের মূল মহাজন শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বল-নীলমণি-গ্রন্থে এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জৈবধর্ম্মে রসতত্ত্বের বিচার করিয়াছেন। সেই রসতত্ত্ব বুঝিবার ক্ষমতা কোথায়? তাহার তাৎপর্য্য উপলব্ধির ক্ষমতা কাহারই বা আছে? অনর্থযুক্ত অবস্থায় তাহাতে প্রবেশাধিকার কোনমতেই হয় না।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।।

(ভাঃ ১।১।৩)

এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব পুরুষার্থপ্রদ বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফলস্বরূপ। ইহা শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া অখণ্ডরূপে অবনীমণ্ডলে পতিত হইয়াছে। অতএব রসবিশেষ ভাবনা-চতুর রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ অমৃতদ্রবসংযুত এই রসময় ফল মোক্ষ পর্য্যন্ত বারম্বার পান করুন। শ্রীল জীবগোস্বামী বলিয়াছেন,—"স চ রসো ভগবৎপ্রীতিময় এব।"

এই রসাস্বাদন বা ভগবৎপ্রীতিলাভের ক্রম আছে। যথা,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।

এমন কি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষেও রসতত্ত্বের তাৎপর্য্য উপলব্ধি সম্ভবপর হয় না। এই রসমাধুর্য্যে প্রবেশের অধিকার একমাত্র শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধারাণীর নিজজন ব্রজগোপীগণেরই রহিয়াছে। তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত কোনমতেই ইহাতে প্রবেশের অধিকার লাভ হইবে না।

সুতরাং শ্রীরাধাগোবিন্দের চিন্ময়ীলীলায় অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত

রসবিশেষ ভাবনাচতুর রসজ্ঞ শুদ্ধভক্ত সাধুগুরুর শ্রীমুখে তাহা শ্রবণপূর্ব্বক কীর্ত্তন-পরায়ণ হইলে শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ সম্ভব হইবে এবং সেই পরাভক্তি লাভ হইলে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ দুরারোগ্য হৃদ্রোগ কাম ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ হইবে এবং তখন কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাময়ী প্রেমভক্তিলাভের সৌভাগ্যের উদয় হইবে। তজ্জন্য উপযুক্ত সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত বক্তার শ্রীমুখেই এই অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের কথা শ্রবণের দ্বারা তাঁহারই কৃপায় শ্রোতার শ্রবণযোগ্যতা লাভ হইয়া ক্রমশঃ উপরোক্ত ক্রম-পর্য্যায়ক্রমে গূঢ় হইতে গূঢ়তর রসমাধুর্য্যে প্রবেশাধিকার লাভ ঘটিবে এবং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের তাৎপর্য্য উপলব্ধির বিষয় হইবে।

জীবের বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশবিধ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র ও মহাভূতপঞ্চক সকলই এক অচেতন প্রকৃতি হইতে যখন পর্য্যায়ক্রমে উৎপন্ন তখন কারণানুগুণে তদুৎপন্ন যাবতীয় প্রসূতকার্য্যই অচেতন ও অনিত্য। এক অধিষ্ঠাভূত পুরুষই চৈতন্যস্বরূপ। তিনি প্রকৃতির গুণ ও ধর্ম্মের অতীত। যাহারা ভগবদ্বহির্ম্মুখ তাহারা অভক্ত। সংসারে ঐ প্রকার জীবগণ ভগবানের পাদপদ্ম ভজনবিচ্যুত হইয়া কৃষ্ণবিমুখ হইয়া পড়িয়াছে। "কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে। নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে।।" তাহারা ভগবানের সেবাবিস্মৃত হইয়া যাইবার জন্য প্রাকৃত অভিমানে মত্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং জড়রসের বশবর্ত্তী হইয়া জগতের বস্তুসমূহকে ভোগ করিবার জন্য লালায়িত। সংসারে তাহারা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসকে জড়রসে স্থাপন করিয়া ঐ সকল রসের ভোগী সাজিয়া অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, জড়রসের বিষয় ও আশ্রয়গুলি ক্ষণকালস্থায়ী এবং খুবই অনুপাদেয়। কৃষ্ণই সমস্ত রসের মালিক। সেই সর্ব্ব রসাশ্রয়ী কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া অর্থাৎ ভগবদ্ভজন না করিয়া ইতর বিষয়গুলির সহিত নিজেদের সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক জড়রস বা প্রাকৃতরস আস্বাদন করিতে গিয়া ভয়ানক ভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে এবং দুঃখ-দুর্দ্দশায় জর্জ্জরিত হইতেছে।

এই ভোগময় জগতে রসের বিকারসমূহ নানাপ্রকার অনর্থ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছে। সেই অনর্থ যতক্ষণ পর্য্যন্ত দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিত্য রসময় বস্তুর অপ্রাকৃত রসতত্ত্ব উপলব্ধি কোনক্রমেই সম্ভবপর হইবে না। সেইসকল অনর্থ অতিক্রম করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে যখন জীব অপ্রাকৃত নিত্য রসময় হরিলীলা সাধুসঙ্গে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে, তখনই তাহার নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।। (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

যিনি শাস্ত্রে বিশ্বাসযুক্ত হইয়া ব্রজবধূগণের সহিত বিভু কৃষ্ণের এই বিশিষ্ট ক্রীড়াকে প্রতিদিন শ্রবণ করেন এবং অনন্তর কীর্ত্তন করেন, সেই পণ্ডিত শীঘ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তিপ্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ের রোগরূপ কামকে অবিলম্বে নাশ করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকের দ্বারা রাসক্রীড়া শ্রবণের অধিকারী ও ফল নিরূপণ করিয়াছেন। সামান্য প্রাকৃত দৃষ্টিতে রাসলীলার প্রতি যেন কেহ অবলোকন না করেন। ভক্ত যদি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবানের লীলার প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার আর কামরোগে ক্লেশ পাইতে হইবে না। সর্ব্বকামনা হইতে নিষ্কৃতিলাভে তিনি সমর্থ হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রত্যেক দুই গোপীর মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া গোপীগণের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, সেইপ্রকার ভক্তের প্রত্যেক বৃত্তি কার্য্যের অন্তরে বিদ্যমান থাকিয়া সংসারের যাবতীয় শোক ও দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করেন ও শান্তি দেন। অতএব অপ্রাকৃত রাসলীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ এই সাধন ব্রহ্মপ্রাপ্তি অপেক্ষা অতিশয় বলবতী। কেবল অবিশ্বাসী জীবের পক্ষে এই অপ্রাকৃত লীলা বোধগম্য নহে বা শ্রোতব্যও নহে, এবং এইপ্রকার ব্যক্তির নিকট ইহা বর্ণনীয়ও নহে।

জগতে ভোগীকুল কনক-কামিনীকে নিজের ভোগের উপকরণ মনে করিয়া প্রাকৃত রসভোগের নিমিত্ত তাহাদের সেবায় জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ উহা কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিয়া প্রাকৃতরসের পরিবর্ত্তে অপ্রাকৃত রসাস্বাদনে কৃতকৃতার্থ হন। তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—

"তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।"

সংসারে বিষয়ী বদ্ধজীবগণ ভোগবাসনায় সমূহ বস্তুকে নিজভোগ্য মনে করে। কিন্তু তাহা নহে। সর্ব্বকারণ-কারণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অদ্বিতীয় পুরুষ, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়, স্বরাট্, লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র অপ্রাকৃত রসরসিক।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যে পৃথক্ উপলব্ধির বিষয় রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ আছে, যাহার সন্নিকর্ষে ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা সাধনে জীব বিষয় আনন্দ বা রস উপভোগ করিতেছে বলিয়া মনে করে, তাহা প্রাকৃত ও নিতান্ত হেয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের সেই ইন্দ্রিয়পঞ্চক এক কৃষ্ণলাভে চরিতার্থ হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে বিষয় আনন্দের পরম নির্ব্বৃত্তি লাভ হইয়া থাকে। কৃষ্ণরূপ দর্শন, কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শ, কৃষ্ণের গাত্র-সৌগন্ধ আঘ্রাণ এবং কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজনের

দ্বারা তাঁহাদের সকল ইন্দ্রিয়ই চরিতার্থতা লাভ করে। এখানেই অপ্রাকৃত রসের তাৎপর্য্য। তাঁহারা অপ্রাকৃত রসাস্বাদনে বিভোর হইয়া পড়েন। তাঁহারা জানেন,—প্রাকৃত রস বা জড়রস নিতান্ত হেয় ও দুঃখময়। সংসারের সার হইতেছেন—করুণাসিন্ধু, দীনবন্ধু, জগৎপতি, গোপেশ, গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তিনি ভোগের বিষয় নহেন। তিনি ভোগের স্বরূপ। তিনি "আনন্দময়োহয়ং পুরুষঃ", "আনন্দময়োহভ্যাসাৎ"। কৃষ্ণই একমাত্র আনন্দের স্বরূপ। কৃষ্ণদর্শনে যে-প্রকার আনন্দ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে।

রস দ্বাদশটী। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী মুখ্য রস এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই সাতটী গৌণ রস। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অখিলরসামৃতসিন্ধু। মধুররসে সমস্ত রসের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। এই অপ্রাকৃত মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে সকল সম্পদের সহিত সর্ব্বাঙ্গদ্বারা সেবা আসক্তি সম্মিলিত হইয়াছে। ইহা অপ্রাকৃত রস।

অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়ায়াঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।।"

(ভাঃ ১০।৩৩।৩৬)

তাঁহার এই দেহধারণ কেবল সংসারে দুঃখসন্তপ্ত মানবগণের উদ্ধারার্থ মাত্র। তাঁহার অনুগ্রহপূর্ণ লীলা শ্রবণে যাহাতে জীবের মতি তাঁহার প্রতিই অগ্রসর হয়, তজ্জন্যই তাঁহার এইরূপ আচরণ। (ক্রমশঃ)

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

গৌড়ীয় মঠ কি করেন?

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫৫ পৃষ্ঠার পর]

নামে 'অর্থবাদ' কল্পনা অর্থাৎ নামমাহাত্ম্য অতিস্তুতি মাত্র—এইরূপ ভগবদ্বিমুখতা বুদ্ধি হইতেই আমাদের প্রত্যক্ষগত অন্যান্য চেষ্টায় বিশ্বাস। আমরা মনে করি, 'হরিনাম' কীর্ত্তন প্রচার প্রভৃতি চেষ্টা লোকহিতকারিণী নহে। কখনও বা ভাবি, অন্যান্য চেষ্টার সহিত নামকীর্ত্তনপ্রচার চেষ্টা সমশ্রেণীভুক্ত। প্রথমটী 'নামে অর্থবাদ', দ্বিতীয়টী 'অন্য শুভক্রিয়ার সহিত নামের সাম্যজ্ঞানরূপ অপরাধ।' নামে বিশ্বাস ত' দূরের কথা, যদি নামাভাসে মাত্র আমাদের বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে আমরা কখনও বলিতাম না, কীর্ত্তন প্রচার অপেক্ষা বন্যায় সাহায্য করা ভাল—ভগবদ্ভক্তি প্রচার অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ দূর করা, হাসপাতাল খোলা ভাল। শত শত দুর্ভিক্ষ নামাভাসে কেন, নামাপরাধে

দূরীভূত হইতে পারে। কোটী জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি হয় না, এক নামাভাসে সেই মুক্তি হইতে পারে—ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে—ইহাই একমাত্র বাস্তব কথা। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের দ্বারা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। গ্রাম্যবার্ত্তাবাহিগণের কুযুক্তিপুষ্ট জৈনবিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ও চৈতন্যের ভক্তগণ কেহই বন্যা বা দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে ছুটেন নাই, হাসপাতাল খুলেন নাই, কাহাকেও অন্য কিছু উপদেশ দেন নাই। সর্ব্বত্র সকলকে সকল সময়ে বলিয়াছেন,—

'কলিকালে নাম বিনা নাহি আর ধর্ম্ম।"

* * *

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল, দেশ, নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়।।"

* * *

"যা'রে দেখ তা'রে কহ 'কৃষ্ণ' উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।।"

* * *

"উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন তা'তে করিলে প্রচার।
স্থিরচর জীবের খণ্ডাইলা সংসার।।"

* * *

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার।।"

'কীর্ত্তন' ব্যতীত জীবের আর অন্য 'ধর্ম্ম' নাই। এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিতে বা শ্রীনামে যাহার যতটুকু অবিশ্বাস অর্থাৎ যাঁহারা মনে করেন, কীর্ত্তনদ্বারা আমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে না, তাঁহারা ততটুকু পরিমাণে নাস্তিক। একমাত্র কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিপ্রচারে যিনি যতটুকু সাহায্য করিবেন, তিনি তত পরিমাণে আস্তিক ; আর যিনি যত পরিমাণে বাধা প্রদান করিবেন, তিনি তত পরিমাণে নাস্তিক। "খাইতে শুইতে" যখন সর্ব্বদাই নাম গ্রহণ করিতে হইবে, যখন কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম, ইহা ব্যতীত যখন অন্য ধর্ম্ম নাই, তখন বন্যা, দুর্ভিক্ষ দূর করিবার বা হাসপাতাল খুলিবার সময় কোথায়? যাহারা প্রত্যক্ষবাদী হইয়াও সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রত্যক্ষটাকে অর্থাৎ 'মৃত্যু'কে ভুলিয়া রহিয়াছে, যাহারা অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় মায়াবিনীর কুহকে পড়িয়া লক্ষ্যহীন পথিকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদেরই 'হরিকীর্ত্তন' ব্যতীত অপর কার্য্যের সময় আছে। 'হরিকীর্ত্তন' ব্যতীত অপর চেষ্টা সংসারের হেতু—পূর্ব্বদিকের উল্টো রাস্তা ; আর সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন—বিভিন্ন দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া 'পূর্ব্বমুখী হওয়া' বা 'বাড়ীর দিকে চলা।'

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৮ : ১৪ জানুয়ারী, ২০০২

গৌড়ীয় মঠ এইরূপ সার্ব্বকালিক কীর্ত্তনের প্রচারক। গৌড়ীয় মঠ বলেন না, জগতের সকল চেষ্টা ধ্বংস করিতে, পরন্তু বলেন,—মোড় ফিরাইতে। জগতের সকলের সকল বস্তুকে কৃষ্ণে অর্পণ করাইবার জন্যই গৌড়ীয় মঠের ভিক্ষা। জগতের সমুদয় চেষ্টাকে বিষ্ণুপরা করাইবার জন্যই গৌড়ীয় মঠের 'ধূমধাম', আগে কৃষ্ণার্পণ, তারপর 'ভক্তি' আরম্ভ। গৌড়ীয় মঠ বলেন,—আগে কৃষ্ণে অর্পণ কর, তারপরে 'ভক্ত' বলিয়া পরিচয় দিও। গৌড়ীয় মঠ বলেন,—কীর্ত্তনকারীর 'অনুকরণ' করিও না। অনুকরণের অপর নাম 'ঢং'। 'ঢং' বা 'সং' সাজিলে লোকবঞ্চনা করা যায়, তাহাতে নিজ উপকার বা 'পর-উপকার' হয় না। যাঁহারা কীর্ত্তনকারীর অনুসরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে 'নিজ উপকারক' বা 'স্বার্থপর' ; 'পর-উপকারক' বা 'পরার্থপর'। তাঁহারা নিজ অপস্বার্থে অন্ধ হন না বা লোকবঞ্চনা করেন না বলিয়া তাঁহারাই প্রকৃত 'নিঃস্বার্থপর'। কীর্ত্তনদ্বারাই যুগপৎ স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতা সাধিত হয়।

'নামাপরাধ' বা 'নামাভাসে' যে দুর্ভিক্ষ-নিবারণাদি ভোগ বা 'মুক্তি' লাভ হয়, তাহা অপেক্ষাও কোটী গুণে অধিক নিত্য মঙ্গল লাভ যাহাতে হয়—জীবের চিরকল্যাণকুমুদ যাহাতে প্রস্ফুটিত হয়, সেই 'শ্রীনাম' বিতরণ করিবার জন্য গৌড়ীয় মঠ সচেষ্ট। তাঁহারা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বিতরণ করিবার জন্য সচেষ্ট।

জগতে অনেকে 'হিতকথা'র বিজ্ঞাপন দিয়া 'অহিতকথা'র প্রচার করেন, কিন্তু আপাতরমণীয় প্রত্যক্ষকে 'হিত' বলিয়া ধারণা করিয়া অনেকেই বঞ্চিত হন। সনাতন-শিক্ষায় "কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়।।"—এই 'কেমনে হিত হয়' কথার উত্তরে যে 'হিতকথা' সনাতন-ধর্ম্মবক্তা গৌরসুন্দর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,—সেই হিতলাভের একমাত্র উপায় আমাদের কর্ণে পৌঁছিলে আমরা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকে দুর্ব্বলা মনে করিয়া অন্য উপায়কে সবল মনে করিতাম না। যে দিকে মুখ ফিরাইলে সহজেই ধন পাওয়া যাইবে, সেই দিক্ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণামার্গে ভীমরুল বরুলীর দংশন, পশ্চিমমার্গে যক্ষের ভয়, উত্তরমার্গে কৃষ্ণসর্পের হাতে প্রাণ সঁপিবার জন্য ছুটিতাম না। পূর্ব্বদিকে আমাদের বাড়ী, পূর্ব্বদিক হইতে আমরা দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া অন্যদিকে চলিয়া যাইতেছি, পূর্ব্বদিকের লোক যখন আমাদিগকে ফিরাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন, তখন মরীচিকাভ্রান্ত আমরা বলিতেছি,—"তোমাদের কথা শুনিব না, ঐ দেখ আমাদের চোখের সামনে কিরূপ স্বচ্ছবারিপূর্ণ বাপী শোভা পাইতেছে।।" ইহা বলিয়া ক্রমশঃ কেবল প্রত্যক্ষ লুব্ধ হইয়া বাড়ী হইতে বিদেশের দিকেই সরিয়া পড়িতেছি। এইরূপ অবস্থায় গৌড়ীয় মঠের কার্য্যকলাপ আমাদের সমশীলব্যক্তিগণের সহিত কখনও আমাদের ধারণায় বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইতেছে। হইবারও কথা, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে ; কিন্তু তথাপি গৌড়ীয়

মঠ তাঁহার বার্ত্তা লইয়া তাঁহার উজ্জ্বল পতাকা উড়াইয়া, তাহাতে এই বাণী অঙ্কিত করিয়া আমাদের শ্রুতি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেছেন,—

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদ-সেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।"

(ভাঃ ৩।২৩।৫৬)

"এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্ম-বিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে।।
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগ-সমন্বিতম্।।"

(ভাঃ ১।৫।৩৪-৩৫)

যে কর্ম্ম ধর্ম্মের নিমিত্ত, যে ধর্ম্ম বিরাগের নিমিত্ত, যে বৈরাগ্য বিষ্ণুর সেবার নিমিত্ত সাধিত না হয়, সেই কর্ম্ম, ধর্ম্ম বা বৈরাগ্যের আচরণকারিব্যক্তি জীবন্মৃত। মানবগণের নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মসমূহ সংসার-বন্ধন বা যোনি-ভ্রমণের কারণ ; কিন্তু সেই সকল কর্ম্মই আবার পরমেশ্বরের জন্য কৃত হইলে ভগবদ্বিমুখতা বিনাশে সমর্থ হয়। ভগবানের সন্তোষের নিমিত্ত যে যে কর্ম্ম এই সংসারে অনুষ্ঠিত হয়, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তিযুক্ত যে ভাগবতজ্ঞান, সেই জ্ঞান নিশ্চয়ই সেই ভগবৎসন্তোষজনক কর্ম্মে অব্যভিচারী ফল।

—শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয় ইহাই। শ্রীগৌড়ীয় মঠ আচার করিয়া প্রচার করেন যে, ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণে 'আত্মোপকার' ও 'পরোপকার' হইতে পারে না। জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণদ্বেষ মুক্তির আবাহনে সেবা হয় না। অনেক আনুকরণিক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা ভাক্ত সজ্জায় 'ভক্তি'র অনুকরণ করেন, কিন্তু ভক্তি যে আত্মার বৃত্তি, তাহা জানেন না। তাঁহারা কেহ উদরভরণ, কেহ প্রতিষ্ঠা, কেহ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যের অনুকরণদ্বারা লোকবঞ্চনা করেন।

গৌড়ীয় মঠ বলেন, ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় করা উচিত নহে। শ্রীহরিকে নিজের ভোগে না লাগাইয়া শ্রীহরির সেবা করাই কর্ত্তব্য। গৌড়ীয় মঠ বলেন, হরিভক্তের অনুকরণ বা যাত্রায় 'নারদ' সাজা, হরিভক্তের অনুসরণ বা প্রকৃত নারদের আনুগত্য হইতে বহুদূরে। গৌড়ীয় মঠের কেবল মনোরম সুর, তাল, লয় হরিকীর্ত্তন নহে, উহাত' গ্রামোফোনে বা বারবনিতাতেও আছে। চেতনতা চাই—জ্বলন্ত জীবন চাই—আচার-প্রচার যুগপৎ চাই। গৌড়ীয় মঠ বলেন যে, যিনি চরিত্রবান্ নহেন, তিনি 'মনুষ্য' পদবাচ্যই নহেন, ধার্ম্মিক ত' দূরের কথা। গৌড়ীয় মঠ কলিস্থান পঞ্চক হইতে দূরে থাকেন। কলির স্থানগুলি ভাগবতের মতে এই—(১) তাস-পাশা প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়া, ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় বা বণিগ্‌বৃত্তি, (২) পান, তামাক, মদ্যাদি বিলাসসম্ভার গ্রহণ, (৩) অবৈধ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৮ ; ১৪ জানুয়ারী, ২০০২

স্ত্রীসঙ্গ বা নিজ স্ত্রীতে আসক্তি, (৪) পশুবধ, লোকের নিকট সত্যকথা কীর্ত্তন না করিয়া 'অসত্য'দ্বারা তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করা, জীবের নিকট 'হরিকথা' কীর্ত্তন না করা, হরিকথার পরিবর্ত্তে অন্য পরামর্শ দেওয়া, (৫) লোককে ঠকাইয়া কিম্বা সাধারণের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতিপালন কিম্বা নিজভোগসম্ভার বৃদ্ধি করা, জীবের কায়মনোবাক্য, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি—সমস্ত বস্তুকে সকল বস্তুর মালিক, সকল ধনের অধিপতি শ্রীবিষ্ণুর সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত না করা।

শাস্ত্র বলেন,—সর্ব্বাপেক্ষা মনুষ্যদেহই ভগবানের প্রিয়, মনুষ্যদেহই পরমার্থদ ও দুর্ল্লভ, অতএব এই দেহ থাকিতে থাকিতে অন্য কোনও বিষয়ে অভিনিবিষ্ট না হইয়া "শোকমোহভয়াপহা" ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়কে 'মঙ্গলজনক' মনে করিয়া বঞ্চিত না হইয়া নিরন্তর ভক্তিযাজনই কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভক্তি অবলা, কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি সবলা। সবলার আশ্রিতা হইলে 'ভক্তি' অল্প আয়াসেই জীবকুলকে চরমমঙ্গল প্রদান করে। অতএব অনুক্ষণ কীর্ত্তন প্রচার করিয়া পরমাত্মীয় সূত্রে সমগ্র জীবকে গৃহাভিমুখী করাই যথার্থ বিশ্বপ্রেমিকতা, যথার্থ পরোপকার, যথার্থ দয়া এবং যথার্থ জীবনের কৃত্য। গৌড়ীয় মঠ বিশ্ববাসী সকলকেই আলিঙ্গন করিয়া সকলকে ভগবৎ-সেবোন্মুখ হইয়া নিরন্তর এই কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির প্রচারক হইবার জন্য সকাতরে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—

"হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্।।"

জনকরাজ

পরম ধর্ম্মাত্মা সাধুশ্রেষ্ঠ নিমিরাজার বংশে মহাসত্ত্ব মহারাজ জনক আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম হ্রস্বরোমা। জনকের অপর নাম শিরোধ্বজ। তাঁহার একটী সহোদর ছিলেন, তাঁহার নাম কুশধ্বজ।

যজ্ঞার্থ ভূমিকর্ষণের সময় মহারাজ জনকের লাঙ্গল-পদ্ধতি বা সীতার অগ্রভাগে ভূমিগর্ভ হইতে এক কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই অযোনি-সম্ভবা কন্যাই 'সীতা'-নামে খ্যাত। মহারাজ মহাদেবের নিকট হইতে একটী অতীব গুরুভার ভয়ঙ্কর ধনু পাইয়াছিলেন। পরে রাজর্ষি জনক পণ করিয়াছিলেন,—যিনি সেই হর-ধনু ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি সীতা সম্প্রদান করিবেন। ক্রমে সীতা প্রাপ্তবয়স্কা হইলেন। লোকমুখে তাঁহার অসামান্য রূপ-লাবণ্যের কথা শুনিয়া শত শত মহাবল নরপতি মিথিলায় আগমন করেন, কিন্তু কেহই সেই মহাধনু ঈষৎ সঞ্চালন করিতেও পারেন নাই। সীতা-লাভও কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। ঘটিবে কেন? তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৮ ; ১৪ জানুয়ারী, ২০০২

নারায়ণ ভিন্ন অন্যের সে লক্ষ্মী লাভ হইবে কেন? যথাসময়ে বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণই রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া মিথিলানগরে গিয়া ঐ হরধনু ভঙ্গ করিলেন। জনকরাজ পরমানন্দে তাঁহার প্রিয়তমা দুহিতা সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের করে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পরম ভাগবত জনক সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কে জামাতারূপে প্রাপ্ত হইলেন। সীতারামকে অঙ্কে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

বৈষ্ণব পরমহংস জনকরাজ হরিভজনপর গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। বদ্ধজীবের মত মুক্ত বৈষ্ণবগণের গৃহে 'গৃহ' বা বনে 'বন' দর্শন নাই। তাঁহাদের অপ্রাকৃত অনুভূতিতে গৃহে বা বনে সর্ব্বত্রই শ্রীবৃন্দাবন প্রত্যক্ষ হয়। বৈষ্ণব-মহাজন গাহিয়াছেন,—

"যে-দিন গৃহে, ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।"

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও প্রার্থনায় বলিয়াছেন,—

"গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।।"

জনকরাজের গৃহবাসও এমনই ছিল। ভগবদর্পিত নিষ্কপট নিষ্কামকর্ম্মে থাকিয়াও যাঁহারা নৈষ্কর্ম্ম্য-সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা বলিতে স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ও অগ্রে জনকের নাম করিয়াছেন। বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।" (গীতা ৩।২০)

কালপ্রভাবে অধুনা ভোগসুখতৎপর গৃহব্রত গৃহমেধী ব্যক্তিগণ মনোধর্ম্মে সাধু ও শাস্ত্রকে আপনাদের ভোগবৃত্তির অনুকূলে আবশ্যকমত গড়িয়া লইতে চাহে। তাহারা সাধু-মহাজন এবং দেবতাদিগকেও আপনাদের মনের মত করিয়া সাজাইয়া সেই মনঃকল্পিত ভাবটিকে আপনাদের ভোগেচ্ছা পূরণের যন্ত্ররূপে যথেচ্ছ ব্যবহার করে। গঞ্জিকা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য-সেবিগণ সাধু সাজিয়া বলে,—"মহাদেব গঞ্জিকা সেবন করেন, আর আমাদের দোষ কি?" এইরূপে যাহারা মনঃকল্পিত সাধুশাস্ত্রের দোহাই দিয়া যথেচ্ছাচারে কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে চাহে, জন্ম জন্ম কাম-কৃমি-পূর্ণ গৃহ-কূপেই মজিয়া থাকিতে চাহে, তাহারা অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতাকে অবাধে প্রশ্রয় দিয়া বলে,— "জনকরাজ 'এদিক্ ওদিক্ দু'দিক্ রখে খেয়েছিলেন দুধের বাটী।" অতএব গৃহ-সুখ-সম্ভোগ ও হরিভজন একসঙ্গে হইবে না কেন? আমরাও দুইদিক্‌ই বজায় রাখিব।" এইভাবেই আমরা পরমহংস বৈষ্ণব মহাজনে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া তদনুকরণে আত্মবঞ্চিত এবং কেবল ঐ "দুধের বাটী"তেই নিমজ্জিত হইয়া মরি।

নিম্নলিখিত—শুক-জনক-সংবাদে মহাভাগবত মহারাজ জনক যে কেন 'গৃহী' ছিলেন, তাহা উপলব্ধি হইবে।

জনকরাজ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন। একদা ব্যাসদেব আজন্ম-

সন্ন্যাসী ব্রহ্মবিৎ পুত্র শুকদেবকে তত্ত্বজ্ঞানলাভ ও কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য রাজর্ষি জনক-সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। জনকরাজ বিবিধ বিষয় প্রলোভন বিস্তার করিয়া বহু পরীক্ষা করিলেও তাহাতে শুকদেব আত্মযোগ হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। তখন তিনি (মহারাজ) তাঁহার মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত হইয়া স্বয়ং মস্তকে অর্ঘ্যবহন করিয়া আনিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। পরে তাঁহার আগমন উদ্দেশ্য অবগত হইয়া প্রথমতঃ তিনি তাঁহাকে সংসার-ধর্ম্মই উপদেশ দিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী শুকদেব গুণময়ী প্রকৃতি রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া তাহার বহু ঊর্দ্ধে পরমহংস-কুলসেবিত ভাগবতধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তখন তিনি—সেই ব্যাসশিষ্য সর্ব্ববিৎ জনকরাজ—শুকদেবকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"পূর্ব্বতন ঋষিগণ লোকসমূহকে উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে সংহত করিতে সৎশিক্ষা দিবার জন্য এবং তাহাদের ভোগমুখে কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য প্রভৃতি চারি আশ্রমোচিত ধর্ম্মসকল সংস্থাপন করিয়াছেন। যথাক্রমে সেই সকল আশ্রম-ধর্ম্মের বিধিবিধানে অবস্থান করিয়া লোকচয় বহুজন্মের পর কর্ম্মের শুভাশুভ ফল ত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ আত্ম-সুখাভিলাষে কিম্বা দুঃখের ভয়ে কোনও কর্ম্ম না করিয়া কেবল ভগবৎ প্রীতিসাধন-লক্ষ্যে জীবনের কর্ত্তব্যবোধে তাহা অনুষ্ঠান করিয়া) মায়া-মুক্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি বহুজন্ম এইরূপ শাস্ত্রবিধির বশে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্যাদি আশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মনোবুদ্ধ্যাদি বিশুদ্ধ অর্থাৎ কাম-মলমুক্ত ও ভগবদনুরক্ত করিতে পারেন, সেই শুদ্ধাত্মা ব্যক্তি পরবর্ত্তী জন্মে প্রথম আশ্রমেই অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যেই থাকিয়া মায়া-মুক্তি লাভ করেন ; তাঁহাকে আর আশ্রমান্তরে প্রবেশ করিতে অর্থাৎ দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইতে হয় না। কারণ, ধর্ম্ম-কর্ম্মের যাহা চরম ফল সেই ভগবদনুরাগরূপ পরম অভীপ্সিত বস্তু লাভ হইলে আর অন্যত্র অপর ব্যাপার ব্যর্থমাত্র। রজঃ এবং তমোগুণের যে দোষ তাহা সর্ব্বদা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তাহাদের বশে বিপথ-গত বা ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত না হইয়া সতত সাত্ত্বিকমার্গ-অবলম্বনে যাহাতে অন্তরে পরমাত্ম-স্বরূপ প্রত্যক্ষ হন, তাহাই শ্রেয়স্কামিগণের সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়। এইরূপে সর্ব্বভূতে অন্তরে বাহিরে ভগবদ্দর্শন এবং জগদ্ধাম শ্রীভগবানেই আশ্রিততত্ত্বরূপে সকলকে দর্শন হইলে সেই দ্রষ্টার আর বনে বা ভবনে কোন ভেদ থাকে না ; তিনি জলে জলচর জীবের মত যে কোনও স্থলে যে কোনও অবস্থায় থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। কোনও কারণে তাঁহার অসুখ বা উদ্বেগ জন্মে না ; তিনিও কাহারও অসুখ বা উদ্বেগের হেতু হন না। তিনিই ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করেন। ব্রহ্মন্, এ সমস্তই আপনি সম্যক্ জ্ঞাত আছেন। শ্রীগুরুপ্রসাদে আমি আপনার মহিমা অবগত আছি।" রাজর্ষি জনকের মহিমা জ্ঞাত হইয়া সফলকাম শুকদেবও প্রস্থান করিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৮ ; ১৪ জানুয়ারী, ২০০২

হরিপরায়ণ মহাভাগবত জনকের এই অমূল্য বাক্য মহাভারতে (শান্তিপর্ব্ব ৩২৬ অধ্যায়) চিরোজ্জ্বলভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার ভুবনমঙ্গল মহচ্চরিত্র আলোচনা করিলে সজ্জনমাত্রেরই সদা উপলব্ধি হয়,—তিনি 'এদিক্ ওদিক্ দু'দিক্ রাখিয়া দুধের বাটী' খান নাই। মহাভাগবতগণের কেহ কখনই 'দু'দিক্' রাখিতে ব্যস্ত বা 'দুধের বাটী' খাইতে ব্যগ্র হন না। তাঁহাদিগকে তাহা হইতে হয় না। তাঁহারা অখিল ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মী যাঁহার শ্রীপদসেবা লাভের জন্যই সদা লালায়িতা—একান্ত কাঙ্গালিনী, সেই 'লক্ষ্মী-সহস্র-শত-সম্ভ্রম-সেব্যমান' শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মেই সর্ব্বান্তঃকরণে রত থাকিয়া সর্ব্বজয়ে সমর্থ হন ; সেইদিকেই যথাসর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিয়া সর্ব্বদিগ্বিজয়ে অমিতপ্রভাব ধারণ করেন। আর 'দুধের বাটী'র ন্যায় তাঁহারা ব্যস্ত হইবেন কি? সমস্ত ব্রজগোপগোপীগণের অপরিমিত অমৃত দুগ্ধের যিনি একমাত্র ভোক্তা সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোবিন্দ স্বয়ং দুগ্ধভাণ্ড বহন করিয়া তাঁহার প্রাণাধিক ভক্তগণকে ভোজন করাইবার জন্য সদা ব্যস্ত। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের দৃষ্টান্ত আলোচ্য।

মহারাজ জনকের ন্যায় পরমহংস মহাভাগবতগণ সংসার-লীলাভিনয় দেখাইয়াও তাঁহারা সকল বর্ণ ও আশ্রমের গুরু, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অপরে 'দু'দিক্' রাখিতে গিয়া সেই 'একদিকে'ই অগাধ সংসার-সমুদ্রেই নিমগ্ন হন। 'দু'দিক্ রাখা' কখনও হয় না।

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৮৭)

বৃহদারণ্যকাদি শ্রুতিতে এবং পুরাণে অনেক স্থলে যে-সকল জনকের কথা পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই এই মহাভাগবত জনক বলিয়া বোধ হয় না। জনক-নামে একাধিক রাজা কালে কালে আবির্ভূত এবং তিরোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু, এই মহাভাগবত জনক দেবর্ষি নারদাদির মত যুগে যুগ নিত্য বর্ত্তমান।

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ৫৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩৬ পৃষ্ঠায় ২৯ এবং ৩০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত ★ অংশটি যোগ করিয়া পাঠ করিতে হইবে।—

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিয়াছেন,—

★ "সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়।
অনায়াসে সেই সে মোহারে পায় দঢ়।। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৬২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকেও বলিয়াছেন,—

ধাম-বৈশিষ্ট্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৮ পৃষ্ঠার পর]

[ভক্তসঙ্গে ধাম-পরিক্রমার বৈধতা]

কৃষ্ণদাস্য ভাব হৃদে জাগয়ে যখন।
কৃষ্ণসেবাই হয় তবে সাধন-ভজন।। ১।।
পররসের আস্বাদন যদি কেহ পায়।
অপর রস-পিপাসা তবে দূরে যায়।। ২।।
জড়রসের পিপাসা দূরীবার তরে।
সাধন-ভজন বিশেষ প্রয়োজন করে।। ৩।।
ধাম-মন্দির পরিক্রমা—ভক্ত্যঙ্গ সাধন।
সাধুসঙ্গে পরিক্রমায় মিলে ভক্তিধন।। ৪।।
'স্কন্দপুরাণা'দিতে পরিক্রমা-বিবরণ।
সাধন-ভক্ত্যঙ্গ-রূপে হ'য়েছে বিশ্লেষণ।। ৫।।
'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'—শ্রীরূপের লিখিত।
চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ তাহাতে নিরূপিত।। ৬।।
'হরিভক্তিবিলাস' রচিলা শ্রীসনাতন।
শ্রীগৌরেচ্ছায় তাহা হৈল বৈষ্ণব-আইন।। ৭।।
তাহাতে বর্ণিত ভক্ত্যঙ্গরূপে পরিক্রমা।—
"অভ্যুত্থানমনুব্রজ্যা পতিঃ স্থানে পরিক্রমা।।" ৮।।
কৃষ্ণ-ক্ষেত্রানুগমনে স্বীয় পাদদ্বয়।
মহারাজ অম্বরীষ নিযুক্ত করয়।। ৯।।
বৈধ আত্মনিবেদনের এহেন লক্ষণ।
'শ্রীমদ্ভাগবত'-শাস্ত্রে রয়েছে বর্ণন।। ১০।।
নীলাচলে জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া।
শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য কৈলা ভক্তগণ লইয়া।। ১১।।
গৌরভক্তগণ তবে নৃত্য-কীর্ত্তনযোগে।
ধাম-মন্দির পরিক্রমা করে শুদ্ধ-হৃদে।। ১২।।
ভক্তসঙ্গে পরিক্রমা—ভক্ত্যঙ্গ সাধন।
আচরিতে শিখাইলা গৌর ভগবান্।। ১৩।।

শ্রীরূপানুগাচার্য্যবর্য্য শ্রীভক্তিবিনোদ।
বিরচিলা 'নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' গ্রন্থ।। ১৪।।
নদীয়া-পরিক্রমা-বিধি লিখিলা তাহাতে।
শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীজীবেরে কহিলা যেমতে।। ১৫।।
শ্রীনিবাস, ঈশান, রাম ও নরোত্তম।
নবদ্বীপ পরিক্রমার কৈলা প্রচলন।। ১৬।।
জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ।
পরিক্রমার বিধি প্রচারিলা অভিনব।। ১৭।।
তাঁর প্রেষ্ঠ শ্রীকেশব গোস্বামী মহাত্মন্।
কীর্ত্তনাখ্য পীঠ হৈতে কৈলা পরিক্রমণ।। ১৮।।
আরও নব বৈশিষ্ট্য কৈলা প্রবর্ত্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে হেন উদ্ভাবন।। ১৯।।
সারা বিশ্বে 'বেদান্ত সমিতি'র ভক্তগণ।
প্রতি বর্ষে পরিক্রমার করে আয়োজন।। ২০।।
গুর্ব্বানুগত্যে সাধুসঙ্গে দৈন্যার্ত্তি-সহিত।
অপরাধ ত্যজি' ধাম-পরিক্রমা বিহিত।। ২১।।
ধাম ও মন্দির প্রদক্ষিণ যাঁরা করে।
হরি-সেবাশক্তি ক্রমে যায় ব্রজপুরে।। ২২।।
গৃহ-চতুষ্পার্শ্বে ঘোরে গৃহমেধিগণ।
জন্ম জন্ম করে তারা সংসারে ভ্রমণ।। ২৩।।
গৌর-প্রিয়জন-সঙ্গে ধাম-পরিক্রমণে।
ভক্তি-রস, গৌর-রস উদিত হয় মনে।। ২৪।।
শ্রীগৌরশক্তি-স্বরূপ শ্রীভক্তিবিনোদ।
তাঁ'র ধারায় তাঁ'র শক্তি সদা বিচ্ছুরিত।। ২৫।।
সে-ধারায় প্রকটিত গুরুর দাস্য বরি'।
ভক্তসঙ্গে পরিক্রমায় তুষ্ট হ'বে হরি।। ২৬।।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৮ পৃষ্ঠার পর]

বৃকাসুর তখন প্রতিজ্ঞা করল, সাতদিন যেদিন পূর্ণ হবে, তখন যদি শিব আমাকে দর্শন না দেন, তাহলে আমি নিজ হাতে আমার গলাটা কেটে যজ্ঞেতে আহুতি দেব। এই বলে খড়্গ নিয়ে নিয়েছে। ঠিক এমন সময় ধূর্জ্জটি শিব সেই যজ্ঞাগ্নি হতে উঠে এসে হাতখানা ধরেছে বৃকাসুরের। থাম, মরতে হবে না তোমাকে। তুমি মরতে যাচ্ছ কেন?

তদা মহাকারুণিকঃ স ধূর্জ্জটির্যথা বয়ঞ্চাগ্নিরিবোত্থিতোঽনলাৎ।
নিগৃহ্য দোর্ভ্যাং ভুজয়োর্ন্যবারয়ৎ তৎস্পর্শনাদ্ভূয় উপস্কৃতাকৃতিঃ।।

থাম, তুমি কি চাও? মরতে হবে না তোমাকে।

তমাহ চাঙ্গালমলং বৃণীষ্ব মে যথাভিকামং বিতরামি তে বরম্।
প্রীয়েয় তোয়েন নৃণাং প্রপদ্যতামহো ত্বয়াত্মা ভৃশমর্দ্যতে বৃথা।।

তুমি যে বর চাইবে, আমি তাই দেব, আমি রাজী আছি।

দেবং স বব্রে পাপীয়ান্ বরং ভূতভয়াবহম্।
যস্য যস্য করং শীর্ষ্ণি ধাস্যে স ম্রিয়তামিতি।।

তখন সেই অসুর শিবের নিকট এরূপ নিখিলপ্রাণি-ভয়ঙ্কর বর প্রার্থনা করল যে, আমি যার মাথায় হাত দেব, সে যেন ভস্ম হয়ে যায়।

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ রুদ্রো দুর্ম্মনা ইব ভারত।
ওমিতি প্রহসংস্তস্মৈ দদেঽহেরমৃতং যথা।।

এই কথা শুনে শিবঠাকুরের মাথা ঘুরে গেছে। এ কি চাইল! আমার কাছে কত লোকে কত কিছু চায়, আমি সবই দিয়ে দেই। আর এ কি জগৎধ্বংস করার বৃত্তি! এ দুনিয়াকে শেষ করে দেবে! যার মাথায় হাত দেবে সে ভস্ম হয়ে যাবে। এর মধ্যে ত' ভাল ধারণা কিছু নেই। জগৎ ধ্বংস করার বৃত্তি নিয়ে বসে আছে। আর আমিও বলে ফেললাম একে, যা চাইবে তা দিয়ে দেব! মহামুস্কিল হল ত'! কি করব এখন? খুব চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। গালে হাত দিয়ে বসেছেন। যখন ছেলেপিলেদের খুব দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা হয়, তখন গালে হাত দিয়ে বসে। মা-বাপেরা বলেন, এই, গালে হাত দিয়ে বসেছিস্ কেন? অত দুর্ভাবনা কিসের তোর? এখানেও ঠিক সেই অবস্থা, শিবঠাকুর গালে হাত দিয়ে বসেছেন। চিন্তা করতে লাগলেন, কি হবে, কি করব আমি? এ অসুরটাকে আমি বর দেব বলে ফেলেছি, অথচ এ যা বর চাইছে তাতে জগৎকে, দুনিয়াকে শেষ করে দেবে। কি করব এখন? তিনি মনে মনে ঠিক করলেন,—যে অসুর, যে নাস্তিক, যে অপরের অকল্যাণ চিন্তা করে, তার অকল্যাণ আগেই হয়। যা

হয় হোক, আমি মিথ্যাবাদী হব না। আমি বর দেব বলেছি যখন বর দেব। এই চিন্তা করে শিবঠাকুর বর দিয়ে দিলেন—ওঁ তথাস্তু—তাই হোক।

কাকে দিলেন বর? একটা বিষাক্ত সাপ মরার মত হয়ে গিয়েছিল। ঋষি তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। যেই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, অমনই সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছোবল মারছে। এই অসুর ঠিক সেইরকম। এইরকম একটা অসুরকে তিনি বর দিয়ে দিচ্ছেন, যে শিবঠাকুরের বরটাকে নিয়ে তার অপপ্রয়োগ করবে। জেনে-শুনেও শিবঠাকুর বুঝলেন যে, ওর এই দুনিয়াতে বাঁচবার কোন অধিকার নেই। কেন? অপরের অকল্যাণকামীর জগতে অস্তিস্ব সংরক্ষণের কোন অধিকার নেই।

ইত্যুক্তঃ সোঽসুরো নূনং গৌরীহরণলালসঃ।

যেই বর পেয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে গৌরীকে হরণ করবে, সুতরাং শিবকে মার আগে, শিবকে না মারলে ত' হবে না ওটা। শিবের কাছ থেকে বর নিয়ে নিয়েছে। নিয়ে এখন শিবকে মারবে। "তোর শীল তোর নোড়া, তোরই ভাঙি দাঁতের গোড়া।"—এই Policy হল শয়তানদের। সেই Policy নিয়ে বসে আছে শিবকেই মারবে বলে। এখন শিবঠাকুর দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করেছেন। আর অসুরটা ওঁর পিছনে ছুটাছুটি আরম্ভ করেছে। আপনারা মনে করছেন কি শিবকে নাগালের মধ্যে পাবে সে? কখনই নয়। শিব সে তত্ত্ব নয়। অসুরের হাতের মুঠোর মধ্যে যাওয়ার ব্যক্তিত্ব নন তিনি, তিনি তার অনেক উপরে। পারবে না কখনও। কিন্তু অসুরের অপচেষ্টা। সে চেষ্টা করছে, আমি শিবের মাথায় হাত দেব এবং শিবকে সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম করে ফেলব। শিবেরই দেওয়া বর দিয়ে শিবকেই শেষ করবার চেষ্টায় আছে।

স তদ্বরপরীক্ষার্থং শম্ভোর্মূর্ধ্নি কিলাসুরঃ।
স্বহস্তং ধাতুমারেভে সোঽবিভ্যৎ স্বকৃতাচ্ছিবঃ।।

শিবের মাথায় হাত দিয়ে শিবকে ভস্ম করে দেবে বলে শিবের পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল। শিবও ছুটতে লাগলেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল দৌড়াদৌড়ি চলতে লাগল। অসুরও যাচ্ছে পিছনে পিছনে।

তেনোপসৃষ্টঃ সন্ত্রস্তঃ পরাধাবন্ সবেপথুঃ।
যাবদন্তং দিবো ভূমেঃ কাষ্ঠানামুদগাদুদক্।।

সর্ব্বত্র ছুটোছুটি দেখে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শিবের যে অসুবিধা হয়েছে তা তিনি বুঝতে পারলেন। তখন বলছেন শিবকে, শিব, তুমি আমার কাছে চলে এস, আমি সব ব্যবস্থা নিচ্ছি। ও তোমার দ্বারা হবে না। ভগবান্ যেই তাঁকে স্মরণ করেছেন, অমনই শিবঠাকুর চলেছেন ভগবানের কাছে।

অজানন্তঃ প্রতিবিধিং তূষ্ণীমাসন সুরেশ্বরাঃ।
ততো বৈকুণ্ঠমগমদ্ভাস্বরং তমসঃ পরম্।।

যেখানে প্রকৃতির পরপারে বৈকুণ্ঠে অবস্থান করছেন ভগবান্, "তমসঃ পরম্" প্রকৃতির পরপারে যে ধাম—শ্বেতদ্বীপ অবস্থিত, সেইখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন। বিরজার পরপারে যেখানে কারণবারিতে ভগবান্ শয়ন করে আছেন, সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন শিবঠাকুর।

যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ন্যাসিনাং পরমাং গতিঃ।
শান্তানাং ন্যস্তদণ্ডানাং যতো নাবর্ত্ততে গতঃ।।

যেখানে নারায়ণ ভগবান্ অবস্থান করছেন। 'নারায়ণ'-শব্দের অর্থ করেছেন শাস্ত্রে—নর-জাত জল, তাহাতে যাঁহার অয়ন—শয়ন, তাঁহাকে নারায়ণ বলে। অর্থাৎ নিজেরই ঘাম থেকে কারণবারি সৃষ্টি, সেই কারণবারিতে শয়ন করে আছেন নারায়ণ। সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন শিবঠাকুর।

শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ,　　অবতারী নারায়ণ,
যাঁ'র অংশ কলাতে গণন।
যাঁ'র লীলা লাবণ্যধাম,　　আগম-নিগম গান,
সেই রাম রোহিণীনন্দন।।

তাঁরই Part play এর ভিতরে আছে। তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছেন শিবঠাকুর।

"শান্তানাং ন্যস্তদণ্ডানাং যতো নাবর্ত্ততে গতঃ।।"—ভক্তপ্রাণধন ভগবান্ যেখানে অবস্থান করছেন, নিখিল বিশ্বের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা ভগবান্ যেখানে বসে আছেন, 'যতো নাবর্ত্ততে গতঃ'—যেখানে গেলে আর এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে পুনরায় ফিরে আসতে হয় না, পুনরাবর্ত্তন করতে হয় না, সেই স্থান হল বৈকুণ্ঠধাম। শিবঠাকুর সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন, আর এই অসুরটাও সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। আচ্ছা, অসুর কি করে গেল সেখানে? অসুরের সেখানে যাওয়ার কি ক্ষমতা, অধিকার আছে? এখানে ভগবান্ শিবঠাকুরের মহিমা প্রকাশ করছেন, সেইজন্য ভগবদিচ্ছাক্রমে অসুরটা সেখানে গিয়েছে।

তং তথা ব্যসনং দৃষ্ট্বা ভগবান্ বৃজিনার্দ্দনঃ।
দূরাৎ প্রত্যুদিয়াদ্ভুত্বা বটুকো যোগমায়য়া।।

'বৃজিনার্দ্দনঃ' অর্থাৎ লোকের অশেষ পাপ ধ্বংসকারী যে ভগবান্, পাপ-তাপহারী যে ভগবান্ তিনি। তিনি কি করলেন? সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড-কমণ্ডলু নিয়ে, মালা পরে ব্রহ্মচারী-বেষ ধারণ করে বসে গেছেন সেইখানে। আর তাঁর ইচ্ছামাত্রে সুন্দর তপোবন তৈরী হয়ে গেছে সেখানে। বসে বসে মালা জপ করছেন ভগবান্। অসুরটা পিছনে পড়ে গেছে, শিবঠাকুর আগেই এসে গেছেন। ভগবান্ শিবঠাকুরকে বললেন, তুমি লুকিয়ে পড় এখান থেকে। অসুর যখন এসে গেছে, তখন সামনে আসতেই (অসুরের

ভগবান্‌কে প্রণাম করার পরিবর্ত্তে) ভগবান্ অসুরকে একটা প্রণাম করলেন। উল্টো হয়ে গেল, ভগবান্ প্রণাম করলেন, কার্য্যোদ্ধার করতে হবে ত'।

মেখলাজিনদণ্ডাক্ষৈস্তেজাসাগ্নিরিব জ্বলন্।
অভিবাদয়ামাস চ তং কুশপাণির্বিনীতবৎ।।

শুধু প্রণাম নয়, একেবারে হাতজোড় করে সেই অসুরটাকে প্রণাম করলেন ভগবান্। সব জেনে-শুনেও জিজ্ঞাসা করছেন ভগবান্,—

শ্রীভগবানুবাচ—
শাকুনেয় ভবান্ ব্যক্তং শ্রান্তঃ কিং দূরমাগতঃ।
ক্ষণং বিশ্রম্যতাং পুংস আত্মায়ং সর্ব্বকামধুক্।।

চোরকে চোর বললে কি রেহাই আছে? ডাকাতকে ডাকাত বললে রেহাই নেই। বাবা, বাছা না বললে পরে রেহাই নেই। এসেছে একটা শয়তান। ভগবান্ বলছেন কি? হে শকুনিনন্দন, বলে সম্বোধন করছেন। ভবান্ অর্থাৎ আপনি, তুই, তুমি নয়। সম্মান দিয়ে আপনি বলছেন। 'শ্রান্তঃ কিং দূরমাগতঃ'—খুব পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে, বহুদূর থেকে এসেছেন, বড় ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। কি ব্যাপার? 'ক্ষণং বিশ্রম্যতাম্'—আমার এইখানে এই সুন্দর তপোবনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। স্নান করুন, খাওয়া-দাওয়া করুন, আমার এখানে কোনটার অভাব নেই।

যদি নঃ শ্রবণায়ালং যুষ্মদ্ব্যবসিতং বিভো।
ভণ্যতাং প্রায়শঃ পুম্ভির্ধৃতৈঃ স্বার্থান্ সমীহতে।।

লোকে যদি বিপদে-আপদে পড়ে, তাহলে মানুষ মানুষকে সাহায্যও করে। আমি ত' এরূপ সাহায্যও করতে পারি তোমায়। কি হয়েছে, ব্যাপারটা কি? কেন দৌড়াদৌড়ি?

এবং ভগবতা পৃষ্টো বচসামৃতবর্ষিণা।
গতক্লমোঽব্রবীৎ তস্মৈ যথাপূর্ব্বমনুষ্ঠিতম্।।

ভগবান্ যখন জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে, তখন পূর্ব্বাপর সব বলে যাচ্ছে সেই অসুর। আমি শিবঠাকুরের উপাসনা করেছিলাম, শিবঠাকুর আমাকে বর দিয়েছিলেন—'আমি যার মাথায় হাত দেব সে ভস্ম হয়ে যাবে।' তারপর সেই বর পরীক্ষা হচ্ছে। ও শিবকে দিয়েই পরীক্ষা করছ? বলল, হ্যাঁ। তুমি খুব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি! আমি মনে করেছিলাম খুব বুদ্ধিমান্ তুমি, কিন্তু এখন দেখছি তোমার মত বোকা হতভাগা আর কেউ নেই। ভগবান্ তখন কাল্পনিকভাবে শিবঠাকুরের একটু নিন্দা করছেন। কেননা নিন্দা না করলে ওঁকে বাঁচান যায় না, আর অসুরটাকেও মারা যায় না। সেইজন্য ভগবান্ বলতে আরম্ভ করলেন, আমি তোমাকে খুব বুদ্ধিমান্ বলে মনে করেছিলাম, কিন্তু তুমি একদম বুদ্ধিমান্ নও। তোমার মত এরকম বোকা আর দুনিয়ায় নেই। তাই ভগবান্ বলছেন,—

শ্রীভগবানুবাচ—

এবং চেৎ তর্হি তদ্বাক্যং ন বয়ং শ্রদ্দধীমহি।
যো দক্ষশাপাৎ পৈশাচ্যং প্রাপ্তঃ প্রেতপিশাচরাট্।।

যদি তুমি শিবঠাকুরকে পরীক্ষা করতে এসেছ, তাহলে ভুল করেছ। আমরা শিবঠাকুরকে মানি না। কেন জান? ওঁর কথার কোন ঠিক নেই, কতলোককে কত কথা বলে দেন, আর কোনটাই ঠিক হয় না। ওঁর কোন কথা আজ পর্য্যন্ত একটাও ঠিক হয়নি। ভগবান্ বলছেন রহস্য করে। আমরা শিবঠাকুরের বাক্যে বিশ্বাস করি না। কেননা, বিশ্বাস করবার মত অবস্থা ত' নয়, পাগলা লোক। কখন কি বলে তার ঠিক নেই। আর এই গাঁজা, ভাং খেয়ে সবসময় পাগলামি করে, মাতলামি করে। "যো দক্ষশাপাৎ পৈশাচ্যং প্রাপ্তঃ"—প্রজাপতি দক্ষের অভিসম্পাতে যিনি পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। ভূত, প্রেত, পিশাচ তাঁর সঙ্গী, শ্মশানে পড়ে থাকে সবসময়, মাথার ঠিক নেই লোকটার, ওঁর নাম ভোলা, পাগল।

যদি বস্তত্র বিশ্রম্ভো দানবেন্দ্র জগদ্গুরৌ।
তর্হ্যঙ্গাশু স্বশিরসি হস্তং ন্যস্য প্রতীয়তাম্।।

আমার এই কথায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহলে তুমি নিজেই পরীক্ষা করে দেখতে পার। শিবঠাকুর তোমাকে যে বর দিয়েছে 'যার মাথায় হাত দেবে, সে ভস্ম হয়ে যাবে', এটা একেবারে বাজে কথা। কিছুই হবে না। তুমি তোমার নিজের মাথায় হাত দিয়েই দেখ না, কিছুই হবে না। ভগবান্ বুদ্ধি দিয়ে দিচ্ছেন।

ভগবানের বুদ্ধিতে অসুররাও মোহিত হল এবং দেবতারা অমৃতের অধিকার লাভ করলেন। অমৃত বিতরণ করলেন ভগবান্ দেবতাগণকে, অসুরগণকে বঞ্চিত করে। সমুদ্রমন্থন হয়েছিল মন্দার মধুসূদনে। সে মন্দার আজও বিরাজিত, কিন্তু সমুদ্র সরে গেছে। ভগবান্ সেখানে সাক্ষী দিচ্ছেন আজও মন্দারে মধুসূদনরূপে। সেখানে সমুদ্রমন্থন হয়েছিল বাসুকিনাগকে দিয়ে। মুখের দিক্‌টা দেওয়া হয়েছিল অসুরগুলোকে। বাসুকিনাগ ভীষণ বিষবাষ্পোদ্গীরণ করছে, অসুরেরা মরছে তার জ্বালায়। আর লেজের দিক্‌টা সব দেবতাগণ ধরেছিলেন। মন্দারকে নিয়ে দধিমন্থন হওয়ার মত হচ্ছিল। উঠেছে কি? অনেককিছু উঠেছিল। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ইন্দ্রের যে হস্তী সেই হস্তী উঠেছে, লক্ষ্মী উঠেছেন, অমৃত উঠেছে, গরলও উঠেছে। এই গরল—বিষটা কে খাবে? ভগবান্ ব্যবস্থা দিয়েছেন যে, শিবঠাকুর এই বিষ হজম করতে ওস্তাদ। ওঁকেই দাও এটা। শিবঠাকুর সেই বিষ পান করে নাম গ্রহণ করলেন 'নীলকণ্ঠ', 'শিতিকণ্ঠ'। ভগবান্ তাঁর অধিকার জানেন। মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করে দেবতাগণকে অমৃত বিতরণ করেছেন অসুরগণকে বঞ্চিত করে।

ভগবান্ দুই তিনবার মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করেছেন, শাস্ত্রে বর্ণনা আছে। একবার

মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করে অমৃত বিতরণ করেছেন। আর একবার, শিবঠাকুরের ইচ্ছা হল, আমি তোমার সেই মোহিনীমূর্ত্তি দর্শন করব। ভগবান্ বললেন,—দেখ, তুমি ধৈর্য্যধারণ করতে পারবে না, ফলে ওটা দেখে কাজ নেই। কিন্তু শিবঠাকুর ছাড়বার পাত্র নন। ভগবান্ কি করেন তখন। একটা গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে গেছেন মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করে। শিবঠাকুর তখন ছুটে যাচ্ছেন তাঁর দিকে লোলুপ হয়ে। যার ফলে আজ শিবলিঙ্গ পূজা হচ্ছে এ জগতে। কেন না, ভগবান্ ভক্তের অবমাননা সহ্য করেন না, স্বীকার করেন না।

এখানেও সেই ভগবান্ ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছেন। বলছেন কি? দেখ, যদি তুমি শিবকে বিশ্বাস কর, শিবের কথায় বিশ্বাস কর, তা করতে পার ; কিন্তু আমি বলছি ওঁর কথায় কোন কাজ হয় না, কোনদিন ওঁর বর কাজে লাগেনি। তুমি তোমার নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখ। একবার বললেন।

যদ্যসত্যং বচঃ শম্ভোঃ কথঞ্চিদ্দানবর্ষভ।
তদৈনং জহ্যসদ্বাচং ন যদ্বক্তানৃতং পুনঃ।।

শিবঠাকুর এরূপ বহু বর বহুলোককে দিয়েছেন, কিন্তুআজ পর্য্যন্ত একটাও সত্য হয়নি। তোমার ক্ষেত্রেও হবে না। তথাপি তুমি যদি বিশ্বাস কর, তুমি নিজের মাথায় হাত দিয়ে এটার পরীক্ষা নিতে পার। আবার বলছেন দ্বিতীয়বার। তারপর বলছেন, শিবঠাকুর তোমার ভয়ে সরে গেছেন জান। ভগবান্ কিন্তু শিবঠাকুরকে ইশারা করে দিয়েছেন, তিনি লুকিয়ে গেছেন ; আর ভগবান্ বলছেন যে, তোমার ভয়ে শিবঠাকুর লুকিয়ে গেছেন। ওঁর কথা সত্য হবে না। যখন হবে না, তখন ওঁকে ডাকিয়ে এনে তোমার সামনে ওঁকে শাসন করব, তুমি এরকম বাজে বাজে বর দাও কেন?

ইত্থং ভগবতশ্চিত্রৈর্বচোভিঃ স সুপেশলৈঃ।
ভিন্নধীর্বিস্মৃতঃ শীর্ষ্ণি স্বহস্তং কুমতির্ন্যধাৎ।।

ভগবান্ বার বার যখন এরূপ বলতে লাগলেন, তখন বেটা অসুর ভুলে গেছে ভগবানের কথায়। যেই মাথায় হাত দিয়ে দিল তখন কি হয়েছে সেটা ত' আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন। "ভিন্নধীর্বিস্মৃতঃ শীর্ষ্ণি স্বহস্তং কুমতির্ন্যধাৎ"—সেই কুমতি অসুর যখন নিজের মাথায় হাত দিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম হয়ে গেল। কেন? শিবঠাকুরের বাক্য অমোঘ বাক্য। এদিক্ ওদিক্ হওয়ার নয়। সে ঠিকই হবে এবং হলও তাই।

অথাপতদ্ভিন্নশিরাঃ বজ্রাহত ইব ক্ষণাৎ।
জয়শব্দো নমঃশব্দ সাধুশব্দোঽভবদ্দিবি।।

যখন সেই অসুর নিহত হল, তখন হে ভগবান্! তোমার জয় হউক, তোমার

জয় হউক, হে ভগবান্! তোমায় নমস্কার, তোমায় নমস্কার। সাধু, সাধু বলে আকাশে ধ্বনি উত্থিত হতে লাগল।

মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি হতে পাপে বৃকাসুরে।
দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বা মোচিতঃ সঙ্কটাচ্ছিবঃ।।

পাপাসুর বৃকাসুর নিহত হল, ভগবানের উপরে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। দেব, ঋষি, পিতৃ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁরা শিবের সঙ্কটমোচন-স্তোত্র গান করতে লাগলেন। ভগবান্ যে তাঁকে রক্ষা করেছেন, ভগবান্ যে ভক্তবৎসল, ভক্তরক্ষক, সেই প্রমাণ এখানে ভগবান্ দিলেন। তাই ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন হতে লাগল।

মুক্তং গিরিশমভ্যাহ ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
অহো দেব মহাদেব পাপোঽয়ং স্বেন পাপ্মনা।।

যখন অসুর মারা গেছে, ভগবান্ তখন ডেকেছেন শিবকে, ও শিব, কাজ হয়ে গেছে, এবারে এস। ভগবান্ জিজ্ঞাসা করছেন শিবকে, এই যে অসুর মারা গেল, কিসে মারা গেল বলত'? শিব বলছেন,—ঠাকুর, ওর অন্যায়ের জন্য ও মরেছে। ভগবান্ বললেন,—ওর অন্যায়ের জন্য ও মরেছে, এ কথা ঠিক ; কিন্তু অন্যায়টা কার প্রতি করেছে বল? শিবঠাকুর ওটা বলতে চাচ্ছেন না। ভগবান্ তখন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন,—জান, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত, 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ'। তোমার প্রতি অবজ্ঞা করেছে। সুতরাং এ অবজ্ঞা আমি সহ্য করতে পারি না, পারব না। আমি আমার ভক্তের প্রতি অবমাননা কখনও সইতে পারি না, সহ্য করিনি, করবও না। ভক্তের অবমাননার জন্য ওর এই দুরবস্থা লাভ হয়েছে।

হতঃ কো নু মহৎস্বীশ জন্তুর্ব্বৈ কৃতকিল্বিষঃ।
ক্ষেমী স্যাৎ কিমু বিশ্বেশে কৃতাগস্কো জগদ্গুরৌ।।

হে শিবঠাকুর! তোমার মহিমা জগতের লোক জানে না, বোঝে না। কে তুমি? তোমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়—তুমি হলে জগদ্গুরু। আমি ভগবান্, আমার তত্ত্ব তুমি জগতে প্রকাশ কর। জগজ্জীবকে করুণা করে আমার তত্ত্ব তুমি তাদের জানাও, কি করে আমার সাধন-ভজন করতে হবে। তাই তুমি জগদ্গুরু। জগতের লোক তোমাকে চিনল না, বুঝল না। উল্টোপাল্টা করে, ভুল বোঝে তারা। এহেন যে জগদ্গুরু, তাঁর প্রতি অবমাননা হয়েছে—এই অসুর অবমাননা করেছে, সুতরাং এর বাঁচবার কোন অধিকার নেই এ দুনিয়ায়। তাই এ নিজের পাপে নিজে মরেছে। ভগবান্ এই কথা বলছেন। তুমি জগদ্গুরু, জগদ্গুরুর প্রতি অবমাননা হয়েছে, তাই এর এই দুরবস্থা হয়েছে। (ক্রমশঃ)

❑❑❑

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৮ ; ১৪ জানুয়ারী, ২০০২

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
২৯শে পৌষ, ১৪০৮ ; ১৪/১/২০০২

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫১৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৭ই ফাল্গুন, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ (ইং ২/৩/২০০২) শনিবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ-আবির্ভাব মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী** ৫ই গোবিন্দ, ১৯শে ফাল্গুন (ইং ৪।৩।২০০২), সোমবার পর্য্যন্ত **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সেবকবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—১৭ই ফাল্গুন, শনিবার—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরু-মহিমাসূচক বন্দনাদি, মহাজনগীতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলি-প্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্ত্তন এবং শ্রীগুরুমহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তৃতা।

১৮ই ফাল্গুন, রবিবার—পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তৃতা।

১৯শে ফাল্গুন, সোমবার—পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি-প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্পর্কে ভাষণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫৩শ বর্ষ } ১৬ মাধব, অনিরুদ্ধ, ৫১৫ শ্রীগৌরাব্দ { ১২শ সংখ্যা
৩০ মাঘ, বুধবার, ১৪০৮, ইং ১৩/২/২০০২

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্

[লীলাশুক-শ্রীল-বিল্বমঙ্গল-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

জিহ্বে রসজ্ঞে মধুরপ্রিয়া ত্বং, সত্যং হিতং ত্বাং পরমং বদামি।
আবর্ণয়েথা মধুরাক্ষরাণি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪০।।

হে রসিক জিহ্বে! মধুর রসকে তুমি অধিক ভালবাস, সেজন্য তোমায় পরম সত্যকথা বলিতেছি যে, "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" এই নামসমূহ সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন কর।। ৪০।।

আত্যন্তিক-ব্যাধিহরং জনানাং, চিকিৎসকং বেদবিদো বদন্তি।
সংসার-তাপত্রয়-নাশবীজং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪১।।

"গোবিন্দ-দামোদর-মাধব"—শ্রীভগবানের এই নামাবলী মানবের আত্যন্তিক ব্যাধিহরণকারী ও সংসারে ত্রিতাপ-নাশের একমাত্র মূল বীজস্বরূপ।। ৪১।।

তাতাজ্ঞয়া গচ্ছতি রামচন্দ্রে, সলক্ষ্মণেঽরণ্যচয়ে সসীতে।
চক্রন্দ রামস্য নিজা জনিত্রী, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪২।।

পিতৃ-আজ্ঞা পালনহেতু ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতাদেবীর সহিত শ্রীরামচন্দ্র বনগমনে উদ্যত হইলে মাতা কৌশল্যাদেবী "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।। ৪২।।

একাকিনী দণ্ডক-কাননান্তাৎ, সা নীয়মানা দশকন্ধরেণ।
সীতা তদাক্রন্দদনন্যনাথা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪৩।।

সীতাদেবীকে দণ্ডকারণ্যে একাকিনী দেখিয়া যখন দশানন রাবণ তথা হইতে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তখন জনকদুহিতা অনন্যশরণা হইয়া "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।। ৪৩।।

রামাদ্বিযুক্তা জনকাত্মজা সা, বিচিন্তয়ন্তী হৃদি রামরূপম্।
রুরোদ সীতা রঘুনাথ পাহি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪৪।।

লঙ্কাভিমুখে গমনকালে শ্রীরাম-বিরহব্যথিতা সীতাদেবী হৃদয়মধ্যে রামরূপ ধ্যান করত "হে রঘুনাথ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! আমাকে রক্ষা কর বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।।" ৪৪।।

প্রসীদ বিষ্ণো রঘুবংশনাথ, সুরাসুরাণাং সুখদুঃখহেতো।
রুরোদ সীতা তু সমুদ্রমধ্যে, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪৫।।

যখন সমুদ্রমধ্য দিয়া রাবণের সঙ্গে সীতাদেবী অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন "হে বিষ্ণো! হে রঘুপতে! হে সুরাসুরের সুখ-দুঃখবিধাতঃ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! আমাকে রক্ষা কর"—এই বলিয়া রোদন করিতেছিলেন।। ৪৫।।

অন্তর্জলে গ্রাহ-গৃহীত-পাদো, বিসৃষ্ট-বিক্লিষ্ট-সমস্তবন্ধুঃ।
তদা গজেন্দ্রো নিতরাং জগাদ, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪৬।।

যখন জলমধ্যে গ্রাহ (কুম্ভীর)-কর্ত্তৃক গজেন্দ্রের পাদদ্বয় আক্রান্ত হইল, তখন বন্ধু-বান্ধববিহীন সাতিশয় ক্লিষ্ট করীন্দ্র "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" বলিয়া সর্ব্বক্ষণ সকাতর আহ্বান করিতে লাগিলেন।। ৪৬।।

হংসধ্বজঃ শঙ্খযুতো দদর্শ, পুত্রং কটাহে প্রতপন্তমেনম্।
পুণ্যানি নামানি হরের্জপন্তং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪৭।।

নৃপতি শঙ্খধ্বজ দেখিতে পাইলেন,—তাহার পুত্র হংসধ্বজ উত্তপ্ত তৈলপাত্রে নিপতিত হইয়া "গোবিন্দ! দামোদর! মাধব!"—শ্রীহরির এই পবিত্র নাম মন্দ মন্দ স্বরে জপ করিতেছেন।। ৪৭।।

দুর্ব্বাসসো বাক্যমুপেত্য কৃষ্ণা, সা চাব্রবীৎ কাননবাসিনীশম্।
অন্তঃপ্রবিষ্টং মনসাজুহাব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪৮।।

একদিন দুর্ব্বাসা ঋষি শিষ্যগণসহ কাননবাসিনী কৃষ্ণা অর্থাৎ দ্রৌপদীর কুটিরে পদার্পণ করত আহার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু দ্রৌপদীর ভোজনান্তে আহার নিঃশেষ হওয়ায় অতিথি সৎকারের নিমিত্ত অন্তর্যামী বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" বলিয়া কাতরস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন।। ৪৮।।

ধ্যেয়ঃ সদা যোগিভিরপ্রমেয়ঃ চিন্তাহরশ্চিন্তিত-পারিজাতঃ।
কস্তূরিকাকল্পিত-নীলবর্ণো গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪৯।।

যিনি যোগিগণের অপরিজ্ঞেয়, সর্ব্বচিন্তাহরণকারী, কল্পবৃক্ষসদৃশ ও যিনি কস্তূরিকার ন্যায় নীলকান্তিবিশিষ্ট, তিনি "গোবিন্দ-দামোদর-মাধব"-নামে সর্ব্বদা ধ্যানযোগ্য।। ৪৯।।

সংসারকূপে পতিতোঽত্যগাধে, মোহান্ধপূর্ণে বিষয়াভিতপ্তে।
করাবলম্বং মম দেহি বিষ্ণো, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫০।।

আমি মোহান্ধকার-পরিব্যাপ্ত, অতিশয় তপ্ত বিষয়রূপ বিষে পরিপূর্ণ গভীর-সংসারকূপে নিপতিত হইয়াছি। হে বিষ্ণো! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! আপনার শ্রীকর-কমলাবলম্বনদানে আমায় ত্রাণ করুন।। ৫০।।

ত্বামেব যাচে মম দেহি জিহ্বে, সমাগতে দণ্ডধরে কৃতান্তে।
বক্তব্যমেবং মধুরং সুভক্ত্যা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫১।।

হে জিহ্বে! তোমার নিকটে এই যাচ্ঞা করিতেছি যে, দেহাবসানে যে-সময় দণ্ডপাণি যম সমাগত হইবে, তখন তুমি "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!"—এই সুমধুর নামসকল প্রেমভরে গান করিতে থাকিবে।। ৫১।।

ভজস্ব মন্ত্রং ভববন্ধমুক্ত্যৈ, জিহ্বে রসজ্ঞে সুলভং মনোজ্ঞম্।
দ্বৈপায়নাদ্যৈর্মুনিভিঃ প্রজপ্তং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫২।।

হে রসাস্বাদনকারিণি জিহ্বে! তুমি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য ব্যাসপ্রমুখ মুনিবৃন্দগীত "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এইসকল সহজলভ্য, মনোমুগ্ধ-কারী নামরূপ মন্ত্র জপ কর।। ৫২।।

গোপাল বংশীধর রূপসিন্ধো, লোকেশ নারায়ণ দীনবন্ধো।
উচ্চস্বরৈস্ত্বং বদ সর্ব্বদৈব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫৩।।

হে জিহ্বে! তুমি সর্ব্বদা "গোপাল, মুরলীধর, রূপসিন্ধু, লোকেশ, নারায়ণ, দীনবন্ধু, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এই নামসমূহ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাক।। ৫৩।।

জিহ্বে সদৈবং ভজ সুন্দরাণি, নামানি কৃষ্ণস্য মনোহরাণি।
সমস্ত-ভক্তার্ত্তি-বিনাশনানি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫৪।।

হে জিহ্বে! তুমি ভক্তবৃন্দের ক্লেশবিনাশক শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর, মনোহর "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" নাম সর্ব্বদা ভজন করিতে থাক।। ৫৪।।

গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে, গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ।
গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গপাণে, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫৫।।

হে জিহ্বে! তুমি "হরি, মুরারি, মুকুন্দ, কৃষ্ণ, চক্রপাণি, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—শ্রীকৃষ্ণের এই নামসমূহ সর্ব্বদা গান কর।। ৫৫।।

সুখাবসানে ত্বিদমেব সারং, দুঃখাবসানে ত্বিদমেব গেয়ম্।
দেহাবসানে ত্বিদমেব জাপ্যং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫৬।।

"গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এই নামসকল সুখের অন্তে একমাত্র সার, দুঃখের শেষে ইহাই গান করা কর্ত্তব্য এবং দেহত্যাগকালে ইহাই জপ্য।। ৫৬।।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০৮ পৃষ্ঠার পর]

ঈশাবাস্যে চ,—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।।

(শ্বেতাশ্বতর ৫ ও ৮ মন্ত্র)

[সেই আত্মতত্ত্ব সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান।]

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।।

[পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, অকায়, অক্ষত, শিরারহিত, উপাধিশূন্য, মায়াতীত, কবি, সর্ব্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভূ ও পরিভূ। তিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা নিত্যপদার্থ-সকলকে তত্তদ্বিশেষদ্বারা পৃথগ্‌রূপে বিধান করিয়াছেন।]

সেই অচিন্ত্য-শক্তির পরিচয়ে তলবকার বলিয়াছেন, যথা,—

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি ; তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুম্ ; স তত এব নিববৃতে—নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি।। (কেনোপনিষৎ ৩।১০ মন্ত্র)

[দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া দেবতাগণ গর্ব্বিত হইলে ভগবান্ তাঁহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া অগ্নিপ্রমুখ দেবতাগণের সম্মুখে একটী তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি সেই তৃণের সমীপবর্ত্তী হইয়া সকলশক্তি প্রয়োগ

করিয়াও উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেবতাগণের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন,—"এই বরেণ্য পুরুষকে আমি জানিতে পারিলাম না।"]

বিভুত্বে মূর্ত্তত্ব কথিত আছে, ছান্দোগ্য,—

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে। (৮।১৩।১)

['শ্যাম'-শব্দের অর্থ 'কৃষ্ণ'। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণ অর্থাৎ 'কালো' বলিলে বর্ণবিহীন—নির্গুণ পরতত্ত্ব-বস্তুকে বুঝায়। এবং 'শবল'-শব্দের অর্থ 'গৌর'। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নানাবর্ণ-যুক্ত বা যাবতীয় বর্ণের সমাবেশের নাম 'গৌর' অর্থাৎ যাবতীয় অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট পরতত্ত্ব-বস্তু। অতএব ইহার গূঢ় নিষ্কৃষ্টার্থ এই যে,—কৃষ্ণ হইতে গৌর এবং গৌর হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।]

গোপালোপনিষদি চ,—

গোপবেশং সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্।। (পূর্ব্ব ১৩।১)

[গোপবেশ, প্রফুল্ল-পদ্মলোচন, নীরদকান্তি, পীতবরণ, দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাযুক্ত, বনমালা-বিভূষিত নন্দনন্দনকে আমরা বন্দনা করি।]

শক্তিতত্ত্ব-বিচারে শ্রীচরিতামৃত-বাক্যই সর্ব্বদা আলোচনীয়,—

কৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি তা'তে তিন প্রধান।
'চিচ্ছক্তি',' মায়াশক্তি', 'জীবশক্তি' নাম।।
'অন্তরঙ্গা', 'বহিরঙ্গা', 'তটস্থ' কহি যা'রে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে।।
সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ।।
আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'।
চিদংশে 'সম্বিৎ', যা'রে জ্ঞান করি' মানি।।
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তা'তে নাম—'হ্লাদিনী'।
সেই শক্তি-দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি।।
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে 'হ্লাদিনী'—কারণ।।
হ্লাদিনীর সার অংশ তা'র 'প্রেম'-নাম।
আনন্দচিন্ময়রূপ রসের আখ্যান।।
প্রেমের পরম-সার 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাব-রূপা রাধা-ঠাকুরাণী।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৫০-১৫৯)

সেই অচিন্ত্য-স্বরূপশক্তির কার্য্যক্রমে ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়-ধাম ও পরিকর সহিত প্রাপঞ্চিক-জগতে স্বয়ং অবতীর্ণ হন। স্বীয় অসীম কৃপাদ্বারা তাঁহার অপ্রাকৃত ধাম, নাম, রূপ, গুণ ও লীলা বদ্ধজীবের গোচরে প্রকাশ করেন। জড়েন্দ্রিয়ে স্বীয়-অধিকারবলে ঐ সমস্ত সাক্ষাৎকার করিতে পারেন না, কিন্তু অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে কৃষ্ণকৃপায় তাহা জড়েন্দ্রিয়ের গোচর করিতে সমর্থ। কখন বা স্বাংশ-বিলাসক্রমে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। এ সকল বিষয়ে তত্ত্ব এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অবতারী এবং আর সমস্ত প্রকাশই অবতার। স্বয়ং বা স্বাংশ-অবতার সকলেই চিন্ময়। কেহই মায়ার সহায়তা গ্রহণ করত প্রাকৃত শরীর ধারণ করেন না। কখনও কখনও বা উপযুক্ত জীবে কৃষ্ণশক্তি আবির্ভূতা হইয়া শক্ত্যাবেশ-অবতার প্রকাশ করেন। শ্রীচরিতামৃতে অবতার সম্বন্ধে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে,—

'প্রাভব'-'বৈভব'রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।'
'প্রাভব'-'বৈভব'-ভেদে বিলাস—দ্বিধাকার।'
"প্রকাশ-বিলাসের এই কৈলুঁ বিবরণ।
স্বাংশের ভেদ এবে শুন, সনাতন।।
সঙ্কর্ষণ, মৎস্যাদিক,—দুই ভেদ তাঁর।
* * * *
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর।।
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার আর, শক্ত্যাবেশাবতার।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৬৭, ১৮৫, ২৪৩-২৪৬)

এই সমস্ত অবতার-বিবরণ ও তত্ত্ব মধ্যলীলার বিংশতি পরিচ্ছেদ এবং শ্রীভাগবতামৃত- গ্রন্থে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

"দীক্ষাগুরুর পূজা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়,—মন্ত্রদাতা গুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যিনি দীক্ষাগুরুর সেবাশিক্ষা প্রদান করেন, তিনিই শিক্ষাগুরু। যিনি দীক্ষাগুরুর সেবাশিক্ষায় বিমুখ, তিনি শিক্ষাগুরু-পদবাচ্য নহেন। তিনি বৈষ্ণবই হইতে পারেন না ; কারণ তিনি দীক্ষাগুরুর মর্য্যাদা দিতে শিক্ষা করেন নাই।"

শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমদ্ভাগবতে দশাবতারের লীলা-বর্ণন, যথা,—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যান্ দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।।
যস্যালীয়ত শল্কসীম্নি জলধিঃ পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডলঃ
দংষ্ট্রায়াং ধরণী নখে দিতিসুতাধীশঃ পদে রোধসি।
ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ শরে দশমুখঃ পাণৌ প্রলম্বাসুরঃ
ধ্যানে বিশ্বমসাবধার্ম্মিককুলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ।।

মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহদেব যে-সকল কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—তাহাদিগকে আমরা বিষ্ণুর বংশ বলিব না। বিষ্ণুর সেবকগণই যথার্থ বিষ্ণুবংশ। অর্থাৎ বৈষ্ণবগণই অচ্যুতগোত্র। বরাহবিষ্ণুর সহিত অন্য বরাহকে সমান মনে করা উচিত নহে। ঋষিবংশ, ব্রহ্মবংশ, ক্ষাত্রবংশ কালপ্রভাবে যোগ্যতারহিত হইয়াও পূর্ব্ববংশ-পরিচয়ে অভিমানী হইলেও কোন ফল হইতেছে না। মনু ও বশিষ্ঠের বংশে জন্মিলেও ব্রহ্মগুণরহিত হইলে শাস্ত্রানুসারে শূদ্রত্বলাভ ঘটে। দেব-দ্বিজ-বংশসকল কালপ্রভাবে আক্রান্ত। উদয়পুরের রাণাগণ রামচন্দ্রের পুত্র লব-কুশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের তদ্দ্বারা কোন গৌরব বাড়িতেছে না। সন্তানকে মহাপুরুষের সহিত সমান মনে করা উচিত নয়। গোস্বামীর পুত্র গোস্বামী হইতে পারে না। গোস্বামীর কার্য্য না করিলে তাহাকে জাতিব্রাহ্মণ মাত্র বলা যাইতে পারে। জাতিগোস্বামী কখনও আচার্য্য হইতে পারে না। নরকাসুর বরাহদেবের সন্তান ছিলেন। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধ করায় বিষ্ণু স্বহস্তে তাহাকে নিধন করেন। নরকাসুর যদি বলে,—"আমি সাক্ষাৎ বিষ্ণুসন্তান, আমার চেয়ে বিষ্ণুকে কেহই বেশী বুঝিতে পারে না, আমিই কেবল বিষ্ণুকে জানি, আমাকে বড় মনে করবে না কেন?" এ সকল বৃথা দম্ভদ্বারা কোন ফলোদয় হয় না। এ-সকল বিচার ছাড়িয়া আমাদের ভক্ত হওয়া দরকার। শুদ্ধ ও অন্তরঙ্গ ভক্ত হওয়া আবশ্যক। রূপানুগগণের বিচার গ্রহণ করিতে হইবে, তিনি গৃহস্থই হউন আর গৃহত্যাগীই হউন। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শ-চরিত্রে ত্যক্তগৃহ জনগণের বাস্তব বিচার-প্রণালী দেখিতে পাই। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও সেন শিবানন্দের বিচারপ্রণালী হইতে কোন অংশেই তফাৎ নহে। কি গৃহস্থ, কি গৃহত্যাগী, অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কি-প্রকারে মুক্ত, তাহা বিচার না করিলে পরের ছিদ্রানুসন্ধান ক'রে মঠাদিতে

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৮ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০২

বাস ক'রেও বঞ্চিত হব। অনুকরণ ও অনুসরণ এক নহে। অনুসরণকারিগণ Bona-fide আর অনুকরণকারিগণ Melafide, এ সম্বন্ধে একটী গল্প মনে পড়ল।—

কুষ্ঠিয়ার এক ব্যক্তির বাড়ীতে ধূমধামের সহিত অষ্টপ্রহরকীর্ত্তনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। দুই জায়গায় দুই দল সহজিয়া বৈরাগী কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিল। একদলের বোষ্টমের কপট দশা হইল। সে যতক্ষণ থাকিল, আর দলের লোক ততক্ষণ থাকিতে পারিল না। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার দশা এত শীঘ্র ভাঙ্গিল কেন? সে বলিল,—চারি আনা পয়সার দশা, আর কত হইবে? দুনিয়ার বাজারে বৈষ্ণবতার নামে এই প্রকার ভণ্ডামি প্রবলভাবে চলিতে থাকিলেও প্রকৃত সত্যের যথার্থ মর্য্যাদা স্থাপন ও অনুসরণ করা আবশ্যক। মেকীকে আসল ও আসলকে মেকী বলিয়া সাব্যস্ত করিলে বৈষ্ণবনিন্দা হয়। ইন্দ্রিয়াসক্ত থাকিয়া বৈষ্ণবের অনুকরণ করিতে গেলে মৎসরতা এ'সে যায়। বহির্দৃষ্টিতে অমল বৈষ্ণবচরিত্রে দোষদৃষ্টি হয়। গৌড়ীয় মঠে যাব না, যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর ভয়ানক জায়গা—প্রভৃতি অমঙ্গলের চিন্তাস্রোত এসে যায়। ইহাতেই আমাদের কপাল পোড়ে। সুতরাং শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গ ভক্তের বিচার গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহাতেই যথার্থ মঙ্গল হইবে।

সন্দর্ভ-সার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১৩ পৃষ্ঠার পর]

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—২০)

যাদবগণ ও গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ। তাহা হইলেও যাদবগণ বৈরিকৃত অস্ত্রাঘাতে ক্ষত হইয়াছেন, গোপগণ কালিয়হ্রদের বিষজল পান করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, শ্রীবসুদেব ও উদ্ধবাদি তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রে শ্রীবসুদেব নারদাদি মুনিগণের নিকট সংসার-নিস্তারের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে-সকল কেবল নরলীলার উপযোগী মাত্র। শ্রীভগবান্ যেমন নরলীলার পুষ্টিনিমিত্ত নানাবিধ মনুষ্যচেষ্টা দেখাইয়াছেন তাঁহার পরিকরগণেরও তাদৃশ ভাব জানিতে হইবে। এইপ্রকার মনুষ্যচেষ্টা প্রকাশের দৃষ্টান্ত রুক্মিণীদেবীর চরিত্রেও দেখা যায়। শ্রীরুক্মিণীদেবী ভ্রাতা রুক্মীর জন্য শোকপ্রকাশ করিলে শ্রীবলদেব বলিয়াছিলেন, তুমি সর্ব্বভূতের অহিতকারী ভাইদের জন্য যে অজ্ঞের ন্যায় মঙ্গল-চেষ্টা করিতেছ, তাহা তোমার অসমীচীনা বুদ্ধি। কারণ, তাহারা তোমার সুহৃদ্গণের অহিতকারী। ভগবদ্দ্রোহী রুক্মীর প্রতি রুক্মিণীর সহানুভূতি দেখিয়া বলদেবের এই উক্তি। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীর তাদৃশ ব্যক্তিতে ভ্রাতৃত্বমনন ও তজ্জনিত হিতানুসন্ধান-চেষ্টা কেবল নরলীলার মুগ্ধতা, অজ্ঞতা নহে।

আবার শুকদেবের উক্তি,—শৈশবাবধি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে করিতে কালক্রমে

বৃদ্ধত্বপ্রাপ্ত শ্রীউদ্ধব বিদুরকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদানে সমর্থ হন নাই। যেহেতু তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরহোৎকণ্ঠায় অতীব অধীর হইয়াছিলেন (ভাঃ ৩।২।৩)। এস্থলে উদ্ধবের বৃদ্ধত্ব প্রাপ্তির কথা কালকৃত বার্দ্ধক্যসূচনা-জনিত নহে ; তিনি যে চিরকাল শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া আসিতেছেন তাহা বুঝাইবার জন্য। কারণ,—

তত্র প্রবয়সোঽপ্যাসন্ যুবানোঽতিবলৌজসঃ।
পিবন্তোঽক্ষৈর্মুকুন্দস্য মুখাম্ভোজসুধাং মুহুঃ।। (ভাঃ ১০।৪৫।১৯)

কংসভয়ে পলায়িত যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ, কুকুরবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আনাইয়া দ্বারকায় বাস করাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলসুধা নয়নযোগে পান করিয়া সাতিশয় তেজঃসম্পন্ন যুবার ন্যায় হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে বয়োবৃদ্ধ যাদবাদি যদি যুবক হইতে পারেন, তবে শৈশব হইতে শ্রীকৃষ্ণসেবাপরায়ণ উদ্ধবের বৃদ্ধত্ব কিরূপে সম্ভব?

অন্তরঙ্গ ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণতুল্য ধর্ম্মত্ব পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"মত্তুল্য-গুণশালিনঃ" অর্থাৎ ইহারা আমার তুল্য গুণশালী। "গোপালা মুনয়ঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠা-নন্দমূর্ত্তয়ঃ। (পাদ্ম নির্ব্বাণ খণ্ড) অর্থাৎ গোপসকল মুনি। যেহেতু তাঁহারা বৈকুণ্ঠা-নন্দমূর্ত্তি।" শ্রীভগবান্ যেমন আনন্দমূর্ত্তি, তদীয় পরিকরগণও তদ্রূপ। শ্রীভগবানের পরমভক্ত বলিয়া তাঁহারা আনন্দমূর্ত্তি, সেইজন্য তাঁহাদিগকে মুনি বলা হইয়াছে। মুনিগণের অবতার বলিয়া গোপগণকে মুনি বলা হয় নাই। কারণ শ্রীবলদেবের উক্তি,—

নৈতে সুরেশা ঋষয়ো ন চৈতে
ত্বমেব ভাসীশ ভিদাশ্রয়েঽপি। (ভাঃ ১০।১৩।৩৫)

হে কৃষ্ণ! এই বৎসসকল ও গোপগণ দেবতাও নহে, ঋষিও নহে, ভেদাশ্রয় হইলেও তুমি ইহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছ। শ্রীবলদেব-বাক্যের তাৎপর্য্য,—ব্রহ্মাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপবালকগণ ও বৎসগণ অপহৃত হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিজ স্বরূপ হইতে গোপাদিকে প্রকাশ করিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন, এ বিষয়ে ভাঃ ১০।১২।৩৫ শ্লোকে শ্রীবলদেবের উক্তি,—

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নর্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী।।

ব্রহ্মমোহনলীলায় ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের বৎস ও সখাগণকে হরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ নিজস্বরূপ হইতে অবিকল তাবৎসংখ্যক বৎস ও সখাগণকে প্রকাশ করিয়া লীলা করিতে থাকেন। উক্ত দিবস শ্রীবলদেব গোচারণে গমন করেন নাই বলিয়া লীলারহস্য দর্শন করেন নাই। এজন্য ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণে যেমন নিত্যবৃদ্ধিশীল প্রেম বর্ত্তমান ছিল, গাভীগণের নূতন বৎস হইলেও তাহাদের পুরাতন বৎসের প্রতি আশ্চর্য্যজনক

স্নেহ দর্শনে শ্রীবলদেবের ঐ উক্তি—ইহা মায়ার কার্য্য। কোন্ মায়া আমাকে এরূপ দেখাইতেছে? ইহা কি কোন দেবতার বা মনুষ্যের বা অসুরের? এ মায়া কোথা হইতে আসিল? ইহাত' অন্যত্র সম্ভব হয় না। যেহেতু ইহা হইতে আমারও মোহ জন্মিয়াছে, সুতরাং ইহা নিশ্চয়ই আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মায়া, নচেৎ আমাকে মোহন করিবার যোগ্যতা অন্য কাহারও নাই। এখানে 'প্রভু'-পদদ্বারা নিজন্যূনতা সূচনা করিতেছেন। শ্রীধর্ম্মরাজের উক্তিতেও দেখা যায়,—

তস্যাস্বতন্ত্রস্য হরেরধীশিতুঃ পরস্য মায়াধিপতের্মহাত্মনঃ।
প্রায়েণ দূতা ইহ বৈ মনোহরাশ্চরন্তি তদ্রূপগুণস্বভাবাঃ।।

সেই পরম স্বতন্ত্র অধীশ্বর মায়াধীশ মহাত্মা সর্ব্বনিয়ামক শ্রীহরির মনোহর দূতগণ রূপ, প্রভাবাদিগুণ এবং ভক্তবাৎসল্যাদি স্বভাবে তাঁহার তুল্য, তাঁহারা (ভক্তরক্ষার জন্য) সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন। প্রথম স্কন্ধেও—

মধুভোজদশার্হার্হ-কুকুরান্ধক-বৃষ্ণিভিঃ।
আত্মতুল্যবলৈর্গুপ্তাং নাগৈর্ভোগবতীমিব।। (ভাঃ ১।১১।১০)

নাগগণ-রক্ষিত ভোগবতী পুরীর মত নিজতুল্য বলশালী মধু, ভোজ, যাদব, অর্হ, কুকুর ও অন্ধকগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত দ্বারকাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব পরিকরগণের ভগবৎসাদৃশ্য হেতু নিম্নলিখিত শ্লোকে গোপগণের শ্রীকৃষ্ণতুল্যত্ব সূচিত হইয়াছে,—

গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণম্।
ঈড়িরে কৃষ্ণরামৌ চ নটা ইব নটং নৃপ।। (ভাঃ ১০।১৮।৯)

হে নৃপ! নট যেমন নটের স্তব করে, গোপজাতি প্রতিচ্ছন্ন দেবগণও তদ্রূপ গোপালরূপী রামকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন। এস্থলে দেবতা অর্থে 'শ্রীকৃষ্ণ-সখাগণ' অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহারা গোপজাতিদ্বারা প্রতিচ্ছন্ন অন্য সাধারণ গোপের ন্যায় বেশ-ব্যবহারবিশিষ্ট হইলেও তাঁহারা প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণতুল্য, ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং শ্রীবলরাম মূল-সঙ্কর্ষণ হইলেও তাঁহারা যেমন গোপালরূপী ভগবন্নিত্যপার্ষদ, শ্রীদামাদিও তদ্রূপ জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরমধ্যে যাদবাদিকেও যোজনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবকে বলিতেছেন,—

অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরম্।। (ভাঃ ১০।৮৫।২১)

হে যদুশ্রেষ্ঠ! আমি, আপনারা, আর্য্য শ্রীবলদেব এবং এই দ্বারকাবাসী সচরাচর সকলেই ব্রহ্মস্বরূপে অন্বেষণীয়। শ্রীবসুদেব প্রভৃতি পারমার্থিক সত্যবস্তু বলিয়া অন্বেষণযোগ্য দ্বারকাবাসিগণেরও পারমার্থিক সত্যতা নিরূপণজন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজকে

দৃষ্টান্তস্বরূপে উপনাস্ত করিয়াছেন। নরাকৃতি পরব্রহ্ম তাঁহার ন্যায় তদীয় পরিকরগণেরও পরমার্থ-স্বরূপত্ব জানাইতেছেন। সকলেই পুরুষার্থের অনুসন্ধান করে। শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষার্থ বস্তু বলিয়া যেমন অনুসন্ধানের পাত্র, তদীয় পরিকরগণও তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি যেমন প্রয়োজন, তদীয় পরিকরগণের প্রাপ্তিও তদ্রূপ। কেবল শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিতে লীলারস আস্বাদনের সম্ভাবনা নাই।

অতএব যাদবগণের শ্রীকৃষ্ণতুল্যতাহেতু কুরুক্ষেত্রে রাজন্যবর্গ যাদবগণকে বলিয়াছিলেন,—

তদ্দর্শনস্পর্শনানুপথপ্রজল্প-
শয্যাসনাশন-সযৌন-সপিণ্ডবন্ধঃ।
যেষাং গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বর্ত্ততাং বঃ
স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বয়মাস বিষ্ণুঃ।। (ভাঃ ১০।৮২।৩০)

তোমাদের প্রপঞ্চাতীত গৃহে দর্শন, স্পর্শন, অনুগমন, কথন, শয্যা, আসন, ভোজন, বিবাহ-সম্বন্ধ ও জ্ঞাতিসম্বন্ধ-সহকারে স্বর্গাপবর্গ-বিতৃষ্ণাকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন, তোমরাই সার্থকজন্মা। ভগবান্ কোন কারণের অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃই বাস করেন যে গৃহে, সে গৃহ কিরূপ? অনিরয়বর্ত্ম। নিরয়—'সংসার', তাহার বর্ত্ম—'প্রপঞ্চ'। সুতরাং প্রপঞ্চাতীত গৃহে। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ? "স্বর্গাপবর্গবিরম" —যাঁহা কর্ত্তৃক স্বর্গ ও মোক্ষের বিরতি ঘটে অর্থাৎ যিনি নিজজনগণকে ভগবদ্বিমুখতাপর স্বর্গ বা ভক্তিসম্পর্কশূন্য মোক্ষ প্রদান করেন না। সমান ব্যক্তির সহিতই একত্র শয়নাদি সম্ভব এবং স্বজাতির সহিতই বিবাহাদি সম্বন্ধ ও দৈহিক সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে।

যাদবগণ ভগবৎপার্ষদত্ব হইতে কখনও বঞ্চিত হন না, তাহা জানাইতেছেন,—

তত্রোপবিষ্টঃ পরমাসনে বিভুর্বভৌ স্বভাসা ককুভোঽবভাসয়ন্।
বৃতো নৃসিংহৈর্যদুভির্যদুত্তমো যথোড়ুরাজো দিবি তারকাগণৈঃ।।
(ভাঃ ১০।৭০।১৫)

সুধর্ম্মাসভায় বিভু শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠাসনে উপবেশনপূর্ব্বক নরশ্রেষ্ঠ যাদবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ প্রভাবদ্বারা দিকসকল দীপ্ত করত তারকাবেষ্টিত শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এস্থলে তারকাগণের সহিত যেরূপ চন্দ্রের বিচ্ছেদ হয় না, তদ্রূপ যাদবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণেরও বিচ্ছেদ ঘটে না। আর তারাগণের চন্দ্রের সঙ্গে অবস্থিতির যোগ্যতার ন্যায় যাদবগণের শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ-যোগ্যতা বুঝিতে হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৮ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০২

অঋণী

ভগবৎ-সেবা ব্যতীত অন্য সকলপ্রকারইতর কামনাই অসৎ ও ঋণাত্মক। জড়মায়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তিই অঋণী হইয়া ইহজগতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীব মাত্রেই পরস্পর পরস্পরের নিকট ঋণী। আকাশ, মাটী, বায়ু, জল, অগ্নি, সূর্য্য, বৃক্ষ, দেবতা, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, রাজা, ঋষি, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির নিকট প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ঋণী। ঋণপাশে আবদ্ধ হইলে তাহা হইতে নিস্তার লাভ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। ঋণ ক্রমশঃই চক্রবৃদ্ধিহারে এতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে, তাহা শোধ করিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া জীব যতই প্রাকৃত জগতে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, ততই তাহাকে প্রতিক্ষণে প্রতি পদক্ষেপে প্রত্যেকের নিকট ঋণগ্রস্ত থাকিতে বাধ্য হইতে হয়। ঋণদাতার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া কন্যারবিবাহে পণ দিতে গিয়া কত পিতামাতাকে যে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া অনেক ব্যক্তিকে ঋণদাতার গৃহে দাসরূপে সারাজীবন দুঃখে অতিবাহিত করিতে হইয়াছে, তাহাও দেখা যায়। সরকারী ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া ঋণগ্রহীতার অনেকের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সরকার-কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইতেও দেখা গিয়াছে।

'ঋণ' বলিতে সাধারণতঃ কর্জ্জ, ধার, দেনা প্রভৃতিকে বুঝায়। ঋণ ধর্ম্ম ও মর্য্যাদা —উভয়ই নষ্ট করে বলিয়া তাহা ধার্ম্মিকের পক্ষে কলঙ্ক। ঋণ থাকিলে অগ্নি ব্যতীত শরীর প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। "ঋণ করে যেই, দুঃখ পায় সেই।" হাদীস্-শরীফ ঋণ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছেন,—"ঋণ থেকে সাবধান থাক, কারণ রাত্রিকালে তাহা দুশ্চিন্তার কারণ এবং দিনের বেলায় তাহা অপমানের কারণ।" যাহারা ঋণ করিয়া কাণে সোনা দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের ভিটেয় যে কোন মুহূর্ত্তে ঘুঘু চরিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। "পরের সোনা দিও না কাণে, প্রাণ যাবে হেঁচকা টানে।" যাহারা ঋণ করিয়া হাতী কেনা অর্থাৎ স্বচ্ছন্দে দামী দামী জিনিষ ক্রয় করিবার পক্ষপাতী, ঋণ পরিশোধের সময় তাহাদের বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কথায় বলে,—"ঋণের অপেক্ষা ভয়ানক পাপ আর নাই।" হাদীস্-শরীফে রহিয়াছে,—"মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বড় পাপ হইল ঋণগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করা এবং তাহা পরিশোধ করিবার উপযুক্ত সম্পত্তি না রাখিয়া যাওয়া।" নাস্তিক চার্ব্বাক ঋণ করিয়া ঘৃত অর্থাৎ ভাল-মন্দ খাইবার পক্ষপাতী ; ঋণ পরিশোধের প্রয়োজন আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। পরলোক অস্বীকারকারী চার্ব্বাকের বিচারে, পরলোক যেহেতু নাই, সেহেতু কে কাহার ঋণ পরিশোধ করিবে? চার্ব্বাকের অনুগামিগণও নিজেদের ঋণচোরের তালিকায় তালিকাভুক্ত করিয়া ভবচক্রে অনন্তকালের জন্য ঘুরপাক খাইতে থাকেন।

ভোগোন্মুখ কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ পরমার্থকে ধন না জানিয়া নিজেদের ভোগোপ-করণসমূহকে ধন জ্ঞান করেন ; বস্তুতঃপক্ষে তাহা 'ঋণ'-পদবাচ্য। পরমার্থহীন ঋণ-

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৮ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০২

রূপ কাম কখনও 'ধন' হইতে পারে না। ভোগীকুল সাংসারিক উন্নতিকেই একমাত্র কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাতেই প্রয়াসযুক্ত হন। তখন তাহারা নানাপ্রকার অসদ্বিষয়ে ধাবিত হইয়া নানাপ্রকার ঋণপাশে আবদ্ধ হন। 'অঋণী' ব্যক্তিমাত্রেই সুখী। বকরূপী ধর্ম্মের চারিটী প্রশ্নের মধ্যে 'সুখী কে?'—এই প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—

দিবস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যদ্‌গৃহে।
অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে।। (মহাভারত বনপর্ব্ব)

"যিনি দিবসের শেষভাগে শাকান্ন খান, অথচ তিনি যদি অঋণী ও অপ্রবাসী হন, তাহা হইলে তিনিই সুখী।" দেহে ও মনে আমিত্ব বুদ্ধি থাকায় জড়বাদিগণ মনে করেন, 'অঋণী'-শব্দের অর্থে টাকা-পয়সার ঋণশূন্যতাকে বুঝায়। কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞানিগণ এই বিচারকে নিতান্ত ভুল ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া জগৎকে জানাইয়াছেন। তাহারা অঋণী-শব্দের অর্থে যাবতীয় ঋণশূন্যতাকে লক্ষ্য করেন। মানব জন্মিবামাত্রই ঋণী হইয়া থাকেন। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত মায়াবদ্ধ জীবগণ কখনও ঋণমুক্ত হইতে পারেন না। যাহাদিগকে ইহজগতে ঋণদাতা বলিয়া চিহ্নিত করা হয়, তাহারাও প্রকৃতপক্ষে ঋণগ্রহীতার মধ্যে গণ্য। কেননা, তাহাদিগেরও বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতির নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। তাই একজন ঋণগ্রহীতা কি করিয়া অপরকে ঋণ দিয়া 'ঋণদাতা'র উপাধি লাভ করিতে পারেন?

মিত্রাক্ষরার মতে,—"মানবগণ ত্রিবিধ ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, যথা—ঋষি-ঋণ, দেব-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ঋষি-ঋণ, যজ্ঞকর্ম্মদ্বারা দেব-ঋণ ও পুত্রোৎপাদনদ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ হয়।" পুরাণসম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবতের "দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাম্" শ্লোকে (ভাঃ ১১।৫।৪১) নবযোগেন্দ্র ঋষির অন্যতম করভাজন ঋষি নিমি মহারাজকে মনুষ্যের দেবঋণ, ঋষিঋণ, ভূতঋণ, পিতৃঋণ ও মনুষ্যঋণ—এই পঞ্চবিধ ঋণের কথা জানাইয়াছেন। জগতের সকলপ্রকার ঋণই পঞ্চবিধ ঋণের অন্তর্ভুক্ত। পঞ্চবিধ ঋণই পঞ্চবিধ যজ্ঞের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্।"

অর্থাৎ "হোমদ্বারা দেবযজ্ঞ, অধ্যাপনদ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ, তর্পণদ্বারা পিতৃযজ্ঞ, বলিদ্বারা ভূতযজ্ঞ ও অতিথিপূজাদ্বারা নৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়।" অধ্যাপনাদি প্রভৃতির দ্বারা পঞ্চবিধ ঋণ পরিশোধ হইলেও তাহাতে জগৎপিতা শ্রীকৃষ্ণের ঋণ পরিশোধ হয় না। যিনি পার্থিব কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে মুকুন্দের শরণাগত হইয়াছেন, তিনি সকলপ্রকার ঋণ হইতে চিরবিমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪০)

উপরোক্ত পয়ারের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে বৈষ্ণব ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"যিনি পার্থিব কর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বস্বরূপে শরণ্য মুকুন্দের শরণাগত হইয়াছেন, তিনি দেব, ঋষি, অন্যপ্রাণী, আত্মীয়, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট আর ঋণী নহেন। তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্য জন্মিবামাত্র ঐ সমস্ত ঋণে ঋণী হন এবং শাস্ত্রমতে বহুবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ঐ সকল ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণচরণে শরণাপন্ন হন, তাঁহার ঐ সমস্ত ঋণ উপযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেও পরিশোধিত হইয়া যায়।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেই নিখিল দেবদেবী, ভূত, ঋষি ও আত্মীয়-স্বজনগণের পূজা হইয়া থাকে, স্বতন্ত্রভাবে কাহারও পূজা করিবার প্রয়োজন হয় না। যাহারা সাংসারিক উন্নতির জন্য কৃষ্ণপূজা ত্যাগ করিয়া অন্য দেবদেবীর পৃথক্‌ভাবে পূজা করেন, তাহাদের কখনও নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। মুকুন্দসেবিগণ ভোগীর ভোগোপকরণসমূহে কখনও ধনবুদ্ধি করেন না, তাহাতে তাহাদের ঋণবুদ্ধি আছে। কৃষ্ণভক্ত প্রেমধনে ধনী বলিয়া তিনি কাহারও নিকট ঋণী নহেন, তিনি 'অঋণী'। যে কোনপ্রকার ঋণ পরিশোধের জন্য তাহাকে আর জাগতিক কর্ত্তব্যপরায়ণতারূপ কোন কার্য্যে ব্রতী হইতে বাধ্য হইতে হয় না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-বোধায়ন মহারাজ

ধাম-বৈশিষ্ট্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩২ পৃষ্ঠার পর]

[ভগবদ্ধাম-বাসের প্রকৃত অর্থ ধাম-সেবা]

চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ-মধ্যে পঞ্চাঙ্গ প্রধান ।
তার মধ্যেই ধামবাস হয় অন্যতম ॥ ১ ॥
ধাম-বাসের প্রকৃতার্থ ধামের সেবন ।
ধামে ভোগবুদ্ধিতে হয় নরকে পতন ॥ ২ ॥
কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির সন্ধিনী বৃত্তিতে ।
নিত্য প্রকটিত ধাম তাঁহার ইচ্ছাতে ॥ ৩ ॥
স্বয়ং ভগবান্ ও তদ্রূপ বৈভব ধাম ।
উভয়েই অভিন্ন তত্ত্ব—শাস্ত্রে পরমাণ ॥ ৪ ॥
ধাম অধোক্ষজ বস্তু—স্বতঃ প্রকাশ তত্ত্ব ।
ভক্তিচক্ষে ভক্তই তাহা হেরিতে সমর্থ ॥ ৫ ॥
"যথা ক্রীড়তি তদ্‌ভূমৌ"—শ্লোকে জানা যায় ।
গোলোকে ও ভৌম ব্রজে লীলা নিত্য ভায় ॥ ৬ ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৮ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০২

সর্ব্বোর্দ্ধ প্রদেশে গোলোকধাম বিরাজিত ।
পরিদৃশ্যমান্ ব্রজ এ বিশ্বে প্রকটিত ॥ ৭ ॥
ঊর্দ্ধেস্থিত ব্রজধাম ও ভৌম ব্রজধাম ।
একই বস্তু যুগপৎ নিত্য বিদ্যমান ॥ ৮ ॥
"আসামহো"—শ্লোকে উদ্ধব প্রেমভরে গায় ।
'ব্রজে গুল্মলতারূপে জন্ম যেন পায় ॥' ৯ ॥
ব্রজধামে গুল্মলতাদি সকলি চিন্ময় ।
চিন্ময় নেত্র বিনা তাহা দৃষ্ট নাহি হয় ॥ ১০ ॥
সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ ও অষ্টাঙ্গ যোগসিদ্ধগণ।
ব্রজে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত অনুক্ষণ ॥ ১১ ॥
"তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী ।"—
হেন উপদেশ কৈলা শ্রীরূপ গোস্বামী ॥ ১২ ॥
বিশুদ্ধ ভজন-বিজ্ঞ ব্রজবাসীজন ।
তাঁর মন্ত্রোপদেশে মায়া করে পলায়ন ॥ ১৩ ॥
কিবা সেবা, কিবা মায়া তবে চেনা যাবে ।
নতুবা মায়া ভক্তি-ছলে আসিয়া গ্রাসিবে ॥ ১৪ ॥
"আরাধিতং নববনং"—শ্লোকেতে লিখিত ।
গৌরবন সেবিলেই ব্রজ হয় স্ফুরিত ॥ ১৫ ॥
গৌরধামে ও ব্রজধামে অভেদ প্রতীতি ।
গৌরধাম সেবায় হয় ব্রজধাম প্রাপ্তি ॥ ১৬ ॥
"ভবন্তি কিল সদ্‌গুণা গৌরধামার্চ্চনে ।"—
হেন শ্লোক শিক্ষা পাই ধামের সেবনে ॥ ১৭ ॥
"আরাধ্যো ভগবান্"—শ্লোকে গৌর-মত সার ।
স্বয়ং কৃষ্ণ ও বৃন্দাবন আরাধ্য সবার ॥ ১৮ ॥
স্ব-সুখ পরতার লেশ যা'র হৃদে রয় ।
তা'র হৃদে সেবাবুদ্ধির উদয় না হয় ॥ ১৯ ॥
কৃষ্ণ-সেবাবুদ্ধি সহ ধাম-বাস হয় ।
সেবাবুদ্ধিহীন ব্যক্তি ধামবাসী নয় ॥ ২০ ॥
কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সুখ লাগি' যে সদা প্রয়াসী ।
অন্যত্র থাকিয়াও সে নিত্যধামবাসী ॥ ২১ ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা নর-লীলার মত ভায় ।
মর্ত্ত্যের জড়বিলাস তাহাতে কভু নাই ॥ ২২ ॥

তাঁ'র লীলাধার ধাম প্রাকৃত কভু নয় ।
দেখিতে প্রাকৃত-সম, তবু প্রাকৃত নয় ॥ ২৩ ॥
প্রেমাস্পদের ধাম—সদা চিদানন্দময় ।
"রাসোৎসবাদ্ বৃন্দারণ্যম্"—পরিচয় ॥ ২৪ ॥
অতএব ভগবদ্ধাম ভজনীয় হয় ।
ভক্তগণ কোটি কণ্ঠে গাহে ধামের জয় ॥ ২৫ ॥

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের পার্থক্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২৩ পৃষ্ঠার পর]

যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা নারায়ণ, অখিলসৃষ্ট জীব ও জগৎ যাঁহার বশীভূত, তাঁহার আনন্দকণালাভে জাগতিক জীব বা পদার্থ আনন্দপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"রসো বৈ সঃ। রস হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" তিনি আনন্দের আধার। গুড়কে মিষ্ট করিবার জন্য যেমন গুড়ান্তরের প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ যাঁহার আনন্দ রসাভাসের জন্য অন্য কোন আনন্দপূর্ণ পদার্থের প্রয়োজন করে না, তাদৃশ পরমানন্দ মূর্ত্তি সর্ব্ব জগৎ আধার। সর্ব্ব চেতন-চেতন, জগৎপ্রাণৈকবল্লভ জনার্দ্দন-বিগ্রহ পরিগ্রহে নরলীলাচ্ছলে যে-সমস্ত লৌকিক আচরণ করিয়াছেন, সে-সমস্ত তাঁহার নিজের স্বার্থ সমাধার জন্য কখনই নহে। কেবল রাসলীলা কেন, তাঁহার পক্ষে যাবতীয় কর্ম্ম, এমনকি শরীর ধারণ পর্য্যন্ত যাবতীয় লীলাই অনাবশ্যক। তথাপি তিনি যে এই সমস্ত লীলাও প্রকাশ করিয়াছেন, সে কেবল সংসারান্ধ জীবের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া মুক্তিপথের পথিক করিবার জন্য মাত্র। তিনি অনন্ত লীলার আবরণে অনন্ত জীবকে অনন্ত আসক্তির পথ হইতে প্রতিনিবৃত্তির উপায় ও প্রবৃত্তি প্রদর্শন করাইয়াছেন। কামিনী ও কাঞ্চনাদি ভোগের বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া কিরূপ বীরত্বের পরিচয় দিলে যে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত হওয়া যায়—তাহা এক কৃষ্ণচরিত্র শ্রবণে ও পাঠে উপলব্ধ ও পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। তিনি অনন্ত গোপিকার আকর্ষণী শক্তির কেন্দ্রস্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে, পুরুষ যদি কামিনীতে আসক্ত হয়, তবে তাহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া ধন, যৌবন, জীবন সকলই বিফলে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু অনাসক্তভাবে অবস্থিত থাকিলে কোটী নারীর প্রেমেও তাহাকে কণামাত্র হতচিত্ত হইতে হয় না। বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধারাণী ক্ষণকালের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রেমে আবদ্ধ মনে করিয়া স্কন্ধারোহণের প্রয়াস প্রকাশ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ অমনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অন্য গোপিকারা যখন দেখিলেন যে,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৮ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০২

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আশাকে ছেদন করিয়া একা রাধিকাকে লইয়াই আনন্দিত, তখন তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেম লাভের আর প্রত্যাশা ছিল না। তাঁহারা তখন অসূয়াপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব আচরণ স্মরণ ও তাহা উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি দোষারোপই করিয়াছিলেন। অতএব ইহার দ্বারা ভগবান্ জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে,—যদি কেহ কোন বস্তুতে বা ব্যক্তিতে আসক্ত হয়, তাহা হইলে প্রায় বিনামূল্যে তাহার স্বাধীন ভাবের বিক্রয় হইয়া যায়। সেই প্রিয় বস্তুর সম্পূর্ণ অধীন হইয়া অন্যসকল ভোগ্য বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। অতএব আসক্তি জীবের অধিকারকে সঙ্কুচিত করে এবং অনাসক্তিই অধিকারকে প্রশস্ত করে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রত্যেক লীলাতেই আসক্তি ও অনাসক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে মানবগণকে তাহার দোষ বা গুণের পরিচয় স্পষ্টতঃ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইলেই শক্তির সঞ্চয়ে যে শ্রেষ্ঠ হইতে পারা যায়, তাহারই পরিচয় বার বার দিয়াছেন।

অপ্রাকৃত রস-তাৎপর্য্য বুঝিবার বা লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে যে,—লীলারস আস্বাদননিমিত্ত রাসরাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ গোপললনার সহিত বনে বিহার করিলেন। তাঁহাদের পতি বা শাশুড়ী প্রভৃতি স্বজনগণ তাঁহাদিগকে গৃহে না দেখিতে পাইয়া অবশ্যই কৃষ্ণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা স্বপ্নেও শ্রীকৃষ্ণের উপর কোনরূপ দোষারোপ করেন নাই। ইহার গূঢ় রহস্য হইতেছে যে, যে-সকল গোপিকা শ্রীকৃষ্ণসহ রাসরাত্রিতে বিহার করিতেছিলেন, তাঁহারা তাঁহার নিত্য প্রেয়সী। গোপের বনিতারূপে যাঁহারা ব্যবহার-দশাতে প্রতীতা ছিলেন, তাঁহারা যোগমায়ার রচিতা মাত্র। যেমন, ব্রহ্মমোহনকালে প্রকৃত বৎস, বালক ও ধেনু প্রভৃতি সত্ত্বেও যোগমায়া-রচিত বৎস ও বালকসমূহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। সেইরূপ যোগমায়া-কল্পিত গোপাঙ্গনার মূর্ত্তি গোপগণের সহিত এবং তদনুরূপ মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসরঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন। যিনি সর্ব্বাধার, মায়াও যাঁহার আশ্রয়ে আশ্রিতা, তাঁহার আর আপনার বা পর এই বিপরীত সম্বন্ধ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। অতএব—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"

শুকদেব বলিলেন,—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।।"

(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

যাহারা কর্ম্মপরায়ণ তেজোহীন ব্যক্তি, তাহারা যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কুৎসা মনে মনেও কখনও কল্পনা করে, কিম্বা অজ্ঞানবশতঃ নিজেদের সামর্থ্য আছে মনে করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহারা বিনষ্ট হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। দেখ, পঞ্চানন নিজ সামর্থ্যগুণে সমুদ্রোৎপন্ন গরল পান করিয়াও জীবিত আছেন। বরং তদ্দ্বারা অন্যের উপকারই করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই গরল যদি তদপেক্ষা অসমর্থ

কোন ব্যক্তি পান করিত, তাহা হইলে অবিলম্বে কাল কবলে কবলিত হইত, সন্দেহ নাই। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি,—

"জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি।।" (ভাঃ ৭।৯।৪০)

হে অচ্যুত! স্বামীকে বহু সপত্নীর ন্যায় আমার অপরিতৃপ্ত জিহ্বা একদিকে, উপস্থ অন্যদিকে, চর্ম্ম ভিন্নদিকে, উদর অন্যদিকে, কর্ণ পৃথক্ দিকে, নাসিকা ইতর দিকে, চঞ্চল দৃষ্টি একদিকে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় অন্যদিকে আমাকে আকর্ষণ করিয়া বিনাশ করিতেছে।

"যন্মৈথুনাদি-গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ।।" (ভাঃ ৭।৯।৪৫)

হস্তদ্বয়ের কণ্ডূয়নতুল্য অত্যন্ত দুঃখদায়ক গৃহস্থগণের স্ত্রীসম্ভোগাদি তুচ্ছসুখে বহুদুঃখভাক্ কামুকগণ তৃপ্তিলাভ করে না। কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিই কণ্ডূয়নের ন্যায় কামবেগ সহ্য করিয়া থাকেন। ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে।। (ভাঃ ১১।১৭।৫৬)

যে গৃহস্থ স্ত্রৈণ, ক্ষুদ্রবুদ্ধি, বিবেকশূন্য ও পুত্র-বিত্তাদি সন্ধানরত হইয়া গৃহে আসক্ত হন, তিনি অহংমম-জ্ঞানে আবদ্ধ হইয়া থাকেন।

সুতরাং প্রাকৃতরস রসিক মূঢ়গণ ঘোর অন্ধতামিস্রে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ করে এবং তাহাদের জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়ে। প্রাকৃত রসে বা জড়রসে বিষয় ও আশ্রয় বহু। কিন্তু অপ্রাকৃত রসে বা চেতনরসে বিষয় একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। এই রসের সন্ধান শ্রীমদ্ভাগবত দিয়াছেন। ভাবুক ও রসিকের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতে হইবে।

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।" (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

অতএব বিবেকী পুরুষ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুগণের সঙ্গ করিবেন। যেহেতু সাধুগণই উপদেশবচনদ্বারা তাহার মানসিকী বিরুদ্ধা আসক্তির বিনাশ করিয়া থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীরূপানুগ-ভজন-প্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ প্রদানকল্পে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিতেছি।—

প্রাকৃত চেষ্টাতে ভাই কভু রস হয় না।
জড়ীয় প্রাকৃত রস শুদ্ধভক্ত গায় না।।
'অহং মম' ভাব সত্ত্বে নাম কভু হয় না।
ভোগবুদ্ধি না ছাড়িলে অপ্রাকৃত হয় না।।
প্রাকৃত জড়ের ভোগে কৃষ্ণসেবা হয় না।
জড়বস্তু কোনকালে অপ্রাকৃত হয় না।।
জড়ীয় রসের কথা শিষ্যে গুরু বলে না।
জড় রসগানে কভু শ্রেয়ঃ কেহ লভে না।।
জাত ভাব না হইলে রসিক ত' হয় না।
জড়ভাব না ছাড়িলে রসিক ত' হয় না।।
কৃষ্ণ-লীলা জড়তুল্য রূপানুগ বলে না।
কৃষ্ণেতর ভোগ্যবস্তু কৃষ্ণ কভু হয় না।।
জড়কে অনর্থ ছাড়া আর কিছু মানে না।
জড়াসক্তি বশে রসে কৃষ্ণজ্ঞান করে না।।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ কভু জড় বলে না।
অনর্থ থাকার কালে রসগান করে না।।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি ফল ধরি' টানে না।
রূপানুগ-ক্রমপথ বিলোপ ত' করে না।।
অনর্থকে 'অর্থ' বলি' কুপথে ত' লয় না।
প্রাকৃত সহজ-মত 'অপ্রাকৃত' বলে না।।
জড়ভোগ ব্যবধানে লীলোদয় হয় না।
অপরাধ ব্যবধানে রস লাভ হয় না।।
সেবায় উন্মুখ হ'লে জড়কথা হয় না।
নতুবা চিন্ময় কথা কভু শ্রুত হয় না।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্ত্তনাংশ কীর্ত্তন করিয়া পরিসমাপ্তি করিতেছি,—

"কবে হবে বল সেদিন আমার।

* * * *

কিনিব লুটিব, হরিনাম-রস,
নামরসে মাতি' হইব বিবশ।
রসের রসিক, চরণ পরশ,
করিয়া মজিব রসে অনিবার।।"

—**শ্রীহরিদাস রায়**, ভক্তিশাস্ত্রী

আচার্য্যের অবদান-বৈশিষ্ট্য

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।।

এই শ্লোকটি শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর আপ্তজন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তাঁ'র 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। সেই গুরুদেবকে আমি নমস্কার ক'রছি, যাঁ'র সুবিস্তৃতা কৃপায় আমি এতগুলি জিনিস পেয়েছি ; এতগুলি জিনিস তিনি কৃপা ক'রে দান ক'রেছেন। কি দান ক'রেছেন? সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণনাম দান ক'রেছেন। পরমেশ্বরের অনেক নাম আছে। কতকগুলি নামের প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতা বা সম্বন্ধ র'য়েছে। 'পাতা', 'বিধাতা', 'সৃষ্টিকর্ত্তা' প্রভৃতি নামের সহিত প্রকৃতিজাত জগতের সংশ্রব আছে। এইসকল গৌণনাম। 'পরমাত্মা', 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি নামের মধ্যেও তাঁ'র আংশিক ও অসম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন জাতি তাঁ'দের ধারণানুযায়ী কতপ্রকার নাম রচনা ক'রেছেন। ইহুদীরা 'জিহোবা', গ্রীকেরা 'জিয়ুস', পার্শীরা 'অহুর মস্‌দ', রোমদেশের লোকেরা 'জুপিটর', মুসলমানেরা 'আল্লা' প্রভৃতি নাম দিয়েছেন ; কিন্তু সেই সকল নাম পরমেশ্বরের মানব-অভিজ্ঞানের এক একটী ভাব ও ধারণামূলক ; তাহা পরমেশ্বরের সর্ব্বাঙ্গীন নিরঙ্কুশ স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম পরিব্যঞ্জক শব্দাবতার নহে ; যেমন 'জিহোবা' ব'লতে সত্তা মাত্র লক্ষিত হয়, 'জিয়ুস'-শব্দে অমরত্ব, 'অহুর মস্‌দ'-শব্দে অপাপবিদ্ধত্ব, 'জুপিটর'-শব্দে লোকপিতৃত্ব, 'আল্লা'-শব্দে পূজনীয়ত্ব বা ব্যাপকত্ব লক্ষ্য করে।

যে নামে ভগবত্তার নিখিল অপ্রাকৃত রস ও সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা প্রকাশিত হ'চ্ছে, তাহাই শ্রেষ্ঠ নামাবতার। 'নারায়ণ' বা 'রাম'-নামে অখিল পরিপূর্ণ রসের পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু গোপীজনবল্লভ 'কৃষ্ণ' নামের মধ্যে সমস্ত অপ্রাকৃত রসের চিৎসমন্বয় ও ভগবত্তার নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রতা পরিপূর্ণ মায়ায় র'য়েছে। কৃষ্ণকে 'গোপবধূবিট্'—'চেল চৌর'—'ননীচোর' প্রভৃতি বলা হ'য়েছে। নৈতিক জগতে এটা কদর্য্যভাবময় মনে হ'লেও উক্ত নামে ভগবত্তার স্বরাট্ লীলা পুরুষোত্তমত্বই প্রকাশিত হ'য়েছে। কৃষ্ণ যদি প্রাকৃত নৈতিকতার কাঠগড়ার আসামী হন, তা' হ'লে ত' তিনি আমারই মত জীব হ'য়ে গেলেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যথেচ্ছাচারিতা শক্তি একমাত্র তাঁ'রই একচেটিয়া। তিনি আমার ভাল-মন্দ বিচার ক'রবার বুদ্ধি বা বিবেকের অধীন নন। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি পাঁচটী মুখ্য রস এবং বীর, করুণ প্রভৃতি সাতটী গৌণরস,—এই দ্বাদশটী রসের নায়ক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। 'রসো বৈ সঃ'' শ্রুতিমন্ত্রের প্রতিপাদ্য পুরুষই

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৮ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০২

রসিকশেখর কৃষ্ণ। শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলনাম অখিলরসামৃতসিন্ধু ও পরিপূর্ণ চিদ্বিলাসবিগ্রহ বলিয়া শ্রেষ্ঠ নাম। শ্রীকৃষ্ণনামের অন্তর্ভুক্তই 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা', 'অন্তর্যামী', শ্রীরাম, নৃসিংহাদি যাবতীয় নাম ; যেমন কৈমুতিক ন্যায় অনুসারে এক পয়সা, এক আনা, এক টাকা, শতমুদ্রা, সহস্রমুদ্রা প্রভৃতি আছে।

আজকাল অনেকে ব'লছেন,—আমরা ভগবানের নাম তৈয়ারী ক'রে দিব। এটা আমাদের বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। তিনি নিত্য নামী, নিত্য রূপী, নিত্য গুণী, নিত্য পরিকরবৈশিষ্ট্যযুক্ত ও নিত্যলীলাময়। তাঁ'র নিত্য নাম ও রূপাদিকে জীব সৃষ্টি ক'রতে পারে না। শ্রীগুরুদেব শুশ্রূষু শিষ্যকে দান করেন সেই বাস্তববাণী—সেই শ্রেষ্ঠ নাম। সেইজন্য ব'ললেন—এই শ্রেষ্ঠ নাম যিনি দান ক'রেছেন, সেই গুরুদেবকে নমস্কার করি।

তারপর মন্ত্রের কথা ব'লেছেন। মনোধর্ম্ম হ'তে যাহা আমাদিগকে ত্রাণ করে, তাহাই মন্ত্র। যে-সকল ধর্ম্ম আমরা মনের দ্বারা তৈয়ারী করি, সেটাই মনোধর্ম্ম। অনেকে বলেন, একমাত্র নামে যদি সর্ব্বসিদ্ধি হয়, তবে আর মন্ত্রগ্রহণের আবশ্যকতা কি? যাঁ'রা মনোধর্ম্ম হ'তে স্বভাবতঃ মুক্ত, তাঁ'দের দিক্ দিয়ে এই বিচারটি হ'তে পারে। কিন্তু মনোধর্ম্মী বদ্ধজীবের পক্ষে মন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহা রূপানুগবর শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ক্রমসন্দর্ভে বিশেষভাবে আলোচনা ক'রেছেন। এজন্য ব'লেছেন,—মনোধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ পা'বার জন্য যাঁ'র নিকট হ'তে মন্ত্র পেয়েছি, সেই গুরুদেবকে আমি নমস্কার করি।

শ্রীগুরুদেবের কাছ হ'তে আর কি পেয়েছি?—শচীপুত্র মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে। অনেকে বলেন,—ভগবান্‌কে ত' আমিই ডাক্‌তে পারি, আচার্য্য বা গুরুর আর প্রয়োজন কি? এটা নির্ব্বিশেষবাদ। আমার কি যোগ্যতা আছে—ভগবানের সেবা ক'রব? গুরুকৃষ্ণ বা সেবক-ভগবান্ সেব্যকৃষ্ণের যেরূপ সেবা ক'রতে পারেন, সেরূপ আর কেহই পারেন না। এজন্য আশ্রয়-বিগ্রহের অনুগত হ'য়ে বিষয়-বিগ্রহের সেবা ক'রতে হয়। আবার গুরুদেবের অনুগত যাঁ'রা, তাঁ'দের দাস্যে থেকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ক'রতে হয়। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—

সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যম্।
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্।।

অর্থাৎ হে আশ্রয়বিগ্রহ বৃষভানুনন্দিনি, আমি তোমার সখী হ'তে চাই না, তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে চাই না। আমি শ্রীরূপমঞ্জরীর পাদপদ্মের ধূলি হ'তে চাই, তাঁ'র আনুগত্যে থেকে সেবা ক'রতে চাই। শ্রীবার্ষভানবীদেবীর নিজজন শ্রীরূপপ্রভু 'সখী' অভিমান ক'রতে পা'রতেন, কিন্তু তিনি অভিমান ক'রলেন—আমি 'রূপমঞ্জরী'। "তদ্-ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ"। 'আমি বৈষ্ণব'

যে ব'লবে, সে ত' অবৈষ্ণব। স্বয়ং মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন—"গোপীভর্ত্তুঃ পদ-কমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।" কাজেই আমরা গুরুসেবকের ভৃত্য হ'ব—গুরুনিজজন-গণের আনুগত্যে বা দাসত্বে তাঁ'র সেবা ক'রব।

শ্রীগুরুদেব আমায় আর কি দান ক'রেছেন?—ভক্তিসিদ্ধান্তের সম্রাট্ শ্রীস্বরূপ প্রভুকে। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ। তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ ও ভক্তিসিদ্ধান্তপরীক্ষক। তাঁ'কে ডিঙ্গিয়ে কেহ মহাপ্রভুর নিকটে যেতে পারতেন না। ভগবদ্ভক্তির কোন কথা মহাপ্রভুকে শুনাতে হ'লে আগে স্বরূপ পরীক্ষা ক'রে দেখ্তেন, তা'তে কোন সিদ্ধান্তবিরোধ, তত্ত্ববিরোধ বা রসাভাসদোষ আছে কি না। কারণ, মহাপ্রভু ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধ, তত্ত্ববিরোধ বা রসাভাসদোষের কোন কথা শুন্লে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হ'তেন।

আর শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীরূপ প্রভুকে পে'য়েছি—যিনি ভক্তিবিজ্ঞানের কথা ব'লেছেন। ঠাকুরঘরে গিয়ে দুটো ধূপকাঠি জ্বালান বা একটুকু চোখ বুঝে থাকা বা নামাবলী গায় দেওয়া, যে কোন একটী ঠাকুর দেবতা বা আমাদের কল্পিত সাধুর ছবি পূজা করাকেই আমরা ভক্তি মনে করি। কিন্তু আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি প্রকাশিত না হ'লে সেটাকে ভক্তি বলা যায় না। ভক্তি আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। যেখানে সেখানে 'ভক্তি'-শব্দের প্রয়োগ হ'তে পারে না। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে আত্মার যে স্বাভাবিকী অনুরাগ, তা'রই নাম 'ভক্তি'। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাই ব'লেছেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো **ভক্তিরধোক্ষজে**।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি।।

সংসারে শান্তি পা'বার জন্য যে ভগবান্‌কে ডাকা, সেটা ভগবান্‌কে দিয়ে খাজাঞ্চি-গিরি করিয়ে নেওয়া, সেটা ভোগ। আর কৃষ্ণের আনন্দবিধানের জন্য যে চেষ্টা, তা'রই নাম ভক্তি বা প্রেম।—

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এই ভক্তিবিজ্ঞানের কথা যিনি জানিয়েছেন, তিনি শ্রীরূপপ্রভু, যাঁ'র কৃপায় তাঁ'কে পেয়েছি, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমি নমস্কার করি। শ্রীরূপপ্রভু সম্বন্ধের কথা ব'লেছেন; সর্ব্বশক্তিমান্ স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ। তিনিই একমাত্র ভোক্তা, আমরা তাঁ'র শক্তিজাতীয় ভোগ্য, আমরা কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণ আমাদের নিত্য প্রভু, নিরন্তর এই অপ্রাকৃত অনুভবই সম্বন্ধজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান।

"উরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্", মথুরা শুদ্ধসত্ত্ব ভূমিকা—যেখানে বাসুদেব অবতীর্ণ হন। অনেকে টিকিট কিনে মথুরা দর্শন ক'রতে যান, কিন্তু দেখে আসেন—জল, কাদা, বাড়ী, ঘর ইত্যাদি। মথুরা যাঁ'রা দর্শন ক'রেছেন, তাঁ'দের কৃপা না হ'লে,

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের ধারায় প্রবিষ্ট না হ'লে মথুরা দর্শন হয় না। অনেকে হাওয়া খাওয়ার জন্য পুরী গিয়ে থাকেন, কিন্তু মহাপ্রভু পুরী গিয়ে 'কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন"—এই ভাবে বিভাবিত হ'য়েছিলেন। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মেও সেই বিপ্রলম্ভভাবের পরিপোষণকার্য্য দর্শন ক'রবার সৌভাগ্য হ'য়েছে।

আর গুরুদেবের কৃপায় গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে পেয়েছি। যেখানে কৃষ্ণের গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বর্দ্ধন বা নবনবায়মান তর্পণ হয়, সেই স্থানই গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধন আশ্রয়বিগ্রহ সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহের ইন্দ্রিয়তর্পণের স্থান।

শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—'আর শ্রীগুরুদেবের নিকট হ'তে আমি শ্রীরাধাকুণ্ডের কথা জান্‌তে পে'রেছি' ; এটা সবচেয়ে বড় জিনিষ। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী এখানে নিজগণের সহিত কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ নিজস্ব ও তাঁহারা একচেটিয়া কান্তবিচারে সেবা-পরাকাষ্ঠা সুখ অনুভব করেন। শ্রীমতী রাধারাণীর সেবায় কৃষ্ণ যেরূপ প্রীত হন, আর কা'রও সেবা তাঁ'কে তদপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট ক'রতে পারে না। যাঁ'র কৃপায় আমি এই রাধাকুণ্ড লাভ ক'রেছি, সেই গুরুদেবকে নমস্কার করি।

পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের

৮১তম শুভাবির্ভাব-তিথিতে

ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞানে অতি, সদা যাঁ'র দৃঢ় মতি,
মনে-প্রাণে শ্রীকেশবে করেন যিনি প্রীত।
শ্রীকেশবের মনোঽভীষ্ট, প্রতিক্ষণে করেন পুষ্ট,
বিশ্রম্ভ গুরুসেবায় মগ্ন অবিরত।।
এ হেন গোস্বামী যিনি, শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন তিনি,
মুঞি অধম বন্দোঁ তাঁ'র অভয় চরণ।
বাল্যকালে গৃহ ছাড়ি', আকুমার ব্রহ্মচারী,
হরি-গুরু-বৈষ্ণব করেন সেবন।।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, যাঁ'রে কৃপা করেন অতি,
"শ্রীসজ্জনসেবক" বলে জানেন ভক্তগণ।
সরল আর সুলভ স্বভাব, হরি-গুরু-সেবাই যাঁ'র মনোভাব,
কি দিয়ে করিব তাঁ'র চরণ পূজন।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৮ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০২

ঘোর বদ্ধজীব আমি, মোরে কৃপা কর্‌লে স্বামী,
ভাবি মুঞি অহৈতুকী করুণার কথা।
মো অধমে উদ্ধারিতে, গণ্য কর্‌লে সন্ন্যাসীতে,
ঘুচাইলে ত্রিতাপ-জ্বালা ব্যথা।।
আজিকার এই শুভদিনে, প্রপন্ন হইনু তব চরণে,
অগণিত অপরাধ ক্ষমহে ঠাকুর।
ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি, তব পদে দিনু অঞ্জলি,
মোরে কৃপা করহে প্রচুর।।

শ্রীগুরু-কিঙ্করাভিলাষী—
—শ্রীভক্তিবেদান্ত পরমহংস

প্রণতি-কুসুমাঞ্জলি

জয় জয় গুরুদেব—'শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন'।
প্রণমি শ্রীপদে তব জগমন-বিমোহন।।
দীন অগতির গতি তুমি অতি কৃপাময়।
'হরিনাম-দীক্ষা' বিতরিয়া দানিছ অভয়।।
দয়ার সাগর তুমি গুণেতে অতুলনীয়।
শান্ত-সৌম্য-ধ্যান গম্ভীর মূর্ত্তি কেশবপ্রিয়।।
বিদ্যা বাচস্পতি হ'য়ে রহিলে নিরভিমান।
'কৃষ্ণৈকশরণ' জীবনে করিলে সুস্থাপন।।
আমি অতিদীন মূঢ়মতি অতি অভাজন।
না জানি সেবা ভকতি স্তুতি না জানি পূজন।।
কি দিয়ে পূজিব নাথ চরণপদ্ম তোমার।
শূন্য হৃদয় মোর অশেষ দোষের আকর।।
দাসাধম কাঁদি কয় তুয়া কৃপাই সম্বল।
জন্মে জন্মে মাগি তব শ্রীচরণধূলি তল।।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবাভিলাষী—
—শ্রীগৌরগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৯ পৃষ্ঠার পর]

সত্যই এ জগতে দেখতে পাওয়া যায় ভগবান্ ভক্তবৎসল। ভগবান্ ভক্তবৎসল কথাটা আছে। কোন জায়গায় কি লেখা আছে, ভগবান্ অভক্তবৎসল? কোথাও অভক্তবৎসল বলে শব্দ নেই, ভক্তবৎসল বলে লেখা আছে। ভগবান্‌কে পাণ্ডবসখা বলে বলছেন। কোন জায়গায় কি বলা হয়েছে কৌরবসখা? কেন? পাণ্ডবসখা বলে বলা হচ্ছে, ভক্তবৎসল বলে বলা হচ্ছে, ভক্তসংরক্ষক বলে বলা হচ্ছে, আশ্রিতজনপালক বলে বলা হচ্ছে ভগবান্‌কে। ভগবানের শ্রীচরণে যাঁরা শরণ গ্রহণ করছেন, তাঁদের সব দায়দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছেন তিনি। এ দায়িত্ব সব আমার। আমার ভক্ত খেতে পারছে না, পরতে পারছে না, দায়িত্ব ভগবান্ নিজেই নিয়ে নিলেন। ভক্তের কিছু নেই, ভগবান্ দিয়ে দিলেন। আবার ভক্ত প্রেমবিভাবিত অবস্থায় আছেন সবসময়, তাঁর নাম চিন্তা করছেন, সংরক্ষণ করবে কে তাকে যে সম্পত্তি দেওয়া হয়েছে? ভগবান্ আবার ব্যবস্থা নিচ্ছেন, সেগুলো সংরক্ষণ করছেন। সেইকথাই ত' ভগবান্ বলেছেন গীতায় অর্জ্জুনকে,—হে অর্জ্জুন! আমার ভক্ত না খেতে পেয়ে মরবে না কোনদিন, তুমি বল গিয়ে। অর্জ্জুনকে এ কথা বলাতে অর্জ্জুন বলছেন,—তোমার ভক্ত না খেতে পেয়ে মরবে না, এ কথা তুমি গিয়ে বল, আমি বলব কেন?

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।

বিবদমান সভায় গিয়ে তুমি ঢক্কানিনাদ করে জানাও, যে আমার ভক্তের বিনাশ নেই, আমার ভক্ত না খেতে পেয়ে মরে না, মরবে না। অর্জ্জুন বলছেন, তুমি প্রতিজ্ঞা করে বল না কেন? আমি প্রতিজ্ঞা করলে অনেক সময় আমার প্রতিজ্ঞা থাকে না, অনেক সময় আমার প্রতিজ্ঞা উল্টে দেয় ভক্ত, সেজন্য তোমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করাতে চাচ্ছি। কেন? তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আমার চেষ্টা থাকবে। সুতরাং ওটা ঠিক থাকবে। এইজন্য তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে বলছি, তুমি প্রতিজ্ঞা কর।

সত্যই তাই। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে অস্ত্রধারণ করবেন না কৃষ্ণ, প্রতিজ্ঞা করলেন। আমি রথের সারথিগিরি করব, আমি অস্ত্রধারণ করব না। কিন্তু পিতামহ ভীষ্মদেব যখন তাঁর প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বাণে জর্জ্জরিত করতে লাগলেন, তখন তা দেখে আর থাকতে পারেন নাই ভগবান্। রথ থেকে লাফিয়ে পড়েছেন, কোথায় তাঁর বস্ত্র, কোথায় তাঁর সাজসজ্জা! অস্ত্র ত' তিনি ধারণ করবেন না ; কিন্তু ততক্ষণে রথের চাকা খুলে ফেলেছেন। সেই রথের চাকা হাতে নিয়ে ছুটে যাচ্ছেন তিনি ভীষ্মদেবের প্রতি। সেই ভগবানের নাম চক্রধারী ভগবান্। ভাগবতে বর্ণনা আছে,—

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ।।

রথাঙ্গপাণি কখন হয়েছেন চক্রপাণি ভগবান্? তাঁর হাতে ত' সুদর্শন চক্র আছে।

রথের চাকা যখন তিনি হাতে তুলেছেন, তখন তাঁর নাম হয়েছে রথাঙ্গপাণি। ভগবান্ নিজের প্রতিজ্ঞা অনেক সময় ভঙ্গ করে ফেলেন, উপায় থাকে না ভক্তের বাক্য রক্ষা করতে গিয়ে। সেইজন্য ভীষ্মদেবের বাক্য রক্ষা করতে গিয়ে ভগবান্ নিজের বাক্য ছেড়ে দিলেন। ভক্তবাৎসল্য। সেইজন্য ভগবান্ বলছেন,—বার বার ত' এইরকম ঘটনা ঘটে, তাই অর্জ্জুন তোমাকে দিয়ে এই প্রতিজ্ঞাটা করতে চাচ্ছি। তাহলে প্রতিজ্ঞাটা ঠিক থাকবে। প্রেমবৎসল ভগবান্, ভক্তবৎসল ভগবানের মহিমা এইভাবে কীর্ত্তিত হয়েছে। তিনি ভক্তের জন্য নিজের প্রতিজ্ঞাকেও ছোট করে ফেলছেন। সেই কথাই পিতামহ ভীষ্মদেব স্তব করে বলছেন,—

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ।।

সিংহ যেমন তার শিকারের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরকম সিংহবিক্রমে ভগবান্ কৃষ্ণ রথের চাকা খুলে নিয়ে ভীষ্মদেবের দিকে ছুটে গেলেন, আর ভীষ্মদেব হাঁটু গেড়ে স্তব আরম্ভ করে দিয়েছেন। ভক্তবাক্য সত্যকারী ভগবান্। নিজের প্রতিজ্ঞাকে ছোট করে ফেলছেন তখন। এইরকম হলেন ভক্তবৎসল।

সেই যে জগদ্গুরু শিব-শিবানী, ব্রহ্মা-ব্রহ্মাণী এঁদের যে অধিকার আছে জগতে, এঁদের শিক্ষাটা এইভাবে নিতে হবে। তাঁরা কি শিখাচ্ছেন? আমরা মালিক নই, মালিক সেই পরাৎপরতত্ত্ব ভগবান্। আমরা তাঁর দাসানুদাস, ভৃত্য, ভৃত্যাধম—এই শিক্ষা তাঁরা সর্ব্বত্র দিয়ে গেছেন। যেমন ভগবান্ বলছেন,—প্রজাপতি রুদ্রকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাঁরা আমার প্রতি অনেক সময় উল্টোপাল্টা করে ফেলছে। তাঁদের মুখের উক্তিও ত' যথেষ্ট রয়েছে। ব্রহ্মা বলছেন,—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষ-রূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্।।

সেই ভগবানের আজ্ঞাবাহী হয়ে আমি গৌণ সৃষ্টি চালিয়ে যাচ্ছি, আর শিব তাঁরই আজ্ঞায় গৌণ প্রলয় ঘটিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং উভয়ের কথা মিলছে। ভগবান্ যেমন বলছেন, এঁরাও তাই বলছেন,—আমরা ভগবানের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য হয়ে সেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। যাঁর পদধৌত বারি গঙ্গারূপে জগৎ পবিত্র করছে, সেই ভগবান্ ছাড়া আর পরাৎপর তত্ত্ব কে আছেন?

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎ-পদার্থঃ।।

যে ভগবানের পদধৌত বারি গঙ্গারূপে জগতে প্রবাহিত হয়েছেন, শিবঠাকুর সেই গঙ্গাকে জটায় ধারণ করেছেন এবং গঙ্গা ত্রিপথগামিনী হয়ে এই জগতে প্রকটিত হয়েছেন। গঙ্গারূপে, ভাগীরথীরূপে, পাতালে ভোগবতী গঙ্গারূপে এই জগতে প্রবাহিত হয়েছেন। 'কো নাম লোকে ভগবৎ-পদার্থঃ'—সেই ভগবান্ মুকুন্দ ব্যতীত এ জগতে

শ্রেষ্ঠ আরাধ্য তত্ত্ব কে আছেন? ব্রহ্মা বলছেন নিজে। এ সব তত্ত্বদর্শনগুলো কি আলোচ্য তত্ত্ব নয় আমাদের? এগুলো বুঝতে হবে। সুতরাং এখানে শিব-শিবানী, ব্রহ্মা-ব্রহ্মাণী জগদ্‌গুরু, তাঁরা জগতে ঐ নাম, শিক্ষা প্রচার করছেন।

শিব-শিবানী উভয়েই নাম গ্রহণ করছেন। 'পঞ্চমুখে রামনাম গান ত্রিপুরারি।' সবসময় সেই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র গান করছেন, জগজ্জীবকে সেই নাম গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। সুতরাং তাঁরা জগদ্‌গুরু নন ত' কে জগদ্‌গুরু? এইভাবে তত্ত্বদর্শনটা শাস্ত্রে ব্যাখা করছেন। ঠিক এইভাবে শিব-শিবানীকে নিতে হবে আমাদের। তবে আমাদের কল্যাণ। এইকথাই বলছেন শাস্ত্রে,—

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা।।

এই ভাগবতের মধ্যে রয়েছে শ্লোক। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভু। দেবদেব—সমস্ত দেবতার মালিক, পরদেবতা ভগবান্ কৃষ্ণ। 'নিম্নগানাং যথা গঙ্গা'—গঙ্গা হলেন সরিৎশ্রেষ্ঠা ; 'পুরাণানামিদং তথা'—এই ভাগবত হলেন তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ অমলপুরাণ, অমল শব্দপ্রমাণ। এই তত্ত্বদর্শন ব্যক্ত করেছেন শিব-শিবানী জগতে। সুতরাং তত্ত্বদর্শন যা তাকে ঠিক সেইভাবে চিনতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে—এইটাই হল শাস্ত্রের শিক্ষা।

এতক্ষণ আপনারা এখানে বসে আছেন, সময় নষ্ট হয় নাই, সময়টা সদ্ব্যবহার হয়েছে। তাই বলছেন শেষকালে শুকদেব গোস্বামী,—আপনাদের কি মনে হচ্ছে সময়টা নষ্ট হয়েছে। এতক্ষণ এখানে যা আলোচনা হয়েছে সব Fixed depositএর ঘর, খরচের ঘর নয়। সেইটা এখানে আলোচনা করছেন শুকদেব গোস্বামী।—

য এবমব্যাকৃতশক্ত্যুদন্বতঃ পরস্য সাক্ষাৎ পরমাত্মনো হরেঃ।
গিরিত্রমোক্ষং কথয়েচ্ছৃণোতি বা বিমুচ্যতে সংসৃতিভিস্তথারিভিঃ।।

যিনি প্রপঞ্চাতীতস্বরূপ নিখিল শক্তিসমূহের আধারস্বরূপ ভগবান্, পুরুষোত্তম শ্রীহরির অনুষ্ঠিত এই শিবমোচনরূপ চরিত যিনি শ্রবণ করবেন, যিনি অন্যের নিকট কীর্ত্তন করবেন, জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারপ্রবাহ থেকে তিনি মুক্তিলাভ করবেন। শুধু কি তাই? শত্রুহস্ত থেকে পরিত্রাণ লাভ করবেন, ভগবানে ভক্তিলাভ করবেন। আর কি চাই বলুন? এই সব কয়টী জিনিষ হবে। সেই পরমপ্রেমময় ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা আলোচনা করলে, অনুশীলন করলে, অভ্যাস করলে ভগবানে ভক্তি লাভ হয়। সংসারদশা ত' ঘুচে যায়ই, আর বিশেষ লাভ কি হয়? ভগবানে ভক্তিলাভ হয়। সেইটা ত' সবথেকে বড় কথা আমাদের জন্য। সেইকথাই ত' শিখিয়েছেন। সাধন-ভজন অন্য কিছু নয়, এই নামের অনুশীলন। বিশেষতঃ এই কলিযুগে নামভজন ছাড়া অন্য কোন সাধনাঙ্গ নাই। সেইজন্য বলছেন,—'নামসঙ্কীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়।'

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৮ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০২

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্।।
ভগবানের নাম কীর্ত্তনই হল শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।
কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।।
এ ঘোর সংসারে, পড়িয়া মানব, না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি', হরি ভজে যদি, তবে অন্ত হয় ক্লেশ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রুদ্রমোক্ষণং নাম অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কেশবাভিন্ন-মূর্ত্তয়ে।
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-বামনদেবেতি-রূপিণে।।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রজ্ঞানৌ বসতো যদ্ধৃদি মুদা।
তদ্বাণী-বিনোদপর-রূপভক্তিদায় নমঃ।।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ" (ভাঃ ১১।১৭।২৭)—শ্রীকেশব বলিয়াছেন,—'দেখ উদ্ধব! যিনি আমাকে সর্ব্বজীবের নিকট যথাযথ প্রকাশ করেন, তিনি আমারই স্বরূপ। কারণ, আমি স্ব-প্রকাশ বস্তু—আমি-ভিন্ন আমার প্রকাশক অন্য কেহ হইতে পারে না। সুতরাং যিনি আমাকে, আমার সেবাকে সমস্ত জগতের নিকট প্রকাশ করিতেছেন, দেখিতেছ—তিনি আমারই অভিন্ন-স্বরূপ। তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলে আমারই অবজ্ঞা করা হইয়া থাকে জানিবে।'—এই বলিয়া শ্রীকেশব স্বয়ং যাঁহাকে নিজাভিন্ন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, আবার একই সাথে যিনি পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের সর্ব্বপ্রথম মন্ত্রানুগ্রহ-প্রাপ্ত সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তান, আশৈশব কি অপত্য-স্নেহ, কি সর্ব্ববিধ শাস্ত্রজ্ঞান, কি সাক্ষাৎ উত্তমা ভক্তি সর্ব্বতোভাবে তদ্দ্বারা লালিত-পালিত এবং তাঁহার অত্যন্ত মর্ম্মজ্ঞ হইয়া "কেশব-ধৃত বামন-রূপঃ" বর্ণনার সার্থকতা সম্পাদনদ্বারা যথার্থই 'কেশবাভিন্ন'-মূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৮ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০২

যাঁহার হৃদয়ে সমস্ত সম্বন্ধ-অভিধেয়াত্মক 'ভক্তিসিদ্ধান্ত' ও প্রয়োজনাত্মক 'প্রজ্ঞান'-রূপ প্রেম পূর্ণানন্দে বিশ্রাম করেন, আবার অপরদিকে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এবং তদন্তরঙ্গ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ চৈত্ত্যগুরু-অভিন্ন মহান্তগুরুরূপে পরমানন্দে নিবাস করেন—যিনি সারস্বত-বাণী ও ভক্তিবিনোদ-ধারাপর শ্রীরূপভক্তি সকলকে প্রদান করেন অর্থাৎ তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যিনি কখনও রূপানুগত্বের পরিচয় প্রকাশ করেন না, সেই পরমারাধ্যতম গুরুপাদপদ্ম, বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি ও আচার্য্যদেব জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণকমলে অনন্তকোটী সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম। তাঁহারই ৮১তম শুভাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সমিতির সেবকগণ এই বৎসর শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে গত ২২শে পৌষ, ১৪০৮ (ইং ৭।১।২০০২), সোমবার পৌষী কৃষ্ণা-নবমী-তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজের আনুগত্যে বিপুল সমারোহে পালন করেন।

একদিকে দেশে যেস্থলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ধর্ম্মের নামে সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব্ব চলিতেছে এবং তজ্জন্য দেশের সকল সীমান্ত-প্রদেশ হইতে সৈন্যগণ ও যুযুৎসুগণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া দিল্লী ও কাশ্মীর-অভিমুখে ধাবমান, অপরদিকে একইসাথে দেশের চতুর্দ্দিক হইতে কৃষ্ণপ্রেমাকাঙ্ক্ষী আবাল-বৃদ্ধবনিতা দলে দলে শ্রীব্যাসপূজা-পর্ব্ব পালনোদেশ্যে দেশের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তের অন্যতম প্রধান নগর শিলিগুড়ি-অভিমুখে চলিতেছেন। এই হইতেছে India–guided by God. ভারতবর্ষের পারমার্থিকতা এইরূপ চিরশাশ্বত, অবিনশ্বর, বন্ধনচ্ছেদী। আর এইরূপ ভগবদিচ্ছা যে, ঠিক ঐ সময়েই কলকাতা হইতে উত্তরপূর্ব্ব-সীমান্তাভিমুখী দুইটী ট্রেনের নির্দ্দিষ্ট পথ (Route) বাতিল হইয়া কেবল নিউজলপাইগুড়ি পর্য্যন্তই ব্যবস্থাপিত হইয়া এতদঞ্চলীয় ব্যাসপূজা র্থিগণের তথায় গমনাগমনের বিশেষ সুযোগ আসিয়া সমুপস্থিত করিল। ইহাতে ভগবৎ-করুণার ইঙ্গিত পাইয়া সকলে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। দেশে চতুর্দ্দিকে সন্ত্রাসময় থমথমে পরিবেশের মধ্যেও সকলেই নির্ব্বিঘ্নে শিলিগুড়িতে পৌঁছাইলেন। শ্রীগৌরকৃষ্ণাশ্রিত সমাজ যূথে-যূথে সকলে একত্রিত হওয়ায় যে আনন্দ-হিল্লোল উত্থিত হইল, তাহাতে সকলে আত্মহারা হইয়া গেলেন। শ্রীসমিতির অধিকাংশ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের সমাবেশে সমগ্র মঠপ্রাঙ্গন গমগম করিতে লাগিল।

২০শে পৌষ, ১৪০৮ (ইং ৫।১।২০০২), পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম মিলনপল্লীস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ হইতে উচ্চসঙ্কীর্ত্তন-মুখে শক্তিগড়স্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে এবং উক্ত মঠে নবনির্ম্মিত ভজন-কুটীরে প্রবেশ করিলে পর শ্রীব্যাসপূজার আনন্দ-সমীরণ চতুর্দ্দিকে বহিতে লাগিল। শ্রীগুরুপাদপদ্ম—অভিন্ন শ্রীব্যাসদেব। শ্রীকৃষ্ণই মূল-ব্যাসদেব। "মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান। জীবেরে

কৃপায় কৈল বেদ-পুরাণ।।' শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসরূপেই নিজেকে বদ্ধ জীবনিচয়ের নিকট প্রকাশ করেন। জীবের বিভিন্ন অধিকারানুসারে শ্রীব্যাস বিভিন্ন সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেও তিনি প্রকৃত বৈদিক সিদ্ধান্ত বেদান্তসূত্রেই অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে তুলনামূলক আলোচনাদ্বারা গ্রথিত করিয়াছেন। কিন্তু "তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে। অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে।। যেই সূত্রকর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান। তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান।। যেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয়-বচন। ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন।। অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত। ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে 'এক' মত।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২৫ পঃ)। সুতরাং শ্রীব্যাস-বিচার বলিতে শ্রীমদ্ভাগবত-বিচারই বুঝিতে হইবে। সেই শ্রীমদ্ভাগবত-বিচারই যিনি স্বয়ং আচরণদ্বারা জগজ্জীবের নিকট প্রচার করেন, তিনিই 'আচার্য্য'—তিনিই অভিন্ন শ্রীব্যাস। সুতরাং তাঁহার পূজাই শ্রীব্যাসপূজা এবং ব্যাসপূজাই শ্রীগুরু-পূজা। সেই ব্যাস-গুরুর নিত্য নীরাজনই বৈয়াসকি-সম্প্রদায়ের নিত্যকৃত্য।

২১শে পৌষ (ইং ৬।১।২০০২), রবিবার শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-দিবস। অপরাহ্ণে সমস্ত ভক্তগোষ্ঠী এবং স্থানীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই পরমোৎসাহে শ্রীব্যাসপূজা-বার্ত্তা সমস্ত নগরে নাগরিকগণের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে একত্রিত হইলেন। শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল-করতাল, ব্যাণ্ডপার্টী, হস্তী, বিচিত্র পতাকা প্রভৃতি সহযোগে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-বিজয়-বিগ্রহ ও শ্রীগুরুবর্গের আলেখ্য অগ্রে করিয়া সকল ভক্তগণ নগরের প্রধান প্রধান রাজপথ দিয়া দলে দলে নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের যে অপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণা করিলেন, তাহাতে ক্ষণকালের জন্যও নাগরিকগণ দেশের, প্রদেশের, নগরের, সমাজের, অঞ্চলের, আত্মীয়ের ও আত্মার (নিজের) বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ ভুলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন—দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত নানা 'ভয়' হইতে মুক্তির প্রেরণা-সৌরভ বুক ভরিয়া গ্রহণ করিলেন।

২২শে পৌষ (ইং ৭।১।২০০২), সোমবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে সকলে স্নানাদি নিত্যকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক বহু আকাঙ্ক্ষিত শ্রীব্যাসপূজার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মঙ্গলারাত্রিকান্তেই শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজের পরিচালনায় শ্রীব্যাসপূজা-অঙ্গীভূত কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি পঞ্চক, আচার্য্যপঞ্চক, তত্ত্বপঞ্চকের পূজা ও হোম আরম্ভ হইল। যজ্ঞশেষে পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্য ও সরলতা লইয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইলে হরিধ্বনি ও উলুধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। কীর্ত্তনীয়া ব্রহ্মচারিগণ হৃদয়াকর্ষী মধুরস্বরে গুরু-বৈষ্ণব-মহিমাসূচক বিভিন্ন কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনধ্বনি প্রপূরিত পূত-পরিবেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ স্বয়ং তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতার পূজা ও আরাত্রিক সম্পাদন করিলেন। তৎপশ্চাৎ তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতা সন্ন্যাসিগণ তাঁহার পূজাবিধান করিলে পর অন্যান্য সকল সন্ন্যাসিগণ, বয়োজ্যেষ্ঠ-

ক্রমে মঠবাসিগণ, গৃহস্থভক্তগণ, মহিলাভক্তগণ, স্থানীয় শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ সকলে একে একে নানা পূজোপহার লইয়া গুরুপাদপদ্ম-অগ্রে উপস্থিত হইয়া আর্ত্তিসহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

তদনন্তর মাধ্যাহ্নিক ভোগারাত্রিকান্তে উপস্থিত প্রায় চতুঃসহস্রাধিক জনগণকে আকণ্ঠ পূরিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়। প্রসাদ-পরিবেশনে মঠবাসী ও

গৃহস্থভক্তগণের সম্মিলিত উদ্যোগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় কাউন্সিলার শ্রীমতী গীতা রায়চৌধুরীর সহযোগিতাও বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে ধর্ম্মসভা আরম্ভ হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন ধর্ম্মসভায় সাক্ষাদ্রূপে উপস্থিত হইতে না পারিলে পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ সভাপতিত্ব করেন। সর্ব্বপ্রথমে উক্ত ব্যাসপূজা-উপলক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সঙ্কলিত "শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে দীনের হরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন"-নামক দীর্ঘ দার্শনিক ও গম্ভীর প্রবন্ধ তদাদেশে শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী পাঠ করিয়া সকলকে শ্রবণ করান। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী পিন-পতন নিস্তব্ধতায় সেই গুরুগম্ভীর তত্ত্বদর্শন কর্ণপুটে পান করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। তৎপশ্চাৎ সভাপতি মহারাজের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকিঙ্কর হরিজন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ প্রভৃতি বক্তাগণ "শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাসপূজা"-বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক বিচার-সম্বলিত বক্তৃতাদ্বারা সকলের অত্যন্ত আনন্দবিধান করেন। গুরুপাদপদ্ম-কৃত উক্ত প্রবন্ধ শ্রীপত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইবে।

পরদিবস অর্থাৎ ২৩শে পৌষ (ইং ৮।১।২০০২), মঙ্গলবার অপরাহ্ণে ধর্ম্মসভায় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মঙ্গল মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সাধু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ভারতী মহারাজ, শ্রীরসানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বক্তৃমহোদয়গণ শ্রীগুরুতত্ত্ব ও বিশেষতঃ গুরুপাদপদ্মের বাল্যাবধি অপূর্ব্ব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যময় জীবনবৃত্তান্ত ব্যাখ্যাদ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর শ্রুতিপিপাসা প্রপূরণ করেন।

শ্রীব্যাসপূজা গৌড়ীয়গণের এক বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত-পর্ব্ব। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পূজা গৌড়ীয়গণের নিত্যকৃত্য হইলেও শ্রীগুর্ব্বাবির্ভাব-বাসরের মহিমাই আলাদা। তজ্জন্য প্রতি বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ এই তিথির বিদায়ে যেমন বিরহকাতর হন, আবার সাথে সাথে অনাগত ব্যাসপূজার দিকে তাকাইয়া সমগ্র বৎসর আশায় বুক বাঁধিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৮ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০২

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিষ্টার্ড)
এস. টি. ডি.ঃ ০৩৪৭২ ☎ ৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** সেবানুগত্যে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ৯ই চৈত্র, ১৪০৮ (ইং ২৩।৩।২০০২) শনিবার হইতে ১৫ই চৈত্র, ১৪০৮ (ইং ২৯।৩।২০০২) শুক্রবার পর্য্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপধামের** অন্তর্গত নয়টী (৯টী) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান মাহাত্ম্যকীর্ত্তন এবং নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে **ষোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা** হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং **শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল**। ইতি—১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৮

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির "সভাপতি-আচার্য্য" অথবা "সাধারণ-সম্পাদক"-এঁর নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৯ই চৈত্র (ইং ২৩।৩।২০০২), শনিবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ১০ই চৈত্র (ইং ২৪।৩।২০০২), রবিবার ;—(৩) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা ; এবং (৪) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়া-মায়াস্থান)।

৩। ১১ই চৈত্র (ইং ২৫।৩।২০০২), সোমবার ;—(৫) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী ; এবং (৬) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর। ***শ্রীএকাদশী-ব্রতোপবাস ।***

৪। ১২ই চৈত্র (ইং ২৬।৩।২০০২), মঙ্গলবার ;—(৭) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৮) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্ক্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)। ***পূর্ব্বাহ্ণ ৭/৩৪ মধ্যে একাদশীর পারণ।***

৫। ১৩ই চৈত্র (ইং ২৭।৩।২০০২), বুধবার ;—(৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারীগুপ্তের পাট, চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ১৪ই চৈত্র (ইং ২৮।৩।২০০২), বৃহস্পতিবার ;—**শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তীর উপবাস ও সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব।**

৭। ১৫ই চৈত্র (ইং ২৯।৩।২০০২), শুক্রবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)। পূর্ব্বাহ্ণ ৯/৪০ মধ্যে শ্রীগৌর-জয়ন্তী-ব্রতোপবাসের পারণ।**

জ্ঞাতব্য ঃ—পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণ হাল্কা থালা ও ঘটি এবং মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন। ৮ই চৈত্র (ইং ২২।৩।২০০২) শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন ; এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ আসিলে থাকা ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। পরিক্রমা ৯ই চৈত্র (ইং ২৩।৩।২০০২), শনিবার প্রাতঃ ৫টা হইতে আরম্ভ হইবে।

卐 "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট" এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয় দান ৮০জি ধারায় আয়কর-মুক্ত।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা** প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। সাধারণ ডাকযোগ **শ্রীপত্রিকা** গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ৪০·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ২২·০০ টাকা ও আজীবন সদস্যপক্ষে ১০০১·০০ টাকা এবং বাংলাদেশবাসীপক্ষে বার্ষিক ৫৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩০·০০ টাকা এবং আজীবন সদস্যপক্ষে ১,৫০১·০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভি. পি. তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য্য।

৩। যে কোনও সময়ে **শ্রীপত্রিকার** গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।**

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণসূচক প্রবন্ধাদি **শ্রীপত্রিকায়** প্রকাশিত হইবে না। সৎ-সমালোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোন কিছু জানিতে বা গ্রাহক-মূল্য পাঠাইতে হইলে **কার্য্যাধ্যক্ষ** অথবা **প্রকাশক, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়**, শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ২৮, হালদার বাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৪ ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে পারেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সংস্করণ), ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। মায়াবাদের জীবনী, ৬। শরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-চরিত, ৮। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রবন্ধাবলী, ৯। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ও পরিক্রমা-গ্রন্থাবলী, ১০। জৈবধর্ম্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১১। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা, ১২। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১৩। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১৪। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৫। শ্রীদামোদরাষ্টকম্, ১৬। অর্চ্চন-দীপিকা, ১৭। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৮। শ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা, ১৯। শ্রীগৌর-কথামালা, ২০। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গ, ২১। সাংখ্য-বাণী, ২২। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ২৩। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ২৪। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২৫। উদ্ধারের পথ, ২৬। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২৭। শ্রীমনঃশিক্ষা, ২৮। শ্রীউপদেশামৃতম, ২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ), ৩০। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ৩১। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য, ৩২। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-কণ্ঠহার, ৩৩। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব, ৩৪। প্রেম-প্রদীপ, ৩৫। শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্ররত্নমালা, ৩৬। মাধুর্য্য-কাদম্বিনী, ৩৭। তত্ত্ববিবেক, ৩৮। ভক্তিতত্ত্ববিবেক, ৩৯। Shri Chaitanya Mahaprabhu, ৪০। The Bhagavat, ৪১। Nam-Bhajan, ৪২। The Vedanta, ৪৩। Vaishnavism, ৪৪। Rai Ramananda, ৪৫। Relative Worlds, ৪৬। A Few Words on Vedanta, ৪৭। Life Story of Impersonalism (Mayabad) or Victory of Vaishnavism (Vaishnava Vijaya)।

CENTRAL REGD. NO. R.N. 5717/57 ❑ POSTAL REGD. NO. CAL/WB/CP-1/2001
LICENCED TO POST WITHOUT PREPAYMENT ❑ LICENCE No. TECH/WB/RNP-9/LPWP-28/2001

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ — তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ। ✆ ০৩৪৭২/৪০০৬৮
২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ — চৌমাথা, পোঃ চুচুঁড়া (হুগলী) পঃ বঃ। ✆ ০৩৩/৬৮০-৭৪৫৬
৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ — কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা) উঃ প্রঃ। ✆ ০৫৬৫/৪০-৯৪৫৩
৪। শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ — দানগলি, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা) উঃ প্রঃ । ✆ ০৫৬৫/৪৪-৩২৭০
৫। শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ — রাণাপতঘাট, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা) উঃ প্রঃ। ✆ ০৫৬৫/৪৪-৪৯৬১
৬। শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ — সন্ন্যাস রোড, পোঃ কঙ্খল (হরিদ্বার) উঃ প্রঃ। ✆ ০১৩৩/৪১-২৪৩৮
৭। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ — গৌরবাটসাহি, পোঃ পুরী (পুরী) উড়িষ্যা। ✆ ০৬৭৫২/৩১৪৭৪
৮। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ — ২৮, হালদার বাগান লেন, কলকাতা-৪। ✆ ০৩৩/৫৪৩-১২৪৭
৯। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ — শক্তিগড়, পোঃ শিলিগুড়ি (জলপাইগুড়ি)। ✆ ০৩৫৩/৪৬-২৮৩৭
১০। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র — পোঃ রান্দিয়াহাট (বালেশ্বর) উড়িষ্যা। ✆ ০৬৭৮৪/৪১৭৪৪
১১। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ — মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং) পঃ বঃ। ✆ ০৩৫৩/৪৬-১৫৯৬
১২। শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ — পোঃ মাথাভাঙ্গা (কোচবিহার) পঃ বঃ। ✆ ০৩৫৮৩/৫৬১৩৪
১৩। শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ — শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫ (বর্দ্ধমান) পঃ বঃ। ✆ ০৩৪৩/৫৬-৮৫৩২
১৪। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ — রংপুর, শিলচর-৯ (কাছাড়) আসাম। ✆ ০৩৮৪২/৩৫৭৩৭
১৫। শ্রীদুর্ব্বাসাঋষি গৌড়ীয় আশ্রম — ঈশাপুর, পোঃ মাঠবন (মথুরা) উঃ প্রঃ। ✆ ০৫৬৫/৪৫-০৫১০
১৬। শ্রীমাধবজীউ গৌড়ীয় মঠ — ১/১ কালীতলা লেন, পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)। ✆ ০৩৩/৬৩২-৫৮৩৮
১৭। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ —পোঃ তুরা (ওয়েষ্ট গারো হিলস্) মেঘালয়। ✆ ০৩৬৫১/২৩৬৯১
১৮। শ্রীনিমানন্দ গৌড়ীয় মঠ — জহরলাল নেহেরু রোড, (ধুবড়ী) আসাম। ✆ ০৩৬৬২/২১৮৩০
১৯। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ — পোঃ গোলকগঞ্জ (ধুবড়ী) আসাম।
২০। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ — পোঃ আশুতিয়াবাড় (মেদিনীপুর) পঃ বঃ।
২১। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ — সিধাবাড়ী, পোঃ রূপনারায়ণপুর (বর্দ্ধমান) পঃ বঃ।
২২। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ — পোঃ বাসুগাঁও (কোকড়াঝাড়) আসাম।
২৩। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ — পশ্চিম খাগড়াবাড়ী, পোঃ কোচবিহার (কোচবিহার) পঃ বঃ।
২৪। শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ — ভাস্করগঞ্জ, পোঃ বালেশ্বর (উড়িষ্যা)। ✆ ০৬৭৮২/৩৬৭২৫৬
২৫। শ্রীগোবিন্দজী গৌড়ীয় মঠ — রেলওয়ে স্টোর গেট্, পোঃ পাণ্ডু, গৌহাটী-১২। ✆ ০৩৬১/৫৭৩৪৮০
২৬। শ্রীদাউজী গৌড়ীয় মঠ — কৈলাস মার্গ, পোঃ বলদেও (মথুরা) উঃ প্রঃ।
২৭। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম — গদখালি, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।
২৮। Shri Giriraj Govardhan Goudiya Math–54 Brisbane St. Murwillimbah N.S.W. Australia
২৯। Shri Binode Behari Goudiya Math–22 Mundaring Wier Rd. Kalamunda, Perth, Australia
৩০। Shri Gour Gobinda Goudiya Math–32 Handsworth Wood Road, Birmingham (U.K.)
৩১। Shri Manila Goudiya Math–15 Bituan St. North Araneta Quezon City, Philippines.

BOOK POST
TO

SL.NO.

From :–

SHRI GOUDIYA-PATRIKA OFFICE
SHRI BINODE BEHARI GOUDIYA MATH
28, HALDER BAGAN LANE
KOLKATA-700 004

✆ 555-8973